সাহিত্য অঙ্গন

ISSN:2394 4889
Vol : IX, Issue : XVIII
15th October 2023

শতবর্ষ পরে—
'কল্লোল' পত্রিকা
এবং.....

লিখেছেন—
সুমিতা চক্রবর্তী
গণেশ বসু
তরুণ মুখোপাধ্যায়
সুমন গুণ
কামরুজ্জামান
অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়
তাপস রায়
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
ঋতম্ মুখোপাধ্যায়
সঞ্জীব দাস
জয়গোপাল মণ্ডল .....

ISSN : 2394 4889 Vol : IX, Issue : XVIII, 15th October 2023 ● সাহিত্য অঙ্গন

সাহিত্য অঙ্গন

(साहित्य आंगन // Sahitya Angan)

ISSN : 2394 4889 Vol : IX, Issue : XVIII 15th October 2023

Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

(Chief Editor : Dr. Joygopal Mandal)

কার্যকরী সম্পাদক

ড. সমরেশ ভৌমিক

ড. সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. মৌসুমী সাহা

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

অভিষেক টাওয়ার, ৪র্থ তল, ফ্ল্যাট নং-২

কলাকুশমা, ডাক-কে. জি. আশ্রম, ধানবাদ-৩২৮১০০৯

SAHITYA ANGAN
An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal
ISSN : 2394 4889 Vol : IX, Issue : XVIII 15th October 2023

Chief Editor :
Dr. Jaygopal Mandal

Working Editor :
Dr. Samaresh Bhowmik
Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay
Dr. Mousumi Saha

© Publisher

Type Setting & Cover Disign :
Manik Sahu
Mob : 9830950380

Printing and Binding :
Granco Process
44, Biplabi Pulin Das Street
Kolkata - 700 009
Ph. : 9331801957

Price : 350.00

Published By :
Dr. Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A.
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P.S. Saraidhela, Dhanbad-828127
Phone : 09830633202 / 7003488354
E-mail : joygopalvbu@gmail.com,
Website : www.sahityaangan.com

Advisory Board :

Prof. (Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam
Prof. (Dr.) Suranjan Middey, Department of Bengali, R.B.U. Kolkata
Prof (Dr) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U.P.
Amar Mitra, (Katha Sahityik: Bankim & Ananda Awarded)
Nalini Bera (Katha Sahityik. Bankim & Ananda Awarded)
Professor (Dr.) Bikash Chandra Paul, Dept. of Bengali, University
Sushil Mondal (Poet), Narendrapur, Kolkata
Tapas Roy (Poet & Kathasahityik), Kasba, Kolkata
Dr. Ritam Mukhopadhyay, Presidency University, Kolkata

Members from the other Countries :

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, Bangladesh) Afroza Shoma (Dhaka, Bangladesh)
Md. Majid Mahmud, (Writer), Greentouch Apt. Mahamudpur, Dhaka

Working Editor :

Dr. Samaresh Bhowmik
Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay
Dr. Mousumi Saha

Working Editorial Board :

Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata
Dr. Soma Bhadra Roy, Associate Professor, West Bengal State University, West Bengal
Dr. Sampa Basu, Associate Professor, Dept. of Bengali, Mahishadal College, Midnapure
Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W.B.
Dr. Nabanita Basu, Assistant professor, Singur Govt. College, West Bengal
Tapas Koley, Boalia, Ujjaini (East), Garia, Kolkata-84
Panchanan Naskar, Scholar, Binod Bihari Mahto Koyalanchal University, Dhanbad
Swapan Kumar Paramanik, SACT, Magrahat College, 24 pgs. (South)
Ujwal Kumar Pramanik, SACT, Saltora Netaji Centenary College, Bankura

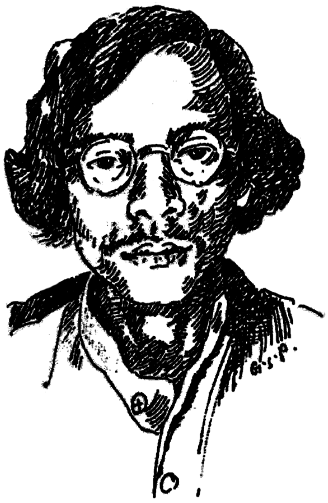

গোকুল চন্দ্র নাগ
(১৮৯৪-১৯২৫)

দীনেশরঞ্জন দাশ
(১৮৮৮-১৯৪১)

অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত
(১৯০৩-১৯৭৬)

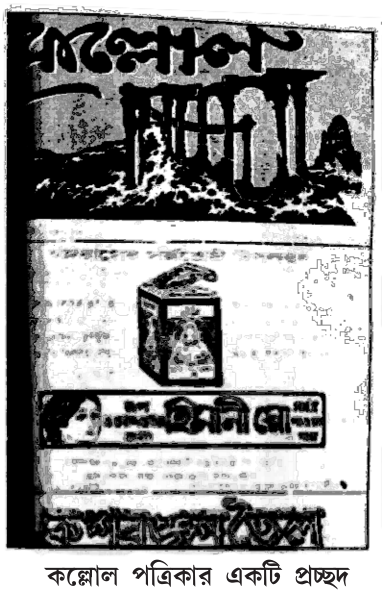

কল্লোল পত্রিকার একটি প্রচ্ছদ
(১৯২৩-১৯২৯)

সূচি

‘পরিচয়লিপি’ : পরিভাব —জয়গোপাল মন্ডল ৭-১৬

প্রথম পর্ব : ‘কল্লোল’ থেকে ‘কবিতা’

কল্লোল পত্রিকার উৎসমূল : একটি ক্লাব এবং নারী পুরুষের সহাবস্থান —সুমিতা চক্রবর্তী ১৭-৩০

কল্লোল ও কালিকলম : দুই দীপ্ত পাখা —তরুণ মুখোপাধ্যায় ৩১-৩৫

কল্লোলিত শনিবারের চিঠি —তাপস রায় ৩৬-৪১

কল্লোল ও তৎকালীন কয়েকটি সাময়িক পত্র —অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২-৫৫

বিবাদ- বিসংবাদ : কল্লোল ও শনিবারের চিঠি—সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬-৬৪

কল্লোল-সংহতি-উত্তরা : সময়ের কথাকার —নিত্যানন্দ মন্ডল ৬৫-৭১

সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও ‘পূর্ব্বাশা’: ‘বাংলার মনোজীবনেরই ইতিহাস’ —কামরুজ্জামান ৭২-৮৩

পরিচয় পত্রিকা : পথ চলতে চলতে —সঞ্জীব দাস ৮৪-৯১

বুদ্ধদেব বসু ও কবিতা পত্রিকা —সুমন গুণ ৮২-৯৭

দ্বিতীয় পর্ব : ‘কল্লোলে’ অনুবাদ ও ইতিহাসে ‘কল্লোল’

বাঙালির গোর্কি-চর্চা: ‘কল্লোল’ থেকে ‘পূর্ব্বাশা’— ঋতম্‌ মুখোপাধ্যায় ৯৮-১০৮

সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যে কল্লোল —স্বপ্ননীল সরকার ১০৯-১১৯

তৃতীয় পর্ব : কল্লোলের কাব্য-কবিতা

বিশ্বকবি ও কল্লোল—বাপ্পাদিত্য ঘোষ ১২০-১২৮

‘রবীন্দ্রেতর কবি’ ও বিষ্ণু দে : কল্লোল প্রসঙ্গ —গণেশ বসু ১২৯-১৫০

অন্ধকার সময় : কবিতাপাখির ডানা ঝাপটানো —পার্থ চট্টোপাধ্যায় ১৫১-১৬৯

কল্লোলের সমকাল : কাজী নজরুল ইসলাম —দেবশ্রী ঘোষ বিশ্বাস ১৭০-১৭৮

একগাদা প্রাণভরা এক মুঠো ঘর আর নজরুল —স্বরূপ দত্ত ১৭৯-১৮৪

কল্লোল : কবিতায় এক ব্যতিক্রমী পালাবদল —গুরুপদ অধিকারী ১৮৫-১৯২

অহর্নিশি জ্বলে আছে যে নক্ষত্রেরা : কল্লোলের কবি-কথা —সুরজিৎ প্রামানিক ১৯৩-২০৩

চতুর্থ পর্ব : কল্লোলের গল্প-কথা

কল্লোলের দীনেশরঞ্জন দাশ —শর্মিলা ঘোষ ২০৪-২১৬

আমার চোখে কল্লোল —হাসি বসু ২১৭-২২১

কল্লোলের নারী গল্পকার —নবনীতা বসু ২২২-২৪৬

কল্লোলের কালে জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে মৃত্যুভাবনা : এক বিপরীত স্রোত —শুভাশিস দাস ২৪৭-২৫৫

এক ব্যতিক্রমী চরিত্র-সন্ধানী গল্পকার জগদীশ গুপ্ত —সুবোধ মণ্ডল ২৫৬-২৬৫

গোকুল নাগের গল্প : 'ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ' —প্রীতম চক্রবর্তী ২৬৬-২৭৭

কল্লোল যুগের বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় —অঞ্জনা দেবরায় ২৭৮-২৮৩

ছোটগল্পে শৈলজানন্দ : এক স্বতন্ত্র পথের নিঃসঙ্গ পথিক —মানস আচার্য ২৮৪-২৯৭

প্রেমেন্দ্রের গল্পে পতিতাবৃত্তি —সমরেশ ভৌমিক ২৯৮-৩০৫

কল্লোল ও তারাশঙ্কর : বাংলা সাহিত্যের এক নব অধ্যায় —সংহিতা ব্যানার্জি ৩০৬-৩১২

পটলডাঙ্গার পাঁচালী : মান্ধাতার বাবার আমলের কথকতা —সাগ্নিক মিত্র ৩১৩-৩২৬

কল্লোলের সাথী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্প —মৌসুমী সাহা ৩২৭-৩২৯

কল্লোল ও সমকালে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প —উজ্জ্বল প্রামাণিক ৩৩০-৩৩৮

কল্লোল-কুল মানিক —নীলাঞ্জনা ঘোষ গুপ্ত ৩৩৯-৩৪২

পঞ্চম পর্ব :

কল্লোলের সূচিপত্র (১৩২৩-১৩২৯) ৩৪৩-৩৭৫

পরিচয়লিপি : পরিভাব

জ য় গো পা ল ম ণ্ড ল

শতবর্ষ অতিক্রান্ত। একটা প্রয়াস-স্বপ্ন-প্রত্যাশা-সৃষ্টির মনের কথা নিয়ে যার যাত্রা শুরু সেই কল্লোল (এপ্রিল ১৯২৩), আজও পাঠকের হৃদয়ে সে ঢেউ এসে ছিটকে লাগে পত্র-পত্র পত্রিকার ইতিহাসের আলো। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ', জীবেন্দ্র সিংহরায়ের 'কল্লোলের কাল', অরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কল্লোল গল্প সমগ্র' (চার খন্ডে), 'কল্লোল কবিতা সমগ্র', রবীন পালের 'কল্লোল কালি-কলমের ছোটগল্প' সেই ইতিহাসের প্রবহমানতায় লালিত। বাংলা সাহিত্যের পালাবদলের কাল চিহ্নিত করেছে এই পত্রিকার সংখ্যাগুলি, মোট ৮১ টি সংখ্যা। প্রবীণ ও নবীন লেখকের রচনামালায় সমৃদ্ধ। নতুন লেখকদের জন্য কল্লোলের আন্তরিকতা সহ সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ এবং সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় বিরামহীন যাত্রা। তবে মাত্র ৭ বছর। কিন্তু এই স্বল্প সময়েও যে সমুদ্র-ঢেউ বাঙালি পাঠকের হৃদয়ে আছড়ে পড়েছিল তা আজও যেন উথলে ওঠে।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে পত্রিকা সম্পাদনা (মাসিক, ত্রৈমাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক) প্রকাশ কি খুব সহজ ছিল? পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে নানা জনে নানা কথা বলেছেন। 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, 'কল্লোলে' কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা প্রকাশ নিয়ে নানা ব্যঙ্গ করেছেন, যদিও এ প্রসঙ্গ অন্যত্র দেখা যেতে পারে। আমার অন্বিষ্ট 'কল্লোল' এবং তার সম্পাদকীয় 'পরিচয়লিপি', বিষয় বিন্যাসের কলাকৌশল এবং পত্রিকার পাতা ভরানোর শিল্পসৌষ্ঠব : কীভাবে নানা ফুলে ফলে সজ্জিত হয়েছে তার গল্প।

এই যে সময়; প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে কোথাও ভাঙা, কোথাও গড়ার খেলা, সমগ্র ইউরোপের ধ্বস্ত চিত্র নিয়ে টি এস এলিয়ট লিখলেন **'The Waste Land'**, বিষ্ণু দে যার অনুবাদ করেছেন 'প'ড়োজমি'। শিরোনামে একটা প্রবণতা স্পষ্ট হয়, কালের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এভাবেই বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যকে নতুন গতিতে নতুন দিকে বাঁক নিতে বাধ্য করেছে। আর এই সময় বাংলা সাহিত্যের সূর্য রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার স্পর্শে এক রবীন্দ্রানুসারী কবি-গোষ্ঠী যেমন আছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথের আনন্দধারার বিপ্রতীপে একটা গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করেন অগ্রজের প্রতি আপন শ্রদ্ধা রেখে, কল্লোল পত্রিকা তাদের প্রশ্রয়। এরপর প্রকাশিত হয়েছিল শনিবারের চিঠি (১৯২৪), উত্তরা (১৯২৫), কালি-কলম (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭), ধূপছায়া (১৯২৭), পূর্বাশা (১৯৩০), পরিচয় (১৯৩১), কবিতা (১৯৩৫)। সবটাই যেন কল্লোলের ফেনায় আলোড়িত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন, "ভাবতে আশ্চর্য লাগে দুটি মাসিক পত্র এই একই বছরে একই মাসে একসঙ্গে জন্ম নেয়। ১৩৩০ বৈশাখ। 'কল্লোল' চলে প্রায় সাত বছর, আর 'সংহতি' উঠে যায় দু'বছর না পেরুতেই।

'কল্লোল' বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ; স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।" (কল্লোল যুগ/ পৃষ্ঠা ১৭)

কবি জীবনানন্দ দাশও এই সময়কে বিশ্লেষণ করেছেন, বাংলা কাব্যের পর্যালোচনা করতে গিয়ে 'কল্লোল'-এর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ সূক্ষ্ম এবং গভীর। তাঁর পূর্বে চলছিল রবীন্দ্রযুগ। যেখানে একা রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল শিখা কেবল নয়, রবিরশ্মিতে বাকিরাও যেন রবীন্দ্রময় : "উত্তররৈবিক যুগ কল্লোলের সময় থেকে আরম্ভ হয়েছিল।................... সাহিত্যে অনূত্তরণ নামে যে এক দীর্ঘ নদী আছে তার এক মহৎ অববাহিকার মত ছড়িয়ে থাকবে যেখানে কোন একজন রবীন্দ্রনাথ নেই, কিন্তু এমন কয়েকজন কবি আছেন যাঁরা সকলে মিলে একসঙ্গে উপস্থিত আছেন বলে কোনো দ্বিতীয় একক রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন নেই। এই যুগ অনেক লেখকের একজনের নয় কয়েকজন কবির যুগ।" (কবিতার কথা/ পৃষ্ঠা ৪০)।

এটাই 'কল্লোল' পত্রিকার কৃতিত্ব—এক নয়, সমূহের দ্যুতি তার তরঙ্গমালা। তবে লক্ষণীয়, এই পত্রিকার পাতায় তো রবীন্দ্রনাথ আছেন, আবার নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল প্রমুখের সঙ্গে শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রবোধকুমার সান্যাল, যুবনাশ্ব সহ আরো কত অখ্যাত-প্রখ্যাত উঠতি লেখক, কত বলব! এভাবে মহানদীর সঙ্গে যেন মিলে গেছে অনেক উপনদী। 'কল্লোল' সম্পর্কে বলতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ নির্দ্বিধায় সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বছর আগেই একটা নতুন প্রস্তুতির ইশারা পাওয়া যাচ্ছিল বাংলা কাব্যে, সেটা কল্লোলের সময়। কল্লোলের লেখকেরা মনে করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ অনেক সার্থক কবিতা লিখেছেন কিন্তু তিনি যাবতীয় উল্লেখ্য বিষয় নিয়ে কবিতা লেখার প্রয়োজন বোধ করেন না। যদিও তাঁর কোনো কোনো কবিতায় ইতিহাসের জটিলতা প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়। তিনি ভারত ও ইউরোপের অনেক জ্ঞাত ও অনেকের মতে শাশ্বত বিষয় নিয়ে শিল্পে সিদ্ধিলাভ করেছেন, কিন্তু জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের নানা রকম সংকেত রয়েছে যা তিনি ধারণা করতে পারেননি বা করতে চাননি।..................... নতুন উপায়ে নতুন বিষয়ের অবতারণা করে কবিতা লেখবার প্রয়োজন বোধ করলেও রবীন্দ্রনাথ যা দিচ্ছিলেন কল্লোলীয় কাব্যে তার অনুলেখনই বেশি চলছিল।................ কবিতার ছন্দ ও আঙ্গিকেও কোনো নতুন আবিষ্কার হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে গদ্য কবিতার একটা বিশেষ ভঙ্গি যা ঠিক রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায় না তার ভিতর কল্লোল নিজের মন খুঁজে পেয়েছিল বোধ হয়।" (কবিতার কথা/ পৃষ্ঠা ১২৯-১৩০)

এই যে সেকালের কবির চোখে কল্লোলের স্বতন্ত্র উদ্যোগ- উচ্ছ্বাস, স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা সৃষ্টির একান্ত প্রয়াস সে তো একটা যুগ নির্মাণের উত্তরাধিকারী। কবি-প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব

বসুর কথাও স্মরণীয় : “নজরুল ইসলাম নিজে জানেননি যে, তিনি নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন; তাঁর রচনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই।.................. যে প্রক্রিয়া অচেতনভাবে তাঁর মধ্যে শুরু হলো তা সচেতন স্তরে উঠে আসতে দেরি হলো না। যাকে ‘কল্লোল যুগ’ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অভাব বোধ জেগে উঠল বন্ধ্য প্রাচীনের সমালোচনার ক্ষেত্রে নয়, অর্বাচীনের সৃষ্টির ক্ষেত্রেই। মনে হলো তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা চিহ্ন, মনে হল তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের অনস্বীকার্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।” (প্রবন্ধ সংকলন/ রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক/ পৃষ্ঠা ৭৩)

এই যা কিছু রবীন্দ্রনাথে নেই তার সবকিছু নিয়ে কল্লোলের উদ্যম যাত্রা। কথাসাহিত্যে শৈলজানন্দ থেকে শুরু করে কবিতায় জীবনানন্দ নিয়ে এলেন নতুনের ডাক, নজরুলের চড়া ধ্বনি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের হৃদয় নিংড়ানো সুর আর নতুন নতুন লেখক এবং লেখিকার নতুন বিষয় নিয়ে নতুন আঙ্গিকে সমবেদনার আর্তি-আকুলতা—এত কিছুর মূল নায়ক গোকুলচন্দ্র নাগ এবং দীনেশরঞ্জন দাশ। জীবেন্দ্র সিংহ রায় ‘কল্লোলের কাল’ গ্রন্থে লিখেছেন, “ফোর আর্টস ক্লাব বা চতুষ্কলা সমিতি বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি ইতিহাসের একটি স্মরণীয় নাম। বঙ্গসংস্কৃতির মুখ্য কেন্দ্র কলকাতায় নারী পুরুষের ক্লাব হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা।............ ক্লাবটি মুখ্য তো দুজন ব্যক্তির স্বপ্ন ও ভাবনার ফল। দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১) একদা কলকাতার রাজপথে পরিচিত হয়েছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগের (১৮৯৪-১৯২৫) সঙ্গে। প্রথমজন তখন চৌরঙ্গী অঞ্চলে খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা এস রায় এন্ড কোম্পানিতে কাজ করতেন; আর দ্বিতীয়জন দেখাশুনা করতেন তাঁর মামা এস বোস ফ্লোরিস্টের নিউমার্কেটের ফুলের স্টলটি। এরপর দীনেশরঞ্জন আগের কাজটি ছেড়ে দিয়ে লিন্ডসে স্ট্রীটের একটি ওষুধ দোকানের কাজ নেন। তখন একেবারে কাছাকাছি থাকতেন বলে তিনি নিউমার্কেটে গোকুলচন্দ্রের দোকানে যখন তখন যেতেন।” তারপর তাঁদের সেই আড্ডার প্রসারিত রূপ এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা। এই ক্লাবের চিত্রশিল্প বিভাগের প্রধান ভূমিকা নিতেন দু’জন দীনেশরঞ্জন দাশ ছিলেন কমার্শিয়াল আর্ট ও কার্টুন অঙ্কনে পারদর্শী এবং গোকুলচন্দ্র ছিলেন পাশ করা আর্টিস্ট ও তৈলচিত্র নির্মাণের দক্ষ শিল্পী। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষ্যে : গোকুলচন্দ্র “প্রবাসী, ভারতীতে ছোট ধাঁচের প্রেমের গল্প লিখত, যাতে অর্থের চাইতে ইঙ্গিত থাকত বেশি, যার মানে দাঁড়ি ক’মার চেয়ে ফুটকিই অধিকতর। সেই ফুটকি চিহ্নিত হেঁয়ালির মতই মনে হতো তাকে।” —এই যে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি, -এর মধ্যেই নিহিত ছিল ‘কল্লোল’ প্রকাশের বীজ।

তারপর তো দুজনের সাথে গড়ে ওঠে কল্লোলের ধারা। এর উৎস ও ইতিহাস (কল্লোল পত্রিকার উৎসমূল : একটি ক্লাব এবং নারী-পুরুষের সহাবস্থান) নিয়ে লিখেছেন অধ্যাপক

সুমিতা চক্রবর্তী। কবি গণেশ বসুর মননে 'কবি বিষ্ণু দে এবং কল্লোল প্রসঙ্গ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ মুখোপাধ্যায়, সুমন গুণ কামরুজ্জামান, সঞ্জীব দাস—এমন অনেক প্রাবন্ধিকের রচনায় এই সংখ্যা সমৃদ্ধ। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

আমার লক্ষ্য পত্রিকার সম্পাদক-দ্বয়ের নানা দৃষ্টিভঙ্গি, পত্রিকার পাতায় সম্পাদকীয় না থাকলেও তারই বিচিত্রতা। সম্পাদকীয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকে কালের বার্তাবাহক কিংবা প্রকাশের নির্দিষ্ট অভিমুখ, আদর্শ-চেতনার দলিল হিসেবে। সম্পাদকের কলমে এমন ক্ষুরধার দৃষ্টিভঙ্গিও প্রচারিত হয় যা পাঠক তথা দেশবাসী বা সমাজের কাছে অনেকটা প্রেরণাদায়ক অথবা দার্শনিক প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি শাসকের গদি তলিয়ে দেওয়ার মত তথ্য, ভিত নাড়িয়ে দেয়ার মত বীজ অন্তর্নিহিত থাকে।

ব্রিটিশ—শাসিত ভারতবর্ষে ১৯ শতকে শুরু হয়েছিল সাময়িক পত্রিকার যাত্রা। যদিও অধিকাংশই সম্পাদক ছিলেন ইউরোপীয়। প্রায় একই সঙ্গে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশ করে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রথম বাঙালি হিসেবে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহসিকতা দেখান। তার বিবর্তনে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণকে এড়িয়ে এখন চলে লিটিল ম্যাগাজিনের অনন্য লড়াই। এর মধ্যে নানা প্রকারের উদ্দেশ্য ছিল কোনও লেখকগোষ্ঠী তাদের মত করে নিজেদের পসরা পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন কবিতা-আত্মার আকুতিতে, সমালোচকেরা হয়তো বলবেন আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কখনো কোন লিটিল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আত্মপ্রচারের সাথে সাথে সমকালের প্রবীণ ও নতুন লেখকদের যৌথ প্রয়াসে কালের পটচিত্র হিসেবে তাদের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায়? 'কল্লোল'-'সংহতি'-'উত্তরা' কি এই লিটল ম্যাগাজিনের পূর্বসুরি নয়? এই সব পত্রিকার মধ্যে প্রথম দেখি বর্তমানের সূচনা।

যাই হোক বাঙালি পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কিংবা সাময়িক পত্র হিসেবে 'বাঙ্গাল গেজেটি' থেকে শুরু করে 'বঙ্গদর্শন'(বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত), 'সবুজ পত্র' (প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত) সব পত্রিকার সম্পাদকীয় পাঠকের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। হয়তো এই কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পত্রিকা প্রকাশক এবং সম্পাদকের উদ্দেশ্যে নিয়মের বেড়াজাল তৈরি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায় :

"সে যুগে কোম্পানীর গবর্নমেন্ট সংবাদপত্রের উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহারা অধিকাংশ সংবাদপত্রের রচনা-ভঙ্গি উগ্র এবং ভাষা ইতর ও অশ্লীল বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই কারণে এবং সৈন্যসামন্তের গতিবিধি, জাহাজ গমনাগমনের সংবাদ প্রভৃতি যাহাতে অবাধে সংবাদপত্রে প্রচারিত হইতে না পারে, তজ্জন্য ১৭৯৯ সনের মে মাসে লর্ড ওয়েলেসলি সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংকোচবিধান করেন। তখন হইতেই নিয়ম হয়, সেক্রেটারির

দ্বারা পরীক্ষিত হইবার পূর্বে এ-দেশে কোন সংবাদপত্রই প্রকাশিত হইতে পারিবে না; নিয়মভঙ্গ করিলে সম্পাদককে ইউরোপে নির্বাসিত হইতে হইবে।" (বাংলা সাময়িক-পত্র / পৃষ্ঠা — ২)

বলা বাহুল্য প্রথম দিকের প্রকাশিত সংবাদপত্রের অধিকাংশ সম্পাদক ছিলেন বিদেশী। ইতিহাস থেকে জানা যায় 'দিগ্দর্শন'(সম্পাদক : ক্লার্ক মার্শম্যান / মাসিক / এপ্রিল ১৮১৮), 'সমাচার দর্পণ'(সম্পাদক : জে সি মার্শম্যান / সাপ্তাহিক / ২৩ মে ১৮১৮), 'বাঙ্গাল গেজেটি' (সম্পাদক : গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য / সাপ্তাহিক / জুন ১৮১৮) থেকে শুরু করে দীর্ঘ যাত্রাপথ হাজার হাজার পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছিল। সেই যাত্রাপথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পর্বে সমগ্র ইউরোপের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষেও নতুন সংযোজন ঘটতে থাকে। 'কল্লোল' সেই সমুদ্র-সৈকতে নবতর সৃষ্টির উল্লাস। যেন এক নতুন পালতোলা নৌকা, নাকি উদ্দাম উচ্ছ্বাসে নতুন ধারা। নতুন বলেই ছিল না প্রথাগত প্রকাশের রূপ, ঢঙ, কোনও সম্পাদকীয় নেই, নতুন এক বিন্যাস 'পরিচয়লিপি' দিয়ে শুরু। জীবনানন্দ দাশের দৃষ্টিতে এখানে কোনো একক প্রতিভার প্রতিভাস নয় ; গোষ্ঠীর মুখ উল্লসিত। এ প্রসঙ্গে জীবেন্দ্র সিংহরায়ের পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ :

"কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কল্লোলের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৩০) কোনো পত্রসূচনা, মুখপত্র, ভূমিকা, সম্পাদকীয় নিবেদন নেই। তাই পত্রটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা আমরা পাই না। বঙ্কিম (১৮৩৮-১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী স্ব স্ব পত্রিকা প্রকাশের সময় ছিলেন প্রতিষ্ঠিত লেখক ও চিন্তাবিদ। দেশের কাছে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বলবার সামাজিক ও সাহিত্যিক অধিকার তাঁদের ছিল। কিন্তু কল্লোল ছিল দু'জন স্বপ্নাভিলাষী সাহিত্যনবিশের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা মাত্র।" (কল্লোলের কাল /পৃষ্ঠা — ২৮)

এই পর্যবেক্ষণ যেমন সত্য, আবার এও তো হতে পারে 'কল্লোল' প্রকাশের যে আবেগ সেখানে 'ফোর আর্টস ক্লাব' তথা গোষ্ঠীর উন্মাদনা — উচ্চারণ মুখ্য, সম্পাদনায় এক নতুন ঘরানা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাও সচেষ্ট ছিল, যেন এক নতুন ধরণের প্রচ্ছদ নির্মাণের পরিকল্পনা : পরিচয়লিপি, সূচিপত্রের নিচে ফাঁকা অংশে বিজ্ঞপ্তি আকারে উদ্দেশ্য প্রকাশের বিস্ময় পরিকল্পনা—নবীন প্রজন্মের পাঠক ও লেখকের জন্য উন্মুক্ত জানালা, ছবি, সমাচার, আলোচনা, 'ডাকঘর' ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে সম্পাদকের অভিমত প্রকাশিত; যুগচিন্তার নানা দৃশ্য ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়, বিচিত্র সুরে নীরবে নিভৃতে উচ্চারিত। আসলে 'কল্লোল' এক সময়ের দাবি, গল্পগাথা। অধ্যাপক জীবেন্দ্র সিংহরায়ের একটি মন্তব্যের সাথে এখানে একমত হওয়া যায়:

"১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'কল্লোলের জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা ছিল ক্রমবর্ধমান, সেখানে কল্লোল গোষ্ঠীরই একাংশের পৃথক হয়ে গিয়ে 'কালি-কলম' প্রকাশের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল কিনা, সেটা ভেবে দেখতে হবে।.............. দুটি কাগজেরই প্রকাশিত সংখ্যাগুলি পড়লে মনে হয়, কালক্রমে সমাজে ও মানসে যে সমস্ত নতুন সংশয়, সংকট ও অনুভব এসে

পড়েছে, তা স্পষ্ট ও সংহত করে তোলা প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের নতুন মানুষের দেহমনের আরেক চেহারা ফুটিয়ে তোলা দুটি কাগজের লেখকদেরই উদ্দেশ্য ছিল।" (কল্লোলের কাল / পৃষ্ঠা — ১৪৩)

এক্ষেত্রে নিজস্ব অভিজ্ঞতায় দেখেছি এই যে গোষ্ঠীর গড়ে ওঠা আবার ভেঙে যাওয়ার নেপথ্যে কোনো কোনো মানুষের ব্যক্তিগত লিপ্সা অথবা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির স্বার্থের সংঘাত অন্তর্লীন স্রোতের মত বহমান থাকে। আবার এও দেখেছি গড়িয়ার অশনি নাট্যমের মতো (৫০ বছর অতিক্রান্ত) নাট্য সংগঠনের মধ্যেই কোনো ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রকাশ পায় না (যদিও নাট্যকার প্রদীপ সেনগুপ্তের নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও পরিচালনা দৃশ্যমান)। এই সংগঠনের নেপথ্যে এক রাজনৈতিক দর্শনও তারের মতো বেঁধে রাখে সবাইকে। যেমন দেখি কল্লোল গোষ্ঠীর আড্ডায় : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালের সংকট — সংশয় — দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সমাজ জিজ্ঞাসার মুখপত্র করে তোলাই একমাত্র অভীষ্ট, ব্যক্তি নয় গোষ্ঠী নায়ক। কিন্তু যে উদারতা শিল্পী — লেখক গোকুলচন্দ্রের মধ্যে ছিল তা হয়তো দীনেশরঞ্জন দাশের মধ্যে থাকলেও তাঁর অকাল মৃত্যুর পর সেই চেতনা একক প্রচেষ্টায় রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। একালের 'সুইন হো স্ট্রীট' (প্রথম প্রকাশ—২০০০ খ্রিস্টাব্দ) একটি বিশুদ্ধ কবিতা বিষয়ক এবং কবিতা-পত্রিকা। কিন্তু লেখা থাকে 'একটি অসম্পাদিত সাদামাঠা কবিতার কাগজ—যেন সব লেখকই সম্পাদক। অথচ সকলেরই জানা—কবি-কথাসাহিত্যিক তাপস রায়ের সম্পাদনার প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১), সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১), সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২), সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) থেকে শুরু করে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্য নিয়ে হাজার হাজার পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছিল ; সেইসব পত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ এবং গবেষণার আকরও। সম্পাদকীয় বলতে বুঝি পত্রিকার মুখবন্ধ, ঐ সংখ্যার বিশেষত্ব, মূল সুর। বিশেষত 'বঙ্গদর্শন' থেকে এর শৈল্পিক নানা দৃষ্টিভঙ্গি দীপ্যমান। সে ইতিহাস আজও আমাদের ভিত্তি, পথ চলার চাবিকাঠি।

স্বাভাবিক-ভাবেই একটা স্বতন্ত্র ঘরানা সৃজনের পরিকল্পনা নিয়ে কল্লোলের আত্মপ্রকাশ বলা যায়। সম্পাদকীয় রচনার প্রথাসিদ্ধ রীতি-নীতির বাইরে অন্যতর ভুবন গড়ার লক্ষ্যে গোকুলচন্দ্র নাগ ও দীনেশরঞ্জন দাশ যেন ব্রত নিয়েছিলেন। যদিও এর নেপথ্যভূমি তৈরি হয়েছিল ফোর আর্টস ক্লাবের সৌজন্যে —কেউ কেউ মনে করেন।

পত্রিকার সূচি নির্মাণের যে সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি, কল্লোলের একশ বছর আগেই নির্মিত কৌশল উপেক্ষা করে লিখলেন 'পরিচয়লিপি', কোনও সম্পাদকের নাম উল্লেখ না করেই। আসলে গল্প — উপন্যাস, কবিতা ছাড়া যা কিছু বিভাগ সেখানেই লেখকবিহীন সম্পাদনা, শিরোনামেই বিষয়-মাধুর্য। 'কল্লোল' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বিপণন এবং পাঠকের মন নিয়ে কতটা সজাগ থাকতেন তা সুস্পষ্ট হয় বিজ্ঞাপনের কলাকৃতি দেখলেই।

"বিজ্ঞাপন"

১। ১৩৩০ সালের কল্লোল আর মাত্র ২০টা পূর্ণ-সেট আছে। কাহারও প্রয়োজন হইলে আপিসে, তিনি যেন সত্বর একসেটের মূল্য বাবদ ৩।০ টাকা ও ডাক খরচ তিন আনা সমেত ৩৵০ মনিঅর্ডার করিয়া আমাদের পাঠাইয়া দেন।

২। গত বৎসর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছিল। তাহা পুনরায় মুদ্রিত করিতে আমাদের বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছিল। এ বৎসর কোনও সংখ্যা ফুরাইয়া গেলে, তাহা আর পুনরায় ছাপিতে পারিব না। পাঠক-পাঠিকাদিগের নিকট সানুনয়ে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন বৎসরের প্রথম দিকেই গ্রাহক শেণীভুক্ত হইয়া আমাদিগকে বাধিত করেন।

৩। কল্লোলের জন্য রচনা পাঠাইতে হইলে সঙ্গে ডাকটিকিট দিবেন। ভাল ছোট গল্প হইলেই ভাল হয়। চিঠিপত্রের উত্তরের জন্য ও ডাকটিকিট পাঠাইলে সুবিধা হয়।"

বিজ্ঞাপণের এই প্রকৃতিতে পত্রিকার অভিমুখ সিদ্ধ হয়। নতুন লেখকদের সামনে কতটা উদার ও উন্মুক্ত জানালা রেখেছিলেন, তাও প্রতীয়মান।

১৩৩১ বঙ্গাব্দ, 'কল্লোল' প্রকাশের এক বছর অতিক্রান্ত, কেমন ছিল 'পরিচয়লিপি' একটা উপস্থাপন করা যাক :

"কল্লোলে গত এক বৎসর ধরিয়া পরিচয়লিপি লেখা হইতেছে। এই পরিচয়লিপির উদ্দেশ্য, লেখক বা লেখিকাদিগের রচনার ভিতর যে বিশেষ একটি ভাব থাকে তাহা পাঠক-পাঠিকাদের নিকট উপস্থিত করা। কল্লোলের প্রতি সংখ্যার সমস্ত রচনাগুলির বিচিত্রতা হইতে একটি সহজ সুর সংগ্রহ করিয়া তাহাও পরিচয়লিপির আকারে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা অনেক লেখকের লেখাকে সাধারণের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত করিয়া দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। যাঁহারা স্বভাবতঃ একটু সঙ্কোচ করেন, অথচ তাঁহাদের রচনাশক্তি আছে, এমন অনেক লেখককে এই অবসরে বাংলার পাঠকসমাজে সুপরিচিত করিতে পারাও সৌভাগ্য ঘটে।

সম্পাদকীয় কর্তব্য পালন করিতে গিয়া যাঁহাদের ক্ষুণ করিয়াছি, সে অপরাধ ইচ্ছাকৃত নয় জানিয়া মার্জনা চাহিতেছি।

আজ এক বৎসর পরে পাঠক পাঠিকা ও বন্ধুদের অত্যন্ত আনন্দের সাহিত আমাদের প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইয়া বলিতে পারি যে কল্লোল এই সকল নানা অবস্থার ভিতরেও আপনাদিগকে ইহার বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া সেবা করিতে পারিয়াছে। ইহার অন্য কোনও কারণে কল্লোল কখনও ভয় পায় নাই, ভয় পাইবে না। আরও সুখের কথা কল্লোলের যে অল্পাধিক গ্রাহক-গ্রাহিকা আছেন তাহারা সাধারণের অপেক্ষা বিশেষ ভাবে পৃথক বলিয়া চিহ্নিত এবং তাঁহারা প্রায় সকলেই আজ পর্যন্ত কল্লোলের হিতৈষী ও সহযাত্রী রূপে ইহার সুখেদুঃখে জড়িত হইয়া রহিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে নূতন বৎসরের নমস্কার জানাইয়া বৈশাখের কল্লোল উপহার দিতেছি।

এবারকার সংখ্যায় ধ্যানী-কবি রবীন্দ্রনাথ "শেষ অর্ঘ্যে' বিদায়ের গান গাহিয়া যাত্রা করিয়াছেন, আমরা প্রার্থনা করি বিশ্বকবি ও তাহার সহযাত্রীগণ এই দেশ-পর্য্যটন মহিমান্বিত করিয়া ফিরিয়া আসুন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় ও শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এ সংখ্যায় তাঁহাদের রচনা কল্লোলের পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিতেছেন।

এই সংখ্যায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পারের খেয়া' গল্পটি মনোনীত হইয়াছে।

শ্রীসুনীতি দেবী, শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী, শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়, শ্রীলীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুধীর চৌধুরী, শ্রী অহল্যা গুপ্ত, শ্রীহরিহর চন্দ্র, শ্রীনীলিমা বসাক, কাজী নজরুল ইসলাম, শ্রীসান্ত্বনা বসাক, শীসুবোধ রায়, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখক- লেখিকাগণ কল্লোলের প্রাণ-শক্তির সহিত বিশেষ ভাবে যুক্ত। তাঁহাদের রচনা ও উৎসাহ কল্লোলকে বহু ভাবে সাহায্য করিয়াছে।

শ্রীকুমুদিনীকান্ত কর তাঁহার 'বিচ্ছেদ' নামক গল্পে 'ছোট ভাইয়ের' চরিত্রটি সুন্দর সৃষ্টি করিয়াছেন।

আজ বৈশাখে সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আশা করি আবার সকলে প্রদীপ্ত উৎসাহে সমস্ত অসারতাকে অবহেলা করিয়া এই কল্লোলের সার্থক যাত্রায় যোগ দিবেন।" (বৈশাখ, ১৩৩১)

এখানে সুস্পষ্টভাবে সম্পাদক-দ্বয় আত্মপ্রচারের জন্য নিজ নাম মুদ্রিত করেননি। এ যেন সকলেরই জানা। এই সংখ্যায় আমরা বুঝতে পারি যে 'পরিচয়লিপি' কী ও কেন লেখা : এখানে তার অভিমুখ এবং সুর সহজভাষ্যে উচ্চারিত। একই সঙ্গে নবাগত লেখকদের 'সঙ্কোচ' উপেক্ষা করে লেখা পাঠানোর অনুচ্চারিত আহ্বান এবং তাদের লেখা যে অত্যন্ত গৌরবের সাথে প্রকাশ করা হবে সেই মরমী ডাক ধ্বনিত। কল্লোলের এই যে চরৈবেতি—এগিয়ে চলার মুখর গতি; নব কলস্বনা সমুদ্র-উচ্ছ্বাস, সেকথাও এখানে লিপিবদ্ধ। এই স্বল্প পরিসরে কালের পদচিহ্নও ছাপ রেখেছে : "এবারকার সংখ্যায় ধ্যানী-কবি রবীন্দ্রনাথ 'শেষ অর্ঘ্যে' বিদায়ের গান গাহিয়া যাত্রা করিয়াছেন, আমরা প্রার্থনা করি বিশ্বকবি ও তাঁহার সহযাত্রীগণ এই দেশ-পর্য্যটন মহিমান্বিত করিয়া ফিরিয়া আসুন।"— কবিগুরু সে সময় (১৩৩১) ৬৩ বছর বয়সে পেরু সরকারের আমন্ত্রণে পেরু ভ্রমণে যান, সেখান থেকে মেক্সিকো (উভয় দেশের সরকার শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীকে এক লক্ষ মার্কিন ডলার অর্থ দান করেন)। ১৯২৪-এর ৬ নভেম্বর আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এয়ার্সে উপস্থিত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময় ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথেয়তায় মিরালিওতে কবি চলে যান। ১৯২৫-এর জানুয়ারিতে তিনি দেশে ফেরার জন্য যাত্রা করেন। কবির এই বিদেশ ভ্রমণও কল্লোলের 'পরিচয়লিপি'কে বিশিষ্টতা দান করেছে। আর আছে বর্তমান সংখ্যায় যাঁদের লেখা ছাপা হয়েছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং তার গুরুত্ব।

আবার এই 'পরিচয়লিপি'র অন্তিমে ফাঁকা অংশ ভরাটের জন্য কল্লোলের 'পাঠক পাঠিকা ও লেখক লেখিকার' উদ্দেশ্যে গল্প পাঠানোর আহ্বান লক্ষণীয়—পত্রিকায় প্রকাশের মূল লক্ষ্য যে গল্প তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে : "কল্লোলের পাঠক পাঠিকা ও লেখক লেখিকার গল্পগুলি আমরা যতদূর সম্ভব যত্ন করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকি। অনেক রচনা ফিরাইয়া দিতে হয়। লেখক লেখিকারা যদি ছোট গল্প পাঠান, তাহা হইলে আমরা আনন্দের সহিত তাহা প্রকাশ করিব।"(১৩৩১, জ্যৈষ্ঠ)

কল্লোলের অন্য এক বিভাগ : 'সমাচার', কখনো কখনো গ্রন্থ প্রকাশের সংবাদ যেভাবে আন্তরিকতার সাথে ঘোষিত হয়েছে, তা সত্যিই অভাবনীয়। একালের পত্র পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনা বা গ্রন্থ সমালোচনা প্রকাশিত হয়, কল্লোল হয়তো এক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল। এমন আরও একটি বিভাগ : 'আলোচনা'— কার লেখা উল্লেখ নেই ; গোকুলচন্দ্রের নাকি দীনেশরঞ্জন দাশের? আলোচনা বেশ সমৃদ্ধ, যুক্তিনিষ্ঠ, সহজ-সরল, গতিশীল সে যাত্রা। গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ : 'ছবি', 'সংগ্রহ' 'ডাকঘর', 'প্রাপ্ত পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়' এবং 'বঙ্গদর্শন', 'ছিন্নপত্র', 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রভৃতি নানা বিখ্যাত পত্রিকা, গ্রন্থের তাৎপর্যপূর্ণ অংশ পুনরায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। এভাবেই কল্লোল বিচিত্র বিষয়ে এবং সারস্বত সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ, নতুন ও পুরাতনের শিল্পিত সৌরভ।

সর্বোপরি একটি বিষয় বিশেষ করে ভাবনায় আলোড়িত করে, কবি-প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর ভাষ্যে "যাকে কল্লোল-যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।" কিন্তু যদি কল্লোলের সব সংখ্যা মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে দেখব কোনো কোনো লেখকের সৃজনশৈলীতে রবীন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করে আত্মপ্রসাদের গুণ পরিলক্ষিত হলেও সম্পাদনার ছত্রে ছত্রে রবীন্দ্রনাথ জুড়ে আছেন। অবাক করার মতো ঘটনা কল্লোলের 'বিষয় সূচী'র নিচে শূন্যতা পূরণে যে রবীন্দ্র বন্দনা প্রকাশিত তা গভীর অরণ্যে যেন প্রশান্তির বার্তা আনে : "বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষগণ পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ করিয়া—রবীন্দ্রনাথের কবিতা সর্বসাধারণে প্রচার করিবার যে বিরাট আয়োজন করিয়াছেন, তাহা একান্ত শ্রমসাধ্য এবং বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। সাধারণতঃই রবীন্দ্রনাথ বাংলার সকল শিক্ষিত নরনারীর প্রিয় এবং তাঁহার কবিতা অনেকেরই বিশেষ আদরের সামগ্রী। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাঁর সব বই সাধারণের পক্ষে খুব সুলভ নহে। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্য-গ্রন্থের একত্র সমাবেশে একটা "শোভন সংস্করণ" আছে বটে, কিন্তু বিশেষ ব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া জনসাধারণের তাহাতে কোনও অধিকার নাই। আমাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গদ্য, পদ্য এবং নাটকের 'শোভন সংস্করণ' অপেক্ষা একটি 'সুলভ সংস্করণে'র অভাব দেশের লোক বেশী বোধ করিতেছে এবং তাহাতে রবীন্দ্রনাথের দেশের লোকের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা লাভ করা ছাড়া 'সুলভ' (Cheap) হইয়া পড়িবার আশঙ্কা নাই।" (১৩৩১, জ্যৈষ্ঠ)

পত্রিকার প্রথম থেকে প্রায় শেষ অবধি যেভাবে বহু সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা, (ছবি প্রসঙ্গে) নানা ধ্রুপদী মন্তব্য, নাটক প্রভৃতি দিয়ে অত্যন্ত কৌশলে পত্রিকার পাতা সাজিয়েছেন (এককথায় থরে থরে ডালি ভরেছে রবীন্দ্র-পুষ্পে) রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি (গীতিমাল্য, ছিন্নপত্র, মুক্তধারা, ফাল্গুনী, ব্যথার দান আরও কত) দিয়ে তা তো রবীন্দ্র — শ্রদ্ধা এবং ভক্তি নিবেদনের সামিল।

যে সুর বেজে উঠেছিল ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় কবি-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের কবিতার শব্দ-ব্রহ্মে সেই লয় বজায় ছিল সৃজনের তৃষাজলে, কিন্তু আজও সমগ্র বাঙালি জাতি রবীন্দ্রনাথের বাণী ও সুরে যেভাবে আত্মমগ্ন, আত্মলীন, আত্মচেতনার সমৃদ্ধি ঘটায়—ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের পূজা, আরতি করে তা অনস্বীকার্য। সেকাল থেকে একাল, আগামীকালও রবীন্দ্রনাথ বাঙালির চেতনায় সবুজের নেশা লাগাবে, আর কল্লোল তো পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের সজীব ও পরম আত্মীয়তা। আলোচ্য পত্রিকার 'পরিচয়লিপি'কে এক বিস্ময়কর সৃষ্টিও বলা অত্যুক্তি হবে না। 'পরিচয়লিপি' একা নয়, আলোচনা, সমালোচনা, সংগ্রহ, ছবি, সমাচার, রঙীন ছবি, নিয়মিত লেখক, প্রাপ্ত পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় এমন ব্যতিক্রমী শিরোনামে সম্পাদকের দায়িত্ব ও অভিজ্ঞতার আকর প্রকাশিত, এককথায় অনবদ্য, অনন্য, অনুকরণীয়।

কেউ কেউ বলেন যে 'কল্লোল' প্রতিষ্ঠিত লেখকের সৃজনশৈলীতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, নতুন কোনো খ্যাতনামা লেখকের প্রতিষ্ঠানভূমি হয়ে উঠতে পারেনি। কথাটা একেবারে ভুল— শৈলজানন্দ; অচিন্ত্যকুমার তো তখনও খ্যাতির শিখরে পৌঁছয়নি, কল্লোলের ফেনিল উন্মাদনা কি এঁদের সারস্বত সাধনাকে প্রাণিত করেনি? প্রায় সব পত্রিকার ঠাঁই ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, একই সঙ্গে নবাগত অনেক লেখক আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করে। তাঁদের প্রতিভার স্ফূরণের এমন, আত্মশ্লাঘা প্রকাশের সুলভ ক্ষেত্র তো কল্লোলের মতো পত্রিকাগুলি (এখন লিটল ম্যাগাজিন ভাষ্যে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়)। আর তাঁদের পরিচিতি-জনপ্রিয়তা কিংবা খ্যাতির জন্য পত্রিকার ভূমিকা যেমন থাকে তেমনি পাঠকেরও দায় থাকে নবাগতকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করা। একালের বাণিজ্যিক পত্রিকা আনন্দবাজার কিংবা দেশ পত্রিকার মতো বহু পত্রিকায় যাঁদের লেখা মুদ্রিত হয়—সবাই কি প্রখ্যাত হয়ে ওঠেন? দেখা যায় অনেক কাঁচা লেখা পাকা মাথার রূপে প্রকাশিত হয়। আসল কথা 'কল্লোল' একা কোনও যুগ নাও হতে পারে, কিন্তু যুগের সূচনা করেছিল—একথা নির্দ্বিধায় উচ্চকণ্ঠে বলা যায়। 'কল্লোল' আগামীর এক বাতাবরণ। যে বাতাবরণ খুলে একালের লেখক- লেখিকা-সম্পাদক মুক্তির শ্বাস গ্রহণ করতে পারে। এই উন্মুক্ত আকাশ আজও দিলখোলা, অমর কৃতিত্বের চাবিকাঠি।

‘কল্লোল’ পত্রিকার উৎসমূল : একটি ক্লাব এবং নারী-পুরুষের সহাবস্থান

সু মি তা চ ক্র ব র্তী

একশো বছর অতিক্রান্ত। ‘কল্লোল’ পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যবিন্দুতে। এই পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন কারণে স্মরণযোগ্য হয়ে আছে। তা নিয়ে আলোচনাও কম হয়নি। খুব সংক্ষেপে বলা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে পৃথিবীর সব দেশেই চিন্তন, মনন ও ভাবাবেগের জগতে এসেছিল অভাবিতপূর্ব পরিবর্তন। মানুষের মনে দেখা দিয়েছিল ঈশ্বর সম্পর্কে অবিশ্বাস ও সংশয় জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতাকে; হতাশা ও নিরাশ্রয়তার বোধকে; অমঙ্গলবোধকে স্বীকার করে নিয়েছিল বিশ্বের মানুষ। সেই সঙ্গে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকেই ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯), অ্যাডলার (১৮৭০—১৯৩৭) প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদেরা মনের অবচেতন স্বর, অবদমিত বাসনা এবং যৌনচেতনা সম্পর্কে যেসব ভাবনাকে সামনে এনেছিলেন তারও প্রভাব কম ছিল না। সেই সঙ্গেই ছিল শ্রেণিবিভক্ত সমাজ এবং শ্রেণিশোষণ ও শ্রেণিসংঘাত সম্পর্কে সচেতনতা। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) চলার মধ্যেই ঘটে গেছে রুশ বিপ্লবের অত্যাচারী শাসকের পতন এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবীন আদর্শের সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র। এই সব কিছুর সম্মিলিত প্রভাব যেমন বিশ্বসাহিত্যের সর্বত্রই অনুভূত হয়েছিল, তেমনই বাংলা সাহিত্যেও ১৯২০ পরবর্তী লেখায় তার চিহ্ন দেখা গেছে। ‘কল্লোল’ পত্রিকায়। সেই তুলনায় বলা যায়, ১৯২০ থেকে ১৯৩০ -এর মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিফলন ‘কল্লোল’-এর পৃষ্ঠায় তেমন ছিল না। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আলাদা এবং এই নিবন্ধে তা আলোচ্য নয়।

কীভাবে এক বন্ধুর পকেটের দু-টাকা এবং আর এক বন্ধুর পকেটের এক টাকা আট আনা সম্বল করে। হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে প্রায় রাতারাতি ‘কল্লোল’ প্রকাশের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে ফেললেন দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুল নাগ তার বিবরণ অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। দীনেশরঞ্জন দাশ-এর ‘আত্মস্মৃতি’ এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘কল্লোল যুগ’ গ্রন্থে এইসব বিবরণ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যাবে। ‘কল্লোল’ পত্রিকার ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যে তার অভিঘাত বিষয়ে জীবেন্দ্র সিংহরায় লিখিত ‘কল্লোলের কাল’ (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, পরিবর্ধিত সাম্প্রতিক সংস্করণ ২০১৮, দে’জ পাবলিশিং) নামে সুলিখিত গ্রন্থটি আগ্রহী পাঠক দেখে নিতে পারেন।

কিন্তু এই নিবন্ধে একটু অন্যদিক থেকে এই পত্রিকাটির দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাই। নিবন্ধের শিরোনামে পাঠকেরা তার আভাস পেয়েছে।

‘কল্লোল’-এর আগে বিশ শতকে বাংলা ভাষায় অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে. কিন্তু সেগুলির পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় পুরুষ ও নারীর সমান অংশগ্রহণ কি অনুভব করা যায়? উনিশ শতকের বাংলা পত্রিকাগুলির প্রসঙ্গ তুলব না। মেয়েদের নিয়মিত লেখাপড়ার প্রাতিষ্ঠানিক

ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। কিন্তু সে-শিক্ষা নিতান্তই প্রাথমিক পাঠ। অধিকাংশে মেয়েরই বিবাহ হয়ে যেত বারো-তেরো বছর বয়সের মধ্যে। কাজেই উনিশ শতকের পত্রিকাগুলিতে নারীর স্থান ছিল কেবল সাহিত্যের বিষয়বস্তু রূপে; স্রষ্টা-রূপে নয়। অবশ্য অল্প-কিছু ব্যতিক্রম ছিল। তার উল্লেখ করছি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কিছু পত্রিকার নাম ছিল 'অবলাবান্ধব' (প্রকাশ ১৮৬৯), 'বামাবোধিনী' (প্রকাশ ১৮৬৩) ইত্যাদি। সেগুলি স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পের পরিকল্পিত পুরুষদের সম্পাদিত পত্রিকা। এই উন্নতির ধারণায় উনিশ শতকের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অভিভাবকত্ব প্রকাশিত হত। সন্তান-পালন, গৃহধর্ম, স্বামীর প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি বিষয়েরই ছিল প্রাধান্য। তবে 'বামাবোধিনী' পত্রিকাটি চলেছিল দীর্ঘ ষাট বছর। প্রথম সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় চুয়াল্লিশ বছর চলবার পর পরবর্তী ১৯০৭ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত কালপর্বে অনেকেই পত্রিকাটি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার মধ্যে উষাপ্রভা দত্ত নামের এক নারীকে পাওয়া যায়। কিন্তু সে-ঘটনা উনিশ শতকের নয়, বিশ শতকের।

একটি কথা প্রথমেই বলে নেওয়া যায়। বাংলা সাময়িক পত্রের সঙ্গে মহিলাদের সংযোগের সমগ্র বাতাবরণেই ছিল ব্রাহ্মসমাজের অবস্থান। 'কল্লোল' সম্পর্কেও কথাটি সত্য। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কেবল শিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারেই মেয়েদের বিবাহের বয়স ছিল অনেক সময় চোদ্দো-পনেরো। বড়ো বয়স পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষাও দেওয়া হত। ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরাই স্কুলের পড়া শেষ করতেন, কেউ কেউ কলেজেও পড়তেন। এ ব্যাপারে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা অগ্রগণ্য। এই বাড়িতে ছেলেদের সঙ্গেই মেয়েদের লেখাপড়া, সাহিত্যচর্চা, গানে ও নাটকে পুরুষের সঙ্গেই নারীর অংশগ্রহণে বাধা ছিল না। সেজন্য সাময়িক পত্রে নারী ও পুরুষের সহাবস্থানের দিকে যদি দৃষ্টি দেওয়া যায় তাহলে নারী-পুরুষের সহাবস্থানের ক্ষেত্রে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকাকে ধরতে হবে 'কল্লোল'-এর পূর্বসূরি।

'ভারতী' ছিল ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা। প্রথম সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী পত্রিকার সম্পাদক হলেন ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম পর্বে ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৪, দ্বিতীয় পর্বে ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন। মাঝখানে কিছুকাল ১৮৯৯ থেকে ১৯০৭ কালপর্বে সম্পাদক ছিলেন স্বর্ণকুমারী কন্যা সরলাদেবী, পরে আবার ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সরলাদেবী ও তাঁর বোন হিরন্ময়ী দেবা পত্রিকাটির ভার নিয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী যে প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন, যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে পারতেন তাতে তাঁর সম্পাদনাকালে তিনিই ছিলেন সম্পূর্ণ রূপে পত্রিকাটির পরিচালক। তাঁর ওপরে খবরদারি করার ক্ষমতা কারোর ছিল না। তাঁর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় ছিল নারী ও পুরুষের সমান সম্মান। এদিক থেকে বাংলা পত্রিকার ইতিহাসে 'ভারতী' এক স্মরণযোগ্য নাম এবং উনিশ শতকের একমাত্র পত্রিকা যেখানে নারী ও পুরুষ সমানভাবে সমমর্যাদায় স্থান পেতেন।

উনিশ শতকের আরও একটি পত্রিকা 'ছিল 'বালক'। যার সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৮৮৫। তবে জ্ঞানদানন্দিনীর সহযোগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁরই ভাবনা পত্রিকাটিকে চালিয়ে নিয়ে যেত। ঠাকুর পরিবারের সদস্যরাই লিখতেন। জীবিত ছিল মাত্র এক বছর। বিশ শতকের প্রথম বছরেই প্রকাশিত আর একটি পত্রিকা 'ব্রহ্মবাদী' (১৯০০-১৯৩৭)। প্রকাশিত হত বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজ থেকে। সম্পাদক মনোমোহন চক্রবর্তী ছিলেন জীবনানন্দের পিসেমশাই। এই পত্রিকায় অনেক কবিতা লিখেছেন জীবনানন্দ দাশের জননী কুসুমকুমারী। তাছাড়াও ব্রাহ্মসমাজের মহিলারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। কিন্তু এই পত্রিকায় ব্রাহ্মসমাজের নির্ধারিত নীতি ছিল সুস্পষ্ট। প্রায়শই ঠিক করে দেওয়া হত মেয়েরা কী লিখবেন। মেয়েদের কবিতা থাকলেও গল্প প্রকাশিত হয়নি। প্রধানত ব্রাহ্মসমাজের নীতির ধারক পত্রিকাটিকে নারী-পুরুষের সহাবস্থানের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য বলা যায় না।

এতক্ষণ আমরা দেখলাম উনিশ শতকে ব্রাহ্ম সমাজের ক্ষেত্রটির বাইরে নারী লেখকের অংশগ্রহণ বাংলা পত্রিকায় প্রায় শূন্য। 'বামাবোধিনী'-র সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত-ও ব্রাহ্ম ছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের লেখার চর্চা কিছুটা বর্ধিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও ছিল ব্রাহ্মসমাজের প্রাধান্য এবং নারীর উপস্থিতি নগণ্য। শতাব্দীর সূত্রপাতেই 'প্রবাসী' পত্রিকা নিয়ে উপস্থিত হলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বিশেষভাবে নারী-দরদি। এবং ব্রাহ্ম সমাজেরই একজন। তবে লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি নারী-পুরুষের বিশেষ পার্থক্য করতেন না। বরং মেয়েদের লেখা প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন।

'প্রবাসী' পত্রিকায় সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে আরও কোনও কোন মহিলা 'প্রবাসী'র লেখক হয়ে উঠলেন। রামানন্দের দুই কন্যা শান্তাদেবী ও সীতাদেবী লিখতেন নিয়মিত। আরও ছিলেন হেমলতা সরকার, অবলা বসু, ভগিনী নিবেদিতা। বহির্বঙ্গের কোনও কোনও মহিলা মাঝে মাঝে 'প্রবাসী'—তে লিখেছেন। কিন্তু সম্পাদক রামানন্দের বিবেচনাই ছিল পত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে শেষ কথা। নারী-পুরুষ সম্পর্কের চিত্রণে সম্পাদকের কিছু অনুশাসন ছিল। শরৎচন্দ্রের লেখাটি কখনও সেখানে স্থান পায়নি।

বাংলা পত্রিকার জগতে ১৯১৩-১৪ থেকে ১৯২৩ ('কল্লোল' প্রকাশের আগে পর্যন্ত)—এই কালপর্ব হল চারটি বিশিষ্ট পত্রিকা—জলধর সেন সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' (১৯২৩), প্রথম চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' (১৯২৪), 'নারায়ণ' (১৯১৪), 'মানসী ও মর্মবাণী' (১৯১৬)। 'মানসী ও মর্মবাণী' সম্পাদনা করতেন নাটোরের রাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। 'ভারতবর্ষ' এবং 'মানসী ও মর্মবাণী'—তে অনেক মহিলা লেখক লিখতেন। সেই সময়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮), নিরুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১), প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৯০৫-১৯৭২), নিরিবালা দেবী (১৮৯১-১৯৮৩), সামান্য পরে শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪)। একসঙ্গে এতজন শক্তিময়ী লেখিকাকে বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আগে

দেখা যায়নি। এই সময় থেকেই দেখতে পাই ব্রাহ্মসমাজের বাইরেও হিন্দু পরিবারের লেখিকারা যথেষ্ট পরিমাণে সামনে এসেছেন। অর্থাৎ বাঙালি মেয়েদের লেখার জগতে হিন্দু-ব্রাহ্মের ভেদরেখা মুছে যেতে শুরু করল এই সময় থেকে। মেয়েরাও হয়ে উঠলেন অনেক স্বচ্ছন্দ। ঈষৎ বিস্মিত করে 'সবুজ পত্র'-এর লেখক- তালিকা। সম্পাদক প্রথম চৌধুরী -সহ নবীনকালের প্রগতিপন্থী আবহাওয়া ছিল এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য। নারীর স্বাধীনতা নিয়ে এই পত্রিকায় লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের একাধিক বিখ্যাত ছোটোগল্প; কিন্তু ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ছাড়া আর কোনও মহিলা লেখকের নাম পত্রিকাটিতে পাওয়া যায় না। ইন্দিরা দেবীও গ্রন্থপরিচয়ভিত্তিক প্রবন্ধ ছাড়া আর কিছুই লেখেননি। 'নারায়ণ' ছিল রক্ষণশীল রুচির পত্রিকা। নারী লেখকের অস্তিত্ব সেভাবে চোখে পড়েনি।

যে বাংলা পত্রিকাগুলি ১৯২৩ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে প্রকাশিত হল সেগুলিতেও নারী-সম্পাদক ছিলেন না। কিন্তু অন্তত তিনটি পত্রিকায়—'কল্লোল' (প্রকাশ ১৯২৩), 'উত্তরা' (১৯২৫), 'কালি-কলম' (১৯২৬) একটু বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই তিনটি পত্রিকায় নারী লেখকের সংখ্যা বর্ধিত হওয়া ছাড়াও সেই সব লেখার ধরণও কিছু বদলে গেছে। মেয়েরা অনেক বেশি খোলাখুলি লিখছেন, কেবল নিজেদের কথা নয়, সমগ্র সমাজের কথা। অর্থাৎ মহিলা লেখক কেবল মহিলাদের জীবন এবং মনের সংকট নিয়েই লিখছেন না; তাঁদের দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে। নারী ও পুরুষ কারও লেখাতেই নারীকে 'আদর্শ নারী' অথবা 'অসহায় নারী' রূপে দেখা হচ্ছে না; নারীকে পাওয়া যাচ্ছে স্বতন্ত্র ব্যক্তি-নারী রূপে। সেখানে কোনও সামাজিক অনুশাসনের চাপ বা প্রত্যাশা নেই। সেখানে নারীর লেখার ভঙ্গিতেই কোনও নারীসুলভ 'কোমলতা', 'শোভনতা' ইত্যাদি কোনও প্রত্যাশা পাঠকদের থাকছে না। এই মনোভঙ্গিকেই নারী-পুরুষের সমমর্যাদা সম্পন্ন সহাবস্থান বলত চাইছি।

এই ধারণার পথ-প্রদর্শক হল 'কল্লোল'। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই এই ভাবাদর্শ লগ্ন হয়ে আছে। কারণ এই পত্রিকা অঙ্কুরিত হয়েছে একটি ক্লাব থেকে।

ক্লাব-এর ধারণা এসেছে ইউরোপ থেকে। কয়েকজন ব্যক্তির সম্মিলনে বিভিন্ন ধরনের চিন্তার বিনিময় ও অনুশীলন চলে ক্লাব-এ। সেই সঙ্গে ক্লাব হয়ে ওঠে সদস্যদের মনের বিশ্রামেরও জায়গা। সেখানে তাস, দাবা, বিলিয়ার্ডস্-এর আয়োজন থাকে। সেখানে পানভোজনেরও ব্যবস্থা থাকে। অভিজাত ক্লাবগুলিতে রাত্রিবাসেরও ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু তা ক্লাব-এর সদস্যরাই ব্যবহার করতে পারেন। ক্লাব-এর মর্যাদা অনুসারে সদস্যদের চাঁদা দিতে হয়। এই হল সাহেবি ক্লাব। এখানে এলে সকলকেই যে বাক্যালাপে যোগ দিতে হবে তাও নয়। একা কাগজ পড়েও কেউ সময় কাটাতে পারেন।

এই ক্লাব-এর সঙ্গে আমাদের দেশের চায়ের দোকানের আড্ডা বা গলির রোয়াকের আড্ডার মৌলিক পার্থক্য আছে তা বলা বাহুল্য। ক্লাব-এর যে ধারণা তার সঙ্গে নির্দিষ্ট একটি বাড়ি

থাকতে হবে। এ দেশেও একটি সাধারণ ক্লাব গড়ে উঠতে গেলেও ক্লাব-এর অন্তত একটি ঘর প্রয়োজন হয়; তাস, ক্যারাম, টেবল টেনিস-এর ব্যবস্থা থাকে।

ভারতে ক্লাব-সংস্কৃতি এনেছিলেন ইংরেজরা। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ক্লাব এ-দেশে এখনও কিছু কিছু আছে। সেগুলির সদস্যপদ উচ্চবিত্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রথম চৌধুরীর 'চার ইয়ারী কথা' গল্পগ্রন্থের পটভূমি এমনই একটি ক্লাব। অন্নদাশঙ্কর রায়ের অনেক গল্পে এমন ক্লাব-এর পরিবেশ আছে।

ইউরোপীয় ক্লাব-এর বঙ্গীয় সংস্করণ দেখা দিয়েছিল বিশ শতকের প্রথমে। সেখানে প্রথম পরিবর্তন হল নির্দিষ্ট একটি ক্লাবহাউজ-এর পরিবর্তে কোনও বিশিষ্ট-জনের গৃহে আড্ডা ও আলাপ-আলোচনার আসর বসানো। যেমন ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে 'বিচিত্রা ক্লাব'। সুকুমার রায়-এর উদ্যোগে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী-র বাড়িতে কিছুদিনের জন্য গড়ে উঠেছিল 'মান্ডে ক্লাব'। কবি কালিদাস রায়ের গৃহে ছিল 'রসচক্র'। এই ক্লাবগুলিতে বিলিতি ক্লাব-এর চরিত্র ছিল না। চাঁদাও প্রায় ছিল না, থাকলেও নামমাত্র। পানভোজনের ব্যবস্থা সাধারণত গৃহস্বামীর তরফ থেকেই করা হত। বিলিত ক্লাব-এর মতো ব্যক্তির পছন্দের নিজস্ব পরিসর ও অবকাশ গড়ে ওঠবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। এই ক্লাবগুলিকে বলা যায় গলির রোয়াকের আড্ডারই অভিজাত সংস্করণ।

আর এক ধরনের আড্ডা এবং ক্লাবের মিশ্রিত সংস্করণ ছিল সাময়িক পত্রিকাগুলির কার্যালয়। বঙ্গদেশে সাময়িক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বহু বিখ্যাত আড্ডা সাহিত্যের ইতিহাসেও স্থান করে নিয়েছে। 'ভারতী' পত্রিকা, 'সবুজ পত্র' এবং তারপরেই বিখ্যাত আড্ডা ছিল 'কল্লোল' এবং 'শনিবারের চিঠি'র পত্রিকার। পরবর্তীকালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়'-এর আড্ডাও বিখ্যাত হয়েছে।

'কল্লোল' পত্রিকার প্রসঙ্গে আমরা ক্লাব-এর বিষয়টি আলোচনা করলাম কারণ একটি ক্লাব থেকেই সূচনা হয়েছিল এই পত্রিকার। যদিও ক্লাব-এর প্রতিষ্ঠাকালে পত্রিকা করবার চিন্তা তাঁদের মধ্যে ছিল না, যাঁরা পরে পত্রিকাটির সম্পাদক হয়েছিলেন। 'কল্লোল' পত্রিকার উৎসমূল এই ক্লাব-এর বিবরণ একটু বিস্তৃতভাবে দিতে চাই কারণ নারী ও পুরুষের সহাবস্থানের ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল এই ক্লাব থেকেই। সাধারণভাবে ক্লাব-কালচারে কিন্তু মেয়েদের স্বচ্ছন্দ প্রবেশ ছিল না। পত্রিকার আড্ডায় মেয়েরা প্রায় যেতেনই না।

ক্লাব-এর নাম বেশ সপ্রতিভ ইংরেজি ভাষায় পরিকল্পিত—'ফোর আর্টস ক্লাব'। 'কল্লোল' পত্রিকার ইতিহাস ও বাংলার সংস্কৃতিতে এই পত্রিকার অভিঘাত নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান অধ্যাপক জীবেন্দ্র সিংহ রায় নামটির বঙ্গীকরণ করেছেন 'চতুষ্কলা সমিতি'। যদি ক্লাব-এর বাংলা ঠিক 'সমিতি' হয় না।

এই ক্লাব-এর ভাবনাটাও প্রথম এসেছিল ব্রাহ্মসমাজভুক্ত দুই যুবকের মনে। একজন দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১), অপরজন গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪- ১৯২৫)। শিক্ষিত

ও মোটামুটি সচ্ছল ব্রাহ্ম-পরিবারগুলির অনেকেই সাহেবি আদবকায়দা একটু অনুসরণ করতেন। দীনেশরঞ্জন চাকরি করতেন চৌরঙ্গি অঞ্চলের খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা এস. রায় অ্যান্ড কোম্পানিতে; পরে কাজ নিয়েছিলেন লিণ্ডসে স্ট্রিটের একটি ওষুধের দোকানে। গোকুলচন্দ্র নাগ বসতেন নিউ মার্কেটের একটি ফুলের স্টলে, যার মালিক ছিলেন এস. বোস ফ্লোরিস্ট, তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল সেই সময়ের কলকাতার সাহেব-পাড়া। তাঁরা দুজনেই পরামর্শ করে এই ক্লাবটি গঠন করতে প্রয়াসী হলেন—যেখানে প্রথম থেকেই নারী ও পুরুষেরা যোগ দেবেন একসঙ্গে। এ বিষয়ে দীনেশরঞ্জনের একটি লিখিত সাক্ষ্য আছে। গোকুলচন্দ্র নাগের অকালমৃত্যুর পর দীনেশরঞ্জন তাঁর স্মৃতিচারণে এই ক্লাব গড়ে তোলবার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছিলেন—"আমি বলিলাম, ভাবছি একটি পান্থশালার কথা—যেখানে মানুষ এসে শ্রান্ত জীবন-ভার নিয়ে বিশ্রাম করতে পারবে। জাতি, sex ও Position সেখানে কোনও বাধা হবে না। আপন আপন কাজকে মানুষ আনন্দময় করে তুলবে, মানুষ মানুষের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মিশে আপন স্বচ্ছন্দ ইচ্ছায় আপনাকে সার্থক মনে করতে পারবে। গোকুল আমার হাতের উপর তার হাতে জোরে তালি দিয়া মহা আনন্দে বলিয়া উঠিল, আমারও যে এটা জীবনের স্বপ্ন!—ঠিক রূপটা ধরে উঠতে পারছিলাম না এতদিন! (দীনেশরঞ্জন দাশ, প্রবন্ধ ঃ গোকুলচন্দ্র নাগ, কল্লোল, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ (১৯২৫) খ্রি.)

প্রথমেই তাঁরা গেলেন কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী সুনীতিদেবীর কাছে। তাঁর স্বামী ডা. বিজলীবিহারী সরকার ছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত শরীরবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক। তাঁর শ্বশ্রূমাতা ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা দেবী। সুনীতিদেবী অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন এবং ক্লাব-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা চার সদস্যের অন্যতম রূপে স্বীকৃতি-পত্রে স্বাক্ষর করলেন। সেই স্বীকৃতি-পত্রটি এখানে উদ্ধৃত হল। তারিখ ছিল ৪ জুন ১৯২১।

"যে আনন্দ কখনও আশা করে না মানুষ তাও পায়, আবার যে দুঃখ কখনও সইতে পারবে না মনে করে—তাও সয়। এই অসহ্য সুখ আর দুঃখের বোঝা বয়ে আমরা চলেছি। সুখের ভারেও বুক কাঁপে, দুঃখের বেদনায়ও ভেঙে পড়ে,—তবু চলার শেষ নেই। চাওয়ারও শেষ নেই—পৃথিবীতে তাই পাওয়ারও অন্ত নেই। —সু

মানুষকে জাগিয়ে তোলে —তৃষ্ণা
মানুষকে কাজের পথে এগিয়ে দিয়ে যায়—কামনা
মানুষকে নির্ম্মল করে—বেদনা
মানুষকে সুন্দর করে—প্রেম। —গো

...ছিল যে পরাণের অন্ধকারে
এল সে ভুবনের আলোর পারে।

স্বপনবাধা টুটি—বাহিরে এল ছুটী
অবাক আঁখি দুটী হেরিলে তারে।
নীরব বেদনায় পুজিনু যারে হায়
নিখিল তারি গায় বন্দনা রে।" —দী

কালের অজেয় ....মৃত্যুঞ্জয়। —স

June 4, 1921
Four Arts Club

স্বাক্ষরকারী চারজন হলেন যথাক্রমে সুনীতিদেবী, গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ এবং সতীপ্রসাদ সেন। এই সতীপ্রসাদ সেন লেখক ছিলেন না। তিনি ছিলেন অকৃত্রিম সাহিত্য-অনুরাগী, গোকুলচন্দ্র নাগের কলেজ জীবনের সহপাঠী এবং 'কল্লোল' গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ।

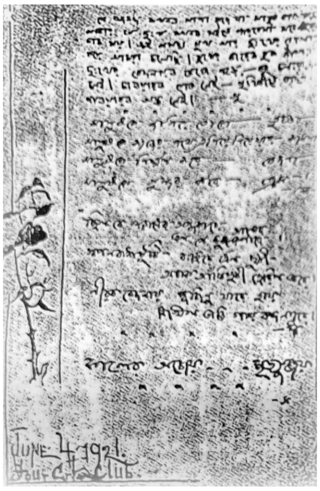

ক্লাব-এর নাম 'ফোর আর্টস ক্লাব'। সেই চারটি 'আর্ট' হল সাহিত্য, সংগীত, চিত্রশিল্প ও কারুশিল্প। প্রতিটি বিভাগেই নারী ও পুরুষের অবাধ সঞ্চরণের অধিকার। এখানেই একটি কৌতুকজনক তথ্য দেওয়া যেতে পার। কারুশিল্পের অন্তর্গত ছিল সেলাই। পরে দেখা গিয়েছিল মেয়েদের থেকে ছেলেদেরও সেলাই শিখতে বেশি উৎসাহ।

সেই ক্লাব-এর যে মহিলারা নিয়মিত আসতেন তাঁদের মধ্যে সুনীতিদেবী ছাড়া ছিলেন নিরুপমা দাশগুপ্ত এবং উমা দাশগুপ্ত। নিরুপমা ছিলেন দিনেশরঞ্জন দাশের বোন। আর উমা দাশগুপ্ত ছিলেন তাঁর ছোটো জা। প্রতিটি অধিবেশনে যাতে সকলে উপস্থিত থাকেন তার জন্য গোকুল নাগের চেষ্টাই ছিল বেশি। সেই চেষ্টার আন্তরিকতা বোঝাবার জন্য গোকুল নাগের একটি চিঠি এখানে উদ্ধৃত হল—

Zoo Garden
Alipore P.O
Calcutta
11.7.21

নিরুদি,

কাল কখন চলে গেলেন বুঝতে পারিনি। একটা কথা বলবার ছিল—একটা অনুরোধ মাত্র। মুখে বললেই ভাল হ'ত। যাক চিঠিতেই সেটা সেরে নিচ্ছি।

বুধবার আপনাকে কিছু পড়তে হবে। নিজের লেখা। 'না' বলবেন না। কারণ এইটেই আমাদের literacy sec. এর প্রথম অধিবেশন।

সুনীতিদি পড়বেন। দীনেশকে এখনও বাগ মানাতে পারিনি। যে একবগ্‌গা ছেলে! উমা দেবীও আশা করি আমাদের অনুরোধ রাখবেন। সেদিন কিন্তু আমি কিছুই করব না। শুধু শুন্‌ব। কেমন? একটা লোভ দেখিয়ে রাখি এইখানে। বুধবারে যদি আপনারা সবাই লক্ষ্মী ছেলেমেয়ের মত যা বললাম তা করেন, তাহলে এর পরেই বারে লক্ষ্মী ছেলের মত আমিও আপনাদের হুকুম শুন্‌ব। নইলে নয়।

এ বিষয়ে আপনি সুনীতিদি আর উমা দেবীর সঙ্গে সব কথা বলে রাখবেন। এখনও সময় ঢের আছে। আপনার পুরান লেখা থেকেও কিছু বার করে পড়তে পারেন। আপনার লেখবার ক্ষমতা আছে। ওটা নষ্ট হ'তে আর দেবো না।

আপনারা আমার নমস্কার নিন। ইতি।

P.S. শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

ছবি যা পারেন কিছু করে রাখবেন।

নারী ও পুরুষ মিলে একসঙ্গে জমায়েত হবেন; গানবাজনা, আলাপ-আলোচনা, গল্পগুজব করবেন এমন একটি ক্লাব করবার জন্য ঘর ভাড়া পাওয়া তখন সহজ ছিল না। শেষ পর্যন্ত একটা অপোস করতে হল। নিরুপমা দাশগুপ্ত ও তাঁর স্বামী সুকুমার দাশগুপ্ত তাঁদের বাড়ির বাইরের ঘরটি অল্প ভাড়ার বিনিময়ে ছেড়ে দিলেন। ঠিকানা ছিল ৮৮ বি হাজরা রোড। ক্লাব-এর সভা বসত বুধবার সন্ধ্যায়। খুব নির্দিষ্ট কোনও অনুষ্ঠান সূচি ছিল না। কিন্তু সংগীত, কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধপাঠ। কোনও বিশেষ মানুষের ভাষণ এবং সাধারণ গল্প-আড্ডা সবই চলত। মাঝে মাঝে অবশ্য বিশেষ আমন্ত্রণ করা হত কোনও ব্যক্তিকে। সেদিন তাঁর কথা সকলে শুনতেন।

মেয়েরা কীভাবে অংশগ্রহণ করতেন এবং কোন্ মহিলারা অংশগ্রহণ করতেন সেদিকে একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। কারণ এই ধরনের মুক্ত আলোচনার আসরে তখনও মেয়েদের স্বচ্ছন্দ অংশগ্রহণ ছিল কম। বিভিন্ন সূত্র থেকে, যেমন অনেকবার স্মৃতিকথা কারও কারও জীবনী ইত্যাদি সাক্ষ্য থেকে যেটুকু জানা যায় তা হল আসরে নিয়মিত উপস্থিত হতেন সুনীতিদেবী, নিরুপমা দাশগুপ্ত এবং উমা দাশগুপ্ত। আর ছিলেন অণু নামের একটি মেয়ে। তিনি আসতেন যামিনী রায়ের কাছে ছবি আঁকা শিখতে। তাঁর পরিচয় ছিল—তিনি দীনেশরঞ্জনের ছোটো ভাই প্রিয়রঞ্জনের স্ত্রী রেণু দাশগুপ্তের বোন। তাঁর পদবি জানা যায়নি। নিরুপমা দাশগুপ্তকে লিখিত যামিনী রায়ের একটি চিঠি থেকে এই সংবাদ জানা গেছে।

যামিনী রায়ের নাম শুনে একটু বিস্ময় জাগতে পারে। কিন্তু সেই সময়ের বহু খ্যাতনামা শিল্পীও সাহিত্যিক মাঝেমাঝেই আসতেন এই ক্লাব-এ। মহিলাদের মধ্যে শান্তাদেবী ও সীতাদেবী এসেছেন মাঝেমাঝে। সেই সময় 'বাতায়ন' নামে একটি কবিতার বই লিখে পরিচিতি

পেয়েছিলেন উমা দাশগুপ্ত। তিনি প্রায়ই আসতেন। অল্প বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়। ছিলেন মায়াদেবী (বন্দ্যোপাধ্যায়) নামের এক মহিলা। সমাজের অভিজাত উচ্চস্তরে ছিল তাঁর বিচরণ। তাঁর স্বামী অবনী ব্যানার্জি ছিলেন ব্যারিস্টার; পিতা রজনীনাথ ছিলেন অ্যাকাউন্টেড জেনারেল। তিনি নিজে ছিলেন লোরেটো-য় পড়া, স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলা, ফ্যাশন-দুরস্ত এক মহিলা। তাঁদের এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথের জামাতা মীরা-দেবীর স্বামী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। মায়াদেবীকে নিয়ে ক্লাব-এ কিছুটা সমস্যা হয়নি তা নয়। তিনি অনেকটা নিজের ইচ্ছেয় সকলকে চালাতে চাইতেন এবং খুব হইচই ভালোবাসতেন। তাঁর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে সমাজে যথেষ্ট গুঞ্জন ছিল। ঠিক যে-কারণে নারী-পুরুষের মিলিত ক্লাব নিয়ে মানুষের মনে ছিল বাধা, ঠিক সেই কারণটাই বাস্তব হয়েছিল নগেন্দ্রনাথ-মায়াদেবীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

অন্য মহিলা সদস্যদের মধ্যে ছিলেন হিরণকুমার সান্যালের স্ত্রী মীরা সান্যাল এবং তাঁর বোন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অফিসার কিরণ দে এবং তাঁর দুই বোন, মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা উমা দাশগুপ্তের বোন, অজয় দাশগুপ্তের স্ত্রী মীরা দাশগুপ্ত। এছাড়াও অনেক অল্পবয়সি মেয়েও আসতেন। অনেকেরই পরে বিয়ে হয়ে যেত। এখান থেকে বোঝা যায় যে, ‘ফোর আর্টস ক্লাব’-এ নারী-পুরুষের এই সহাবস্থান খুব বেশি বিস্তৃত হতে পারেনি। কিন্তু সেই যুগে যতটা হয়েছিল তা এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বাঙালি সমাজে দেখা যায়নি। তবে ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদেরই প্রাধান্য ছিল এ সত্য স্বীকার্য।

আমরা বিস্মিত হই যখন এই ক্লাব-এ নিয়মিত এবং মাঝেমাঝে উপস্থিত হওয়া পুরুষ সদস্যদের নামের তালিকা লক্ষ করি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যিক মণীন্দ্রলাল বসু, যিনি ‘রমলা’ উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন; কান্তিচন্দ্র ঘোষ, যাঁর ‘ওমর খৈয়াম’-এর অনুবাদ সুপরিচিত; সুধীরকুমার চৌধুরী, যিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতাদেবীর স্বামী এবং কবি হিসেবে যথেষ্ট সুখ্যাত। আসতেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুরাগী এবং অনেক সাহিত্যিকের বিশিষ্ট বন্ধু। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘চলমান জীবন’ বইটি থেকে ‘ফোর আর্টস ক্লাব’—অনেক সংবাদ পাওয়া গেছে। বিখ্যাত শিল্পী অতুল বসু আসতেন নিয়মিত, তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। অনেককেই ছবি আঁকা শেখাবার চেষ্টা করতেন। তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে আসতেন যামিনী রায়। দু-একবার এসেছেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর মতো ভাস্করও। এখানে সুনীতিদেবীর স্মৃতিচারণা থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি। এই অংশে বোঝা যায় যে কীভাবে এই বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে ক্লাব-এর মহিলাদের সহজ অথচ শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই পরিবেশটাই ‘ফোর আর্টস ক্লাব’-এর দান। “বিখ্যাত শিল্পী অতুল বসু এলেন গোকুলবাবুর নিমন্ত্রণে। এসেই তাঁর প্রাণ প্রাচুর্যে উচ্ছ্বসিত করে তুললেন সবাইকে। আমাদের মত আনাড়িও তাঁর উৎসাহে কাগজে আঁচড় কাটতে শুরু করে দিল। তিনি মাঝে মাঝে নিয়ে আসতেন শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় মহাশয়কে। যামিনীবাবু নীরবে সব দেখতেন, কাউকে বা একটু আধটু ছবি আঁকার পদ্ধতি দেখিয়ে দিতেন, সে ধন্য হয়ে যেত। একটি মেয়ে ত তাঁর কাছে আশ্বাস পেয়ে শান্তিনিকেতনে কলাভবনে গেল চিত্রবিদ্যা অনুশীলন করতে।

তার ভিতরের শিল্পীকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন বলে তার আঁকার কাছে সে এগিয়ে যেতে সাহস করেছিল।” (সুনীতিদেবী, ফোর আর্টস ক্লাব’, প্রবাসী ষষ্ঠি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ)

একবার ক্লাব-এ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন স্টেলা ক্রামরিশ। তিনি ছিলেন বিখ্যাত চিত্রকলা-বোদ্ধা ও সমালোচক। সেদিন ক্লাব-এর সদস্যরা নিজেদের আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনী করেছিলেন। একবার এসেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, পাঠ করেছিলেন নিজের কবিতা। এসেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক হোসেন শাহেদ সোহরাওয়ার্দি। এসেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, কোচবিহারের তৎকালীন রাজার ভাই কুমার ভিক্টর নারায়ণ। এইসব অতি-অভিজাত ব্যক্তিদের নিয়ে আসার পেছনে মায়াবেদীর প্রভাব ও যোগাযোগ কার্যকর ছিল। তাতে করে শেষের দিকে ক্লাব-এর ঘরোয়া পরিবেশ একটু বিঘ্নিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

দু-বছরের মধ্যেই ক্লাব বন্ধ হয়ে যায়। সমাজের সাধারণ মানুষের অপছন্দই তার প্রধান কারণ। ব্রাহ্মসমাজেরও সকলে এই ক্লাব-এর পরিবেশ পছন্দ করতে পারেনি। তবে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান সাধারণতই খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কাজেই ‘ফোর আর্টস ক্লাব’-এর মৃত্যু খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ‘ফোর আর্টস ক্লাব’ থেকেই জন্ম নিল ‘কল্লোল’ পত্রিকা। এরপর সেই ইতিহাসের দিকে আমরা চোখ রাখব।

সাধারণভাবে ‘কল্লোল’ পত্রিকার প্রকাশ সম্পর্কে একটি গল্পের কথা বারবার শোনা যায়। সেই গল্পটি দিয়েই আমরা শুরু করেছি এই নিবন্ধ। দীনেশরঞ্জন দাশ এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা থেকে পাওয়া সেই সংবাদ-দুই বন্ধুর পকেটে যা ছিল তাই দিয়েই হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে বিলি করা ইত্যাদি। কিন্তু এই আকস্মিক ইচ্ছার মূলে ‘ফোর আর্টস ক্লাব’-এর জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনা কাজ করেছিল প্রেরণা রূপে।

‘ফোর আর্টস ক্লাব’-এর কোনও পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা ছিল কিনা তা জানা যায় না। কিন্তু এই ক্লাবকে একটি প্রকাশনা সংস্থা রূপে দাঁড় করবার ইচ্ছা যে সদস্যদের ছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। অন্তত দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তার একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। একটি গল্প-সংকলন, নাম ‘ঝড়ের দোলা’। প্রকাশকাল ১৯২২। চারজনের লেখা চারটি গল্প। লেখকদের নাম ও গল্পের নাম যথাক্রমে— সুনীতিদেবী : ‘পাগল’, গোকুলচন্দ্র নাগ : ‘মাধুরী’, মণীন্দ্রলাল বসু : ‘শ্রীপতি’, দীনেশরঞ্জন দাশ : ‘জয়মালা’। এছাড়াও প্রকাশিত হয়েছিল ছোটোদের জন্য লেখা উমা দাশগুপ্তের আর একটি বই, নাম ‘ঘুমের আগে’। ‘উষার আলো’ নামে আর একটি বই প্রকাশের বিজ্ঞাপন ছিল, কিন্তু প্রকাশিত হয়নি। অর্থাৎ ক্লাব-এর সদস্যরা নিজেদের লেখা প্রকাশ করবার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। ‘কল্লোলের কাল’ নামের গবেষণা-গ্রন্থে লেখক জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের মন্তব্য আছে—“ক্লাবের চর্চিত চতুষ্কলার মধ্যে মুখ্য কলা ছিল সাহিত্য। ক্লাব প্রতিষ্ঠার সময় সাহিত্য বিভাগ থেকে পত্রিকা বার করবার পরিকল্পনা উদ্যোক্তাদের ছিল। তা নিয়ে গোকুলচন্দ্র, দীনেশরঞ্জন

প্রভৃতি আত্মদর্পী তরুণেরা মাঝে মাঝে আলোচনাও করতেন। কোথায় সম্বল, কোথায় লেখা তার কিছু খোঁজ তখন পর্যন্ত ছিল না।” (‘কল্লোলের কাল’, জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, পরিবর্তিত সাম্প্রতিক দে’জ সংস্করণ ২০১৮, পৃ. ২৭)

কিন্তু কোনও লিখিত সাক্ষ্য নেই যে, পত্রিকা প্রকাশ করবার পরিকল্পনা সদস্যদের ছিল। এ-বিষয়ে আমার শিক্ষক অধ্যাপক জীবেন্দ্র সিংহ রায় মশায় আমাকে বলেছিলেন যে, তিনজন মানুষের সঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁর অনেক কথা হয়েছিল। এই তিনজনেই ছিলেন ‘কল্লোল’ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। একজন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ‘চলমান জীবন’ গ্রন্থের লেখক; আর একজন প্রেমেন্দ্র মিত্র, যিনি দ্বিতীয় বছর থেকেই ছিলেন ‘কল্লোল’-এর নিয়মিত কবি ও গল্পকার। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন একেবারে প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যা থেকেই। এই দুই সাহিত্যিকের সঙ্গে জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ১৯৭০-৭১ নাগাদ তাঁদের কিছু সান্নিধ্য আমিও পেয়েছিলাম। তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন সতীপ্রসাদ সেন। তাঁর ডাকনাম ছিল গোরা। সকলে তাঁকে গোরাবাবু বলে ডাকতেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলেই সর্বাধিক ভেতরের খবর জেনেছিলেন ‘কল্লোলের কাল’ গ্রন্থের লেখক। সতীপ্রসাদ ছিলেন কলেজে গোকুলচন্দ্র নাগের সহপাঠী। ব্রাহ্মসমাজের বাতাবরণের মধ্যে তিনি ছিলেন হিন্দুও, মনেপ্রাণে আধুনিক সাহিত্যের ভক্ত। কিন্তু তিনি কখনও কিছু লেখেননি। একমাত্র ‘ফোর আর্টস ক্লাব’ প্রতিষ্ঠান প্রথম স্বাক্ষরপত্রে যাঁদের লেখা ও সই ছিল তিনি তাঁদেরই একজন। প্রথম দিন থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি ‘কল্লোল’ গোষ্ঠীর একান্ত সহচর। তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল দীনেশরঞ্জন দাশের ভ্রাতুষ্পুত্রী মণিকা দাশগুপ্তের। সতীপ্রসাদ সেন ও মণিকা সেনের সঙ্গে পরিচয়-সূত্রে সতীপ্রসাদ সেনের কাছ থেকেই বহু স্মৃতি-টুকরো পাওয়া গিয়েছিল, যা কোথাও লিখিত নেই। সেই সব কথালাপ চলবার সময় মাঝেমাঝে উপস্থিত থেকেছি আমিও।

সতীপ্রসাদ সেন বলেছিলেন, ‘ফোর আর্টস ক্লাব’-এর ‘সাহিত্য’ বিভাগের একটি খাতা ছিল। সেই খাতায় সদস্যরা অনেক সময় কিছু মন্তব্যের সঙ্গে কেউ কেউ তাৎক্ষণিক কবিতাও লিখে দিতেন। সেই কবিতা পড়া হত সভায়। বিশিষ্ট আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ভাষণের সারসংক্ষেপ রাখা হত সেই খাতায়। গল্পকার ও কবিরা মাঝে মাঝে লেখার প্রতিলিপি দিয়ে যেতেন। এইভাবে সেই খাতায় জমে উঠেছিল বেশ কিছু লেখা এবং সম্ভাবিত লেখা। সেই সঙ্গে সম্পাদকদের ভরসা ছিল সেই তরুণ লেখকদের প্রতি যাঁরা এই দু-বছরে প্রায়শই ক্লাব-এ এসেছেন এবং বাঁধা পড়েছেন ক্লাব-সদস্যদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে। সুনীতিদেবী, দীনেশরঞ্জন দাশ এবং গোকুলচন্দ্র নাগ ছিলেনই। ক্লাব-এ এসে ‘ওমর খৈয়াম’-এর অনুবাদ শুনিয়েছেন কান্তিচন্দ্র ঘোষ। নিয়মিত এসেছেন তখনই প্রতিষ্ঠিত কবি সুধীরকুমার চৌধুরী। আর আসতেন ‘রমলা’ উপন্যাসের লেখক মণীন্দ্রলাল বসু। এই উপন্যাসটি লেখার কারণে তিনিও তখন বিখ্যাত। মাঝে মাঝে এসেছেন নজরুল ইসলাম। অতি অল্প সময়ে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠবার ক্ষমতা ছিল তাঁর। শান্তাদেবী ও সীতাদেবী তখন প্রতিষ্ঠিত লেখক। তাঁরাও মাঝে মাঝে আসতেন। কাজেই

পত্রিকার অন্তত কয়েকটি সংখ্যা চালিয়ে নেওয়ার মতো ক্ষমতা ছিল সম্পাদকদের। তারপর তিন-চারটি সংখ্যা প্রকাশের পরেই 'কল্লোল' এমনভাবেই নিজের জাত চিনিয়ে দিল যে, নতুনকালের তরুণ লেখকেরা স্বেচ্ছায় এসে উপস্থিত হলেন 'কল্লোল' দপ্তরে।

তাঁদের মধ্যে ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, মণীশ ঘটক, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকার সম্পাদকেরা এবং সহযোগীরা প্রতিষ্ঠিত ও বিশিষ্ট লেখকদের কাছ থেকে লেখা নিয়ে আসবার জন্য প্রতিনিয়ত তৎপর থাকতেন। তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ ফিরিয়ে দিতেন না সমকালের প্রখ্যাত সাহিত্যিকেরা। এজন্যই দেখি কয়েকজন তরুণের আগ্রহে প্রকাশিত একটি নতুন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যাঁদের লেখা তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরশুরাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, ভূপতি চৌধুরী, গিরিজাকুমার বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, অতুলপ্রসাদ সেন, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, জসীমউদ্দিন, জলধর সেন, কালিদাস নাগ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার, এস. ওয়াজেদ আলি, প্রবোধ কুমার সান্যাল, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, হুমায়ুন কবির, সুনির্মল বসু, হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বাগচী, প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মন্মথ রায়, আব্দুল কাদের, অন্নদাশঙ্কর রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, বিষ্ণু দে, বন্দে আলি মিঞা, পরিমল গোস্বামী।

'কল্লোল' পত্রিকার ব্যাপ্তি ছিল বিস্ময়কর। 'প্রবাসী' ও 'সবুজ পত্র'-এর লেখকেরা এখানে লিখেছেন। পরবর্তীকালে 'পরিচয়' ও 'কবিতা' পত্রিকায় যাঁরা লিখবেন, তাঁরাও এখানে লিখেছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো বর্ষীয়ান লেখকের পাশেই স্থান হয়েছে বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দের-র—যাঁদের বয়স তখনও পঁচিশ অনুত্তীর্ণ।

কিন্তু এই নিবন্ধের অন্যতম প্রেক্ষণবিন্দু হল 'কল্লোল' পত্রিকায় নারী ও পুরুষ লেখকের সহাবস্থান। প্রথমেই লক্ষ করি, পত্রিকায় নারী-লেখকদের সংখ্যা। সেই সময়ে আর কোনও পত্রিকায় এত মহিলা লিখেছেন বলে মনে হয় না। প্রাসঙ্গিকভাবে বলে নেওয়া যায়, 'কল্লোল' পত্রিকায় 'পথিক' নামে গোকুলচন্দ্র নাগের একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসে একদল তরুণ-তরুণীর সমাবেশে ও বাক্যালাপে সেই সামাজিক সহাবস্থানের চিত্রই দেখা যায়।

মহিলা লেখকদের নামের বর্ণানুক্রমিক উল্লেখ করা হল—

অদিতি দেবী, অনিন্দিতা দেবী, অমিয়া চৌধুরী, অহল্যা গুপ্ত, ইন্দুলেখা দেবী, ইন্দুশোভা দেবী, উমা দেবী, কনক রায়, কনকলতা ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ, কল্যাণী পাল, কুসুম কুমারী দেবী, কেতকী দেবী, চামেলী প্রভা ঘোষ, জ্যোৎস্নাময়ী দত্ত, তারা মুখোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী, নীলিমা দেবী (বসু), নীলিমা রায়, নৃহিংহদাসী দেবী, প্রভাবতী দেবী স্বরস্বতী, প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রীতি সেন, বিভাবতী দেবী, বিমলা দেবী, বীণাপাণি দেবী, বীণাপাণি রায়, মায়া বসু, মিনতি দেবী, মুসম্মত সোফিয়া খাতুন, মৈত্রেয়ী দেবী, মোহিনী সেনগুপ্ত, রাধারাণী দত্ত, নীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়,

শান্তাদেবী, শামসুন্নাহার, শৈলবালা ঘোষজায়া, সরোজকুমারী দেব, সরোজিনী নাইডু, সান্ত্বনা বসাক, সীতা দেবী, সুনীতি দেবী, সুরমা দেবী, সুরুচিবালা চৌধুরাণী, সুরুচিবালা রায়, সুশীলাসুন্দরী দেবী, সুষমা মুখোপাধ্যায়, হিমাংশুপ্রভা শিকদার।

নামগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে কয়েকটি কথা মনে হয়। প্রথমত এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা ‘কল্লোল’-এ প্রচুর লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন নৃসিংহদাসী দেবী ও নীলিমা বসু। মূলত গল্পই তাঁরা লিখতেন। অথচ ‘কল্লোল’ পত্রিকার বাইরে নৃসিংহদাসী দেবীর কোনও পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে সতীপ্রসাদ সেন বলেছিলেন—“ডাকযোগে একদিন একটি গল্প এসেছিল। লেখিকার বিচিত্র নামটির দিকে তাকিয়ে মনে হল বয়স্কা কোনও মহিলা। কিন্তু গল্পটির মধ্যে বেশ আধুনিক চিন্তা আছে। পত্রযোগে তাঁর কাছে আবার গল্প চাওয়া হল। উৎসাহিত হয়ে তিনি আরও গল্প পাঠালেন। ‘কল্লোল’-এ সবসুদ্ধ বারোটি গল্প ছাপা হয়েছিল তাঁর। অথচ সমকালীন আর কোনও পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশিত হত না।” সতীপ্রসাদ সেন আরও বলেছেন যে, একবার দু-তিনজন তাঁর বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছে গেলেন তাঁর গল্পে আলাপ করার জন্য। কিন্তু গিয়ে জানলেন তিনি গৃহবধূ এবং বাইরের লোকের সামনে বেরোন না। তাঁর বয়স খুব বেশি নয়—তিরিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যেই। তাঁর লেখার চর্চায় বাড়িতে কেউ বাধা দেন না, কিন্তু বাইরের লোকের সামনে বেরোতে নিষেধ। নৃসিংহদাসী দেবীকে কোনও দিন তাঁদের দেখা হয়নি।

নীলিমা বসু-র নাম কোনও সাহিত্যিক চরিতাভিধানে নেই। কিন্তু তাঁর স্বামী মুরলীধর বসু-র নাম আছে। তিনি শিক্ষিত পরিবারের সাহিত্যমনস্ক তরুণ ছিলেন। জন্ম ১৮৯৭, প্রয়াণ ১৯৬০। শিক্ষকতার জীবিকায় নিযুক্ত থাকাকালীন প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই সূত্রেই ‘কল্লোল’ পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ। তাঁর স্ত্রী নীলিমা বসু-র গল্প মুদ্রিত করবার জন্য কিছুটা জোরাজুরি করতেন। তাই নিয়ে ক্বচিৎ কিছু মতানৈক্যও হত। ‘কল্লোল’ পত্রিকা চলাকালীনই ‘কল্লোল’-সংশ্লিষ্ট তিনজন ‘কালি-কলম’ নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। কিন্তু কেন? সতীপ্রসাদের মতে, মুরলীধর বসু-র লেখায় এবং তাঁর সাহিত্যপ্রীতির মধ্যে একটা ঝোঁক ছিল, যাকে সেই সময় অনেকেই অশ্লীল বলে গণ্য করতেন। ফলে তাঁর পছন্দের লেখাগুলিকে সব সময় দীনেশরঞ্জন দাশ ‘কল্লোল’-এ ছাপতে চাইতেন না। তা-ছাড়া নিজের স্ত্রী-র গল্প তিনি আরও বেশি দিতে চাইতেন। তা-ও সব সময়ে মেনে নিতেন না দীনেশরঞ্জন। এইসব কারণে মুরলীধর বসু আর একটি পত্রিকা-ই বার করবেন বলে স্থির করলেন। ১৯২৬-এর এপ্রিল-এ (বৈশাখ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সম্পাদক তিনজন—মুরলীধর বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত হয় তিন বছর। তবে প্রথম বছরের পর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেন। মুরলীধর বসু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও চালিয়েছিলেন আরও এক বছর। মজা এই যে, ‘কালি-কলম’ পত্রিকায় কিন্তু নীলিমা বসু-র কোনও গল্পই প্রকাশিত হয়নি। তাঁর লেখা ১৯২৬-এর পরে

কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল'-এ। কাজেই নৃসিংহদাসী দেবী ও নীলিমা বসু লেখক হিসেবে থেকে গেলেন কেবল 'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠায়।

কোনও কোনও লেখিকা 'কল্লোল' প্রকাশিত হবার আগেই সাহিত্যে সুপরিচিত নাম ছিলেন। যেমন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তাদেবী ও সীতা দেবী; ঘোষজায়া, কবি প্রসন্নময়ী দেবীর কন্যা এবং প্রমথ চৌধুরীর ভাগিনেয়ী প্রিয়ম্বদা দেবী। অনিন্দিতা দেবীও মোটের ওপর ছিলেন চেনা নাম। তিনি ছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তীর জননী, শিক্ষিত ও প্রগতিমনস্ক এই মহিলা 'বঙ্গনারী' ছদ্মনামে অনেক পত্রিকাতেই প্রবন্ধ লিখেছেন। 'কল্লোল' পত্রিকায় দুটি নামেই তাঁর লেখা পাওয়া যায়। রাধারাণী দেবী এবং তাঁর ছদ্মনাম অপরাজিতা দেবী এখন আমাদের কাছে খুবই চেনা। কিন্তু বিশের দশকে তাঁর কোনও লেখক-পরিচয় তৈরি হয়নি। তাঁর লেখা কবিতা মুদ্রিত হয়েছে রাধারাণী দত্ত নামে। দত্ত ছিল তাঁর প্রথম স্বামীর পদবি। তখনও তিনি কবিরূপে পরিচিতি অর্জন করেননি। নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। মৈত্রেয়ী দেবীর নাম পাওয়া যাচ্ছে একবার মাত্র। 'কল্লোল'-এর চতুর্থ বর্ষ অর্থাৎ ১৯২৬-এ। এই মৈত্রেয়ী দেবী যদি দর্শনবিদ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের কন্যা, রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্রী মংপুবাসিনী মৈত্রেয়ী দেবী হন তাহলে ১৯২৬-এ তাঁর বয়স মাত্র বারো। সেই সময়ে তাঁকে কবিরূপে কেউ চিনত বলে মনে হয় না।

এছাড়া অন্য অনেক মহিলার নাম দেখা যাচ্ছে 'কল্লোল' পত্রিকায়। যাঁদের পরবর্তীকালে কবি বা গল্পকাররূপে কোনও প্রতিষ্ঠা হয়নি। যেমন—কেতকী দেবী, সান্ত্বনা বসাক, মোহিনী সেনগুপ্ত, অহল্যা গুপ্ত, সুরুচিবালা রায়, মিনতি দেবী, ইন্দুলেখা দেবী, সরোজকুমার দেবী, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়, সুষমা মুখোপাধ্যায়, কুসুমকুমারী দেবী, সুশীলাসুন্দরী দেব, হিমাংশুপ্রভা শিকদার, প্রীতি সেন, ইন্দুশোভা দেবী, বিমলা দেবী, অদিতি দেবী, কল্যাণী ঘোষ, কনক রায়, মুসম্মত সোফিয়া খাতুন, শামসুন্নাহার, সুরমা দেবী, চামেলী প্রভা ঘোষ, বীণাপাণি রায়, অমিয়া চৌধুরী, উমাদেবী, সুরুচিবালা চৌধুরাণী প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে শামসুন্নাহার ছিলেন নজরুল ইসলামের পরিচিত এক কিশোরী। তাঁর অগ্রজ ভ্রাতা হবীবুল্লা বাহার ছিলেন নজরুলের অনুজ বন্ধুর মতোই। পরে তিনি আরও কবিতা লিখেছেন। একটি পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে।

আজ যখন বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে পুরুষ ও নারীর সমান অংশগ্রহণ দেখি তখন মনে পড়ে 'কল্লোল' পত্রিকার সেই যুবকদের। বিশেষভাবে দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগের কথা—যাঁরা মুক্ত দৃষ্টিতে নিজেদের পত্রিকা থেকে লিঙ্গবৈষম্যকে দূর করতে চেয়েছিলেন। অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। 'কল্লোল' পত্রিকায় নারী-স্বাধীনতা, নারী-প্রগতি, স্ত্রী-জাতির কর্তব্য কিংবা নারীর প্রতি বিশেষ সহানুভূতিমূলক কোনও লেখাও প্রকাশিত হত না। প্রথম থেকেই লেখার পৃথিবীতে নারী ও পুরুষকে তাঁরা দাঁড় করিয়েছিলেন একই মঞ্চে।

কল্লোল ও কালিকলম : দুই দীপ্ত পাখা

ত রু ণ মু খো পা ধ্যা য়

উত্তর-রবীন্দ্রযুগে সাময়িকপত্র তথা লিটিল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে 'কল্লোল' ও পরে 'কালি-কলম' উজ্জ্বল দুটি নক্ষত্র। অচিন্ত কুমার সেনগুপ্তর ভাষায় বলা যায় 'কল্লোল আর কালিকলম একই মুক্ত বিহঙ্গের দুই দীপ্ত পাখা।' তবু তাঁর মনে হয়েছিল, 'কালি-কলম' বেরুবার পর বাইরে থেকে দেখতে গেলে, কল্লোলের সংহতিতে যেন চিড় খেলো হয়তোবা ছিল ভুল বোঝার অবকাশ। যৌবনের জয় ঘোষণায় 'কল্লোল' ছিল কল্লোলিত। এখানে ভিড় করেছিল হতমান, দীন-হীন হতভাগ্যের চল। ছিল কয়লাকুঠির মজুর, পটলডাঙার ভিখারি, চোর, গুণ্ডা অন্যদিকে যৌনতার অনাবৃত রূপও এখানে ছিল। উচ্চারিত হয়েছে মোহিতলাল মজুমদারের ভোগবাদ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর দুঃখবাদ, কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহীভাবনা ও সাম্যবাদী চিন্তা।

দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগের যুগ্ম সম্পাদনায় 'কল্লোল' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩০ সাল, বৈশাখ মাসে। যদিও এর উৎভূমি ছিল 'ফোর আর্টস্ ক্লাব' প্রথম সংখ্যায় দীনেশরঞ্জনের কবিতা মুদ্রিত হয় 'কল্লোল'—

আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা দিশাহীন,
অজানা জানার নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি' ফিরে আসি নিশিদিন।

যুগের যন্ত্রণা ও যুগজ্বর নিয়ে প্রকাশিত হয় 'কল্লোল'। দেশজুড়ে বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক, ধ্বংসলীলা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, হতাশা। এগুলিই ছিল কল্লোল যুগের উপাদান। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একাধিপত্যকে যুবক লেখকেরা মানতে চাননি, বুদ্ধদেব বুস বলেছেন,

"যাকে কল্লোল যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"

এরিই পাশে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর ভাষ্য—

"রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল। সরে এসেছিল অপজাত ও অজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে; কয়লাকুঠিতে, বস্তি, ফুটপাতে, প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।"

কবিতায় তিনি লিখলেন,

"সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুখি রবীন্দ্র ঠাকুর, আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো যুগসূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর।" (আবিষ্কার)

যৌবনের কামনাকে জ্বলন্ত জাগ্রত করলেন বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য কুমার, মনীশ ঘটক, নজরুল ইসলাম। নারীর 'সুখোদ্বেল তপ্তপূর্ণস্তন' এর বন্দনা করলেন অচিন্ত্য কুমার। 'দগ্ধ তপ্ত চুম্বনে' শিহরিত হলেন। এর পাশে হত ভাগ্যদের জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র তৈরি করলেন 'বেনামী বন্দর'—'জগতের যত হতভাগাদের ভীড়', সেখানে যদিও রবীন্দ্রনাথ এখন সাহিত্য সৃষ্টিতে দেখেছিলেন 'ললিসার অসংযম' আর 'দারিদ্র্যের আস্ফালন'। তা অবশ্য আংশিকভাবে সত্য। অবশ্য 'কল্লোল' সম্পাদক চেয়েছিলেন, গল্পের ভিতরে 'সংযম প্রকাশের কৌশল' থাকুক। ঈষৎ হতাশায় বলেন,

> "আজ কাল সব গল্পগুলিই প্রায় একধরনের আসে। কারখানা ও খনির কুলিন্দের ঘটনা লইয়া গল্প এখন সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

আসলে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠির গল্প'র সাফল্যে ও প্রচারে বহু তরুণ লেখককে এইরকম গল্প লিখতে উৎসাহদেয়। যদিও সম্পাদকের মতে সেখানে 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব দেখা যায়।' শেষ পর্যন্ত আর্থিক অভাব, অসুস্থতায় 'কল্লোল' বন্ধ হয়ে যায়। ১৩৩০ সালের বৈশাখ থেকে ১৩৪৬ এর পৌষমাস পর্যন্ত 'কল্লোল'-এর ৮১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকায় গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অনুবাদ প্রকাশিত হতো। তৎকালীন পাঠকদের কাছে যার আকর্ষণ কম ছিল না।

কল্লোলের পথ রেখে এলো 'কালি-কলম'। এলেন দুই স্রষ্টা—প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মাসিকপত্র হিসেবে 'কালি-কলম' প্রকাশ পায় ১৩৩৩ সালের বৈশাখে। সম্পাদক তিনজন মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। তবে পত্রিকায় আয়ু ছিল মাত্র চার বছর। দ্বিতীয় বছরে প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদনা থেকে সরে যান। তৃতীয় বছরে চলে যান শৈলজানন্দও। একক মুরলীধর সম্পাদক। এ প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাস 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় লেখেন,

> "কালিকলম' জন্ম হইতে Trinity র পূজারী ছিলেন। গত বছর God the father পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাতে তিনি দ্বৈতবাদী হন। এই বৎসর God the sonও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, সুতরাং এখন সবেধন নীলমণি Holy Ghost মুরলীবাবু রহিলেন।"

কল্লোল বা কালি-কলম সেইভাবে (তেমন 'সবুজ পত্র' লিখেছিল)— তাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে কিছু বলেনি। তবে 'কালি-কলম' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, ১৩৩৩ এর ভাদ্র সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র জানান—

> "আমরা শয়তানের নিন্দা করব না, ভগবানের প্রশংসাও না। আমরা আমাদের নব-উন্মীলিত দৃষ্টি দিয়ে জীবনের যাত্রা দেখব,—আর বলে যাব।"

'কালি-কলম' এর লেখক তালিকা গর্ব করার মতন এখানে কে নেই? আছেন—শ্রী অরবিন্দ, অবনীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর, প্রমথনাথ বিশী, প্রবোধ কুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, শরৎচন্দ্র, পরশুরাম। আছেন রবীন্দ্রনাথও। এই পত্রিকায় কমপক্ষে ৮০ টি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবীণে-নবীনে মিলে অপরূপ বন্দিশ। কবিতা বিভাগে পাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মানুষের মানে চাই', মোহিতলালের 'নাগার্জুন', নজরুলের 'মাধবী প্রলাপ', 'অনামিকা'। পাই জীবনানন্দ দাশের 'ঝরাপলিক' কাব্যের কিছু কবিতাও—'বেদিয়া', 'কিশোরের প্রতি', 'ওগো দরদিয়া' ইত্যাদি। প্রকাশিত হয় অতুল প্রসাদের তিনটি গান, কবিগুরুর 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে' গান এখানেই প্রথম প্রকাশিত। আর ছিল বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ। লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুবোধ রায় প্রমুখ। তবু অশ্লীলতার দায়ে 'কালি-কলম' অভিযুক্ত হয়। সম্পাদক মুরলী ধর ও শৈলজানন্দ আর প্রকাশক শিশির নিয়োগীর বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি হয়। 'চিত্রবহা' উপন্যাস প্রকাশের দায়ে এঁরা দোষী হন। উপন্যাসের লেখক ছিলেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কালের পুতুল' গ্রন্থে বলেছেন, তাঁর সম্পাদিত 'প্রগতি' ও মুরলীধর-শৈলজানন্দর 'কালি-কলম স্বল্পায়ু ছিল। "কিন্তু 'কল্লোলে'র স্রোত যে উচ্ছ্বসিত হয়েই সহজে শুকিয়ে যাবে তা আমরা কেউ কল্পনা করিনি।" তবু তিনি মনে করেন,

> "বস্তুত, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলাদেশের যে—কটি যুবক সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের সকলেরই প্রথম ও প্রধান অবলম্বন ছিলো 'কল্লোল',......"

'সবুজপর' ও 'ভারতী'র পাশে তিনি 'কল্লোল'কে স্মরণীয় নাম বলেছেন। তবে 'কালি-কলম' এর গুরুত্বও কম ছিল না। বুদ্ধদেব বসুর যৌনতা বিস্ময় জাগায়।

'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' পত্রিকা প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার কথা এসে যায়। কেননা, সেই সময় সমকালীন সাহিত্যের ভুল-ত্রুটি ইত্যাদি নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষ সজনীকান্তই করতেন। প্রায় অকাট্য ছিল তাঁর যুক্তি ও তথ্য। তরুণ লেখকেরা এজন্য শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত থাকতেন। কখন যে তাঁর বিদ্ধ বা গদাহত হবেন, জানা ছিল না। রবীন্দ্রনাথও রেহাই পাননি। 'সংবাদ সাহিত্য' পর্যায়ে তাঁর বিচিত্র মন্তব্য পাঠকদের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। তিরিশের কবি-লেখকরা তখন ফ্রয়েডীয় তত্ত্বপাঠে নতুন ধারায় সাহিত্য রচনায় উৎসাহী, যদিও তাঁদের বয়স ও অভিজ্ঞতা খুব কম, নজরুল ও শৈলজানন্দের বয়স ২৪/২৫; অচিন্ত্যকুমার-প্রেমেন্দ্রর ১৯/২০; বুদ্ধদেব বসুর বয়স ১৫ বছর মাত্র। কাজেই তারুণ্য, আবেগ মাত্রাছাড়া; মনন তেমন নয়। 'কল্লোল' ও 'শনিবারের চিঠি' পরস্পরের চেনাজানা। দীনেশ রঞ্জন দুটি পত্রিকারই প্রচ্ছদ শিল্পী। সেজন্য শনিবারের চিঠির সম্পাদকের খেদোক্তি,

"দুই সহোদরা তিতি ও অদিতির সন্তানদের মতো

'শনিবারের চিঠি' আর 'কল্লোলে'র কলহ বাধিবে
ইহার সম্পাদনাও প্রারম্ভে অভাবনীয় ছিল।
কিন্তু সেই অভাবনীয়ই ঘটিল।"

নজরুলকে সজনীকান্ত 'গাজী আব্বাস বিটকেল' নাম দেন। 'বিদ্রোহী' কবিতার প্যারডি 'ব্যাং' রচনা করেন। বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হলো উতলা', যুবনাশ্বর 'পটলডাঙ্গার পাঁচালি' বের হলে তাকে ব্যঙ্গ করেন সজনীকান্ত। বলেন, 'যৌন কল্লোল'। সজনীকান্ত বলেন,

"এযুগের তরুণদের পরিচালিত পত্রিকাগুলিতে নিরীহ অতীতের প্রতি একটি অকারণ বিদ্রোহ ঘনাইয়া উঠিতেছে, দেখিতে পাই। এই বিদ্রোহ কোনো ক্ষেত্রেই সক্ষমের বিদ্রোহ নয়।"

কবি-লেখকদের বিরুদ্ধে তাঁর মন্তব্য—

১. ইংলন্ডের রবার্ট ব্রাউনিং, আমেরিকার হুইটম্যান এবং বাংলার শ্রী জীবনানন্দ দাশ। কে ছোট, কে বড় নির্ণয় করা দুরূহ।

২. এই চারুচন্দ্রের (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রতিভা বাংলা ভাষাকে রসাতল না দিয়া কোনমতেই ছাড়িবে না।

৩. (আধুনিক) সাহিত্যের মূলকথা তিনটি—সিগ্রেট, সিনেমা ও Self obuse.

বলা বাহুল্য এই নিন্দার পাচন সেবনে নবীন লেখকদের উপকারই হয়েছিল সেদিন।

'স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত' করার ব্রত ছিল 'কল্লোল' পত্রিকার উদ্দেশ্য। এরই সঙ্গী হয় 'কালি কলম' পত্রিকা। পাঠকদের কাছে এই পত্রিকার আকর্ষণ বাড়াতে সম্পাদকদ্বয় নানা বিভাস চালু করেন। সেগুলি হলো—সংগ্রহ, চয়নিকা, বিচিত্রা, অসংলগ্ন, চিত্র, সাহিত্য প্রসঙ্গ। যেখানে সমকালীন সাহিত্য প্রসঙ্গও আলোচনায় রাখা হতো। 'কালি-কলম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাক' উপন্যাস; শৈলজানন্দর 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস', সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রবহা', মহেন্দ্রনাথ রায়ের গল্প 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে'। মাত্র চার বছর চলেছিল পত্রিকা (১৩৩৩-১৩৩৬)। কথাকার জগদীশ গুপ্ত বলেন,

"কালি-কলমের অকাল মৃত্যু মাঝে আমার নিজেরও সমাধি হইয়াছে এইরূপ অনুভব করিতেছি।"

সম্পাদক মুরলীধর বসু নানা বিঘ্ন পেরিয়ে পত্রিকার কাজ করেছেন। তাঁর স্ত্রী নীলিমা বসু ছিলেন তাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী। তাই পুলিশি হামলা, সজনীকান্তের 'শনিবারের চিঠি'র বিদ্রূপ হজম করেও 'কালি-কলম' চালিয়েছেন। তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পরে ও আর্থিক অনটনে নিংসঙ্গ মুরলীধর পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করতে বাধ্য হন। শৈলজানন্দ অবশ্য খনি শ্রমিকদের নিয়ে প্রথম বাংলা গল্প লেখেন। তাঁকে আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রথম রূপকার বলা হয়। কুমারডুবি কয়লাখনিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি গল্পগুলি লিখেছিলেন। প্রান্তিক

হতমান মানুষদের অন্তরঙ্গ কাহিনী তাঁর হাতে নবরূপ পায়। কয়লাখনির গল্প যেন ম্যাক্সিম গোর্কির 'লোয়ার ডেপথস' এর বঙ্গীয় সংস্করণ মনে হয়। শৈলজানন্দকে প্রথম দেখে অচিন্ত্যকুমারের উপলব্ধি—"বাংলা সাহিত্যে ইনিই সেই কয়লাকুঠির আবিষ্কর্তা! নিঃস্ব, রিক্ত বঞ্চিত জনতার প্রথম প্রতিনিধি'? তবে সিনেমা জগতে যুক্ত হওয়ার ফলে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। একে লেখক নিজেই বলেছেন 'স্বেচ্ছা নির্মাসন'। সিনেমা তৈরির পিছনে অর্থ উপার্জন ছিল মূল লক্ষ এটাও ঠিক। কেননা যুগান্তকারী সাহিত্য রচনা করেও তাঁর অভাব ঘোচেনি। দিনলিপিতে লিখেছিলেন, 'সাহিত্যিকরাও মানুষ, তাদেরও খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হয়। তাদের বাঁচিয়ে রাখবার কোনও ব্যবস্থা আমাদের নেই।" এর জীবন্ত দৃষ্টান্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যিক শৈলজানন্দের সাহিত্যকর্মকে স্বীকৃতি জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—

"আমি ওদের দেখেছি দোতলার জানালা থেকে, আর তুমি দেখেছ ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।....তুমি ওদের সম্বন্ধে লেখার যথার্থ অধিকারী।"

ব্যবহৃত গ্রন্থ/পত্রিকা :

১. কালের পুতুল/বুদ্ধদেব বসু/নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি; ১৯৫৯
২. বাংলা পত্রপত্রিকা : সম্পাদক ও সম্পাদনা/সম্পাদনা : তাপস ভৌমিক/ কোরক, ২০১৭)
৩. অনন্য প্রয়াস : নির্বাচিত সাময়িক পত্র/সম্পাদক : অরিন্দম বারিক/পূর্ণপ্রতিমা, ২০২১
৪. পশ্চিমবঙ্গ : শৈলজানন্দ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ২০০১
৫. অনুষ্টুপ (সজনীকান্ত ও শনিবারের চিঠি)/প্রাক্ শারদীয় : ২০১৯

কল্লোলিত শনিবারের চিঠি

তা প স রা য়

"আমরা সখের মেথর গো দাদা, আমরা সখের মুর্দফরাস
মাথায় বহিয়া ময়লা আনিয়া সাজাই মোদের ঘরের ফরাস।
শকুনি গৃধিনী ভাগাড়ের চিল, টেক্কা কে দেয় মোদের সাথ?
যেখানে নোংরা, ছোঁ মারিয়া পড়ি, তুলে নিই ত্বরা ভরিয়া হাত।
গলা ধ্বসা যত বিকৃত জিনিস কে করে বাছাই মোদের মতো?
আমরা জহুরি পচা পঙ্কের যাচাই করা তো মোদের ব্রত!
মোদের ব্যাসাতি ময়লা-মাণিক আঁ৬স্তাকুড় যে ক্ষেত্র তার,
নর্দমা আর পগার প্রভৃতি লয়েছি কায়েমী ইজারা ভার!"

'হসন্তিকায়' বেরিয়েছিল শনিবারের চিঠির গায়ের এই প্রসাধন পর্ব। হসন্তিকা কি কল্লোল দ্বারা প্রভাবিত ছিল! তখন কল্লোল গ্রুপের সবচে বড় শত্রু 'শনিবারের চিঠি'। আর এই হসন্তিকার কাজ ছিল শনিবারের চিঠিকে ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপে শুইয়ে দেয়া। ভাবনাটা আপাতভাবে সত্যি হতেও পারে। মানে 'ভারতী' পত্রিকার যেসব কুশীলব এই 'হসন্তিকা' পত্রিকার হোমরা-চোমরা, তাঁরা আবার কল্লোলের সাথে গা ঘষাঘষি করে চলছেন। মানে ঐ ভারতীর সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব-রা কল্লোলে লিখছেন। তা এঁদের দিয়ে দুষ্ট দমনের কাজ কল্লোলগোষ্ঠী করতে পারত বৈকি! হসন্তিকার পৃষ্ঠপোষক এঁরা প্রায় সবসময় শনিবারের চিঠিকে ঠুকে গেছে।

এটা কি বলা যাবে কল্লোল পল্লবিত হওয়ার পেছনে শনিবারের চিঠির খুব বড় ইন্ধন ছিল! কল্লোল তো একটা দুটো তিনটে মানে ওই কল্লোল কালিকলম প্রগতি, কাগজ নয়। কল্লোল একটা গোঁ। সাহিত্যের সচলতার পথে একটা প্রতিস্পর্ধী ধারা। মানে এদিক-ওদিক অন্যান্যতা তুচ্ছ করে কিছুটা বেপরোয়তার বেগ এনে দেবার অদম্যতা। আর হতেই পারে তা। ওদের মাথাদের নিজেদের জীবনও তো উঠে আসছে এবড়ো খেবড়ো মাটি থেকে। শৈলজানন্দ খোলার বস্তিতে থাকে, পানের দোকান চালায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ওষুধের বিজ্ঞাপন লেখে, কখনো খবরের কাগজের প্রুফ দেখে। বুদ্ধদেব প্রগতির ১৮০ টাকা ধার মেটাতে পারছেন না। প্রগতি তুলে দেবেন। কল্লোলের সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের কাছে দুটাকা আর গোকুলচন্দ্র নাগের কাছে থাকা দেড় টাকা দিয়ে কল্লোল হচ্ছে। --- এরকম সম্মিলিত 'না'-এর ভেতর বসে থেকে সাহিত্যে একটা প্রলয় নাচন নাচ যোগাতে চেয়েছিল অনেকেই।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখছেন, " কল্লোল-আপিসে একবার একটা খুব গম্ভীর সভা করেছিলাম আমরা। সেই ছোট, ঘন, মায়াময় ঘরটিতে অনেকেই একত্র হয়েছিল সেদিন। কালিদাস নাগ, নরেন্দ্র দেব, দীনেশরঞ্জন, মুরলীধর, শৈলজা, প্রেমেন, সুবোধ রায়,

পবিত্র, নৃপেন, ভূপতি, হরিহর এবং আরো কেউ কেউ। সেদিন ঠিক হয়েছিল 'কল্লোল'-কে ঘিরে একটা বলবান সাহিত্য-গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে। যার মধ্য দিয়ে একটা মহৎ প্রেরণা ও বৃহৎ প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্য শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। একটা কিছু বড় রকমের সৃষ্টি, বড় রকমের প্রজ্ঞা। সমস্ত বাধা বিপদ ও ব্যর্থ বিতর্ক উপেক্ষা করে একাগ্র সাধন।"

যেকথা বলছিলাম শনিবারের চিঠির ইন্ধন। সত্যিই কি শনিবারের চিঠি পেছনে লেগেছিল! একবার সজনীকান্ত কল্লোলের অফিসে হানা দেন। তাঁকে দেখে যথারীতি আগমন উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও তাঁর দলবল। একটু কি গা ঘষাঘষি করতে গিয়েছিলেন! অনেকেই সেখানে যায়। ভারতীর লেখকরা যায়, প্রবাসীর লেখকরা যায়। শরৎচন্দ্র কালিকলমে লেখা দিয়ে আসেন। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র সেদিন সজনীকান্তকে একেবারে পাত্তা দিলেন না। নিজের বিছানায় কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলেন। সজনীকান্ত তখন পুরনো কয়েকটা কল্লোল-এর সংখ্যা কিনে নিয়ে ফিরেছিলেন। তারপর স্বভাবসিদ্ধ তরবারি চালানো শনিবারের চিঠিতে। কিন্তু ওই আকচা আকচি তো প্রকাশ্য ব্যাপার। গোপনে গোপনে সজনীকান্ত কি কল্লোল থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন! বা কল্লোলের লেখকরাও সজনীকান্তর মুখদর্শন করতেন না!

কল্লোলের এক কর্ণধার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কিন্তু জানাচ্ছেন অন্য কথা। তলে তলে কিন্তু সজনীকান্ত-র ব্যক্তিত্বে গোটা কল্লোল কবলিত। প্রথমেই সজনীকান্তের কোলে উঠে পড়েছিলেন প্রেমেন। তারপর পেছনে পেছনে শৈলজানন্দ, নজরুল, নৃপেন। কিন্তু তলে তলে বন্ধুত্ব থাকলেও প্রকাশ্যে তো তা থাকলে চলবে না। ব্যবসা মার খাবে। ফলে সজনীকান্তকে কল্লোলের লেখকদের গালাগালি দেয়া থেকে বিরত রাখা যায়নি। ব্যক্তি আক্রমণের ঝাঁঝ কম হয়নি। তা করলেই শনিবারের চিঠি বাজার হারাবে যে! কল্লোলীরা স্বীকার করেছেন যে একখানা শনিবারের চিঠি মানে কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, ধূপছায়া --- সব। একটা শনিবারের চিঠি কিনলেই এই সব কাগজের বিকৃত মণিমুক্তোর সন্ধান পাওয়া হয়ে যেত।

'প্রগতি'র বুদ্ধদেব বসু শনিবারের চিঠির সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, "এক হিসেবে শনিবারের চিঠির চাইতে হসন্তিকা ঢের নিকৃষ্ট ধরণের কাগজ হয়েছে। শনিবারের চিঠি আর যাই হোক sincere — ওরা যা বলে তা ওরা নিজেরা বিশ্বাস করে। কিন্তু হসন্তিকার এই গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসার প্রবৃত্তিটা অতি জঘন্য। কিছু না বুঝে এলোপাথাড়ি বাজে সমালোচনা — কতখানি মানসিক অধঃপতন হলে যে এ সম্ভব জানিনে। তার উপর আগাগোড়া ওদের patronising attitud টাই সব চেয়ে অসহ্য। আমাদের যেন অত্যন্ত কৃপার চোখে দেখে। এর চেয়ে শনিবারের চিঠির sworn enmity অনেক ভালো অনেক সুস্থ।"

বুদ্ধদেব বসুর রজনী হলো উতলা কল্লোলে প্রকাশিত হবার পর সাহিত্যমহল উত্তাল।

শনিবারের চিঠিও ছেড়ে দেয়নি। অশ্লীলতার দায়ে বুদ্ধদেবকে দেগে দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই যেন বাগে আনতে পারছে না কল্লোল আর কালিকলমকে। সজনীকান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ কথ্য জপতে জপতে নিজের কাজকে জাস্টিফাই করতে লাগলেন। যেখানটায় রামকৃষ্ণ মন্ত্র আর তন্ত্রের ফারাক দেখাচ্ছিলেন। তা হলো রামকৃষ্ণ মতে মন্ত্র ঢোকে সদর দরজা দিয়ে আর তন্ত্র ঢোকে পায়খানার ভেতর দিয়ে। পৌঁছানো নিয়ে হলো কথা, পথ নিয়ে নয়।

সজনীকান্ত বুদ্ধদেবদের থামাতে এ সময় একটা চাল চাললেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের ঘোর নিন্দুক শনিবারের চিঠি, তবুও একটা আর্জি বা অনুযোগ রাখলেন সজনীকান্ত দাস গুরুদেবের কাছে। জানালেন, কন্টিনেন্টাল লিটারেচারের দোহাই দিয়ে যেসব অশ্লীল, আজেবাজে লেখা কল্লোলে বা কালিকলমে প্রকাশ পাচ্ছে তা কি তিনি নজর করেছেন! তিনি কি মতামত জানাবেন না! এই চিঠিতে তিনি অসাহিত্যকারদের নামও উল্লেখ করে দিয়েছিলেন — নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, যুবনাশ্ব আর নজরুল। নজরুলের 'মাধবী প্রলাপ' আর 'অনামিকার' উল্লেখ ছিল চিঠিতে। বুদ্ধদেবের 'বন্দীর বন্দনা'র কথা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য সজনীকান্তর প্যাঁচ বুঝে ফেলে তাঁর চিঠির উত্তরে এইসব লেখালিখি নিয়ে মতামত এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

শনিবারের চিঠির সঙ্গে কল্লোলের আদা-কাঁচকলা সম্পর্কটা যে বাইরের তার আর একটা প্রমাণ আছে। সেটা হলো অনেকেই বলত শনিবারের চিঠির হেড পেয়াদা হলেন দীনেশরঞ্জন। দীনেশরঞ্জন দাশ। দীনেশরঞ্জন কল্লোলের সম্পাদক। আবার শনিবারের চিঠির ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অলংকার ঐ বেত হাতে যণ্ডার ছবিও তো দীনেশরঞ্জনের আঁকা।

সে যাক বাংলা সাহিত্যের শনিগ্রহ সজনীকান্তর কথা আরও একটু জানাজানি হোক। চিঠির আকারে ২৪ পৃষ্ঠার কাগজ, দাম এক আনা। বের হলো ২৬ জুলাই,১৯২৪। সম্পাদক যোগানন্দ দাস। জানা যায় এই সাপ্তাহিক পত্রিকার অষ্টম সংখ্যায় প্রথম সজনীকান্ত ঢোকেন ভাবকুমার প্রধান ছদ্মনামে একটা কবিতা লিখে। আর শনিবারের চিঠির উনিশতম সংখ্যা থেকে সজনীকান্ত দাসের নাম মুদ্রিত আকারে বের হতে থাকে সহকারী সম্পাদক হিসেবে। তারপর খানিকটা চলার পর 'শনিবারের চিঠি' বন্ধ হয়ে যায়। আর নবকলেবরে মাসিক পত্রিকা হিসেবে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন সজনীকান্ত দাস এই পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ। সম্পাদক নীরদচন্দ্র চৌধুরী। টানা আটটি সংখ্যার সম্পাদনার শেষে নীরদচন্দ্র পদ ছেড়ে দিলে সজনীকান্ত ১৩৩৫ সালের আশ্বিন সংখ্যা থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে নেন। শুরু হয় বাংলা সাহিত্যে চাবুক হাকড়ানোর কাল। কিন্তু তখনও তিনি 'প্রবাসী' প্রেসের কর্মচারী। ১৩৩৮ সালের আশ্বিন থেকে প্রবাসীর চাকরী ছেড়ে দিয়ে সজনীকান্ত শনিবারের চিঠির মালিক হয়ে যান। এবার তিনি বল্গাহীন ঘোড়া। শনিবারের চিঠিকে নিয়ে দাপিয়ে বেড়াবেন। মাঝখানে অবশ্য আবার কিছুদিন দুশো টাকার 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করতে হয়েছিল। তখন শনিবারের চিঠির সম্পাদক পরিমল গোস্বামী। তারপর ১৩৪৮ থেকে ১৩৬৮ পর্যন্ত আবার শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস।

তারাশঙ্কর তাঁকে বলেছিলেন যোদ্ধা সাহিত্যিক। বলেছিলেন এজন্য যে সজনীকান্ত ওই কাগজের মাধ্যমে সমাজের নানা ভণ্ডামি, ব্যাভিচার আর ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। জীবনের সব স্তরের বিকার আর অসত্যের বিরুদ্ধে, নগ্নতা, যৌনতা, উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে ছিল শনিবারের চিঠির যুদ্ধ। বাংলা পত্র-পত্রিকার জগতে যে উচ্চতায় সংবাদ প্রভাকর, বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র-এর বিচরণ, সেই সমান উচ্চতায় শনিবারের চিঠিও প্রবেশ করেছিল।

এই উচ্চতা তো এমনি এমনি আসেনি। কল্লোলীয় আধুনিকতা আর তাদের একাধিপত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হলে যে ব্যক্তিত্ব থাকা জরুরি, তা ছিল সজনীকান্তের। তাঁর নেতৃত্বেও একটা গোষ্ঠী ছিল --- শনিচক্র। এই শনিচক্র থেকে বাংলার সাহিত্য সমাজ কম উপকৃত হয়নি। সমাজের সমস্ত স্তর থেকে টেনে আনা সেই শনিমণ্ডলীতে কারা ছিলেন! প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে অশোক চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বনফুল, শরদিন্দু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, প্রমনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচী, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, রবীন্দ্র মৈত্র, রথীন্দ্রনাথ রায়, সুশীল কুমার দে, বিনয় ঘোষ, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জগদীশ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

শনিচক্রের এই লিস্টি দেখেই একটা আন্দাজ করা যায় যে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ যেভাবে আলোড়িত করেছিল শনিবারের চিঠি, তার থেকে বেশি না হলেও আলোকিত করার কাজও কম করে যাননি এই শনির বুধমণ্ডলি। শনিবারের চিঠির একটা বিশেষ চোখে পড়তে পারে এই যে, সেখানকার লেখকদের নাম ছাপা হত রচনার শেষে। আর সংবাদ-সাহিত্যে রচনাকারের নামই ছাপা হত না। সেসব শনি গোষ্ঠীর। মানে গোষ্ঠী চেতনাকে সজনীকান্ত একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন। বলা যাবে, গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ কবিতা নাটক ছাড়াও যে একটা পত্রিকা নিজেকে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় নিয়ে যেতে পারে তার প্রকাশ এই শনিবারের চিঠি। এখানে নিয়মিত সাহিত্য সাধনাতো থাকতই, কিন্তু যা একে বিশিষ্টতা দিল, তা হল এর 'মণিমুক্তা' বিভাগ।

রবীন্দ্রনাথ এই মণিমুক্তোয় তিতিবিরক্ত। একখানা চিঠিও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখে ফেললেন। আবার সে চিঠি তেরোশ চৌত্রিশের মাঘ মাসের শনিবারের চিঠিতে ছাপা হল। তার খানিকটা এরকম ঃ

"সাহিত্যের দোহাই ছেড়ে দিয়ে সমাজহিতের দোহাই দিতে পারো। আমার নিজের বিশ্বাস শনিবারের চিঠির শাসনের দ্বারাই অপর পক্ষে সাহিত্যের বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্ছে। যে সব লেখা উৎকট ভঙ্গীর রান্না নিজের সৃষ্টিছাড়া বিশেষত্বে ধাক্কা মেরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমালোচনার খোঁচা তাদের সেই ধাক্কা মারাকেই সাহায্য করে। সম্ভবত

ক্ষণজীবীর আয়ু এ-তে বেড়েই যায়। তাই যদি না হয়, তবু সম্ভবত এতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। আইনে প্রাণদণ্ডের বিধান আছে, প্রাণহত্যাও থামছে না। ব্যঙ্গরসকে চিরসাহিত্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আর্টের দাবী আছে। শনিবারের চিঠির অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান-নব-নব হাস্যরূপের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তিবিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়। সে কাজ করবারও লোক আছে, তাদের কাগজী লেখক বলা যেতে পারে, তারা প্যারাগ্রাফ-বিহারী।"

সজনীকান্তের হাতে শনিবারের চিঠিতে প্যারডি সাহিত্যও চালু হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের সবুজের অভিযান প্যারডিতে হলো প্যাঁচা।

"ওরে হুতোম ওরে আমার প্যাঁচা
ভর সাঁঝেতে শ্যাওড়া-ডালে
প্রাণ খুলে তুই চ্যাঁচারে আজ চ্যাঁচা।
ড্যাবরা চোখে মিটমিটিয়ে দেখে,
পোড়ো-বাড়ীর ভাঙা আলসে থেকে,
ঘরের কোণের কালি-ঝুলি মেখে
পুচ্ছটি তোর চুলের ভুলে নাচা!
আয়রে হুতোম আয়রে আমার প্যাঁচা।"

এখানে তত ব্যক্তি আক্রমণ ছিল না। কিন্তু নজরুল বা বুদ্ধদেব বসুর প্যারোডিতে ঝাঁঝাঁল আক্রমণ। সজনীকান্ত লিখলেন 'ভাণ্ডারী হুঁশিয়ার'।

"চোর ও ছ্যাঁচড় সিঁধেলে দুনিয়া চমৎকার
তল্পি-তলপা-তহবিল নিয়ে ভাণ্ডারী হুঁশিয়ার।"

বা বুদ্ধদেবের প্রতি নেমে আসা তীব্র হলাহল ----

"তরুণ বয়সে ভীমরতি কোথা হয়?
বালকের মন রমণ রণেতে নিতি মাগে পরাজয়---
ঝুটা কোথা হয় শাস্ত্র বিবাহ, স্বামী নামটাই ফাঁকি,
কপিলাবস্তু? যশোধরা কার হস্তে বাঁধিল রাখী?"

শুরুতেই যেকথাটি নিয়ে চলা শুরু হয়েছিল যে বিরোধিতার জায়গাটা প্রকাশ্যে থাকলেও, মানে শনিবারের চিঠির পাতায় থাকলেও কল্লোলীয়দের সঙ্গে, মানে অনেকের সঙ্গেই সজনীকান্তর ব্যক্তিগত নিকটতা ছিল। রেডিওতে একটা অনুষ্ঠানে সজনীকান্তকে কবির লড়াইতে ডাকা হয়েছিল। সজনীকান্ত কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন লড়তে হলে প্রেমেন্দ্র মিত্রর সঙ্গে লড়বেন। এই কথা শুনে প্রেমেন্দ্র মিত্র সজনীকান্তকে ফোন করলে সজনীকান্ত জানিয়েছিলেন, গাল খেতে হলে তোর গালাগাল খাব। অন্যের সঙ্গে লড়ব না।

১৩৬১ সালের কার্তিকের শনিবারের চিঠি দেখাচ্ছে যে জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে যে

বিরোধিতা হয়েছিল, তা সুসাহিত্যের পাহারাদার হিসেবে। ব্যক্তিগত বিরোধিতা নেই। সেখানে লেখা হয়েছিল,

"কবি জীবনানন্দের কাব্যের প্রতি আমরা যৌবনে যথেষ্ট বিরূপতা দেখাইয়াছি, তাঁহার দুর্বোধ্যতাকে ব্যঙ্গ করিয়া বহু পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে হাস্যস্পদ করিবার চেষ্টা করিতেও ছাড়ি নাই। তিনি প্রধানত 'কল্লোল-প্রগতি' গোষ্ঠীর লেখক ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে বিপক্ষ দলে ফেলিয়া লড়াইয়ের ধর্ম অনুযায়ী আক্রমণেই আমাদের আনন্দ ছিল। আজ কালধর্মে আমাদের মতি ও বুদ্ধির পরিবর্তন হইয়াছে, তিনিও সকল নিন্দা-প্রশংসার ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছেন। পুরাতন যাবতীয় অশোভন বিরূপতা সত্ত্বেও একথা আজ স্বীকার করা কর্তব্য মনে করিতেছি যে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য সাহিত্যের তিনি অন্যতম গৌরব ছিলেন।"

একথা বলা হয়, সজনীকান্তর ভেতর দুটি রূপ ক্রিয়াশীল ছিল, একটি সংহারক রূপ অন্যটি সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের। মনে রাখতে হবে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী প্রকাশের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য বিভূতিভূষণ সজনীকান্তর দৃষ্টিভঙ্গির বাঁক বদলে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিভূতির সংস্পর্শে এসে সজনীকান্ত বিদ্বেষের জগৎ ছেড়ে রসের দেশের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন যে!

কল্লোল ও তৎকালীন কয়েকটি সাময়িক পত্র : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা (১৯২৩-১৯৩০)

অ লো ক ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

'I now wonder that we of the Kallol–clan, then so young and tentative, should have been taken so seriously; and I conclude that our first efforts, despite yonthful excesses, did reveal a new world, that though we sometimes succumbed to the temptations of shocking and showing of our sincerity was manifest. Adolescent rebels we derided Rabindranath's peace and swooned in ecstasy over his lines, reciting them in chorus in hot streets and cheap restaurants, and murmuring then alone in bed at night.... man is noble in his unremitting struggle with the bute nature within him, not because he wins, for he may not but simply because he struggles. I do not mean that these ideas were clearly formulated or except occasionally, succesufully applied, but the trend of thought was there unmistakably, insistently there.

–An Acre of Green Grass, Buddhadevs Bose Papyuns Nov' 82 P-81

"রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।' (কল্লোল যুগ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলের সুসমঞ্জস বাতাবরণ, সত্য-শিব-সুন্দরের ত্রিপাদ দর্শন, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের মতো আপ্তবাক্য—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে যে ভয়ঙ্কর ভাঙচুরের সম্মুখীন হয়, তা যে কোনো সমাজ-সচেতন নাগরিকের কাছে বিশদে বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ শতকের প্রাক্কালে মার্কসবাদী দর্শন ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের অভিযোজনা মানবমনের ভাবনার জগতেও এক অবিনশ্বর আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

এক সমূহ বিভ্রান্তি, সংশয়বাদ, স্থিতধী বিশ্বাসের অবক্ষয়, মূল্যবোধের দুর্মর বিনষ্টি, অস্তিত্বের সংকট, অনিকেত অবস্থান—ইত্যাকার নানাবিধ অস্থিরতা সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে অতলান্তিক অবসাদ ও নির্বেদের (ennui) জন্ম দিল তার প্রতিফলন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সাহিত্যকেও প্রভাবিত করল। সাময়িক পত্র এক চলমান আলোকবর্তিকার মতো পরিবর্তমান পরিপার্শ্বকে দৃশ্যমান ক'রে তোলে।

কল্লোল :

সাহিত্যের পালা বদলের এই অভিমুখকে স্বাগত জানাতে যে ক'টি পত্র-পত্রিকা সেদিন

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পা রেখেছিল, তার মধ্যে কল্লোলের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছোটো পত্রিকার অহংকার তার দারিদ্র্যে। গোকুলচন্দ্র নাগের দেড় টাকা আর দীনেশরঞ্জন দাশের টাকা দুই সম্বল করে কাগজ কিনে হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে শুরু হয়েছিল কল্লোলের জয়যাত্রা। সূচনা পর্বেই ঘোষিত হলো—"বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার/দুয়ার ভাঙা কল্লোলে।" (সৃষ্টি মুখের উল্লাসে—নজরুল, কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০)। কল্লোলের সৃষ্টিমূলে (genesis) বারি সিঞ্চন করেছিল 'ফোর আর্টস ক্লাবে'র প্রাথমিক উদ্যোগ। দীনেশরঞ্জন (১৮৮৮-১৯৪১) ও গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) সাহিত্য-সংগীত, চিত্রকলা ও কারুশিল্প—এই চতুষ্কলার চর্চাও অনুশীলনের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পারিবারিক বৃত্তের বাইরে একটি রুচিশীল পরিবেশ গঠনের মানসতা—এই 'ফোর আর্টস ক্লাব' প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন। এই অভিপ্রায়ে তাঁরা তখন কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের (১৮৬১-১৯৪২) কন্যা ও অধ্যাপক বিজলী বিহারী সরকারের (১৮৯৩-১৯৭২) স্ত্রী সুনীতি দেবীর (১৮৯৩-১৯৮৩) সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ক্লাবের উদ্দেশ্য ও কর্মধারা বিষয় হিসেবে তাঁদের পূর্বপরিচয় থাকার সুবাদে সুনীতিদেবী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহের সঙ্গে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এক পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে চিড়িয়াখানার চত্বরে প্রথম সভাতে ঠিক হয় ৪ঠা জুন ১৯২১ তারিখে ক্লাবের উদ্বোধন হবে। এই নামকরণ গোকুলচন্দ্র নাগের; সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হন দীনেশরঞ্জন। মাসিক সভ্য চাঁদা এক টাকা। জাতি-ধর্ম-বয়স-লিঙ্গ নির্বিশেষে সভ্য হতে পারবেন প্রত্যেকে—এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করেই নির্দিষ্ট দিনে ৮৮ বি হাজরা রোডে ক্লাবের প্রথম অধিবেশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্লাবকে কেন্দ্র করে তৎকালীন শিল্পী সাহিত্যিকেরা একত্রিত হতেন— তাঁদের লেখা পাঠ, চিত্রকলার প্রদর্শন, সংগীত চর্চা ও কারুশিল্পের নানা নিদর্শনের ধারাবাহিক চর্চার আয়োজনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত সারস্বত সাধনায় এই চতুষ্কলার রঙ্গমঞ্চ। বছর দুয়েকে সীমাবদ্ধ এই ক্লাবের আয়ুষ্কাল হলেও এর দুই কর্ণধার গোকুল চন্দ্র নাগ ও দীনেশরঞ্জন দাসের বিশেষ আগ্রহে যে পরবর্তী কালে 'কল্লোল' পত্রিকার অভ্যুত্থান, তার বীজক্ষেত্রে রচিত হয়েছিল এই ফোর আর্টস ক্লাবের অন্তঃস্থ অভিজ্ঞানেই।

কল্লোলের সূচনাপর্বে আর্থিক সংগতির অভাব থাকলেও কোনো পরমার্থিক ঘাটতি ছিল না। পূর্বোক্ত ক্লাবের চর্চার বিষয় ছিল যে চতুষ্কলা, তার মধ্যে সাহিত্য ছিল মুখ্য বিষয়—তাই পত্রিকা প্রকাশের তাগিদ প্রথমাবধিই উদ্যোক্তারা পোষণ করতেন—এবং সেই অদম্য অভিলাষ ক্লাব-পর্বের সমাপ্তির পরে রূপায়িত হ'ল ফোর আর্টস ক্লাবের একটি খাতা, মনীন্দ্রলাল বসুর লেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, 'প্রবাসী' পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সুধীরকুমার চৌধুরীর লেখক সংগ্রহের ভরসা, তৎকালীন অন্যতম লেখিকা সুনীতি দেবীর সক্রিয় সহযোগিতা এবং গোকুলচন্দ্রের বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করেই। গোকুলচন্দ্রের বিদ্যালয় জীবনের সতীর্থ সতীপ্রসাদ সেনের কর্মোদ্যম, দীনেশরঞ্জনের প্রশাসনিক দক্ষতা, পত্রিকাটি প্রাণপ্রতিষ্ঠায়

সহায়ক হয়ে ওঠে। মূলতঃ মাসিক গল্প পত্রিকা হিসেবেই কল্লোলের আত্মপ্রকাশ। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ঘোষিত হয়েছিল—"কল্লোল, মাসিক গল্প-সাহিত্য।.... এরূপ গল্প-সাহিত্য বাংলা দেশে এই প্রথম।" দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩১), ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত প্রচ্ছদে লেখা ছিল "বাংলার মাসিক গল্প-সাহিত্য" 'প্রবাসী'র ১৩৩১ সালের আশ্বিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হয়েছিল "বাংলার মাসিক গল্প-সাহিত্য পত্রিকা"। প্রাথমিকভাবে গল্পের পত্রিকা রূপে কল্লোলকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য থাকলেও পরবর্তীকালে উদ্যোক্তারা তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। শুধু গল্পের পত্রিকার সর্বশ্রেণির পাঠকের চাহিদা পূরণে অপারগতা এবং এই সীমাবদ্ধতার কারণে পাঠকসংখ্যার পতন ও আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা ও বেশ কিছু প্রতিভাবান নবীন কবি ও গল্প-কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই পারঙ্গম কয়েকজন লেখক তাদের দলে যোগ দিয়েছেন। এছাড়াও মননসমৃদ্ধ দু-একজন গদ্যকারও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ফলে সবাইয়ের সম্মিলিত অংশগ্রহণে একটি পূর্ণাঙ্গ পত্রিকার নির্মাণের এষণায় কল্লোলকে তাদের প্রাথমিক ঘোষণার অবস্থান রদ-বদল করতে হয়। যেমন একসময় তারা মনস্থ করেছিলেন রঙিন ছবি ছাপবেন না, কিন্তু সেই ভাবনা থেকেও পরে তারা সরে এসেছিলেন। ঘোষিত নীতি অনুযায়ী কল্লোল গল্পের পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হলেও প্রথমাবধি কবিতার প্রতি তার সহৃদয় আমন্ত্রণ ছিল। আত্মপ্রকাশ সংখ্যাটিতে দীনেশরঞ্জনের লেখা 'কল্লোল' নামক কবিতাটিই প্রথম রচনা। প্রত্যেক সংখ্যাতেই কবিতার প্রকাশ লক্ষণীয়। সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে গল্পের পরেই কবিতার প্রাধান্য ছিল।

গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ ও একাঙ্ক নাটিকার সম্ভার ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগ কল্লোলকে সমৃদ্ধ করেছিল যেমন (১) সংগ্রহ—গভীর উপলব্ধি সমন্বিত নানা লেখার উদ্ধৃতি। লেখার নাম থাকলেও লেখকের নাম উল্লেখিত হ'ত না। (২) আলোচনা—বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা নাটক সংক্রান্ত আলোচনা ও সাহিত্যের নানা বিষয়ে আলোকপাত এবং গ্রন্থ-সমীক্ষা কখনও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (৩) সমাচার—এই বিভাগে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খবরাখবর মন্তব্য সহকারে পরিবেশিত হতো। এই বিভাগেও কখনো-সখনো গ্রন্থ-পরিচয় অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। (৪) পরিচয়লিপি—বিভিন্ন লেখকের রচনাগত বৈশিষ্ট্য আলোচিত হত এই বিভাগে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংখ্যার পরিচয় দেওয়া হত। (৫) ছবি—চিত্রসমন্বিত বর্ণনা এই বিভাগে থাকত—মৌলিক বা উদ্বৃতি সহযোগে —কিছুটা ইলাষ্ট্রেশনের মাধ্যমে পরিবেশিত হত। পত্রিকার প্রথম দু-বছরে এই পঞ্চবিভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল পত্রিকার আয়তন। (৬) তৃতীয় বছরে 'ডাকঘর' বিভাগটি সংযুক্ত হল—বিবিধ বিষয়ের সমাহারে প্রকীর্ণ এই বিভাগ-বুক রিভিউ, স্মৃতিচারণা, পত্রিকা সম্পর্কিত বিষয় সমূহ, দেশ-বিদেশের কৃতী মানুষও লেখকদের কথা, অন্যান্য পত্র পত্রিকার আলোচনা, বিভিন্ন খবরাখবর, সাহিত্যের বিচিত্র বিষয়, নানা সাহিত্য সম্মেলনের বিবরণী। তৃতীয় বছরের আষাঢ় থেকে ষষ্ঠ বছরের নাম সংখ্যার প্রতিটিতেই এই বিভাগটি প্রায় নিয়মিত স্থান পেয়েছে। (৭) 'ডাকঘর', বিভাগটির

বদলে ‘প্রবাহ’ আসে তার জায়গায় সামান্য পরিবর্তিত রূপে। (৮) ‘কাহিনী’—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাহিত্যভাবনা ও সাহিত্যিকদের পরিচায়ক এই বিভাগটির সূচনা হয়েছিল ১৩৩০ এর মাঘ মাস থেকে—এই বিভাগের লেখক ছিলেন মূলত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। কল্লোলে মনীষীদের ছবিও ছাপা হতো যেমন—নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, রমাঁ রলাঁ। তৎকালীন চিত্রশিল্পীদের কাজও মুদ্রিত হতো, (যেমন যামিনী রায়, সত্যেন্দ্র বিশী, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী প্রমুখের) আবার তাজমহল, প্রজ্ঞাপারমিতা, বা ব্যঙ্গচিত্রও (যেমন দীনেশরঞ্জনের) প্রকাশিত হতো মাঝে মধ্যে।

সমকালীন অর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহের অভিঘাত যে সাময়িক পত্র-পত্রিকার অভিমুখকে নিয়ন্ত্রিত করে একথা আগেই বলেছি—এবং কল্লোলও তার ব্যতিক্রম নয় এবং শুধু কল্লোল নয়, কালিকলম, প্রগতি, ধূপছায়া, উত্তরা-র প্রেক্ষিত ও পরম্পরা গড়ে উঠেছিল একইভাবে। যুদ্ধোত্তর সময়ে ক্রমবর্ধমান জিনিসপত্রের দাম বেকারত্বের জ্বালা, মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের জীবনসংকট শহর-কেন্দ্রিক জীবনের আকর্ষণের ফলে গ্রাম থেকে শহরের দিকে যাত্রা একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন ইত্যাকার অস্থিরতা সাহিত্য-শিল্পে যে নতুন ন্যারেটি'ভের জন্ম দিল তার প্রকাশ কল্লোল ও অন্যান্য এ-পত্রিকায় স্পষ্ট উচ্চারণে ফুটে ওঠে। কল্লোল প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনুভব অবশ্যস্মর্তব্য :

“কল্লোলের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ কল্লোল অফিসে গিয়ে হয়নি। মধ্য কলকাতায় সে আঁকাবাঁকা এবং তখন নিতান্ত অখ্যাত গলির একটি ছোট দোতলা বাড়ির ঠিকানায় পৌছোবার আগে আমাদের এই ভবানীপুরের রাস্তাতেই ‘কল্লোল’কে পেয়েছি। আর সেইদিনই সচেতন ভাবে না হোক মনের অগোচরে বুঝেছি যে কল্লোল একটা বিশেষ ঠিকানার ছোট একটা ঘর কি একটা ছাপানো মাসিকপত্র মাত্র নয়, সত্যিকার একটা উত্তাল ঢেউ যা সেদিনকার বাংলার যৌবনের বুকের তলা থেকে উথলে উঠে আরো অনেক কিছুর মত সাহিত্যের জগতও তোলপাড় করে তুলছে।....

নির্ভেজাল বাস্তববাদ ‘কল্লোলে’র অবশ্য কোনদিনই ছিল না। কিন্তু সাহিত্যে যাদের কোন দিন দেখা যায়নি, এ রাজ্যে নেহাৎ সুলভ ভাবালুতার প্রশ্রয়ে ছাড়া যাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল, তাদের নির্ভয়ে আমন্ত্রণ করে আনার সাহস ও উৎসাহ কল্লোলেই প্রথম দেখা দিয়েছিল। প্রথম বিদ্রোহের উন্মাদনায় মাত্রাবোধ হয়ত লঙ্ঘিত হয়েছে, বহু জায়গায়, তবু তার ভেতর দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির যে আমূল পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেছে সেটার মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিল না।.......

কল্লোল এক সময়ে আন্তর্জাতিক লেখক সমাজের কল্পনায় দেশ-বিদেশের তখনকার সমস্ত অসামান্য সাহিত্যিকদের যোগাযোগ করেছিল। এ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পরাধীন ভারতবর্ষে বাংলা ভাষার একটি ছোট দরিদ্র নিঃসম্বল পত্রিকার পক্ষে সেটা দারুণ দুঃসাহস। এ দুঃসাহসের মূলে ছিল সাহিত্যের সর্বজনীনতায় একটা গভীর আস্থা। আর যেখানেই থাক,

সাহিত্যে দেশ কাল বা জাতিভেদ বলে কিছু থাকতে পারে না এই বিশ্বাসেই 'কল্লোল' সেদিন বার্নাড শ', রোমা রোলাঁ থেকে হামসুন, গোর্কিদের কাছে ভিক্ষুকের মত নয়, সমকক্ষের মত প্রীতি বিনিময়ের পত্রালাপ করেছিল। সাড়াও তাতে পেয়েছিল অভূতপূর্ব।'

[কল্লোলের কাল—জীবেন্দ্র সিংহরায়/প্রেমেন্দ্র মিত্র (পরিশিষ্ট-ত) দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ পূর্নর্মুদ্রণ জানু—২০১৮; পৃ ২৩০-২৩৩]

২

সংহতি :

সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির মুখপত্র হিসেবে, কৃষক, শ্রমিক সম্প্রদায় ও খেটে খাওয়া মানুষের ঘাম, কান্না আর রক্তের আখ্যানকে সাধারণ্যে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে কল্লোলের সমসাময়িক 'সংহতি' পত্রিকাটি বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পাল ও মুরলীধর বসুর যৌথ সম্পাদনায় ১৯২৩ সালে আত্মপ্রকাশ করে। মাত্র দু-বছরের পরমায়ুসম্পন্ন এই পত্রিকা বাংলা সাময়িক পত্রের ধারাবাহিকতায় একটি নতুন সাম্যবাদী স্বরায়ন ঘটায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বস্তিবাসীদের যাপন কথা এবং কারখানার শ্রমিকদের জীবনচিত্র যথাক্রমে উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। পত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষে মুরলীধর বসুর বদলে কেশবেশ্বর বসু সম্পাদক হন। 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মুরলীধর বসু এবং 'সংহতি' সম্পর্কে কী বলেছেন একটু দেখে নেওয়া যাক—

"মুরলীধর বসু ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনের একজন সাদাসিদে সাধারণ ইস্কুল মাষ্টার। নিরাড়ম্বর নিরীহ জীবন, হয়তো বা নিম্নগত। এমনিতে উচ্চকিত-উৎসাহিত হবার কিছু নেই। কিন্তু কাছে এসে একটা মহৎ উপলব্ধির আস্বাদ পেলাম। অদম্য কর্ম বা উত্তুঙ্গ চিন্তায় শুধু নয়—আছে সুদূরবিলাসী স্বপ্ন। দীনেশরঞ্জনে মত মুরলীধরও স্বপ্নদর্শী। তাই একজন D. R. আরেকজন মুরলীদা।

একদিকে "কল্লোল" আরেক দিকে "সংহতি"।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, দুটি মাসিক পত্রই একই বছরে একই মাসে এক সঙ্গে জন্ম নেয়। ১৩৩০ বৈশাখ। "কল্লোল" চলে প্রায় সাত বছর, আর "সংহতি" উঠে যায় দু'বছর না পুরতেই।

"কল্লোল" বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন। কিন্তু সংহতি তো শিলীভূত শক্তি। সংঘ সমূহ, গণগোষ্ঠী। যে গুণের জন্যে সহধর্মী পরমাণুসমূহ জমাট বাঁধে, তাই তো সংহতি। আশ্চর্য নাম। আশ্চর্য সেই নামের তাৎপর্য।

একদিকে বেগ, আরেকদিকে বল। একদিকে ভাঙন, আরেকদিকে সংগঠন, একীকরণ।

আজকের দিনে অনেকেই হয়তো জানেন না, সেই "সংহতি"ই বাংলাদেশে শ্রমজীবীদের প্রথম মুখপত্র, প্রথমতম মাসিক পত্রিকা। সেই ক্ষীণকায় স্বল্পায়ু কাগজটিই গণজয়যাত্রায় প্রথম মশালদার। "লাঙল", "গণবানী" ও "গণশক্তি"-এরা এসেছিল অনেক পরে। "সংহতিই অগ্রনায়ক"।

[অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি. কলি-৭৩ সপ্তম প্রকাশ ১৩৯৫ : পৃ. ১৭-১৮]

শনিবারের চিঠি :

১৯২৪ সালে যোগানন্দ দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় একাধারে বহুনিন্দিত ও বহুপ্রশংসিত পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি'। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সদ্য বিলেত ফেরত পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় পিতার সম্পাদিত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' এর রীতি অনুসারে তত্ত্বভারাক্লান্ত যুক্তিজালসমৃদ্ধ স্বরাজ্যদলের বিরূপ সমালোচনায় ঠিক খুশি হননি। তীক্ষ্ণ শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে হাস্যরসের উদ্রেক করার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করাতেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন তাই তিনি 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাকেই এই দ্বৈরথের হাতিয়ার করার কথা ভেবেছিলেন। মনে রাখতে হবে ১৩৩১ সালের ১০ই শ্রাবণে প্রকাশিত ডবল-ক্রাউন সাইজের চব্বিশ পৃষ্ঠা সমন্বিত পত্রিকার প্রথম সংখ্যার খামের ওপর সবুজ কালিতে ছাপা চাবুক প্রহাররত যে বীরপুরুষের চিত্রটি ছাপা হয়েছিল সেই চিত্রশিল্পী হলেন কল্লোল সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাস। শনিবারের চিঠির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে প্রায় অধিকাংশ রচনাই ছদ্মনামে বা নাম ছাড়াই প্রকাশিত হতো। দাম প্রত্যেক সংখ্যা এক আনা বার্ষিক সডাক তিন টাকা।

প্রথম সংখ্যায় 'মুখবন্ধ' লিখেছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায় 'শঙ্করাচার্য' নামে। এই রচনায় প্রথমে জানানো হলো : "আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই। এমনকি উদ্দেশ্যহীনতাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়।" এই রচনারই অন্তিম পর্যায়ে উদ্দেশ্য কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে—"রাষ্ট্রকে আমরা বাদ দেবনা। রাষ্ট্রীয়তা আমাদের একটা শক্ত রোগের মত চেপে ধরে রয়েছে, সেই রোগটাকে তাড়িয়ে বা দাবিয়ে আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে' আনতে হবে। একে অবাধে বেড়ে উঠতে আমরা দেব না...।" [শনিবারের চিঠি, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা পৃ. ১-২]

প্রথম সংখ্যায় হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় ও যোগানন্দ দাসের লেখাও বেরিয়েছে। যোগানন্দ 'শ্রীপ্রকাশ' নামে 'জীবনদর্শন' লিখেছেন। সাতাশটি সংখ্যা প্রকাশের পর সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'ও বন্ধ হয়ে যায়। এই সীমিত সময়েও তৎকালীন প্রথিতযশা লেখক-লেখিকাদের বর্ণময় সমাবেশ আমাদের বিস্মিত করে। দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রথম লেখা অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চরখা না বেহালা' (তুলোনায় তুলোধুনা)। তৃতীয় সংখ্যায় 'চরখার কথা' লিখলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। নবম সংখ্যায় আবার অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন 'নানা পংহি' রসুল আলী ছদ্মনামে। সাতাশটি সংখ্যায় যেসব লেখকেরা পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছে তা নিঃসন্দেহে সম্ভ্রমের

উদ্রেক করে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, যোগেশচন্দ্র রায় (বিদ্যানিধি), সুশীল কুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, পুলিন বিহারী দাস, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, শান্তা দেবী, মোহিতলাল মজুমদার, সুবিমল রায়, প্রভাকর দাস, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, যোগানন্দ দাস প্রমুখ; কে নেই সেই তালিকায়।

এই পত্রিকার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে অনেক লেখক একাধিক ছদ্মনামে লিখেছেন। অলোক চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন শঙ্করাচার্য, মধুকরকুমার কাঞ্জীলাল, ভজনরাম পাহাড়িয়া গাজী আব্বাস বিটকেল, ক্ষীণেন্দ্র খেয়াল গায়, বঙ্গসন্তান, নটনারায়ণ ও শুভগ্রহ নামের অড়ালে। যোগানন্দ দাস যে যে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে রয়েছে—প্রকাশ রায়, সনাতন দেবশর্মা, যথাগত কবিঞ্চু, গাজী আব্বাস বিটকেল। শান্তা দেবী নিয়েছেন—বাঙালীর মেয়ে, মঙ্গলচন্দ্র শর্মা, ক্ষণিকা—এই নামগুলি। সজনীকান্ত দাস বহু ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে ভাবকুমার প্রধান, কেবলরাম গাজনদার, গোলকচন্দ্র ধাঁধা, গাজী আব্বাস বিটকেল, ক্ষীণেন্দ্র ধ্রুপদ গায় প্রভৃতি উল্লেখ্য। গাজী আব্বাস বিটকেল সহ আরো কয়েকটি নাম একাধিক লেখক ব্যবহার করেছেন।

সজনীকান্ত দাস প্রথম থেকেই নির্বিচার আক্রমণে তাঁর লেখনীতে শান দিয়েছিসেলন শনিবারের চিঠির বিভিন্ন সংখ্যায়। চিঠির একাদশত সংখ্যায় 'কামস্কাট্‌কীয় ছন্দের আমদানি করলেন—এবং শেষ কবিতা "আমি ব্যাঙ/লম্বা আমার ঠ্যাং" নজরুলের 'বিদ্রোহী কবিতার প্যারডি। গাজী আব্বাস বিটকেল ছদ্মনামটি মূলত কাজী নজরুল ইসলামের নামকে ব্যাঙ্গ করে পরিকল্পিত।

এই নামের আড়ালে থেকেই তিনি তাঁর আক্রমণকে শাণিত করে তুললেন। তাঁর ব্যাঙ সাপে রূপান্তরিত হলো। "আমি ভীম ভুজঙ্গ ফণিনীদলিত ফণা", অবশেষে "আমি খোদার ষণ্ড, নিখিলের নীল খিলানে যে ক্ষুর হানি"। এর পরিণতি হলো মারাত্মক; বিক্ষুব্ধ নজরুল এই দুষ্কর্মের জন্য কাঠগড়ায় বসালেন মোহিতলাল মজুমদারকে। মোহিতলালকে গুরু মানতেন নজরুল। কিন্তু সে সময় তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণে মোহিতলালকেই এই প্যারাডির রচয়িতা ঠাওরালেন নজরুল। প্রত্যুত্তরে কল্লোল পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় (আশ্বিন)—নজরুল লিখলেন 'সর্বনাশের নেশা' কবিতা—"ভূধরপ্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার"। বিনা অপরাধে এভাবে হেনস্থা হয়ে মোহিতলাল ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে 'দ্রোণগুরু' নামে এক দীর্ঘ কবিতা লিখলেন, শনিবারের চিঠির দ্বাদশ সংখ্যার ক্রোড়পত্রে। তিনি শিষ্যকে অভিশাপ দিতে কার্পণ্য করলেন না। এই সংখ্যাটিকে 'বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যা' হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। মোহিতলাল কিন্তু এতেও ক্ষান্ত হলেন না। ত্রয়োদশ সংখ্যায় তিনি লিখলেন 'চামার খায়-আম'-এর নবরুবাইয়ত। সাহিত্যের বাতাবরণ কলুষিত হলো ব্যক্তিগত আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের আকচা আকচিতে। 'চিঠি'র পূর্ব ঘোষিত রাষ্ট্রনীতির

বিরুদ্ধে জেহাদ ম্রিয়মান হয়ে গেল। শনিবারের চিঠির সাতাশতম সংখ্যা ১৩৩১ সালের ৯ ফাল্গুন রেরনোর পর পত্রিকাটি যে বন্ধ হয়ে যায় সে কথা আগেই বলা হয়ছে। ১৩৩৩ তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, জৈষ্ঠ, আষাঢ় এবং কার্তিকে যথাক্রমে 'জুবিলী সংখ্যা', 'বিরহ সংখ্যা' ও 'ভোট সংখ্যা'। 'জুবিলী-সংখ্যা' মূলত কলকাতার দাঙ্গার বিষয় নিয়েই রচিত। এই নামকরণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের তাঁব মন্তব্য : "ঊনপঞ্চাশ বৎসর পরে 'শনিবারের চিঠি'র পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবে। সেইজন্য আমরা ইহার এই জুবিলী সংখ্যা প্রকাশ করিতেছি।" সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে শনিবারের চিঠিই প্রথম হিন্দু-মুসলমানের অর্ন্তগত সাম্প্রদায়িক সমস্যার চিত্রটি সাহিত্য রূপে পরিবেশনা করল। পরবর্তী 'বিরহ সংখ্যা'র উপজীব্য ছিল 'অতি আধুনিক সাহিত্যের ন্যাকামি ও সম্পর্ক-বিরুদ্ধে যৌন আবেদনের বিরুদ্ধে আমাদের সেই সর্বোদয়-অভিযান।' [সজনীকান্ত দাস : আত্মস্মৃতি : প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ পৃ. ১৬৯-৭০]

১৩৩৩-এ উপরে উল্লিখিত তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের পর এই পত্রিকা আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রায় দশ মাস পরে ১৩৩৪ সালের ভাদ্রমাসে পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ, তবে সাপ্তাহিক নয় মাসিক পত্রিকা হিসেবে। একথা সর্বজনবিদিত যে সজনীকান্ত দাস যে ভাবেই শনিবারের চিঠিতে যুক্ত থাকুন না কেন, তিনি ছিলেন এই পত্রিকার প্রাণপুরুষ। নবপর্যায়ে শনিবারের চিঠি প্রকাশিত হবার পর ১৩৩৪ এর মাঘ সংখ্যা থেকে সম্পাদক হলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী আর কর্মাধ্যক্ষ—সজনীকান্ত দাস। অনেক নতুন লেখকও যুক্ত হলেন যেমন, রাজশেখর বসু (পরশুরাম) এবং মনোবৈজ্ঞানিক গিরীন্দ্রশেখর বসু, সঙ্গে শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন। পরশুরামের সরস দুটি রচনা 'সাহিত্য সংস্কার' এবং 'তামাক ও বড় তামাক' আর গিরীন্দ্রশেখরের 'কবিসংসদের ডায়ারী' শনিবারের চিঠিকে জনপ্রিয় করে ছিল। নীরদচন্দ্র ও সজনীকান্ত প্রমথ চৌধুরীর নানা লেখা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও দোষ ত্রুটি দুর্বলতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে শুরু করলেন। স্বভাবতই প্রমথ চৌধুরীর তরফের সারস্বত সমাজ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে শনিবারের চিঠিকে নানা দিক থেকে পাল্টা আক্রমণ করতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ ডাকযোগে প্রেরিত পত্রিকা প্রত্যাখান করলেন। নীরদচন্দ্র পুনর্বার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লিখলেন 'প্রথম চৌধুরী-জের'।

১৩৩৫-এর ভাদ্র মাসে পত্রিকার নতুন বছরের শুরু। সজনীকান্ত, এই সংখ্যা থেকেই আরম্ভ করলেন ধারাবাহিক 'নকুড় ঠাকুরের আশ্রম'। পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে নীরদচন্দ্র এই উপন্যাস বন্ধ করতে বললেন সজনীকান্তকে। সজনীকান্ত রাজি না হওয়ায় নীরদচন্দ্র পদত্যাগ করলেন। চিঠির তৃতীয় সম্পাদক হলেন সজনীকান্ত দাস। উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় নিন্দামন্দ-র মাধ্যমেই পত্রিকাটি পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসে। এক উজ্জ্বল লেখকগোষ্ঠীকে সমন্বিত করতে পেরেছিল এই পত্রিকাটি। কিন্তু সজনীকান্তের আক্রমণ থেকে কারও রেহাই নেই। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মতো মহীরূহ

সদৃশ লেখকদের থেকে শুরু করে তরুণ কবি জীবনানন্দ দাশ প্রত্যেকেই এই ক্ষুরধার আঘাতে বিদ্ধ হয়েছেন—এবং এই পত্রিকার খ্যাতির নেপথ্যেও এই বৈশিষ্ট্যটিই কাজ করেছে। "কুখ্যাতিও বলা যায়, কারণ আক্রমণে, শব্দ ব্যবহারে শালীনতার মাত্রা বজায় থাকত না সর্বদা। কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি' গোষ্ঠীর লড়াই একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। তার জন্য রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত জোড়াসাঁকোয় দুই দলকে নিয়ে সালিশীসভা ডাকতে হয়েছিল। জীবনানন্দ দাশের কবিতা নিয়ে যেসব অন্যায্য, অশালীন আক্রমণ সজনীকান্ত চালিয়ে গিয়েছেন তা ক্ষমার অযোগ্য মনে হয়। তবু অধুনা বিস্মৃত শনিবারের চিঠির সবটাই নিন্দার যোগ্য নয়।"

[গোপা দত্ত ভৌমিক : বাংলা সামরিক পত্রের দুশো বছর : অরিন্দম বারিক, সুনীল নন্দী ও সৌমেন কুমার বেরা সম্পাদিত নির্বাচিত সাময়িকপত্র ১৮১৮-১৯৫০; পূর্ণপ্রতিমা, কল-৭০০১২২, প্রথম সংস্করণ মার্চ ২০২১ : পৃ. ২৯]

উত্তরা :

অতুলপ্রসদা সেন ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় ১লা আশ্বিন ১৩৩২ শুভ মহালয়ার দিনে ইণ্ডিয়ান প্রেসের কাশীতে স্থিত শাখা অফিস থেকে প্রবাসীদের পত্রিকা 'উত্তরা'র আত্মপ্রকাশ। সহসম্পাদক : সুরেশ চক্রবর্তী এবং কোষাধ্যক্ষ হলেন ড: রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে এই পত্রিকা যাত্রা শুরু করলেও নানা ঘাত প্রতিঘাত অর্থনৈতিক সংকট মাঝেই মাঝেই দুরূহ ও দুর্গম করেছে এর পথচলা—সব সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি। কখনও বা কয়েকটি সংখ্যা সম্মিলিতভাবে একটি যৌথ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই পত্রিকা সমস্ত প্রতিরোধ ও প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে দীর্ঘ সময় যে জীবিত থাকতে পেরেছে তার নেপথ্যের মূল কাণ্ডারী ছিলেন সুরেশ চক্রবর্তী। কল্লোল গোষ্ঠী অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করেছিল 'উত্তরা'কে। 'উত্তরা'র মুক্তচিন্তা, প্রাগ্রসর আধুনিকতাকে বরণ করে নিয়েছিলেন কল্লোলের লেখকবৃন্দ। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করেছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সুরেশ চক্রবর্তীকে লেখা পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্রটি উল্লেখ্য : "উত্তর ভারতের প্রবাসী বাঙালীদের মুখপত্র 'উত্তরা' সেদিন কল্লোলের বিনিময়ে এসে যখন আমার হাতে পৌঁছল তখন সাগ্রহে সানন্দে এবং সগৌরবে তাকে মাথায় তুলে নিলেম। হ্যাঁ কাগজ বার করতে হয় এমন কাগজই বার হওয়া উচিত। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে লেখকের অভাব কোনদিনই নেই, হবেও না। তবে এতদিন তাদের নিমন্ত্রিত হবার, যথাযোগ্য সুযোগ আসেনি, আজ এসেছে, এ সুযোগ অবহেলিত না হলেই সুখী হ'ব। অতুল প্রসাদ, কমল ভ্রাতৃদ্বয়, কবিরাজ, ভট্টাচার্য, রায়, মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রথীরা যে প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডা, তার বৈভব যে কোনদিন হ্রাস হবে এটা অবিশ্বাসের কথা, তার উপর তোমার সহকারিতা যাকে প্রাণশক্তি দেবে তার সাফল্য সুনিশ্চিত। প্রথম সংখ্যা পড়ে ভারী খুশী হয়েছি। সব কটি লেখা ভারী সুন্দর। বাঙলার কোন কাগজই একে প্রবন্ধ সম্পদে

এড়িয়ে যেতে পারবে না।" পক্ষান্তরে সুরেশ চক্রবর্তীও কল্লোলের সাহচর্য চেয়েছিলেন। নজরুল ইসলাম, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত প্রত্যেকেই জমায়েত হয়েছেন 'উত্তরা'র দপ্তরে। একদিকে রবীন্দ্রনাথের অকৃপণ সহযোগিতা অন্যদিকে আধুনিক লেখকদের সানন্দ অংশগ্রহণ 'উত্তরা'কে এক সর্বজনীনতা এনে দিয়ে ছিল। এই যোগাযোগের—এক অকপট ছবি আমরা পাই অচিন্ত্যকুমারের আশ্চর্য লেখনীতে : "মোহিতলালও এলেন 'উত্তরা'য়—এলেন আমাদের পুরোবর্তী হয়ে। 'কল্লোলে'র সঙ্গে সঙ্গে 'উত্তরা'ও সরগরম হয়ে উঠল। কিন্তু দিন যেতে-না-যেতে কেমন বেসুর ধরল বাজনায়। মতে বা মনে কোনো অমিল নেই, তবু কেন কে জানে, মোহিতলাল বেঁকে দাঁড়ালেন—কল্লোলের দলের যে সব লেখক তোমার কাগজে লেখে তাদের সংশ্রব যদি না ত্যাগ করো তবে আমি তার 'উত্তরা'য় লিখব না। সুরেশ মেনে নিতে চাইল না এ শর্ত। এত প্রাখর্য যেন সইল না অতুলপ্রসাদের। তিনি সরে দাঁড়ালেন। তবু সুরেশ অবিচ্যুত। রাধাকমল আছেন যিনি 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' নামক প্রবন্ধে রায় দিয়েছেন আধুনিকতার স্বপক্ষে। কিন্তু অবশেষে রাধাকমলও বিযুক্ত হলেন। সুরেশ একা পড়ল। তবু সে দমল না। পিছু হটল না। প্রতিজ্ঞার পতাকা খাড়া করে রাখল।

তবু কেন জানিনা, কল্লোলের সঙ্গে শুধু 'কালি-কলমের' নামটাই লোকে জুড়ে দেয়-'উত্তরা'র কথা দিব্যি ভুলে থাকে। এ বোধ হয় শুধু অনপ্রাসের খাতিরে। নইলে, একই লেখকদল এই তিন কাজে সমানে লিখছে—সমান স্বাধীনতায়। কালি-কলমের মত 'উত্তরা'ও এই আধুনিক ভাবের তন্ত্রধারক ছিল বরং কালি-কলমের আগে আবির্ভাব হয়েছিল 'উত্তরা'র 'কালি-কলমের' জন্মের পিছনে হয়তো খানিকটা বিক্ষোভ ছিল, 'উত্তরা'র শুধু সৃজনমুখের মহোল্লাস। 'কল্লোল'-'কালি-কলমে'র বহু অসম্পূর্ণ কাজ 'উত্তরা' করে দিয়েছে। যেমন আরো বহু পরে করেছে 'পূর্বাশা'।"

[অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ: এমসি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড : সপ্তম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৯৫ পৃ. ৭৮-৭৯]

'উত্তরা' পত্রিকার দীর্ঘ জীবন ১৯৬৩ পর্যন্ত প্রসারিত। অভিজাত রুচি সম্পন্ন এই পত্রিকা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনায়াসে বিচরণে সর্বশ্রেণির পাঠকের নজর কেড়েছিল। নবীন ও প্রবীন লেখকদের রচনা সমৃদ্ধ 'উত্তরা' সারস্বত সমাজে একটি বিশেষ স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে গানের স্বরলিপিও এই পত্রিকায় স্থান পেত।

কালি-কলম :

মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা কালি-কলমের প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩ সালে বৈশাখে। কলেজ স্ট্রিটের 'বরদা এজেন্সি' থেকে প্রকাশ পেয়েছিল এই পত্রিকা। প্রকাশক ছিলেন 'শিশিরকুমার নিয়োগী এম এ, বি এল।

পত্রিকার মুদ্রণের কাজটি বরদা এজেন্সির পক্ষে, ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ২১১ কর্ণওয়ালি স্ট্রিট থেকে সম্পন্ন হত। ডাবল ক্রাউন সাইজে মোটা অ্যান্টিক কাগজে ছাপা এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল চার আনা, বার্ষিক সংখ্যা সডাক সাড়ে তিন টাকা। পত্রিকাটির তিন বছর দশ মাস জীবৎকালে কখনও মূল্যবৃদ্ধি হয়নি। শুধু চতুর্থ বছরে প্রথম সংখ্যা দুটি না বেরোনয় বার্ষিক গ্রাহকমূল্য কমিয়ে দু'টাকা করা হয়। মাঝে মাঝে অবশ্য পত্রিকাটির ছাপাখানা বদল হয়েছে। 'কালি-কলমে'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল—উৎকৃষ্ট ও নির্ভুল ছাপা ও নিয়মিত প্রকাশ। প্রতিমাসের ৩০ তারিখে প্রকাশিত হত পত্রিকাটি—এ ব্যাপারে তৎকালীন পত্র-পত্রিকার জগতে কালি-কলম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। পত্রিকাটির সম্পাদনার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু বদল আমাদের চোখে পড়ে। ত্রয়ী সম্পাদকের উজ্জ্বল অংশগ্রহণে যাত্রা শুরু হলেও দ্বিতীয় বছর অর্থাৎ ১৩৩৪ সালের গোড়াতেই প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। পরবর্তী বছরের শুরুতেই শৈলজানন্দও প্রেমেন্দ্র মিত্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ফলে পত্রিকাটির অবশিষ্ট আয়ুস্কালে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন মুরলীধর বসু সম্পূর্ণ এককভাবে। কল্লোল গোষ্ঠীর দু'জন সম্ভাবনাময় লেখক যখন মুরলীধর বসুর অনুরোধে কালি-কলম পত্রিকার সম্পাদনায় ব্রতী হন, তখন সেই নিষ্ক্রমণ নিয়ে স্বভাবতই কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়, সেই চাপান উতোরে প্রবেশ না করেও আমরা লক্ষ করি তাঁরা অচিরেই আবার কল্লোলে যোগদান করেন। দুটি পত্রিকার লেখক সূচির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় মোটামুটি দুটি পত্রিকাতেই তাঁদের অবাধ বিচরণ। জগদীশ গুপ্তের গল্প ও জীবনানন্দের কবিতা কিছুটা অধিক সংখ্যায় কালি-কলমে স্থান পেয়েছে। তবে মূলত সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনে দুটি পত্রিকার মধ্যে কোনো ভিন্নতা ছিল না। ফলে সমমনস্ক ও সম-আদর্শ সম্পন্ন দুটি পত্রিকার যুগ্ম পদচারণা আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে বলেই আমাদের মনে হয়।

প্রগতি :

ইংরাজি ভাষায় সাম্মানিক নিয়ে স্নাতক স্তরে ১৯২৭ এর জুলাইয়ে যখন বুদ্ধদেব বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নেন, আই এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারের সূত্রে প্রাপ্ত জলপানির টাকার তিনি তাঁর হাতে লেখা 'প্রগতি'কে মুদ্রিত রূপ দেবেন। প্রথমেই স্থির হয়েছিল দশজন দশটাকা করে অনুদান দেবে। মাসে একশো টাকার সংস্থান হলে পত্রিকা চলবে। বুদ্ধদেবের পক্ষেই এই টাকার সংস্থান করার সমস্যা ছিল। বৃত্তি প্রাপ্তিতে সে সমস্যার সমাধান হলো। বুদ্ধদেবের সঙ্গে অজিত দত্তের পরিচয় স্কুলে পড়াকালীন। পুরানা পল্টনে আসার পর বুদ্ধদেবের প্রতিবেশী হলেন পরিমল রায়। অজিত দত্তের বাড়ির কাছেই আর্মানীটোলায় থাকতেন অমলেন্দু বসু। সাহিত্যকে কেন্দ্র করে এই চারজনের অমলিন বন্ধুতা।

১৩৩৪ এর আষাঢ়ে 'প্রগতি'র মুদ্রিত সংস্করণের প্রথম আত্মপ্রকাশ। কল্লোল পত্রিকার ভাদ্র ১৩৩৪ সংখ্যায় এ পত্রিকার পরিচয় প্রকাশিত হলো : "প্রগতি-সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

ঢাকা ৪৭ নং পুরোন পল্টন হইতে প্রকাশিত। শ্রী অজিতকুমার দত্ত ও শ্রীবুদ্ধদেব বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এ পত্রিকাখানি ছোট হইলেও ইহার লেখা প্রভৃতি পড়িয়া মনে হয়, এই পত্রিকা পরিচালনায় যাহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁদের শক্তি ও আদর্শে বিশিষ্টতা আছে। আমরা এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।" পত্রিকার নাম পত্রের মাঝখানে একটি ছবি ছিল এক বৃদ্ধের হাতে কলম। ছবির ডানদিকে বই এবং বাম দিকে 'প্রগতি' পত্রিকার নামাঙ্কন। প্রবাসীর থেকে আকারে কিছু ছোট এই পত্রিকায় কবিতা ছাপা হতো পাইকা টাইপে আর অন্যান্য লেখা ছোট পাইকায়। প্রতি সংখ্যায় একটা করে ফোটো থাকত। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ছিল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আলোকচিত্র। এই বিখ্যাতদের ফোটো দেওয়ার রীতিটি কল্লোল থেকেই অনুসৃত। ভাবে ও ভাবনায় কল্লোলের সঙ্গে প্রগতির একটি আত্মিক-যোগ ছিল তা বলাই বাহুল্য। লেখক সূচিতেও দুটি পত্রিকায় একই নাম চোখে পড়ত। কাগজটি যাতে ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে পারে সে বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। সেজন্য 'কল্লোল' শুধু নয়। 'প্রবাসী'র মতো সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক পত্রিকাতেও প্রগতির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে।

প্রগতির লেখক সূচিতে মাত্র চারজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের অবস্থান আমরা দেখতে পাই। বাকি সবই নবীন লেখক। লেখক নির্বাচন থেকেই একথা স্পষ্ট যে প্রগতির লক্ষ্য ছিল অতি আধুনিকদের প্রতিনিধিত্ব করা। নবীন লেখকরা সর্বদা যে স্বনামে লিখেছেন তা নয়, তাঁরা ছদ্মনামও ব্যবহার করেছেন। যেমন অভিনব গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দেবদত্ত = অজিত দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু, যুবনাশ্ব = মনীষ ঘটক, বিপ্রদাস মিত্র = বিষ্ণু দে। বুদ্ধদেবের প্রচারক সত্তা জীবনানন্দকে পরিচিত করান প্রগতি পত্রিকার মাধ্যমে। কখনও পরবর্তী সংখ্যার ঘোষণাও থাকত।

একটি উদাহরণ :

(আগামী সংখ্যায়) প্রভু গুহঠাকুরতার 'বলশেহ্বিস্ট্ সাহিত্যের ধারা' বিপ্রদাস মিত্রের 'পুরাণের নবজন্ম' (উর্মিলা)। বেলিতো মুসোলিনির একটি ছোট গল্পের অনুবাদ। আইরিশ নাট্যকার শ্যন ও কেইসী-লেখক প্রভু গুহঠাকুরতা। প্রভু গুহঠাকুরতার "আজকালকার ফরাসী সাহিত্য"। ডঃ সুশীল কুমারদের 'প্রাচীন বাঙ্গলা নাটক ও তাহার অভিনয়', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি ছোটগল্প "বিবাহের চেয়ে বড়"।

১৩৩৭ সালে প্রগতি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় মূলত আর্থিক কারণে।

ধূপছায়া ঃ

১৩৩৪ সালের বৈশাখে (১৯২৭) 'ধূপছায়া' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। চিকিৎসক রেণুভূষণ নিজ ব্যয়ভারে পত্রিকা প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে সহ সম্পাদক রূপে যোগদান করেন সুরেন ভট্টাচার্য। লেখক তালিকায় আমরা দেখতে পাই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কল্পনা দেবী, শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, হুমায়ুন কবির, জগদীশ গুপ্ত, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের নাম। ডিমাই সাইজের মাসিক পত্রিকাটির নমুনা সংখ্যার মূল্য ছিল ৯ আনা, বার্ষিক মূল্য আড়াই টাকা। উপস্থাপনায় বা অঙ্গসৌকর্যে তেমন কোনো জৌলুস না থাকলেও পত্রিকাটি অতি-আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে জায়গা করতে পেরেছে, কারণ সাহিত্যের নীতিপুলিশদের তর্জন-গর্জন তাকে দমাতে পারেনি এবং সাধ্যানুযায়ী নতুন সাহিত্যেরই পৃষ্ঠপোষকরা করেছে এই পত্রিকা। এবং স্বাভাবিকভাবেই 'শনিবারের চিঠি' ও সজনীকান্ত দাসের তীব্র আক্রমণ থেকে অন্যান্য। পত্রিকার মতোই 'ধূপছায়া'ও রেহাই পায়নি। পত্রিকাটির 'সওদা' ও 'ঘরে বাইরে' তে সম্পাদকীয় মন্তব্যে সাহিত্যের ধ্যানধারণায় যে পরিবর্তন এসেছে সে বিষয়ে আলোকপাত প্রণিধান যোগ্য। 'কল্লোল'ও 'কালি-কলমে' এ ধরণের সম্পাদকীয় প্রয়াস চোখে পড়ে না। পত্রিকাটির সীমিত আয়ুষ্কাল ছিল ১৯২৭-২৯, মাত্র দু'বছরের। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সময়েই স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যের জন্য পাঠকের নজর কেড়েছিল। প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের অবদান পত্রিকাটির মান বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

বিচিত্রা :

শরৎচন্দ্রের মাতুল সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৩৩৪ সালের পয়লা আষাঢ় বিচিত্রার আত্মপ্রকাশ ঘটে। যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে তিনি পত্রিকার সম্পাদনায় ব্রতী হন। তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল একটি মাসিক পত্রের সম্পাদনা করবেন, এবং এই বিষয়ে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট ছিল। মাসিক পত্রিকাটির নাম প্রথমে 'বিচিত্রা' ছিল না। 'সবিতা' অথবা 'হিমালয়' নাম দুটি ভাবা হয়েছিল। কান্তিচন্দ্র ঘোষের প্রস্তাব অনুযায়ী 'বিচিত্রা' নামটি ঠিক করা হয়। উপেন্দ্রনাথের স্থির বিশ্বাস ছিল, 'বিচিত্রা' নামটিই রবীন্দ্রনাথকে পত্রিকাটির প্রতি আকর্ষিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের নিজ হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি, মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হলো বিচিত্রার প্রথম সংখ্যায় :

"ছিলাম মনে মায়ের কোলে
বাঁশি বাজানো শিখাবে বলে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি
বিচিত্রা হে বিচিত্রা,
সেখানে তব রক্তের বঙ্গভূমি" [বিচিত্রা/কবিতা]

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি এই পত্রিকার অহংকার। আশ্চর্যের ব্যাপার যে উভয়েই এখানে উপন্যাস লিখেছেন, কোনো গল্প লেখেননি। বেশ কিছু কালজয়ী লেখা বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল—যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ', 'দুইবোন', 'মালঞ্চ', 'পারস্য ভ্রমণ', 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা', 'শিশুতীর্থ', বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি', অন্নদাশঙ্করের 'পথে প্রবাসে' ও ছয় খণ্ডের সুবৃহৎ উপন্যাস 'ত্যাসত্য', মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসীমামী' এবং পরে তাঁর লেখা বিভিন্ন গল্প বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অর্থানুকূল্য থাকার কারণে মুদ্রণ সৌকর্যে যেমন কোনো খামতি ছিল না, তেমনি লেখকদের সম্মান দক্ষিণা অকৃপণ্যতা কারণে বারো বছরে প্রভূত ভালো লেখা এই পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উপেন্দ্রনাথের যোগ্য সম্পাদনায় পত্রিকার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। নীহাররঞ্জন রায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ, শান্তিদেব ঘোষ, দিলীপকুমার রায়, প্রমথ চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায় ছিলেন এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রবন্ধ বিভাগও বিশিষ্ট গুণীজনেরই লেখায় সমৃদ্ধ ছিল। সমকালীন লেখকদের ভালো লেখা নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রকাশিত হতো এই পত্রিকায়। এর সঙ্গে সঙ্গীত, নৃত্যকলা, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প, লোকশিল্প ও নাটক সম্পর্কেও নানা উল্লেখযোগ্য রচনা এখানে ছাপা হয়েছে।

নিবন্ধে ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ এই কালপর্বে যেসব পত্র-পত্রিকা নতুন যুগের সাহিত্যের স্বাদগন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। সময়াভাবে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হ'লো না। আশা করা যায় বারান্তরে সে প্রয়াসকে রূপ দেওয়ার।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১। কল্লোলের কাল : জীবেন্দ্র সিংহরায়, দেজ পাবলিশিং : পুনর্মুদ্রণ জানু ২০১৮

২। কল্লোল যুগ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রা. লি সপ্তম প্রকাশ ১৩৯৫

৩। An Acre of Green Grass : Buddhadeva Bose, Papyrus, Nov 1962 (Reprint)

৪। নির্বাচিত সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৯৫০) : সম্পাদনায় : অরিন্দম বারিক, সুনীল নন্দী, এ সৌমেন কুমার বেরা পূর্ণ প্রতিমা, প্রথম সংস্করণ ২০২১

৫। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭

৬। প্রতীতি, মে-জুন ২০২৩

[**কৃতজ্ঞতা স্বীকার :** এই লেখাটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য প্রভূত বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপিকা ড. সুমিতা চক্রবর্তী ও বিশিষ্টকবি ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ।]

বিবাদ- বিসংবাদ : কল্লোল- শনিবারের চিঠি

সৌ ম্য ব্র ত ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

বহমান কাল ধরে নতুনত্বের সন্ধানীরা যখনই শিল্প সাহিত্যকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন কোনও নতুন বাঁকে, সমাজের যেকোনো স্তরে যখনই নতুন কিছুর আমদানি হয়েছে, সনাতনীরা আঁতকে উঠেছেন, বিশুদ্ধবাদীরা বিষম খেয়েছেন, নতুনত্বের স্বাদ পছন্দ হয়নি পুরাতনপন্থীদের। অস্তিত্বের চরম সংকট অনুভব করে সমাজ হিতৈষণার বাহানা তুলে যা কিছু নতুন, তাকে অস্বীকার করতে প্রথমেই তাঁরা একজোট হয়েছেন। তারপর সমাজ সংস্কারের মহান ব্রত পালন করতে রে রে করে তেড়ে এসেছেন নতুনদের দিকে। এই 'চোখে আঙুল দাদা'রা আমজনতাকে বোঝাতে মাঠে নেমেছেন 'আপনি মোড়ল' হয়ে! নতুনকে নাকচ করার এহেন উদ্যোগে বরাবরই লাভ হয়েছে নতুনদের। নতুন সৃষ্টি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে সহজে। কয়েকটি পুরস্কার কিংবা একরাশ তিরস্কারে নয়, সময়ের মাপকাঠিতে নির্ধারিত হয় সৃষ্টির পরমায়ু। এক শতাব্দী তো নেহাত কম সময় নয়! এতটা পথ পেরিয়ে এসে বুঝতে অসুবিধা হয় না, বাংলা সাহিত্যের বাঁক বদলে কত বড় ভূমিকা পালন করেছিল 'কল্লোল'! পাঠককে প্রকৃত অর্থেই নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছিল একদল তরুণ তুর্কি। বিরোধটা বেঁধেছিল সেখান থেকেই। বিরোধীপক্ষ শনিমন্ডল; 'শনিবারের চিঠি'র বিশুদ্ধবাদীরা। সত্যিই কি বিষম খেয়েছিলেন তাঁরা? নাকি একটি নতুন পত্রিকা নিয়ে চটজলদি পাঠকের দরবারে পৌঁছে যেতে এই দ্বন্দ্ব-বিরোধকে হাতিয়ার করতে চেয়েছিল শনিমন্ডল! কতটাই বা বিব্রত হয়েছিল 'কল্লোল'? সাহিত্যের আদর্শ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন কি তাঁরা? বাংলা সাহিত্যের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা এই দ্বন্দ্ব-বিরোধের কথা ও কাহিনি থেকে এহেন নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যেতে পারে।

আসলে অদম্য ইচ্ছেশক্তি, অপরিসীম সাহস, অফুরান আত্মবিশ্বাস আর অটুট বন্ধুত্বকে সম্বল করে একদল তরুণ সাহিত্যপ্রেমী যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নেরই সযত্ন নির্মাণ 'কল্লোল'! নির্মাতা অবশ্যই কল্লোলের দুই সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ এবং দীনেশরঞ্জন দাশ। যাঁদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, অংশগ্রহণ এবং অনুক্ষণ পরিচর্যায় 'কল্লোল' হয়ে উঠেছিল আড্ডার উপনিবেশ! আর এই নির্ভেজাল আড্ডার আখড়াই আস্কারা দিয়েছিল অবাধ সাহিত্য সাধনার। জনকয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠা লুব্ধ কিংবা প্রতিষ্ঠার তোয়াক্কা না করা পাঁচমিশেলি আমুদে তরুণ সাহিত্যপ্রেমী যৌথভাবেই নিজস্বতার সাধনায় মেতেছিলেন 'কল্লোল'এ। দীনেশরঞ্জন এবং গোকুলচন্দ্র তো ছিলেনই, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি চৌধুরী, মুরলীধর বসু, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, অজিত দত্ত, মনীশ ঘটক, সুকুমার ভাদুড়ী প্রমুখ কিংবা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-প্রেমেন্দ্র মিত্র-বুদ্ধদেব বসু 'আজি হতে শতবর্ষ' আগে 'কল্লোল'এর পাতায় যা লিখেছিলেন, যেভাবে

লিখেছিলেন তার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সমঝদার পাঠকের বোঝাপড়া বহুদিনের।

এতদিনের বোঝাপড়ায় একটি কথা স্পষ্ট ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'কল্লোল' পত্রিকা পথ চলা শুরু করেছিল একটি সিরিয়াস সাহিত্যিক আদর্শকে সামনে রেখে। যদিও ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'পত্রসূচনা' লিখে কিংবা ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর 'সূচনা' অংশে বা তার কিছু পরে প্রমথ চৌধুরী ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'সবুজপত্র'র 'মুখপত্রে' যেভাবে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট করেছিলেন, 'কল্লোল'-এর প্রথম সংখ্যায় দীনেশরঞ্জনের 'কল্লোল' কবিতা কিংবা বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'কল্লোল' শীর্ষক গদ্য প্রস্তাবে পাঠকের কাছে ততখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি তাঁদের আচরিত সাহিত্যিক আদর্শ। তবে পত্রিকার প্রথম দিককার সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত গল্প-কবিতা বা অন্যান্য রচনাগুলি থেকে বেশ বোঝা যায় যাবতীয় জড়ত্ব দূর করে প্রথম থেকেই বাঙালি জাতির হৃদয়ে এক দুর্দমনীয় শক্তির সঞ্চার করতে চেয়েছে কল্লোলগোষ্ঠী। সমূহ দুঃখ অতিক্রম করে অপরিসীম সাহস নিয়ে মানুষকে নব জীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে এগিয়ে এসেছে একদল তরুণ প্রাণ। বিজ্ঞাপনে তাঁরা ঘোষণা করেছেন, সময় কাটানোর জন্য আলগোছে যাঁরা সাহিত্য পড়েন 'কল্লোল' তাঁদের জন্য নয়।[১] প্রথম থেকেই কল্লোলগোষ্ঠীর লক্ষ্য পূর্ণবয়স্ক চিন্তাশীল পাঠক।

অন্যদিকে 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিলেত ফেরত পুত্র তরুণ রসিক অশোক চট্টোপাধ্যায় (ক্ষুদুদা) বন্ধু যোগানন্দ দাস, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, সুধীরকুমার চৌধুরী, প্রভাকর দাস প্রমুখের সঙ্গে দেদার আড্ডা দিতে দিতে "একদা সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে হেদুয়া পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া চানাচুর- চিনাবাদাম চিবাইতে চিবাইতে"[২] নিতান্ত একটি 'বাঙ্গালা পাঞ্চ' তথা রঙ্গব্যঙ্গের কাগজ হিসেবে 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১০ই শ্রাবণ পথ চলা শুরু করে 'শনিবারের চিঠি'। প্রথম সংখ্যার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন যোগানন্দ দাস। 'কল্লোল' এবং 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যিক কিংবা সাহিত্যপ্রেমীরা কমবেশি একে অপরকে চিনতেন, হৃদ্যতাও ছিল পরস্পরের। সম্পাদক দীনেশরঞ্জন তাঁরই আঁকা 'কল্লোল'-এর একটি প্রচ্ছদের আদলে এঁকে দিয়েছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ। "সজনীকান্ত তো 'কল্লোলেরই' লোক, ভুল করে অন্য পাড়ায় ঘর নিয়েছে। এই রোয়াকে না বসে বসেছে অন্য রোয়াকে। তেমনি দীনেশরঞ্জনও 'শনিবারের চিঠি'র হেড পিয়াদা!...সবই এক ঝাঁকের কই, এক সানকির ইয়ার, শুধু টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। নইলে একই কর্মনিষ্ঠা। একই তেজ। একই পুরুষকার।"[৩] অচিরেই এ দুটি পত্রিকার যে কলহ বাধবে, তা আগাম আঁচ করতে পারেননি কেউই।

'শনিবারের চিঠি'র প্রথমদিকের সংখ্যাগুলিতে সজনীকান্ত দাসের নাম না থাকলেও প্রথম থেকেই প্রকাশনা এবং সম্পাদনার ব্যাপারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। পরে পরে নিজের যোগ্যতা আর দক্ষতায় তিনিই হয়ে উঠেছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র প্রধান

স্তম্ভ। 'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন,- "সবে যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম, নির্ঝর তখনও গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে নাই, দিগন্তপ্রসারী সমতল শ্যামল প্রান্তর তখনও বহু নিম্নে ক্ষীণ রজতমেখলামণ্ডিতবৎ বোধ হইতেছিল, সহসা জল-কল্লোল কানে আসিল। যুক্তিবিচারহীন অসাবধানী আত্মভোলা পথিকের নিশ্চয়ই সমুদ্র বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু আমরা খেলাচ্ছলে যাত্রা করিলেও উৎকর্ণ হইয়াই ছিলাম, শ্রবণমাত্র একটু চকিত হইয়াই বুঝিতে পারিলাম, গিরি-প্রপাতেরই কল্লোল সমুদ্রের নহে। পূর্বগামী অন্য এক নির্ঝরিণী পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ এক স্থানে স্খলিত হইয়া একটা বড় রকমের পতনের ফলে 'ফলসে'র (falls) সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা সর্বৈব 'ফল (false) সমুদ্র-কল্লোল। আমরাও নাগাল ধরিয়া ফেলিলাম, ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল।"[৪]

আসলে প্রথম থেকেই 'কল্লোল' তথা কল্লোলীয়দের লেখালেখি সম্পর্কে একটি উন্নাসিকতা মনে মনে পোষণ করেছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র কর্মকর্তারা। তাঁরা মনে করতেন বাংলা সাহিত্যের যুগান্তকারী পরিবর্তনে 'যমুনা', 'ভারতবর্ষ', 'বঙ্গবাণী', 'নারায়ণ', 'মাসিক বসুমতী' এমনকি 'বেপরোয়া' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার ভূমিকা যতখানি, তার কণা মাত্র নেই 'কল্লোল'-এর। 'কল্লোল' সম্পর্কে সজনীকান্তই তো লিখেছেন, 'বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত এমন কিছু নহে; আর পাঁচটা পত্রিকা যেমন হয় সেই রকমই পাঁচমিশেলি ব্যাপার, থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় ; "লেখক রবীন্দ্রনাথ, জলধর সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-নৃপেন্দ্র-বুদ্ধদেব পর্যন্ত; পুরাতন এবং নূতনের মিশাল, ভাল মন্দ মাঝারি সব রকমের লেখাই ইহাতে থাকিত। যুগ-পরিবর্তনের কোন সূচনাই ইহাতে ছিল না।"[৫] অথচ 'কল্লোল' তখন স্বমহিমায় এক বছর পার করে উদ্দাম প্রাণশক্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। উপেক্ষা নয়, কল্লোলের গতি রোধ করতে 'শনিবারের চিঠি' বেছে নিয়েছে আক্রমণের পথ।

কল্লোলের গতিময় কবি নজরুল ইসলাম আক্রান্ত হয়েছেন 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যাতেই। শনিমন্ডল তাঁর নাম দিয়েছে 'গাজী আব্বাস বিটকেল'। 'বিজলী' পত্রিকার ১৩২৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'। সজনীকান্ত দাস বেনামে 'শনিবারের চিঠি'তে (অক্টোবর,১৯২৪) এ কবিতার প্যারোডি ছাপলেন 'ব্যাঙ'! লাফিয়ে ওঠার কথাই ছিল নজরুলের। সঙ্গত কারণেই তিনি অনুমান করলেন প্যারোডিটির লেখক আর কেউ নন, তাঁরই গুরু মোহিতলাল মজুমদার। যাঁর হাত ধরে একদিন গজেন ঘোষের আড্ডা থেকে তিনি উঠে এসেছিলেন ১০/২ পটুয়া-টোলা লেনের কল্লোলের আখড়ায়। জন্মলগ্ন থেকেই কল্লোলের স্বজন ছিলেন মোহিতলাল। তাহলে কেন এমন মতিভ্রম! মোহিতলাল তাঁর শিষ্যের কবিতাকে ব্যঙ্গ করে প্যারোডি রচনা করেননি। আসলে মোহিতলালের মনে হয়েছিল ১৩২১ বঙ্গাব্দের পৌষে 'মানসী'তে প্রকাশিত তাঁর গদ্য রচনা 'আমি'র ভাববস্তু অবলম্বন করেই নজরুল রচনা

করেছেন 'বিদ্রোহী' কবিতা। এই ধারণাটি ভুল হলেও তিনি শিষ্যের উপর মনে মনে ক্ষোভ বা অভিমান পোষণ করেছিলেন। আর নজরুল ভেবেছিলেন 'ব্যাঙ' মোহিতলালের সেই বিক্ষুব্ধ চিত্তের নির্মাণ!

স্বাভাবিক কারণেই কল্লোলের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে মোহিতলালের। 'শনিবারের চিঠি' নজরুলের যে নিন্দা শুরু করেছিল, তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল আরো কেউ কেউ। লাগাতার আক্রান্ত হতে হতে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যার 'কল্লোল'-এ গুরু মোহিতলালকে উদ্দেশ্য করে নজরুল লিখলেন,

'রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা,
রুধির-নদীর পার হতে ওই ডাকে বিপ্লব-হ্রেষা।
হে দ্রোণাচার্য! এই নব জয়-যাত্রার আগে
দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
শিষ্য তোমার; দাও গুরু দাও তব রূপ মসী ছানি
অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিত কদর্যতার গ্লানি!....
চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা
যে ভোগানন্দ দাসেদের গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজি তাহাদের বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি,
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা করে ভালবাসিয়াছ বাঁদরামি।
হে অস্ত্র-গুরু! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়-কেতু হলে কুক্কুর-কুরুনেতা।...
মিত্র সাজিয়া শত্রু তোমারে ফেলেছে নরকে টানি
ঘৃণার তিলক পরালো তোমারে স্তাবকের শয়তানী!...
তুমি ভিড়িওনা গো-ভাগাড়ে-পড়া চিল শকুনের দলে
শতদল দলে তুমি যে মরাল শ্বেত সায়রের জলে।...
যত বিদ্রুপই কর গুরু তুমি জান এ সত্য বাণী
কারুর পা চেটে মরিব না, কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি
ফাটাবে না পিলে, মরিব যেদিন মরিব বীরের মত
ধরা মার বুকে আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত।
আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস
ততদিন গুরু সকলের সাথে করে নাও পরিহাস!"[৬]

সত্যিই বেজে উঠলো 'সর্বনাশের ঘন্টা'! শিষ্য নজরুলের এহেন মিথ্যা অভিযোগে রেগে উঠলেন 'দ্রোণগুরু' মোহিতলাল। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৮ই কার্তিক প্রকাশিত 'শনিবারের চিঠি'তে মোহিতলাল লিখলেন,-

"গুরু ভার্গব দিল যা তুহারে! - ওরে মিথ্যার রাজা!
আত্মপূজার ভণ্ড পূজারী! যাত্রার বীর সাজা
ঘুচিবে তোমার, — মহাবীর হওয়া মর্কট-সভাতলে!
দুদিনের এই মুখোশ-মহিমা তিতিবে অশ্রুজলে!
অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস-
চরমক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস!"৭

ব্যক্তি সম্পর্কের অবনমন তো হলই, 'কল্লোলে'র চেয়ে মোহিতলাল বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন 'শনিবারের চিঠি'র। যদিও এই বিরোধ পরবর্তীকালে মোহিতলালের কবিতা মর্যাদার সঙ্গে ছাপা হয়েছে 'কল্লোল'এ(৮)। কেননা কল্লোলীয়রা যে আধুনিকতার পূজারী, সেই আধুনিকতার পুরোধা ছিলেন মোহিতলাল। 'কল্লোল যুগ'এ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, - 'এক কথায়, তিনিই ছিলেন আধুনিকোত্তম। মনে হয়, যজন-যাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কারসাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়। তিনি জানতেন না আমরা তাঁর কবিতার কত বড় ভক্ত ছিলাম, তাঁর কত কবিতার লাইন আমাদের মুখস্ত ছিল।'৯ তাই দেখি পরবর্তীকালে কল্লোলগোষ্ঠীরই তিনমূর্তি মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন 'কালি-কলম' (বৈশাখ,১৩৩৩) প্রকাশ করেছেন, সেখানে উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত থেকেছেন মোহিতলাল মজুমদার। যদিও কল্লোলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মাঝে একটা দূরত্ব বরাবরই থেকে গেছে।

আসলে সজনীকান্তর ব্যবসায়িক বুদ্ধি ছিল প্রখর। বেনামে 'ব্যাঙ' প্রকাশ করে গুরু-শিষ্যের যুদ্ধ বাধিয়ে আখেরে তিনি পাঠকের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন 'শনিবারের চিঠি"র দিকে। বন্ধুত্ব আর ব্যবসার মধ্যে যথাযথ ব্যালেন্স করার অদ্ভুত দক্ষতা রপ্ত করেছিলেন তিনি। বন্ধুর মত মিশে কল্লোলীয়দের সঙ্গে দেদার আড্ডা জমিয়েও ব্যক্তি-বিদ্বেষটা বজায় রাখতেন সমালোচনায় ঝাঁজ আনার জন্য! কল্লোলগোষ্ঠীর সাহিত্যের সম্পূর্ণ নতুন মেজাজটাই ছিল 'শনিবারের চিঠি'র ব্যবসার সম্বল। কেবল 'কল্লোল' তো নয়, 'কল্লোলে'র পথ ধরে 'কালি-কলম'-'প্রগতি'-'ধূপছায়া' বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকতার যে স্তরে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল, তারই ঘোরতর বিরোধিতায় নেমেছিল 'শনিবারের চিঠি'। কেবল বিষয় ভাবনায় নয়, আঙ্গিক নির্মাণেও কল্লোলীয়রা বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে নস্যাৎ করার সাহস দেখিয়েছিলেন। বাংলা বানানের একটি সহজ-সুন্দর যুক্তিসঙ্গত প্রামাণ্য রূপ নির্মাণের প্রয়াস দেখা গিয়েছিল কল্লোলগোষ্ঠীর লেখায়। কল্লোলের সমূহ সাহসী পদক্ষেপের সামনে সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধকতার অন্য নামই হয়ে উঠেছিল 'শনিবারের চিঠি'।

'শনিবারের চিঠি'র 'সংবাদ-সাহিত্য' ও 'মণিমুক্ত' অংশদুটি মুখরোচক হয়ে উঠতো সজনীকান্তর নিরন্তর প্রয়াসে। তাঁর কাজই ছিল কল্লোলে প্রকাশিত লেখাগুলির খুঁত খুঁজে

বের করা। লাল-নীল পেন্সিল হাতে নিয়ে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁজে বের করতেন কোন লেখায় কতখানি শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করেছে 'কল্লোল'! কোন সাহিত্যটিই বা সমাজকে উচ্ছন্নে যাওয়ার পথে এগিয়ে দেবে কয়েক ধাপ! শালীনতার সীমা অতিক্রম করা সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে ছাপা হতো বিস্তর বিষোদ্গার। কখনও আবার নিজ দায়িত্বে বাতলে দেওয়া হত যুতসই দাওয়াই। আর এই সবই কলহ প্রিয় আমুদে বাঙালির কাছে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন,—একখানা 'কল্লোল' বা "কালিকলম', 'প্রগতি' বা 'ধূপছায়া' কিনে কি হবে, তার চেয়ে একখানা 'শনিবারের চিঠি' কিনে আনি। এক থালায় বহু ভোজ্যের আস্বাদ ও আঘ্রাণ পাব। সঙ্গে সঙ্গে বিবেককেও আশ্বাস দিতে পারব, সাহিত্যকে শ্লীল, ধর্মকে খাঁটি ও সমাজকে অটুট রাখবার কাজ করছি। একেই বলে ব্যবসার বাহাদুরি। বিষ যদি বিষের ওষুধ হয়, কণ্টক যদি কণ্টকের, তবে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অশ্লীলতাই বা ব্যবহার করা যাবে না কেন? আর কে না জানে, যদি একটু ধর্মের নাম একটু সমাজস্বাস্থ্যের নাম ঢোকানো যায় তবে অশ্লীলতাও উপাদেয় লাগে।"[১০] সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার ভার নিয়েছি এমন ভাব দেখিয়ে সজনীকান্ত নানান কূটনীতির আশ্রয় অবলম্বন করে আসলে পাঠকের দরবারে 'শনিবারের চিঠি'র আসনটি পাকা করতে চেয়েছিলেন।

'শনিবারের চিঠি' যত আঘাত হেনেছে, কল্লোলীয়রা ততই আরও সাহসী, আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। বুঝেছেন তাঁদের লেখা বিরোধীদের কাছেও মান্যতা পাচ্ছে। 'ভাবের নবীনতায়' আর 'ভাষার সজীবতায়' কল্লোলগোষ্ঠী যতই উদ্দাম বেগে এগিয়ে চলেছেন, বিরোধীপক্ষের নিন্দাবাদের সুর সপ্তমে চড়েছে তত! সজনীকান্তর সব পরিকল্পনাই যখন মুখ থুবড়ে পড়েছে, তখন তিনি ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েছেন! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের সূর্য হয়ে তিনি তখন মধ্য গগনে বিরাজ করছেন। ততদিনে তাঁরও কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে 'কল্লোল' এ। কল্লোলগোষ্ঠীর কারও কারও লেখার প্রশংসাও শোনা গেছে তাঁর মুখে। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিচারক মেনে একটি চিঠি, অভিযোগ পত্র প্রেরণ করেন। যার প্রতি পরতে পরতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সজনীকান্ত তথা 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্য। চিঠিটি ছিল এই রকম,-

"শ্রীচরণকমলেষু, "প্রণাম নিবেদনমিদং"

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাঙলাদেশে এক ধরনের লেখা চলছে, আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রধানত 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' নামক দুটি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এ ধরনের লেখা ক্রমশ সংক্রামিত হচ্ছে। এই লেখা দুই আকারে প্রকাশ পায় কবিতা ও গল্প। কবিতা ও গদ্যের যে প্রচলিত রীতি আমরা এতাবৎকাল দেখে আসছিলাম লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ করে চলে না। কবিতা stanza, অক্ষর, মাত্রা অথবা মিলের কোনো বাঁধন মানে না। গল্পের form সম্পূর্ণ আধুনিক। লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা-বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। যৌনতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব

অথবা এই ধরনের কিছু, নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যাঁরা লেখেন তাঁরা Continental Literature-এর দোহাই পাড়েন। যাঁরা এগুলি পড়ে বাহবা দেন তাঁরা সাধারণ প্রচলিত সাহিত্যকে রুচিবাগীশদের সাহিত্য বলে দূরে সরিয়ে রাখেন। পৃথিবীতে আমরা স্ত্রী-পুরুষের যে সকল পারিবারিক সম্পর্ককে সম্মান করে থাকি এই সব লেখাতে সেই সব সম্পর্কবিরূদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন করে আমাদের ধারণাকে কুসংস্কারশ্রেণিভুক্ত বলে প্রচার করবার একটা চেষ্টা দেখি। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই শ্রেণির লেখকদের অগ্রণী। Realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশেষ অঙ্গ বলে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নরেশবাবুর কয়েকখানি বই, 'কল্লোলে' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা' নামক একটি গল্প, 'যুবনাশ্ব' লিখিত কয়েকটি গল্প, এই মাসের (ফাল্গুন) 'কল্লোলে' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটির (অর্থাৎ 'বন্দীর বন্দনা'), 'কালি-কলমে' নজরুল ইসলামের 'মাধবী প্রলাপ' ও 'অনামিকা' নামক দুটি কবিতা ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। আপনি এ সব লেখার দু-একটা পড়ে থাকবেন। আমরা কতকগুলি বিদ্রপাত্মক কবিতা ও নাটকের সাহায্যে 'শনিবারের চিঠি'তে এর বিরুদ্ধে লিখেছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ও এর বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এই প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এত ক্ষীণ যে, কোনো প্রবল পক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙলা সাহিত্যকে রূপে রসে পুষ্ট করে আসছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্য পথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত করছি।

আমি জানি না, এই সব লেখা সম্বন্ধে আপনার মত কি। নরেশবাবুর কোন বইয়ের সমালোচনায় আপনি তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছেন। সেটা ব্যাজস্তুতি না সত্যিকার প্রশংসা, বুঝতে পারি না। আমি নিজে এগুলিকে সাহিত্যের আগাছা বলে মনে করি। বাঙলা সাহিত্য যথার্থ রূপ নেবার পূর্বেই এই ধরনের লেখার মোহে পড়ে নষ্ট হতে বসেছে, আমার এই ধারণা। সেই জন্যে আপনার মতামতের জন্যে আমি আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। বিরদ্ধে বা পক্ষে যে দিকেই আপনি মত দেন, আপনার মত সাধারণের জানা প্রয়োজন। ....ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীতে সত্য প্রতিবাদও অনেক সময় ঈর্ষা বলে হেলা পায়। আপনি কথা বললে আর যাই বলুক, ঈর্ষার অপবাদ কেউ দেবে না। আমার প্রণাম জানবেন। পণত শ্রীসজনীকান্ত দাস।"[১১]

শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে সংক্ষেপে এই চিঠির একটি উত্তর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যা সজনীকান্তকে খুশি করতে তো পারেইনি, বরং শনিমন্ডলের একটি ধারণা ক্রমেই বদ্ধমূল হয়ে উঠতে থাকে কল্লোলগোষ্ঠীর পিছনে রয়েছে রবি ঠাকুরের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়! ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'তে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি ছাপা হয়। যেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

"আমার নিজের বিশ্বাস শনিবারের চিঠির শাসনের দ্বারাই অপর পক্ষে সাহিত্যের বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্ছে। যে সব লেখা উৎকট ভঙ্গির দ্বারা নিজের সৃষ্টিছাড়া বিশেষত্বে ধাক্কা মেরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমালোচনার খোঁচা তাদের সেই ধাক্কা মারাকেই সাহায্য করে।...শনিবারের চিঠির অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, অস্ত্রশালায় তার স্থান নব নব হাস্যরূপের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তিবিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়।...যেসব লেখক বে-আব্রু লেখা লিখেচে, তাদের কারো কারো রচনা শক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো।... "[১২] এ সময়ই রবীন্দ্রনাথ 'উদ্বোধন' কবিতায় নব যৌবনের বন্দনা গান করেছেন। 'শনিবারের চিঠি'ও থেমে থাকেনি।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের ৪ এবং ৭ তারিখ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বিচিত্রাভবনে বসেছে বিচার সভা! বিচারক অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। একদিকে সংরক্ষণশীল 'শনিবারের চিঠি' অন্যদিকে প্রগতিপন্থী 'কল্লোল'। এক 'হীনতম ইতিহাসে'র সাক্ষী রইলেন বিশ্বকবি। প্রথম দিনের সভায় 'শনিবারের চিঠি'র তেমন কেউ না থাকলেও দ্বিতীয় দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, গোপাল হালদার প্রমুখ। দুদিনই উপস্থিত ছিলেন নবযৌবনের দূত কল্লোলগোষ্ঠী। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, নরেন্দ্র দেব, প্রমথ চৌধুরী, কালিদাস নাগ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ছিলেন নিরপেক্ষ ভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথ যা বললেন, তা মননঋদ্ধ প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ পেল ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী'র বৈশাখ সংখ্যায়। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করল শনিমন্ডল। 'বঙ্গবাণী', "বিচিত্রা"য় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধর্মের বিরোধিতা করলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। কল্লোলগোষ্ঠী নিজেদের আদর্শে স্থির রইল। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে 'কল্লোল' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় অচিন্ত্যকুমার লিখলেন,—

"...পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চোখের থেকে জ্বলিবে যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর!
গভীর আত্মোপলব্ধি—এ আমার দুর্দান্ত সাহস,
উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছি নব নর-জন্ম-সম্ভাবনা;
অক্ষর তুলিকা মোর হস্তে যেন রহে অনলস,
ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি- নবীন প্রেরণা!'...[১৩]

অচিন্ত্যকুমারের এই আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চারণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁদের আদর্শে অবিচল থাকার সংকল্প। নিন্দা যত বেড়েছে, আত্মস্বরূপে ততই স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন তাঁরা। 'শনিবারের

চিঠি'কে অপদস্থ করতে কল্লোলের বন্ধু-সমর্থকরা 'মহাকাল' পত্রিকা প্রকাশ করলে প্রথমের দিকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ তাঁদের সমর্থন করেছেন। কিন্তু অচিরেই বুঝেছেন শনিমন্ডলের খিস্তি-খেউড়ের সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁরা বড্ড বেমানান! তাই বেছে নিয়েছেন অপরিসীম উপেক্ষা আর অফুরন্ত সৃষ্টির পথ। 'শনিবারের চিঠি'র 'মণিমুক্তা'র বেলাগাম রসিকতায় তাঁরা বিচলিত হননি,বরং চিঠিতেই প্রকাশিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তদের সাহিত্য পড়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছেন কল্লোলগোষ্ঠী। বেশ কয়েক বছর ধরে বিস্তর বিষোদ্গারের পর শনিমন্ডলও উপলব্ধি করেছে নিন্দামন্দ করে প্রতিভাকে ঠেকানো যায় না। বন্ধুত্ব আগেই ছিল, কল্লোলীয়দের সঙ্গে সজনীকান্ত ক্রমেই বাঁধা পড়েছেন 'প্রীতির মায়াপাশে'। বিশেষত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এসে শনিমন্ডল "কটূক্তি ছেড়ে সদুক্তির চেষ্টা চর্চা' শুরু করেছে। রোষের জগৎ থেকে রসের জগতে অবগাহন করেছে 'শনিবারের চিঠি'। কিন্তু 'কল্লোল'-'শনিবারের চিঠি"র এই বিবাদ-বিসংবাদ শত বছর ধরে সময় বয়ে নিয়ে চলেছে, চলবেও।

তথ্যসূত্র :

১) 'প্রবাসী' পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগে ছাপা হয়েছিল। আশ্বিন ১৩৩১।

২) সজনীকান্ত দাস, 'আত্মস্মৃতি', নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ,১৩৮৪, পৃষ্ঠা-২৫৬।

৩) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, একাদশ প্রকাশ,১৪২১, পৃষ্ঠা-১৩২।

৪) সজনীকান্ত দাস, (১৩৮৪)আত্মস্মৃতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১১৬।

৫) তদেব। পৃষ্ঠা-১১৭।

৬) সর্বনাশের ঘন্টা : নজরুল ইসলাম, 'কল্লোল' পত্রিকার ১৩৩১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত। সংগৃহীত - অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, (১৪২১) 'কল্লোল যুগ', প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ৪৯।

৭) দ্রোণগুরু : মোহিতলাল মজুমদার, 'কল্লোল' পত্রিকার ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৮ই কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত। সংগৃহীত- জীবেন্দ্র সিংহরায়, 'কল্লোলের কাল', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২৪, পৃষ্ঠা- ৪৫।

৮) মোহিতলালের 'পান্থ' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'কল্লোল' পত্রিকার ১৩৩২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়। অগ্রহায়নে প্রকাশিত হয় 'প্রেতপুরী'।

৯) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, (১৪২১) 'কল্লোল যুগ', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৬।

১০)তদেব। পৃষ্ঠা- ১৪২।

১১)তদেব। পৃষ্ঠা- ১১৬।

১২)তদেব। পৃষ্ঠা- ১৪৭।

১৩)জীবেন্দ্র সিংহরায়, (১৪২৪) 'কল্লোলের কাল', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭।

‘কল্লোল’-‘সংহতি’-‘উত্তরা’ : সময়ের কথাকার

নি ত্যা ন ন্দ ম ণ্ড ল

১৯২৩ সাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরে একসাথে প্রায় ছয়টি পত্রিকা প্রকাশিত হয় : সাপ্তাহিক ‘জন সেবক’ সম্পাদক- শৈলেশ নাথ বিশী। সাপ্তাহিক ‘সোনার বাংলা’ সম্পাদক-শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপিন চন্দ্র পাল ও গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মাসিক ‘কল্লোল’ সম্পাদক-দীনেশ রঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগ। মাসিক ‘সংহতি’ সাম্পাদক- জ্ঞানাঞ্জন পাল ও মুরালীধর বসু। মাসিক ‘তরুণ’ সাম্পাদক-সুকুমার দত্ত ও হীরালাল দাশগুপ্ত। দ্বিমাসিক ‘সোনার ভারত’ সাম্পাদক-মোহাম্মদ জোবেদ আলী।

বাংলা সামায়িক পত্রিকার ইতিহাসে ‘কল্লোল’, ‘সংহতি’,এবং ‘উত্তরা’ (১৯২৫) সমসময়ের কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরে। ‘কল্লোল’ সমসাময়িক যুগের পরিবর্তনের সূচনাবাহী। ‘কল্লোল’-এর প্রথম ও প্রধান কাজ চিরাচরিত সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বা বিরুদ্ধাচারন করা। ঘূণধরা স্থবির সমাজের পরিবর্তন সাধনে তৎকালীন যুব সমাজ যে স্বপ্ন দেখেছিল। তার-ই আত্মপ্রকাশ কল্লোল (১৩৩০/১৯২৩)। তরুণ সমাজের মনের উদ্দীপনাকে কল্লোল-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কল্লোল ছিল যুগের স্বাক্ষরবাহী। কবি বুদ্ধদেব বসু ছিলেন নবযুগের অন্যতম কান্ডারী। যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের সর্ব দিগন্তে, সর্বকোণে সমভাবে প্রতিভাত। সেই সময়ে কল্লোলের আবির্ভাব। কল্লোলের নাবিকদের মূল লক্ষ্য ছিল-“রবীন্দ্র বৃত্তের বাইরে সাহিত্যের এক মৃত্তিকা সংলগ্ন জগৎ সৃষ্টি করা।”

১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখে একই সাথে প্রকাশিত হলো দুটি পত্রিকা ‘কল্লোল’ ও ‘সংহতি’। শ্রমজীবী মানুষের মুখপত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে মাসিকপাত্রিকা ‘সংহতি’। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত তাঁর “কল্লোল যুগ” গ্রন্থে কল্লোল পত্রিকা সম্পর্কে মন্তব্য করেন-“উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা সমস্ত বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।” আর ‘সংহতি’ সম্পর্কে তার মন্তব্য-“সংহতি তো শিলীভূত শক্তি। সংঘ, সমূহ জনগোষ্ঠী যে গুনের জন্য সহধর্মী পরমানু সমূহ জমাট বাঁধে, তাই তো সংহতি, আশ্চর্য নাম। আশ্চর্য সেই নামের তাৎপর্য।” কল্লোলের দু’বছর পর প্রকাশিত হয় ‘উত্তরা’ ১৯২৫। বর্হিবঙ্গে বিশেষ করে উত্তর ভারতে বাংলা সাহিত্য চর্চার এক বিশেষ স্বাক্ষরবাহী পত্রিকা হলো ‘উত্তরা’। কর্মসূত্রে লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কাশী, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙালীদের বসবাস ছিল। সেখানকার সংস্কৃতি মনস্ক বাঙালীগন নিজেদেরকে সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত করেন। ‘উত্তরা’ বর্হিবঙ্গের বাঙালীদের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। ‘উত্তরা’ চলে একচল্লিশ বছর(১৩৩২-১৩৭৪বঙ্গাব্দ)।

।।২।।

‘কল্লোল’১৯২৩। সে সময়ে তরুণ যুব সমাজ “হাল-ভাঙা-পাল-ছেঁড়া-ব্যথা” নিয়ে যে

স্বপ্ন দেখতো তারই বাস্তব রূপদান করে 'কল্লোল' পত্রিকাটি বৈশাখ ১৩৩০থেকে পৌষ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ মাত্র ছয় বছর নয় মাস চলে। গোকুলচন্দ্র নাগের কাছে ছিল মাত্র এক টাকা আট আনা আর দীনেশ রঞ্জন দাশের কাছে ছিল মাত্র দুই টাকা। সর্বসাকুল্যে তিন টাক আট আনা মূলধন নিয়ে দুই তরুণ যুবক ঝাঁপিয়ে পড়লো পত্রিকা প্রকাশ করতে। প্রথমে দোকান থেকে কাগজ কিনে 'কল্লোল'-এর প্রথম হ্যান্ডবিল ছাপানো হয়। দু'জন মিলে তা বিলিও করেন।

বন্ধুদের আড্ডা বা "ফোর আর্টর্স ক্লাব" বা চতুষ্কলা ক্লাবের স্বল্পায়ু সত্ত্বার মধ্যেই নিহিত ছিল 'কল্লোল'পত্রিকার আত্মপ্রকাশের বীজ। সমসময়ের প্রথা সিদ্ধ রচনার ধারা থেকে সরে এসে 'কল্লোল' হয়ে উঠল অনান্য ও অসাধারণ। দীনেশ রঞ্জন দাশ নিজেই পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন। তাঁর অভিমত-"এই বিদ্রোহকে সহস্রের নিষ্পেষণের নাগপাশ থেকে ব্যক্তির মুক্তির এই প্রচেষ্টাকে আমরা গ্রহণ করেছি। তাই আমাদের নাম কল্লোল।"

পত্রিকার আকার ছিল-"আট পৃষ্ঠার ডিমাই সাইজের ও প্রায় পনেরো ফর্মার কাছাকাছি।" যেখানে অন্যান্য পত্রিকা ছিল "ডবল ক্রাউন"। প্রতি সংখ্যার মূল্য চার আনা। বছরের মূল্য সাড়ে তিন টাকা। ১৩৩৩সালের বৈশাখ সংখ্যা থেকে অর্থাৎ চতুর্থ বছরে 'কল্লোল' ডবল ক্রাউন সাইজে আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৩৬ সালের পৌষ অবধি এই আকৃতি বজায় ছিলো। ডবল ক্রাউন-এর দাম হয় পাঁচ আনা।তবে বার্ষিক মূল্য সাড়ে তিন টাকাই থেকে যায়।

দীনেশ রঞ্জন দাশের মেজদা বিভুরঞ্জন দাশের ১০/২পটুয়াটোলা লেনের ভাড়া বাড়িই হলো 'কল্লোল'-এর জন্মভুমি। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে 'কল্লোলে'র ঠিকানাও বদলাতে থাকে। প্রথম দু-মাস 'কল্লোল' ছাপা হয় মানিকতলার দীনেশ রঞ্জন দাশের বন্ধুর প্রেসে। পরে ছাপা হয় ১১১/৪এ মানিকতলা স্ট্রিটের কোহিনুর প্রেস—এ। বর্তমানে সেটি "ছায়া" সিনেমা হল। কখনো ছাপা হয়-৩৩এ মদন মিত্র লেনের শান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাণী প্রেস;২এ অক্রূর দত্ত লেনের রহস্য লহরী প্রেস;২৯ রামকান্ত মিস্ত্রী লেনের ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস; বিবি রোজিয়া লেনের ব্রিটানিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এ।

১৩৩১ সালের বৈশাখ-এ "কল্লোল পাবলিশিং হাউস" স্থাপিত হয়। মনে করা হয় পত্রিকাকে আশ্রয় করে কোন প্রকাশনা সংস্থা গড়ে ওঠার প্রথম নিদর্শন এই "কল্লোল পাবলিশিং হাউস"। কল্লোল প্রকাশনা থেকে প্রথম বই প্রকাশিত হয় সুবোধ রায়ের তিনটি একাঙ্ক নাটিকার সঙ্কলন-"নাট মন্দির"। চতুষ্কলা ক্লাবের সদস্যদের কয়েকটি পুরানো বই-"ঝড়ের দোলা", "রূপরেখা"। তবে নজরুল ইসলামের "বিষের বাঁশী" প্রকাশিত হলে এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যা 'কল্লোল'কে অনেকটা উঁচু স্থান বা সম্মান এনে দেয়।

সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের নাম কবিতা 'কল্লোল' স্থান পায় কল্লোলের প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনা হিসাবে। তাঁর 'ফুলের আকাশ' নামে একটি গল্পও স্থান পায় প্রথম সংখ্যায়। গোকুলচন্দ্র নাগের উপন্যাস 'পথিক'-এর সূচনা হয় কল্লোলের প্রথম সংখ্যাতেই। কালিদাস

নাগ 'বসন্তবিলাপ' নামে একটি কবিতা লেখেন দীপঙ্কর ছদ্মনামে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লেখেন 'মা' গল্প। সুনীতি দেবী লেখেন 'বীণা' গল্প। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন অনুবাদ গল্প 'বিড়ালের স্বর্গ'—এভাবেই কল্লোলের প্রথম সংখ্যা সেজে ওঠে। পত্রিকার শেষে থাকতো নির্বাচিত কবিতার বিশেষ উক্তি। যা পত্রিকার নীতিকে সমর্থন জানাতো।

পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় প্রচ্ছদ একটি বিশিষ্ঠ ভাবকে চিত্রায়িত করতো। প্রথম সংখ্যার ছবিটি ছিল এক রঙা। "উত্তাল তরঙ্গ মালার দিকে চেয়ে এক নিঃসঙ্গ যুবক সমুদ্রতীরে বসে আছে।" তার উদাসীন মনোভাব যেন এক কল্পলোকের জন্ম দেয়। ছবি নয় যেন-"এক একটি কবিতা"-শিল্পী পি ঘোষ। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেছে বারেবারে। প্রচ্ছদ কখনো ফেনিল সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে। কখনো পোড়া মন্দিরের একাংশ উত্তাল তরঙ্গঘাতে ভেঙে পড়েছে। এ যেন পুরানোকে বিদায় দিয়ে নতুনের আহ্বান জানানো। কখনো বা উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গ শীর্ষের উপর "নটরাজের" তাণ্ডব নৃত্য।

তিরিশের দশকে কল্লোলের আদর্শ সম্পর্কে অনেক কবি সাহিত্যিক সন্দেহ প্রকাশ করতেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত কল্লোলের আদর্শকে "বে-আব্রু" বলে মত প্রকাশ করেন তাঁর "সাহিত্য ধর্ম" (১৯২৭) প্রবন্ধে। প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানান্দ চট্টোপাধ্যায় কল্লোলের মধ্যে "সংযমের অভাব" বোধ করে বিচলিত হন। অনুরূপা দেবীও কল্লোলের লেখক কূলকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করতে ছাড়েন নি। তবে "শনিবারের চিঠি"-র সম্পাদক সজনীকান্ত দাশ কল্লোলকে "মনিমুক্তা" সন্ধান বলে উল্লেখ করে গুনগান করেন।

কল্লোল পত্রিকায় লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন, নিরুপমা দেবী, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিশ্বপতি চৌধুরী, কল্যাণী ঘোষ, জসীমুদ্দীন, আবদুল কাদের সহ আরো অনেকে। কল্লোলের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় লেখা হতো-"কল্লোল মাসিক গল্প সাহিত্য"। ১৩৩১সালে ভাদ্র সংখ্যায় লেখা হলো-"বাংলার মাসিক গল্প সাহিত্য"। শুধু গল্প বা কবিতা নয়, প্রবন্ধও এখানে ঠাঁই পেয়েছে। প্রাবন্ধিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়,দিলীপ কুমার রায়, কালিদাস নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, কাজী আবদুল ওদুদ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), নীহার রঞ্জন রায়, বিষ্ণু দে, অন্নদাশঙ্কর রায়, হুমায়ুন কবীর, ভবানী ভট্টাচার্য, বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

কল্লোল পত্রিকায় সর্ব সাকুল্যে মোট এগারোটি মৌলিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে গোকুলচন্দ্র নাগের "পথিক"; প্রেমেন্দ্র মিত্রের "মিছিল"; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "বেদে" উল্লেখযোগ্য। যামিনী রায়ের আঁকা ছবি ছাপা হয় ১৩৩২ সালের আশ্বিন সংখ্যায়। শুধু ছবি নয় ব্যঙ্গচিত্র, ফটোচিত্রও স্থান পেয়েছে এখানে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তিরোধানের পর তার মরদেহ শোক যাত্রা, চিতার সৎকারের ছবিও সযত্নে স্থান পেয়েছে।

কল্লোল প্রকাশের আড়াই বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৩৩২ সালের ৮-ই আশ্বিন, ইংরাজি ১৯২৫সালের ২৪-সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাবেলা গোকুলচন্দ্র নাগের জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যু শয্যায় গোকুলচন্দ্র, দীনেশরঞ্জন দাশের কাছে কল্লোল পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখার আবেদন জানান-"আমাকে রাখতে পারবে না, কিন্তু কল্লোলকে রেখো।" গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পর সব দায়িত্ব এসে পড়ে দীনেশরঞ্জন দাশের উপর। পত্রিকা প্রকাশের অর্থনৈতিক সংকটও দেখা দেয়। ঋণভারে জর্জরিত হয়ে চলচ্চিত্র জগতের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। তার উপর শারীরিক অসুস্থতার জন্য কল্লোল আর বেশীদিন চালানো সম্ভব হয় নি। "ডিউডেনাল আলসার"-এ আক্রান্ত হন দীনেশরঞ্জন। ১২-ই মে ১৯৪১ সাল, সোমবার বেলা ৩.৪৫মিনিটে তিনি প্রয়াত হন।

১৩৩০সালে বৈশাখ থেকে ১৩৩৬সালের পৌষ অর্থাৎ ছয় বছর নয় মাস বয়সে 'কল্লোল'প্রকাশের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই আয়ুষ্কালে ৮১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এখানে প্রকাশিত হয় মৌলিক উপন্যাস ১১টি, অনুদিত উপন্যাস ২টি, ১৬৬টি গল্প। এভাবে কল্লোল জনমানসের মনের কথাকে তার পৃষ্ঠাতে স্থান দিয়ে হয়ে ওঠে সময়ের কথাকার।

।।৩।।

"সংহতি" বৈশাখ ১৩৩০। সংহতি শ্রমজীবী মানুষের মুখপত্র। শ্রমজীবী মানুষের কথাই স্থান দেওয়াই এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য। সম্পাদক জ্ঞানাঞ্জন পাল ও মুরলীধর বসু। সংহতি পত্রিকা প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার প্রেস কর্মচারী শ্রী জীতেন্দ্রনাথ গুপ্ত। মূলত তিনি ছিলেন কলকাতার প্রেস শ্রমিক উনিয়নের এক জন সুদক্ষ কর্মচারী। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর "কল্লোল যুগ" গ্রন্থে লিখছেন-"এ কাগজের পিছনে প্রথম একজনের পরিকল্পনা ছিল তাঁর নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে রাখা উচিত। তিনি জীতেন্দ্রনাথ গুপ্ত। আসলে তিনি কাগজের প্রতিষ্ঠাতা। অমৃতবাজার পত্রিকার ছাপাখানায় কাজ করেন। ঢোকেন ছেলে বয়সে, বেরিয়ে আসেন পঞ্চাশ না পেরোতেই, জরা-জর্জর দেহ নিয়ে। দীর্ঘকাল বিষাক্ত টাইপ আর কদর্য কালি ঘেঁটে ঘেঁটে কঠিন ব্যাধির কবলে পড়েন কিন্তু তাতেও মন্দা পড়েনি তাঁর উদ্যাম-উৎসাহে,মুছে যায়নি তাঁর ভাবীকালের স্বপ্নদৃষ্টি।"

বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ধনী-গরীব সমস্যা নিয়ে বহু দিন ধরে সভা সমিতিতে আলোচনা করে চলেছিলেন। সে কথা শ্রী জীতেন্দ্রনাথ গুপ্ত জানতেন। তাই অনেক আশা নিয়ে তিনি বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাড়িতে যান। পত্রিকা প্রকাশের সদ-ইচ্ছা প্রকাশ করেন, গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দেওয়ার কথাও বলেন। তার-ই উদ্যোগে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পালকে পত্রিকা সম্পাদনার পরামর্শ দেন। বিপিনচন্দ্র পাল পত্রিকার নামকরণ করেন "সংহতি"। সম্পাদক হিসাবে নিজের ছেলে জ্ঞানাঞ্জন পাল ও মুরলীধর বসুর কথা বলেন। কার্যালয় ঠিক হয় জীতেন গুপ্তের নিজের বাসা ১নম্বর

শ্রীকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার। সদ্য পত্নী হারা জীতেন্দ্র, রাতে পুত্রকে নিয়ে যে ঘরে থেকেছেন, দিনে সেখানেই সংহতির কাজকর্ম করেছেন। কঠিন ব্যাধি তাঁকে দমাতে পারে নি।

সংহতি-র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কামিনী রায়ের কবিতা "নিদ্রিত দেবতা জাগো", বিপিনচন্দ্র পাল ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ। জ্ঞানাঞ্জন পাল লেখেন সংহতির আদর্শ নিয়ে। এই আদর্শের কথা পাঠানো হয় আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পত্রিকার শুভ কামনা করে আশীর্বানী পাঠালে তা ছাপা হয় সংহতি পত্রিকাতে। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা গোটা প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেন, তা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হয়। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য "দিন মজুর" নামে একটি গল্প দেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় "বাঙ্গালী ভাইয়া" নামে একটি উপন্যাসের অংশ পাঠালে তা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পও প্রকাশিত হয়।

মুরলীধর বসু গল্প, কবিতা, উপন্যাস না লিখলেও পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গ- হাসি-কান্নার চিত্র অঙ্কন করেছেন। অনুবাদ করেছেন টলস্টয় ও গোর্কির স্মৃতিকথা নিয়ে বেশ কিছু রচনা। কল্লোলের কথাকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন—"একদিকে কল্লোল, আরেক দিকে সংহতি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, দুটি মাসিক পত্রই একই বছরে একই মাসে একসাথে জন্ম নেয় ১৩৩০ বৈশাখ। কল্লোল চলে প্রায় সাত বছর আর সংহতি উঠে যায় দু'বছর না পুরতেই।" জ্ঞানাঞ্জন পাল ও মুরলীধর বসু বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে পড়ার জন্য "সংহতি" প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে অর্থনৈতিক সংকট ও বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

।।৪।।

'উত্তরা' আশ্বিন, ১৩৩২। সম্পাদক অতুল প্রসাদ সেন ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। বহির্বঙ্গে বিশেষ করে কাশীতে বাঙালীরা কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মধ্যমণি করে সাহিত্যিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সাহিত্যিক আসর বসাতেন। কানপুরেও সেই সময় "বঙ্গ সাহিত্য সমাজ" নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ঐ গ্রন্থাগারের সম্পাদক ছিলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতি ছিলেন ড সুরেন্দ্রনাথ সেন। ১৯২০খ্রিস্টাব্দে ১৩২৭বঙ্গাব্দে আশ্বিন মাসে কাশী থেকে প্রকাশিত হয় "প্রবাস জ্যোতি" পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহসম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী। আর্থিক সহায়তা করতেন মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'প্রবাস জ্যোতি' প্রথমে মাসিক, পরে সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশ করেন। প্রবাস জ্যোতির পর প্রকাশিত হয় "অলকা" ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে। মাসিক পত্রিকা রূপে। অলকা-র সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও সুরেশ চক্রবর্তী। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় উচ্চমানের প্রবাদ ও ছোটগল্প। এই "অলকা" পত্রিকাই পরবর্তীতে "উত্তরা" পত্রিকার আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করে।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কানপুরে "বঙ্গ সাহিত্য সমাজ"-র বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক

অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। অধিবেশনের সভাপতি হন অতুলপ্রসাদ সেন।অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ড সুরেন্দ্রনাথ সেন। সভাতে সিদ্ধান্ত হয় কাশীতে পরের বছর এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনটির নাম হবে "উত্তর ভারতীয় সাহিত্য সম্মেলন"। কাশীর সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজে "উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন"-র প্রথম অধিবেশন হয়। যার সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভায় উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্ণৌ থেকে অতুলপ্রসাদ সেন, কানপুর থেকে সুরেন্দ্রনাথ সেন। কাশী থেকে ললিত বিহারী সেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ।ইতিহাস বিভাগের রাধা কুমুদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায় সহ প্রায় দুশো প্রতিনিধি।

তৃতীয় অধিবেশন ১৯২৫ লক্ষ্ণৌ শহরে "প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয় মহাসমারোহে। অতুলপ্রসাদ সেন এই সম্মেলন ডাকেন। অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ললিত বিহারী সেন, মহেন্দ্র চন্দ্র রায়, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। চিত্র শিল্পী অসিত হালদার। "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদিকা সরলা দেবী চৌধুরানীও উপস্থিত ছিলেন। পত্রিকার নাম হলো "উত্তরা"। নামকরণ করলেন অতুলপ্রসাদ সেন। অতুলপ্রসাদ সেন সম্পাদক ও কার্যকরী সমিতির সভাপতি। যুগ্ম-সম্পাদক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। সহ-সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী। কোষাধ্যক্ষ-রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।

সমিতিতে পত্রিকার ব্যয়ভার নিয়ে আলোচনা হয়-এককালীন দান, মাসিক চাঁদা ও গ্রাহক সংগ্রহ করে তা চালানোর কথা বলা হয়। পরিচালন সমিতিতে ঠিক হয়- পাঁচশ গ্রাহক ও এক হাজার টাকা নগদ নিয়ে 'উত্তরা' প্রকাশের কাজে অগ্রসর হওয়া যাবে। ৩নম্বর ব্যাঙ্কস রোড লক্ষ্ণৌ হলো উত্তরা-র অফিস। পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো কাশী থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাণী পত্রিকার প্রথমেই মুদ্রিত হলো। জানা যায়-"সুরেশ চক্রবর্তী উত্তরা নিয়ে কাশী থেকে লক্ষ্ণৌ এলেন অতুল প্রসাদের বাংলোয়। তিনি তখন বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। সুরেশ চক্রবর্তীর প্রতি চোখ যেতেই তাঁর প্রশ্ন 'উত্তরা' কই? হাতে পেয়ে চায়ের টেবিলে গিয়ে বসলেন। 'উত্তরা'-কে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন, আর আনন্দে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রশংসা করলেন সুরেশ চক্রবর্তী।" (মানসী মুখোপাধ্যায়, অতুল প্রসাদ, ডিসেম্বর ১৯৩১, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা,পৃ-১৫৭-১৫৮)।

উত্তরা প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন "আশীর্বাদ" কবিতা। তাছাড়া লিখেছেন- রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধা কুমুদ মুখোপাধ্যায়,অসিত কুমার হালদার, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রতিভাদেবী, অতুল প্রসাদ সেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্র মোহন বাগচী, জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ চন্দ্র সেন,মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,মোহিতলাল মজুমদার, বিমল মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, কালিদাস রায়, আশাপূর্ণা দেবী, রাধারাণী দেবি, জ্যোতির্ময়ী দেবী, নিরূপমা দেবী প্রমূখ।

উত্তরা-র প্রথম দিকে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত 'সপ্তধারা' নামে একটি বিভাগ চালু ছিলো। এই বিভাগে থাকতো উর্দু, হিন্দি, পঞ্জাবি, মারাঠি, তামিল প্রভৃতি প্রতিবেশী সাহিত্যিকদের রচনা বা রচনার অনুবাদ। লোকসাহিত্য, আখ্যায়িকা, বা লোকপ্রবাদও এখানে বিশেষ ভাবে স্থান পায়। যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়,অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাচরণ উকিল, নন্দলাল বসু প্রমুখ চিত্রকরদের আঁকা ছবিও প্রকাশিত হয়।

অতুল প্রসাদ সেন ১৯৩৪ সালে ২৫শে অগস্ট প্রয়াত হন। অতুল প্রসাদের মৃত্যুর পর "অতুল প্রসাদ" সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এছাড়া "অবনীন্দ্রনাথ" সংখ্যা, "কেদারনাথ" সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অতুল প্রসাদের মৃত্যুর পর সমস্ত দায়িত্ব পড়ে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের উপর। পত্রিকার সাথে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী। দীর্ঘ একচল্লিশ বছর পত্রিকাটি চলে। পত্রিকার সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তাঁরা বয়সের ভারে ও শারীরিক কারণে তাদের পক্ষে আর পত্রিকা চালানো সম্ভব হচ্ছিল না।

শারীরিক বাধা ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে পত্রিকা বন্ধ করতে বাধ্য হন। ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় উত্তরা-য় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সুরেশ চক্রবর্তী সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পত্রিকার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। দীর্ঘ (১৩৩২-১৩৭৪) একচল্লিশ বছর ধরে "উত্তরা" সমসময়ের কণ্ঠস্বরকে সযত্নে স্থান দিয়ে বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যে সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে নিজের স্থানটি পাকা করে নেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। বাংলা পত্রপত্রিকা সম্পাদক ও সম্পাদনা; সম্পাদনা-তাপস ভৌমিক, কোরক,পো-দেশবন্ধু নগর,ইএ ১/৮বাগুইআটি,খালধার,কলকাতা-৭০০০৫৯, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি-২০১৭।
২। প্রাগুপ্ত কোরক, প্রবন্ধ, 'কল্লোল'-কল্পনার ধন, কর্মের সাধনা,-শুক্লা দত্ত।
৩। প্রাগুপ্ত কোরক, প্রবন্ধ, 'উত্তরা' পত্রিকাঃ সম্পাদক ও সম্পাদনা-সৈয়দ বসিরুদ্দোজা।
৪। সংহতি, বাংলার মাহনতী মানুষের প্রথম পত্রিকা-এম এ আজিজ মিয়া।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও ‘পূর্ব্বাশা’ : ‘বাংলার মনোজীবনেরই ইতিহাস’

কা ম রু জ্জা মা ন

বাংলা তেরোশো উনচল্লিশ (ইংরেজি উনিশশো বত্রিশ) বৈশাখ মাসে ‘পূর্ব্বাশা’ বেরিয়েছিল। কোনও অভিজাত-গৃহে নয়, জন্ম চায়ের দোকানে। ব্যাপারটা প্যারিসে হলে ঠিক মানিয়ে যেত। কিন্তু তা কলকাতার মতো মহানগরেও নয়, ত্রিপুরার একটি পুরোনো শহরে। ছোট শহর। কিন্তু ছবির মতো। ছবির মতো কিন্তু তখন বাংলার শেষ সন্ত্রাসবাদের জ্বালাধরা।

কুমিল্লা শহরের কেন্দ্রস্থলে চৌমুহনী’র মোড়ে দীনেশ-গণেশ লখনউ কেবিন নামে চায়ের দোকানের আড্ডা ছিল এমন অসমবয়সির যা হয়তো র‍্যাঁবোর আগে প্যারিসেই সম্ভব ছিল। তখনও বিশুদ্ধ সাহিত্যের আড্ডা নয়, নাট্যমোদীর আড্ডা। যাদের বয়স আঠারো থেকে তিরিশ। সকাল-বিকেল যাঁরা আড্ডা দিতেন, তাঁরা সকলেই “অ্যারিস্টোক্রেট ভ্যাগাবন্ডস”। সেই নাট্যমোদীর আড্ডায় একদিন কেউ প্রস্তাব দিয়েছিলেন, “একটা সাহিত্যের কাগজ বার করা যাক, নাটক আর নয়।” তাছাড়া সে সময় কলকাতায় প্রবোধ সান্যালের ‘দুয়ে আর দুরে চার’, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ‘বিবাহের চেয়ে বড়’, ‘প্রাচীর ও প্রান্তর’ এবং বুদ্ধদেব বসুর ‘এরা আর ওরা’ নামের মোট চারটি উপন্যাস অশ্লীলতার অভিযোগে বাজেয়াপ্ত। কুমিল্লার তরুণ সাহিত্যমোদীরা এই ঘটনায় অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, “ওদের সমর্থনে আমরাও একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করব।”

কথাটা বোধহয় সবারই মনে ধরেছিল। সবাই (দশজন!) সম্মতি দিলেন এবং একটা ফুলস্কেপ শিটে লেখা হল “আমরা যে মাসিক কাগজ বার করছি নিম্নস্বাক্ষরকারীর সবাই তার ব্যয়ভার বহন করব”, এত তাড়াতাড়ি খসড়া হল যে কাগজের নামটা ঠিক হয়নি। অজয় ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করলেন : “কী নাম হবে কাগজের?” তাঁর হাতেই খসড়ার কাগজ-কলম ছিল।

ঋগবেদের একটা সূক্তের অনুবাদে সঞ্জয় ভট্টাচার্য ‘পূর্ব্বাশা’ শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন, বললেন : “পূর্ব্বাশা হলে কেমন হয়, যার মানে পূর্বদিক?” তাই সবার সম্মতি পেল। অজয় ভট্টাচার্য বললেন : “তুই যখন কাগজের নাম দিলি, তুই-ই সম্পাদক হবি। সম্পাদক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সহ-সম্পাদক : অজিত গুহ, কর্মাধ্যক্ষ : সত্যপ্রসন্ন দত্ত, নারায়ণ চৌধুরী মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

পরে সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখছেন, “কীভাবে জানিনে নারায়ণ ছাপার কাজ জানত। মাত্র ফাস্ট ইয়ারে কলেজে ভর্তি হয়েছে। সত্যপ্রসন্ন দত্ত, মাত্র একুশ বছর বয়স তার। বিজ্ঞাপন জোগাড়, এর-ওর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, বিক্রি সব ভার তার উপর। কার্যালয় : লখনউ কেবিন, আমাদের চায়ের আড্ডাখানা।”

লেখক বলতে আড্ডায় ছিলেন মাত্র অজয় ভট্টাচার্য, পরবর্তীকালে স্বনামধন্য গীতিকার যিনি স্কুলজীবনে কাজী নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু'-তে একটা কবিতা লিখেছিলেন। বাংলায় এম.এ. পাশ করে তখন 'রুবাইয়াৎ-ই হাফিজ' অনুবাদ করছেন। তিনি বললেন, এরিখ মারিয়া রেমার্কের 'রোডব্যাক' পূর্ব্বাশার জন্যে অনুবাদ করে দেবেন। ছিলেন সুধীর চক্রবর্তী, ইংরেজিতে এম.এ.। শনিবারের চিঠিতে তাঁর কিছু ব্যঙ্গ রচনা ছাপা হয়েছিল। আর সঞ্জয় ভট্টাচার্য কলকাতার 'নবশক্তি' কি 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিকে একটা একাঙ্কিকা আর দুটো সনেট লিখেছিলেন। এই। আর কেউ না।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য বললেন, "লেখা কিন্তু সবাইকে লিখতে হবে। শহরে লেখক ছিলেন কয়েকজন, কবি অবনী চক্রবর্তী আর ইতিহাসের বিখ্যাত ছাত্র প্রবোধচন্দ্র সেন। যিনি 'প্রবাসী'তে বাংলা ছন্দ নিয়ে আলোচনা লিখেছিলেন। প্রবোধচন্দ্র সেনকে ইতিহাসের উপর লিখতে অনুরোধ করা হবে, স্থির হল। পূর্বাশার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে সর্বাগ্রজ ব্যক্তি অমিয় চৌধুরী বলছেন "চায়ের পেয়ালায় তুফান বইতে শুরু হল। ক্রমেই আমাদের বদ্ধমূল ধারণা হল যে আমাদের সাহিত্য চর্চা, ...বা সাহিত্যে অবদান কোনও সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে প্রসারিত হওয়ার শুভক্ষণ এসে গেছে। এই তরুণ বোহেমিয়ান দল একটি দুরূহ কাজে অগ্রসর হল।"

কিন্তু পত্রিকার চরিত্র হবে কেমন? অজয় ভট্টাচার্য বললেন, 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি' এখন আর নেই। তাদের স্থান নিতে হবে। প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য-ই। সাতটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তসূর্যের প্রতীক, তার উপর পূর্ব্বাশা লেখা - যা ছাপার হরফের মতো নয়—জ্যামিতিক।

প্রথম সংখ্যার টাকা কারও কারও টিউশনির টাকা থেকে দিতে হয়েছিল। রয়েল অক্টেভো সাইজ, ৬০ পৃষ্ঠার কাজ। দাম চার আনা। ছাপা হয়েছিল আলিপুর বোমার মামলার উল্লাসকর দত্তের অগ্রজের কুমিল্লার একটি প্রেসে। নাম জগৎসুহৃদ প্রেস। অবশ্য প্রথমে বছরের কয়েকটি সংখ্যা সিংহ প্রেসেও ছাপা হয়েছিল। সত্যপ্রসন্ন দত্ত অত্যন্ত তৎপর হয়ে কুমিদার বিখ্যাত দুজন ব্যাঙ্কার — নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও ইন্দুভূষণ দত্তর থেকে তাঁদের দুই ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করলেন। সেইসঙ্গে রুপি ইন্সিওরেন্স, মীরা স্নো, এরিয়ান মিচুয়াল, এম্পায়ার অব ইন্ডিয়া টি, বেঙ্গল স্টিম লন্ড্রি কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপন এবং কলকাতা থেকে ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তর বেঙ্গল ইমিউনিটির বিজ্ঞাপন। যেসব ছেলে আড্ডার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা কলেজে বিভিন্ন দারিত্ব নিলেন, আসা আত্মীয়জনকে গ্রাহক করার চেষ্টা হল।

উল্লাসকর দত্তের পিতা দ্বিজদাস দত্তের প্রবন্ধ নিয়েই প্রথম সংখ্যা শুরু হয়। উল্লেখযোগ্য রচনা প্রবোধচন্দ্র সেনের ত্রিপুরার ইতিহাস, অজয় ভট্টাচার্যের এরিখ মারিয়া রেমার্কের রোডব্যাকের অনুবাদ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প। তাছাড়া 'অ্যাংরি ইয়ং মেন' হিসেবে একটি বিভাগ খোলা হয়েছিল, যার নাম "দুর্বাসা"। যিনি এক ক্রোধী ঋষি। প্রবাসী, ভারতবর্ষ,

বিচিত্রা, শনিবারের চিঠি-র দুর্বল রচনার উপর ক্রোধবর্ষণ ছিল সে বিভাগের কাজ। প্রধান লেখক, সুধীর চক্রবর্তী। অবশ্য পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ সত্যপ্রসন্ন দত্ত নিজেই স্বীকার করেছেন ‘সেগুলি দুর্বাসা-র রচনা প্রথম যৌবনের অগভীর বিশ্বাসের উচ্ছ্বাস।”

নিছক চায়ের দোকানের অকস্মাৎ উত্থিত একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব থেকে যে শেষ পর্যন্ত বারোমাসে বারোটি সংখ্যা যথানিয়মে বের করা সম্ভব হবে—সেটা নিশ্চয় আশ্চর্য হওয়ার মতো ঘটনা। কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতির উত্তরসূরি পত্রিকা হিসেবে আবির্ভাব মুহূর্ত থেকেই পূর্বাশা সাহিত্যজগতে নিজের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠায় যে সাহস সঞ্চয় করেছিল — তাতে কুমিল্লার মফস্বল সীমা অতিক্রম করার জন্য তরুণ সম্পাদকের মধ্যে এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। সত্যপ্রসন্ন দত্ত বলছেন, “প্রথম বছর পূর্বাশার খুব বেশি আর্থিক ঘাটতি হয়নি। বাকি মাত্র দেড়শো টাকা। কাগজ তখন সস্তা ছিল। প্রথম ছাপতাম (উর্মিলা) সিংহ প্রেসে, তারপর জগৎসুহৃদ প্রেস, জগৎসুহৃদ প্রেস দ্বিজদাসবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রেস, উল্লাসকরের অগ্রজ, কুমিল্লার শিক্ষিত তরুণদের পত্রিকা দেনা-পাওনা সম্পর্কে খুব তাগাদা ছিল না।”

কলকাতা থেকে বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বারবার ডাকছিলেন। নরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন থেকে দুশো টাকা ঋণ নিয়ে পূর্ব্বাশার প্রতিনিধিরা কলকাতায় এলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সত্যপ্রসন্ন দত্ত, অমিয়কৃষ্ণ, কলকাতার এক শিল্পী মনি ঘোষ। লক্ষ্য ছিল, জেলা শহরের সীমানার বাইরে এই পত্রিকার বিস্তার ঘটানো এবং পত্রিকার ব্যয়নির্বাহ করতে বিজ্ঞাপন সংগ্রহে এবং পত্রিকার নিজস্ব প্রেস স্থাপন। পূর্বাশার অফিস হল হাজরা রোডের মোড়ে। কানাই ধর লেনের একটি প্রেস ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ছাপা হল। সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখছেন; “ভবানীপুরের একটি বোর্ডিং হাউসে একটি ঘর নিয়ে বসলাম। মাথাপিছু আঠারো টাকা চার্জ। গেল বাহাত্তর টাকা। ত্রিশ টাকা দিলাম তিনটি গল্পের জন্যে অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব আর প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। শিল্পীবন্ধু প্রচ্ছদপট করল দু-রঙা -ভোরের সূর্য আর প্রস্ফুটিত পদ্ম। কিছু নিলে না। কিন্তু ব্লক করতেই হাত শূন্য।” আরও দুটি সংখ্যা। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের তাগিদে সত্যপ্রসন্ন দত্ত একদিন বেঙ্গল ইমিউনিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেইদিনের অভিজ্ঞতা সত্যপ্রসন্ন দত্ত লিখছেন- তিনি বললেন, তিনি একটি প্রেস করেছেন। ‘চলো দেখবে’। ...আমাদের চোখে তখন ওটা বড় প্রেস। জার্মান ফ্ল্যাটবেড মেশিন, ছবির ব্লক ছাপাবার দুটো জার্মান ট্রেডল, একটি সাধারণ ট্রেডল। প্রচুর টাইপ, অনেক জায়গা।”

ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত এই প্রেসের দায়িত্ব দিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং সত্যপ্রসন্ন দত্তকে। উনিশশো চৌত্রিশ সালের (তেরোশো একচল্লিশ সন) বৈশাখ মাস থেকে ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কসে ‘পূর্ব্বাশা’ ছাপার কাজ শুরু হয়। শিরোনাম ছাপা হল ভিন্ন রঙে (তখনকার

দিনে একমাত্র ‘স্ট্যান্ড’ ম্যাগাজিনের শিরোনাম ছাপা হত ভিন্ন রঙে)। বিজ্ঞাপন নয়, লেখার পৃষ্ঠা দু-রঙে ছাপা সম্ভবত পূর্বাশাই শুরু করে। একদিকে যেমন পূর্ব্বাশাকে কেন্দ্র করে সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সাহিত্যবৃত্তির পথ ধীরে ধীরে প্রশস্ত হয়েছিল, তেমনি তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টাতেই প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, প্রভু গুহঠাকুরতা, নলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীঅরবিন্দ থেকে শুরু করে নবীন অজয় ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, জীবনানন্দ দাশ, নজরুল ইসলাম, বিষ্ণু দে, সমর সেন, অন্নদাশংকর রায়, শৈলেন ঘোষ, সুনীল সরকার—পুরনোদের পাশাপাশি প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নতুনদের জয়যাত্রা প্রশস্ত হল পূর্বাশার পাতায়। আর একথাটাও ঠিক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য প্রতিভার প্রথম আবিষ্কারের গৌরব নিঃসন্দেহে পূর্ব্বাশা তথা সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যেরই প্রাপ্য। দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় (আশ্বিন, তেরোশো চল্লিশ) ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্প প্রকাশের পর তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ল। তৃতীয় বর্ষের (জ্যৈষ্ঠ, তেরোশো একচল্লিশ) দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ‘পদ্মানদীর মাঝি’ প্রকাশিত হয়ে এই জনপ্রিয়তাকে স্থায়িত্ব দিল। প্রকাশক-পাড়া প্রত্যাখ্যাত হয়ে রোদে পুড়ে খুবই উত্তেজিত হয়ে” মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন ‘পদ্মানদীর মাঝি’-র পাণ্ডুলিপি নিয়ে পূর্ব্বাশার দফতরে হাজির হয়েছিলেন। কোনও এক প্রকাশক নাকি তাঁকে বলেছিলেন —“সময় হলে আপনার বাড়ি গিয়ে বই নিয়ে আসব।” সেদিনের স্মৃতিচারণে সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলছেন “তাই আসতে হবে ওঁদের। কিন্তু পূর্বাশাকে কি আপনি দেবেন উপন্যাসটা? জানেন তো অবস্থা। বেশি টাকা দিতে পারব না। মাত্র একশো দিতে পারি।” সেদিন অভিভূত মানিক বন্দোপাধ্যায় আত্মবিশ্বাসের উচ্ছল হয়ে বলে গিয়েছিলেন “আমি লিখব- দেখবেন লিখব।” ‘পদ্মানদীর মাঝি’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাশার পাঠকরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠলেন। স্মরণ করা যেতে পারে, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একদিন সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে পরামর্শ দিয়েছিলেন— “মানিককে টাকা দাও তার লেখার আমি ভক্ত, সত্যকারের ক্ষমতা আছে, সেই সঙ্গে দোষও আছে। তবু, সেই সবচেয়ে শক্তিশালী লেখক।”

ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের ভারতী প্রেসের সঙ্গে ব্যবসা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র চার মাস বৈশাখ থেকে শ্রাবণ, এই ব্যবসায় পূর্বাশার কাজ চলে। এত ভালো প্রোডাকশন এরপর পূর্ব্বাশার আর হয়নি। পূর্ব্বাশা কখনও বাণিজ্যফসল হয়নি। সত্যপ্রসন্ন দত্ত লিখছেন ‘উনিশশো তেত্রিশ সালে কুমিল্লা থেকে কলকাতায় এসেছিলাম পূর্বাশা চালাব বলে— ব্যবসা করতে আসিনি। বাণিজ্যলক্ষ্মী তাই কোনওদিন আমাদের কৃপা করেনি।” শ্রাবণ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাব দিলেন, পূর্বাশা ভালো চলছে না। পূর্ব্বাশা বন্ধ করে দিয়ে ‘নবশক্তি’ পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। আর এই প্রস্তাব পূর্ব্বাশা

সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং কর্মাধ্যক্ষ সত্যপ্রসন্ন দত্ত কারোরই মনঃপূত হয়নি। তাঁরা 'পূর্বাশা' বন্ধ করার কথা ভাবতেও পারেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন 'পূর্ব্বাশা'-ও চলুক এবং 'নবশক্তি'-ও। ভারতী প্রেস থেকে চলে আসার পর বছরের বাকি কয়েকটা মাস পূর্ব্বাশার প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তখন একদা নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশনের কর্ণধার এবং পূর্ব্বাশার পৃষ্ঠপোষক) একটি অনিয়মিত সংখ্যা হাতে পেয়ে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "পূর্বাশা সাপ্তাহিক না মাসিক না বার্ষিক; না ইচ্ছায়িক ! ওদের যখন ইচ্ছা বার করবে"।

উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের প্রথম দিকে কিছু বাংলা টাইপ কিনে ৩৫৭/বি, ধর্মতলা স্ট্রিটে পূর্বাশা প্রেসের কাজ চালু হয়। প্রেস করার উদ্দেশ্য ছিল নিয়মিত পূর্ব্বাশা ছাপানো এবং বাইরের কাজ করে পূর্ব্বাশার খরচ মেটানো। উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে প্রেসের নতুন সংযোজন হল একটি ট্রেডল মেশিন। পত্রিকা ছাপার কাজটা এতে আরও সহজ হয়ে গিয়েছিল। উনিশশো ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ এই সময় প্রেস হাতে থাকায় পূর্বাশা সাপ্তাহিক প্রকাশনায় রূপান্তরিত হয়। 'কবিতা' পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসু লিখলেন "পূর্বাশা মাসিক ছিল শ্রদ্ধেয় পূর্ব্বাশা সাপ্তাহিক অবজ্ঞেয়"। তবে এই পরীক্ষা বেশিদিন চলেনি।

উনিশশো বত্রিশ থেকে সাঁইত্রিশ সাল পর্যন্ত সময় কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতির মতো পূর্বাশাকে একটি প্ল্যাটফর্ম করতে চেয়েছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। এর জন্য অনাহার, অনিদ্রা, উপবাসক্লিষ্ট দিনযাপন কাবু করতে পারেনি। এমনকী শুধু অন্নসংস্থানের তাগিদে অন্য চাকরির কথা ভাবেননি। উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে পূর্ব্বাশা তার নন্দনতাত্ত্বিক ধারা পরিবর্তন করে। ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি হয়। মার্কসীয় দর্শন লেখকদের অনেকেই প্রভাবিত করে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যও প্রভাবিত হন। তবে তাঁর ধারা ছিল ট্রটস্কি ধারা। অর্থাৎ স্টালিন-বিরোধী মার্কসীয় পন্থায় তাঁর আস্থা জন্মেছিল। স্বভাবতই তার প্রভাব পূর্ব্বাশাতে পড়েছিল।

বিশের দশকে ভারতেও কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়ে গেছে। আর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা স্বীকৃত। তিরিশের দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্বাভাবিক কারণেই স্টালিনপন্থী, ট্রটস্কিপন্থী নয়। আবার এই তিরিশের দশকেই জার্মানি, ইতালিতে নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদের উদ্ভব সারা বিশ্বকে আতঙ্কিত করে তোলে। হিটলারের আগ্রাসী আস্ফালনে সারা পৃথিবী যখন আতঙ্কিত এবং ঊনিশশো উনচল্লিশ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল তখন ওই বছরেরই সেপ্টেম্বরে সঞ্জয় ভট্টাচার্য পূর্ব্বাশার 'হিটলার বিরোধী' সংখ্যা করলেন। তিনি তখন ট্রটস্কিপন্থী। নাৎসীবাদের বিরোধিতা করাই স্বাভাবিক। করেও ছিলেন তিনি। কিন্তু ঘটনা হল, সেই সময় ভারতের তথা বাংলার কমিউনিস্টরা পূর্ব্বাশার হিটলার বিরোধী সংখ্যাকে সুনজরে দেখেননি। তার কারণ, স্টালিন ও হিটলারের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি ছিল। এছাড়াও এদেশের স্বাধীনতাকামীরাও ক্ষুব্ধ হন। এইসব নানাবিধ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় 'পূর্ব্বাশা' বন্ধ করে দিতে হয়।

চল্লিশের দশকের শুরুতে শিবির ভাগাভাগি এমনই প্রকট আকার ধারণ করেছিল যে সাহিত্যপত্রিকাগুলির বিবাদও প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। কবি-সাহিত্যিকদের পারস্পরিক সংঘাতও তীব্রতর আকার নেয়। 'পূর্ব্বাশা'ও বন্ধ। কিন্তু পূর্ব্বাশা ভাবনার ফলশ্রুতি 'নিরুক্ত' (১৩৪৭-'৫২) প্রকাশ (আশ্বিন, তেরোশো সাতচল্লিশ) উনিশশো চল্লিশ সালে। "বাংলা সাম্প্রতিক কাব্যে এমন কয়েকটা লক্ষণ কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে যা অসুস্থ বিকারেরই পরিচয় বলে আমাদের ধারণা। এই রুগ্ন কাব্যকে অনায়াসে নীরবে অবজ্ঞা করা চলত যদি না এর মধ্যে সংক্রামকতার বিপদ বর্তমান থাকত। কিন্তু শুধু ভর্ৎসনা বা সমালোচনা এই সংক্রমকতার বিরুদ্ধে প্রতিষেধক নয়। কাব্যের সুস্থ আদর্শ অটুট রাখবার চেষ্টাই এই সংক্রামকতা নিবারণের শ্রেয় উপায় মনে করেই 'নিরুক্ত'-র প্রকাশ করবার এই আয়োজন" — লিখেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, নিরুক্ত"র প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে। এবং এই আয়োজনকে স্বাগত জানিয়ে ওই বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— "কিছুকাল থেকে ভাষার বিকৃতি ছন্দের স্খলন এবং ভাবের দুর্বোধ্য অসংলগ্নতা নিয়ে অকবির পথে কবিযশপ্রার্থীর সংখ্যা অবাধে বেড়ে চলেছে। সাহিত্যে এই মারীর সংক্রমকতা এখনকার বাতাসকে অধিকার করেছে সুতরাং বাহির থেকে কোনও প্রতিকার চেষ্টা ব্যর্থ হবে।... মানুষ ফ্যাশনের তাড়ায় দীর্ঘকাল নিজেকে ব্যঙ্গ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বেই। সেইদিনের জন্য অপেক্ষা করো এবং অবিচলিত চিত্তে আপন কর্তব্য করতে নিযুক্ত থাক।" এই আদর্শ বাঁচিয়ে রাখতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগী ছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। 'নিরুক্ত' নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে 'পূর্ব্বাশা' প্রায় পাঁচ বছর কাল স্থগিতাবস্থায় ছিল। "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের স্মরণে উনিশশো একচল্লিশ সালে (আশ্বিন, তেরোশো আটচল্লিশ) সালে 'রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্ব্বাশা' প্রকাশিত হয় যে সংখ্যাটি এখন সংগ্রাহকদের কাছে দুর্মূল্য। চোদ্দো পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন। আলাদা আর্ট প্লেটে নং "পৃষ্ঠার রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের ছবি—যার মধ্যে দুষ্প্রাপ্য ছবিও আছে কয়েকটি। কভার 'অফসেটে' দু-রঙে ছাপা। লেখকসূচি দেখার মতো—প্রমথ চৌধুরি, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, নীহাররঞ্জন রায়, মোহিতলাল মজুমদার, প্রভু গুহঠাকুরতা, জীবনানন্দ দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজয় ভট্টাচার্য, নীলিমা দেবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হুমায়ূন কবীর, লীলাময় (অন্নদাশংকর রায়), মহেন্দ্রনাথ সরকার, শচীন সেন। সেই সঙ্গে ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত পত্র এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে (দশ মে, উনিশশো চল্লিশ) লেখা একটি ছোট চিঠি (কবিতা) — 'গাছ দেয় ফল/ ঋণ বলে তাহা নহে/নিজের সে দান/ নিজেরই জীবন বহে পথিক অসিয়া লয় যদি ফলভার/প্রাপ্যের বেশি/সে সৌভাগ্য তার।'

সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদকীয় লিখেছেন—একটি শিরোনামহীন, অস্বাক্ষরিত কবিতা— "পৃথিবী এখনও তেমনিও আছে জানি/তেমনি সূর্য্য যারে সে প্রণাম করে বিরহ-মিলন তেমনি আকাশ পরে—/তবু কি হারালো রূপ তার প্রিয় বাণী / তোমার কথারা স্বপ্ন হয়ে

কি গেলো/যেন তারা ছিল কোন দূর শুধু দিনে/ পৃথিবীর মন যখন ফুলে ও তৃণে/বন-জ্যোৎস্না নিশ্বাসে ভাষা পেলো। নীরব পৃথিবী পৃথিবীর মানুষেরা/সেই মানুষের পৃথিবী, তাদের স্বরে/ধূসর আকাশ মুখর বালুর ঝড়ে/অশ্রু আগুন ধোঁয়াটে জীবন ঘেরা।/ তবুও পৃথিবীর ঊষার আকাশে জানি/পাঠায় প্রণাম কোন এক সূর্যেরে/যার মানে সেই হারানো দিনরা ফেরে/তোমার ভাষায় লেখা আছে যার বাণী"। প্রত্যেককে লেখার জন্যে পঁচিশ টাকা করে দক্ষিণা দিয়েছিলেন। সংখ্যাটি সমাদৃত হবে মনে করে সংখ্যাটি 'প্রি-পাবলিকেশন' বিক্রি করার ব্যবস্থা করিয়েছিলেন যাতে নাকি ;'ব্ল্যাক মার্কেট'ও হয়েছিল।

পত্রিকার প্রাথমিক খরচবাবদ পাঁচশো টাকা ব্যাংকের হিসেবে 'ওভার ড্রাফট' মঞ্জুর করে দিয়েছিলেন নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। এই সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার বিক্রি হয়েছিল। দাম ছিল দু'টাকা (ভিন্ন মতে, দেড় টাকা)। খরচও হয়েছিল প্রচুর। এই সংখ্যাটি নিয়ে সত্যপ্রিয় ঘোষ বলেছেন—"চিরকাল সংরক্ষণযোগ্য এই (পূর্ব্বাশা রবীন্দ্রস্মৃতি) সংখ্যাটি নতুন করে বুঝিয়ে দেয় বাংলার সাময়িকপত্রের ইতিহাসে কেন পূর্ব্বাশা অবিস্মরণীয়, কেন সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য অনন্য, কেন তাঁর সমস্ত সাহিত্য প্রচেষ্টার ধাত্রী স্বরূপ সত্যপ্রসন্ন দত্ত বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির লালনকর্মে নিযুক্ত মানুষদের মধ্যে অদ্বিতীয়।"

'রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্ব্বাশা'র সার্থকতা সুধী সাহিত্যিক মহলে অত্যন্ত আশার সঞ্চার করেছিল। অনেকেরই ধারণা হয়েছিল, পত্রিকাটি আবার কিছুদিনের জন্য নিয়মিত হয়ে উঠবে। অবশ্য ইতিমধ্যেই নবীন-প্রবীণ উভয় সম্প্রদায়ের কবিদের কাছে 'নিরুক্ত'র একটা আলাদা আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে কেবল কবিতারই মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হলেও 'নিরুক্ত'র ইতিহাস সর্বাংশে পূর্ব্বাশারই কাব্য প্রচেষ্টার ইতিহাস হিসেবেই চিহ্নিত। স্বতন্ত্র উদ্যোগ হিসেবে 'নিরুক্ত'-র প্রকাশ তাই পূর্ব্বাশার ধারাবাহিকতায় কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র না, কিংবা নিছক কোনও সম্পাদকীয় খেয়ালেই 'নিরুক্ত'র জন্ম হয়নি বরং তা এক জন্মান্তর মাত্র—যার সঙ্গে সম্পাদক ও কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এক নিবিড় সংযোগ সংঘটিত হয়েছিল। এক অর্থে 'নিরুক্ত', 'পূর্ব্বাশারই কবি আত্মা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর প্রায় সমসময়ে, প্রধানত পূর্ব্বাশার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়র পর-পরই নিরুক্ত-র উত্থান ঘটেছিল এবং যুদ্ধ শেষের প্রহরেই 'নিরুক্ত'-র অবসান। বছর পাঁচে সময়কালের প্রথম তিন বছরই 'নিরুক্ত'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করতেন, "উনিশশো একচল্লিশ-তেতাল্লিশ পর্যন্ত সময়টাই বাংলা কবিতার ক্রান্তিকাল। নিরুক্ত আন্দোলন"।

মহাযুদ্ধের অনিশ্চয়তায় বিশ্ব যখন কম্পমান। জাপান এই যুদ্ধে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ শঙ্কার প্রহর গুনতে শুরু করেছে। উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে কলকাতা যখন জাপানি আক্রমণের ভয়ে চঞ্চল, তখন সঞ্জয় ভট্টাচার্য কলকাতা থেকে কুমিল্লা কান্দিরপার গ্রামে চলে যান।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে ইংরেজরা যে নয়া সামন্ততন্ত্র কায়েম করতে চেয়েছিল,

সেটা ধরতে পেরেছিলেন গান্ধীজি। সামন্ততন্ত্রকে ঘা দিতে দরকার ধনতন্ত্রের ('ধনতন্ত্রই জাতীয়বাদের জনক') কুঠার। গান্ধীজি কুঠারটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে গান্ধীজি যখন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক নিয়ে কারাবরণ করলেন, তখন পূর্ব্বাশা পুনঃপ্রকাশের সংকল্প নিয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্য কলকাতায় ফিরে এলেন। কিন্তু আগেকার ধারায় পূর্বাশা প্রকাশ করতে প্রস্তুত নন। সত্যপ্রসন্ন দত্তের ভাষায় : "পূর্ব্বাশা ধনতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের পথেই এগোবে স্থির হল। মনে রাখা ভাল ধনতন্ত্রই জাতীয়তাবাদের জনক। ইউরোপের জাতীয়তাবাদ ধনতন্ত্রের অবদান। নতুন আদর্শে আবার পূর্ব্বাশা বেরুবে।" সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বিশ্বাস যে গান্ধীজির এই আন্দোলন অবধারিতভাবে স্বাধীনতা আনবে।

কলকাতায় ফিরেই পূর্ব্বাশার নিজস্ব ছাপাখানা দপ্তর চলে আসে। পি-১৩ পরে ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউতে। এতকাল পূর্ব্বাশার স্থানীয় কোনও দপ্তর ছিল না। এই বাড়ির একতলায় এক ঘরে প্রেস। অন্য ঘরে সম্পাদকীয়। পূর্ব্বাশা সম্পাদনায় সাহায্য করতেন অনিল চক্রবর্তী এবং সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউর জৌলুস যেন চতুর্গুণ বেড়ে গেল।

চল্লিশ দশকে পূর্ব্বাশা যে ভাবধারায় (আদর্শে) বের হতে লাগল, তা কিছুটা মেনশেভিকপন্থী—অর্থাৎ বুর্জোয়া বিপ্লবে বাধা না দেওয়া এবং এমন সাহিত্য প্রচার করা, যাতে বুর্জোয়া বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়। কাব্যের আদর্শ ছিল 'লাল সূর্যের প্রতিরোধ'। তিনি নিজেও পূর্বাশা সাহিত্য-সংস্থাকে এক বৈজ্ঞানিক ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করে গঠন করলেন "মডেল ফার্ম অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড", যা পূর্বাশারই একটি সংস্থা। তার পর বলেছেন- "উনিশশো তেতাল্লিশ সালে পূর্ব্বাশা যে নতুন সমাজ দর্শনে সঞ্জীবিত ভরেছিল তার এক পিঠ পূর্বাশা, অন্য পিঠ মডেল ফার্ম। ইংরেজিতে বলে ফেস অ্যান্ড মাইন্ড। পূর্ব্বাশা জোগাবে মনের খোরাক মডেল ফার্ম দেহের।

কিন্তু বিধি বাম। উনিশশো তেতাল্লিশ সালে ফার্ম যেদিন রেজিস্ট্রি হল, সেইদিনই ভারত সরকার রেস্ট্রিকশন অফ ক্যাপিটাল ইস্যু নামক এক আদেশ জারি করে নতুন কোম্পানির কাজ বন্ধ করে দেয়। এরপর ছাড়পত্র পেতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত দিল্লি, কলকাতা করে অবশেষে পূর্ববঙ্গের ১২০০ বিঘা (১২ টাকা বিঘা) জমি ক্রয় করেন। তিনটি ট্রাক্টর কেনা হয়। এছাড়া আরও কিছু সরঞ্জাম। কয়েক লক্ষ টাকার জিনিসপত্র। ট্রাক্টর দেখাশোনার জন্য লোক রাখা হয় মাইনে দিয়ে। সবই হল, কিন্তু আবাদ আর শুরু হল না। এত কাণ্ড করতে করতেই দেশ ভাগ হল। ঋণদাতা কুমিল্লা ব্যাংকের অবলুপ্তি ঘটল। ভারতে কুমিল্লা ব্যাংক, হুগলি ব্যাংক সহ আরও কয়েকটি ব্যাংক মিলে সৃষ্টি হল ইউনাইটেড ব্যাংক। দেশভাগের পর মডেল ফার্মের সম্পত্তি হয়ে গেল বিদেশি। ফলে তার জামিনে ভারতীয় ব্যাংক টাকা ঋণ দিল না। সত্যপ্রসন্ন লিখেছেন— "দেশ ভাগ কারও গণনার মধ্যে আসে না, কুমিল্লা ব্যাংকের অবলুপ্তিও নয়।"

মডেল ফার্মের অবলুপ্তি হল। পূর্ব্বাশা প্রেস তখনও চলছিল। মডেল ফার্মের যাবতীয় (কর্মচারী, বেতন, ট্রাক্টর, দেখাশোনা) খরচাপাতির দায় 'পূর্ব্বাশা'র ঘাড়ে এসে পড়ল। এদিকে পূর্ব্বাশা পত্রিকা চলত পূর্ব্বাশা প্রেসের টাকায়। পূর্ব্বাশা প্রেস চলত ব্যাংকের যাবতীয় ছাপার কাজ পেয়ে। সেটা তো আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বাড়িওয়ালার ঋণ, মাড়োয়ারির ঋণ, কাবুলিওয়ালার ঋণ — যাবতীয় ঋণের বোঝা মেটাতে পূর্ব্বাশা প্রেস নিলাম হয়ে গেল উনিশশো সাতান্ন সালে। পূর্ব্বাশা পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। সত্যপ্রসন্ন দত্তের মতে, "পূর্ব্বাশার জীবনে চল্লিশ দশক ছিল উত্থানের যুগ, পঞ্চাশ দশক পতনের'। পূর্ব্বাশা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শনিবারের চিঠিতে খানিকটা শোকবার্তা প্রকাশ করেছিলেন সজনীকান্ত দাস। ওইটুকুই, আর কিছু না।

নরওয়ে নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী লেখিকা সিগ্রিড উন্ডসেটের 'জেনি' উপন্যাসের নায়িকা 'জেনি' আত্মহত্যা করেছিল অদ্ভুতভাবে। হাতের কবজির শিরা কেটে অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে। ঠিক একই পদ্ধতিতে পূর্ব্বাশা সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য আত্মহননের চেষ্টা করেন। বারো জুলাই, উনিশশো একান্ন। রক্তাপ্লুত, অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। দীর্ঘ তিন মাস (বারো জুলাই থেকে বারো অক্টোবর) চিকিৎসার পর তাকে হাসপাতাল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। উনিশশো পঞ্চান্ন সালের অক্টোবর মাসে সঞ্জয় ভট্টাচার্য আর্থিক সংকটে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। বহু শুভার্থীর প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। ষাটের দশকে সুস্থ হয়েই তিনি পূর্ব্বাশাকে পুনরায় আলো দেখাতে সচেষ্ট হন। আরোরা ফিলম কর্পোরেশনের কর্ণধার অজিত বসু ও চলচ্চিত্র নির্মাণ সংস্থা ছায়াবাণীর কর্ণধার অসিত চৌধুরির অর্থ সাহায্যে উনিশশো চৌষট্টি সালে (মাঘ, তেরোশো সত্তর) নবপর্যায়ে সেলিমপুর থেকে 'পূর্ব্বাশা' প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদে ফিরে আসে কিউবিক রীতির অক্ষরলিপি। ভারী অ্যান্টিকে ছাপা ডাবল ক্রাউন সাইজের ছিয়ানব্বই পাতার কাগজ (বিজ্ঞাপন আলাদা ছয় পাতা)। দাম এক টাকা। সূচিপত্র নেই। যোলো পাতার দীর্ঘ সম্পাদকীয়। এই সময়ই বাংলা সাহিত্যে নানা আন্দোলন শুরু হয়েছে। হাংরি জেনারেশন, ধ্বংসকালীন আন্দোলন, শ্রুতি আন্দোলন — যা ছিল কিছুটা যৌনগন্ধী, শ্লীলতার বাঁধভাঙা প্লাবন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য চেয়েছিলেন সৎ সাহিত্যের আন্দোলন। সে কারণে ষাটের দশকে নব পর্যায়ের পূর্ব্বাশার প্রতি কভারে মুদ্রিত থাকত এই কথাটি "একমাত্র সৎ সাহিত্যের মুখপত্র"। নব পর্যায়ে পূর্ব্বাশা নিয়মিত প্রকাশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন।

নবপর্যায়ের পূর্বাশাও বেশিদিন বাঁচেনি, বাঁচেননি সঞ্জয় ভট্টাচার্যও। ১৯৬৪ (মাঘ, তেরোশো সত্তর) থেকে ১৯৬৯ (আশ্বিন, তেরোশো পঁচাত্তর) পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। উনিশশো উনসত্তরের চার ফেব্রুয়ারি (একুশ মাঘ, তেরোশো পঁচাত্তর) তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ। শুধু জানা যায়নি জন্মদিন মৃত্যুদিন এক হয়ে গেল কিনা!

আজীবন সুহৃদ পূর্ব্বাশার নেপথ্যশিল্পী সত্যপ্রসন্ন দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পরও কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। একালের অনেকেই হয়তো জানেন না যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত; 'পূর্ব্বাশা' প্রকাশনা সংস্থার প্রতীক চিহ্ন ছিল অশোকস্তম্ভের ওপর সিংহমূর্তি। স্বাধীনতার পর এই প্রতীক চিহ্নই ভারত সরকারের প্রতীক চিহ্ন হল। ১৯৪৯ সালে এই সিদ্ধান্ত 'পূর্ব্বাশা' সম্পাদক ও প্রকাশককে জানিয়ে দেওয়া হয়।

নানাকারণে পূর্ব্বাশার প্রকাশ অনিয়মিত হলেও তা অচিরে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। সংকট এসেছে, সংকটমুক্তির পথও খুঁজে পাওয়া গেছে সহৃদয় হিতৈষীদের দাক্ষিণ্যে। এ থেকে বোঝা যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রতি পূর্ব্বাশার অনুরাগীদের বিশ্বাস কতটা অটুট ছিলো। নেপথ্যচারী সত্যপ্রসন্ন দত্ত লিখছেন : "ত্রিশের দশকের দ্বিতীয় বৎসরে জন্ম নিয়ে পূর্ব্বাশা আজ পর্যন্ত বাংলার মনোজীবনেরই ইতিহাস। যখনই এ ইতিহাসে অন্ধকার নেমে এসেছে তখনই 'পূর্ব্বাশা' অবলুপ্ত। খালি মনীষীর ঈষৎ স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাশ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। এ প্রকাশ এমনি বিঘ্নিত ও অনিয়মিত। তার জন্য যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকে, তাহলে সে বাঙালির ইতিহাস পুরুষ"।

আজীবন সাহিত্যসেবী সঞ্জয় ভট্টাচার্য কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতির স্থান নেবার বাসনা নিয়ে পূর্ব্বাশা প্রকাশে উৎসাহিত হন। পূর্ব্বাশাই ছিল তাঁর জীবনের আলো। পূর্ব্বাশার বিপন্নতা তাঁর জীবনের অন্ধকার। পূর্বাশা তাঁর লেখার প্রেরণা, বাঁচার ইনসুলিন। 'পূর্ব্বাশা' তাঁর হার্ট আর ফুসফুস। সত্যপ্রসন্ন দত্তকে যদি তাঁর জীবনসঙ্গী বলা যায়, পূর্ব্বাশা তাঁর আমরণ জীবনসঙ্গিনী। পূর্ব্বাশার বাইরে তাঁর কোনো কর্মজীবনই ছিলো না। এখানেই তিনি পেতেন তাঁর জীবনশক্তি, মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রেরণা ও রসদ। নারায়ণ চৌধুরী তাঁর 'সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও পূর্ব্বাশা' রচনায় লিখেছেন :

"ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বন্ধুত্বের মহত্তম দৃষ্টান্তের সঙ্গে যদি প্রতিতুলনা মার্জনীয় তাহলে বলতেই হবে যে, মার্ক-এঙ্গেলসের মধ্যে যে ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের কথা আমরা এ যাবৎ শুনে এসেছি। তারই এক ক্ষুদ্রতর (কিন্তু তা বলে কিছু কম গৌরবজনক নয়) বন্ধুত্বের উদাহরণ আমরা আমাদের জীবদ্দশায় বাংলার বুকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেলাম সঞ্জয়-সত্যপ্রসন্ন ক্লাসিক সৌহার্দ্যের নিদর্শনের মধ্যে"। একই অভিমত বুদ্ধদেব বসুরও "জীবৎকালব্যাপী বন্ধুতার এরকম একটি উদাহরণ আমি চোখে না দেখলে সম্ভব বলেও ভাবতে পারতাম না"।

আসলে অর্থকষ্টই একমাত্র সত্য, যা থেকে জীবনানন্দ, মানিক, সঞ্জয় — কেউ-ই পরিত্রাণ পাননি। 'পূর্ব্বাশা'ও বাঁচেনি। তবু বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে সে আজও এক শিরোধার্য উদাহরণ।।

লেখার শেষে পাঠকের সুবিধার্থে পূর্ব্বাশার একটি পর্যায়ক্রমিক সারণি এখানে সংযোজিত হলো :

কালানুযায়ী পর্যায়

প্রথম পর্যায়

১৯৩২-৩৯

দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৪৩-৫৭

তৃতীয় পর্যায়

১৯৬৪-৬৯

চতুর্থ পর্যায়

১৯৭২-৭৭

(আসলে মাঝে কিছু অনিয়মিত সংখ্যা প্রকাশ পায় : ১৯৭২ (বৈশাখ, ১৩৭৯), ১৯৭৪ (বুর্জোয়া বিপ্লব সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮১)

আদর্শানুযায়ী পর্যায়

প্রথম পর্যায়

১৯৩২-৩৭ : এই সময়ের আদর্শ ছিল কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখা। সাংস্কৃতিক চেতনার বিপ্লব।

দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৩৭-৩৯। এই সময় পূর্ব্বাশা মার্ক্সীয় (ট্রটস্কিপন্থী) ধারায় প্রকাশিত। এই ধারার শেষ সংখ্যা হিটলার-বিরোধী সংখ্যা, যা প্রভূত বিতর্ক জাগায় ও পূর্বাশা প্রকাশ কয়েকবছর বন্ধ থাকে।

তৃতীয় পর্যায়

১৯৪৩-৫৭ : গান্ধীবাদী আন্দোলন সমর্থন তথা মেনশেভিক বুর্জোয়া বিপ্লবে বাধা না দিয়ে তাকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচনা ও প্রচার। মুক্ত মানসিকতা তৈরির সচেতন সাহিত্য প্রয়াস।

চতুর্থ পর্যায়

১৯৬৪-৬৯ — কথাসাহিত্য বিষয়ে বিতর্কিত চেতনার সন্ধান ও ফর্ম নিয়ে পরীক্ষার চেষ্টা। সৎসাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস। সঞ্জয়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর ১৯৬৯-এ সত্যপ্রসন্ন কয়েকটি পূর্ব্বাশা প্রকাশ করেন।

পঞ্চম পর্যায়

১৯৭৬-৭৭ : সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর পূর্ব্বাশার কর্মাধ্যক্ষ সত্যপ্রসন্ন দত্তের সম্পাদনায় পাঁচটি সংখ্যা এই সময় প্রকাশিত হয়। শেষদিন অবদি পূর্ব্বাশার প্রথা মেনে তিনিও লেখকদের সম্মান দক্ষিণা দিতেন। ১৩৮৩-এর ভাদ্র-চৈত্র-ই পূর্ব্বাশার শেষ সংখ্যা বলে মেনে নেওয়া হয়।

ঋণস্বীকার (প্রবন্ধ) :

১. পূর্বাশা : স্বরূপের সন্ধান — নারায়ণ ঘোষ

২. সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও পূর্বাশা — সরোজ দত্ত

৩. সত্যপ্রসন্ন দত্ত ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ — নিত্যপ্রিয় ঘোষ

৪. সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও পূর্বাশা — পবিত্র সরকার

৫. পূর্বাশার কাব্যচর্চা — প্রভাতকুমার দাস

[প্রবন্ধটি 'আমার সময়', নভেম্বর ২০১০, ২য় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ পায়। অধ্যাপক ঋতম্ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় কিছু সংযোজন ও সংশোধন-সহ প্রাবন্ধিকের অনুমতিক্রমে বর্তমান সংকলনে পুনর্মুদ্রিত হলো।]

পরিচয় পত্রিকা : পথ চলতে চলতে

স ঞ্জী ব দা স

পরিচয় পত্রিকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক দেখতে দেখতে দেখতে ১৫ বছর হয়ে গেল। অমিতাভ দাশগুপ্ত, কবি তখন সম্পাদক। গ্রেস সিনেমা হলের পাশে অবস্থিত ঘোষ কেবিনের উঠোন পেরিয়ে অন্ধকার খাড়া সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আসলে বাম দিকে পরিচয় পত্রিকার অফিস। সেখানে একদিন হঠাৎই গিয়েছিলাম। তখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আমার বন্ধু সুশান্তর মামা ছিলেন অমিতাভ দাশগুপ্তের বন্ধু। ও একদিন বলল, অমিতাভ দাশগুপ্তের কাছে যাবে। উনি পরিচয় পত্রিকার দপ্তরে মঙ্গলবার আসেন। সেই মতো ওর সঙ্গেই আমার প্রথম যাওয়া পরিচয় পত্রিকার অফিসে। বাণিজ্যিক পত্রিকার অফিস বললে জাঁকালো কোনো অফিসের যে ছবি মানসপটে ভেসে ওঠে তার সম্পূর্ণ বিপরীত চেহারা নিয়ে সেই দপ্তর আমার সামনে উপস্থিত হয়েছিল। সেখানে এক সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক আসর আলো করে বসেছিলেন। পরে জানলাম উনি জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। স্বনামধন্য লেখক এবং অধ্যাপক।

তবে সে ছিল প্রথম দর্শনের পালা মাত্র। এরপর পরিচয়ের দপ্তরে অমিতাভ দাশগুপ্ত সম্পাদক থাকাকালীন সময়ে আর কখনো যাইনি। এরপর অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি তখন পরিচয়ের সম্পাদক। একদিন সে-ই তিনিই সস্নেহে আমাকে নিয়ে আসেন পরিচয়ের আড্ডার আসরে। তারপর কখন যে এই গোষ্ঠীর ভিতর মহলের বাসিন্দা হয়ে গেলাম তা নিজেই জানি না। সেই পরিচয়ের পরিচিতি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার ভূমিকা লেখা আমার পক্ষে তাই কিছুটা বিড়ম্বনার। কারণ এক্ষেত্রে নিরাসক্ত বিশ্লেষণ কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ে। তবু দেখা যাক করাতের গায়ে লেগে থাকা ভাল লাগার স্নিগ্ধ শিশির হাতে মেখেও নিরাসক্ত ছুতোর হতে পারি কিনা!

একথা বাঙালি মনস্বী পাঠকমাত্রেরই জানা ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে পরিচয় পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। কিন্তু কেন হঠাৎ এই পত্রিকার প্রকাশ? এর প্রেক্ষিত নিহিত ছিল ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩৩৫ সাল) রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়ে তাঁর বিদেশ গমনের মধ্যে। হিরণকুমার সান্যাল জানিয়েছেন: "সুস্থ দেহে তিনি দেশে ফিরলেন বিদেশী ছাঁচে-ঢালা মনের ওপর বিদেশী সমাজ ও সংস্কৃতির পালিশ লাগিয়ে ও মাতৃভাষাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাহিত্য-সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে'।[১] সেখান থেকে ফেরার পরে তাঁর ইচ্ছে হ'ল- ইংরেজি বা ফরাসি 'রিভিউ'-এর আদলে একটি উচ্চমার্গের সাময়িকপত্র প্রকাশের। মূল উদ্দেশ্য 'বিশ্বের পরিশীলন-সম্পদের সহিত বাঙালী পাঠকের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন।'[২] এ বিষয়ে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন,

"এ যুগের আধুনিকতম চিন্তাধারার সঙ্গে এ দেশের চিন্তাশীলদের চিন্তা-সংযোগ"

গড়ে তোলার জন্য 'ফরাসীদের একখানি প্রসিদ্ধ রিভিউয়ের অনুরূপ' সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করে তিনিও সুধীন্দ্রনাথের পত্রিকা-প্রকাশের উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন।[৩]

বন্ধু গিরিজাপতি ভট্টাচার্য লোকবল সংগ্রহ করে দিলেন। নীরেন্দ্রনাথ রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর আগ্রহেই যুক্ত হলেন এই উদ্যোগের সঙ্গে। নীরেন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় পরিচয়ের প্রথম সংখ্যা থেকেই যুক্ত হলেন সুশোভন সরকার ও বিষ্ণু দে, আর দ্বিতীয় সংখ্যার প্রস্তুতি পর্বে যোগ দিলেন শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ও হিরণকুমার সান্যাল। জানা যায়, 'লোকবল সংগ্রহের পর উদ্যোক্তারা পত্রিকার একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠন করেছিলেন। পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনার সঙ্গে প্রথম থেকে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে চারু দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও গিরিজাপতি ভট্টাচার্য এই আটজনকে নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়েছিল।'[৪] স্থির হয়েছিল 'এই মণ্ডলীর কাজ হবে কাগজটির আকৃতি-প্রকৃতি নির্ধারণ ও বিশেষভাবে ছাপার জন্যে লেখা নির্বাচন। আরো ঠিক হল সম্পাদক মণ্ডলীর নিয়মিত অধিবেশন হবে সপ্তাহের নির্দিষ্ট এক দিনে। ক্রমে এক অধিবেশনই পরিণত হল পরিচয়-গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক বৈঠকে।'[৫]

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের ডায়েরি থেকে জানা যায় সুরেন মৈত্র, আবু সৈয়দ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত মহলানবীশ, প্রমথ চৌধুরীও একাধিকবার পরিচয়ের সভায় উপস্থিত থেকেছেন। সেই যুগের তরুণদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনীশ ঘটকও মাঝে মাঝে আড্ডায় হাজির হতেন।

একথা স্থির হয়েছিল পরিচয় তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হবে। সেইমতো "পরিচয়" ত্রৈমাসিকের প্রথম প্রকাশ বাংলা ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। 'প্রথম সংখ্যার মলাটে ছিল, গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের সুন্দর হস্তলিপিতে "পরিচয়" নামটি।'[৬] জানা যায় পত্রিকার নামটি নীরেন্দ্রনাথ রায় করেছিলেন। প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় এই নামকরণের বিশদ ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছিলেন।

ত্রৈমাসিক পরিচয়ের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালে শ্রাবণ মাসে (জুলাই-আগস্ট, ১৯৩১)। প্রথম সংখ্যাতেই চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। কালি - কলম, কল্লোল, সবুজপত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুধীন্দ্রনাথের "কাব্যের মুক্তি", সত্যেন্দ্রনাথ বসুর "বিজ্ঞানের সঙ্কট", হেমেন্দ্রলাল রায়ের "হিন্দুস্থানী বাংলা গান", প্রবোধচন্দ্র বাগচীর "বৌদ্ধধর্মের দান, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'শিল্পীর ব্যথা', হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ধারাবাহিক প্রবন্ধ "যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ", সুশোভন সরকারের "রুশবিপ্লবের পটভূমিকা", ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গল্প, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা। এছাড়া আটজন সমালোচক সমালোচনা করেন ২৩টি বইয়ের।

প্রথম পাঁচ বছর (১৩৩৮-১৩৪৩) পরিচয় ছিল ত্রৈমাসিক পত্রিকা; তারপর এটি মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম থেকেই পরিচয় নামী পত্রিকার ভিড়ে নিজেকে চিনিয়েছিল। কোথায় ছিল এর অভিনবত্ব? এর উত্তর পাওয়া যায় হিরণকুমার সান্যালের মন্তব্যে। তিনি লিখেছেন : 'পরিচয় যে একেবারে প্রথম থেকে বিশিষ্ট পত্রিকা ব'লে খাতি পেয়েছিল তা প্রধানত এই "পুস্তক-পরিচয়" বিভাগের জন্যে। এর আগে বাংলাদেশের কোন পত্রিকা সমালোচনা- সাহিত্যকে এতটা সম্মানের আসন দেয়নি।"[৭] অবশ্য জানা যায় যে কল্লোল 'প্রাপ্ত পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়' শিরোনামে একটি বিভাগ ছিল। আর অমিয় ধরের কথায়,"প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার দানগুলির সঙ্গে" বাঙালি পাঠকের পরিচয় সাধন এবং "কূপমাণ্ডুক্য ও গ্রাম্যতামুক্ত" মননশীলতার চর্চাই পরিচয়-এর প্রথম দশ বছরের সংখ্যাগুলিকে সমসাময়িক অন্য সব পত্রিকা থেকে বিশিষ্টতা নিয়েছিল। "কবিতা, কথাশিল্প, নাটক, কলানুশীলন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব পরিশীলনের সকল বিভাগগুলিই' যাতে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে সে বিষয়ে সম্পাদক ও তাঁর লেখকগোষ্ঠী সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন।'[৮]

সুধীন্দ্রনাথ বারো বছর (শ্রাবণ ১৩৩৮-১৩৫০) পরিচয়-এর সম্পাদক ছিলেন। এগারো বছরে "পরিচয়" পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথের ১৪টি কবিতা, ১০টি প্রবন্ধ ৮টি বিদেশি গ্রন্থ ও ৪টি বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৫০-এর শ্রাবণ মাস থেকে সুধীন্দ্রনাথ "পরিচয়"-এর সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু কেন এই আত্ম প্রত্যাহার? এ সম্পর্কে কিছু তথ্য মেলে গবেষক নিরঞ্জন হালদারের লেখায়। তিনি জানিয়েছেন : 'সম্পাদক কেন "পরিচয়" সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হলেন, এবং শেষ পর্যন্ত পত্রিকাটি বিক্রি করে দিলেন, তার ব্যাখ্যা এই নয় যে, তিনি অন্য কাজে বেশী ব্যস্ত থাকতেন। পরের দিককার পত্রিকার সূচীপত্র দেখলেই এই অনুমান প্রমাণিত হবে যে, যে-উদ্দেশ্যে সুধীন্দ্রনাথ "পরিচয়" পত্রিকা বের করেছিলেন, পরিচয় সেই উদ্দেশ্য পূরণ করছে না। প্রথম বছরের সঙ্গে ৮ম বর্ষের পুস্তক পরিচয়ের সূচীপত্র তুলনা করলেই তা প্রতীয়মান হবে। ৮ম বর্ষে সুশোভন সরকার সমালোচনা করেছেন কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল বইটির, অমিয় গঙ্গোপাধ্যায় সমালোচনা করেছেন রেবতী বর্মণের হেগেল ও মার্কস, সাম্রাজ্যবাদের সংকট, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর মার্কসের অর্থনীতি, সুকুমার মিত্রের রাশিয়ার রূপান্তর এবং রেজাউল করিমের জাগৃহি। নবম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সুশোভন সরকার সমালোচনা করেছেন রেবতী বর্মণের মার্কস প্রবেশিকা, রবি রায়ের মার্কসীয় দর্শন, সুধাংশু দাশগুপ্তের বিপ্লবী চীন।

সম্পাদকের অবস্থা হয়েছিল সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মতো। প্রেসে লেখা পাঠানোর আগে তা সম্পাদককে দেখানোর ব্যবস্থা উঠেই গিয়েছিল। ১৯৪১ সালের ১ নভেম্বর ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা সুধীন্দ্রনাথের চিঠিটি স্মরণীয় : "আমার মতো অন্নদাশঙ্করের চুটকি লেখাটার বিষেয়ে তোমরা সকলেই অবিচার করেছ। ওটা হালকা বলেই লেখা। তবু ওর মোদ্দা কথা

আমার বিচারে সত্য, অন্ততপক্ষে তার জবাবে লেখককে ব্যক্তিগত গালাগালি করলে হাবুল কুরুচির পরিচয় দিয়েছে। মামি আনা করেছিলাম, তাতে সে বলেছিল গালিগালাজ বাঁচিয়ে চলবে। কিন্তু লিখতে গিয়ে শাস্ত রসিকতার লোভ সামলাতে পারল না।”[৯]

তাঁর সময়কাল পর্যন্ত এই পত্রিকা পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে এটি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ঘটনাটির ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকায় ছিলেন অধ্যাপক সুশোভন সরকার। এ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং জানিয়েছেন: ‘সম্ভবত ১৯৪৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশনা আমার মাধ্যমে “পরিচয়” নিয়েছিল, ঠিক হল মাসে মাসে কিস্তিতে সুধীনকে দাম দিতে হবে, টাকাটাও যেত, আমার হাত দিয়ে। ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিস্ট অনুরাগীদের প্রতিষ্ঠান, সুতরাং প্রকারান্তরে পরিচয় এসে পড়ল পার্টির আয়ত্তে।”[১০]

পরবর্তী সম্পাদকদের মধ্যে গোপাল হালদারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কখনো যুগ্ম সম্পাদক কখনো একক সম্পাদকের ভূমিকায় তিনি নির্বাহ করেছেন। ১৩৫১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ (১৯৪৪ খ্রি.) থেকে ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় (১৯৬৭ খ্রি.) পর্যন্ত। তবে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের পৌষ থেকে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত প্রায় তিন বছর তিনি বিচ্ছিন্ন থেকেছেন। সেই দিক থেকে বিচার করে বলা যায়, সম্পাদনার কার্যে প্রায় কুড়ি বছর ধরে তিনি যুক্ত ছিলেন “পরিচয়” পত্রিকার সঙ্গে। এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে তাঁর সঙ্গে সহযোগী রূপে সংযুক্ত হয়েছেন আরও অনেকে। শ্রাবণ ১৩৫১ থেকে ১৩৫৫ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় অবধি গোপাল হালদারের সঙ্গে হিরণকুমার সান্যাল যৌথভাবে সম্পাদনার কাজ করেছেন। তখন পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন আবু সৈয়দ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, চিন্মোহন সেহানবীশ, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্রের মতো ব্যক্তিত্ব। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন গোলাম কুদ্দুস ও সরোজকুমার দত্ত। এরপর ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুশীল জানা যৌথভাবে, পরে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এককভাবে সম্পাদনার কাজ করেছেন। অবশ্য ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা অবধি গোপাল হালদারের সঙ্গে ননী ভৌমিক সম্পাদনার কাজ করেছেন। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার পরে গোপাল হালদারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ১৩৭২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা থেকে সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন গোপাল হালদার এককভাবে। ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত ৩৬ বর্ষ ১২ সংখ্যা অবধি ছিল সম্পাদক হিসেবে তাঁর কার্যসীমা। শেষ পর্যায়ে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে সংযুক্ত হন। সম্পাদকমণ্ডলীতে যুক্ত হন বিনয় ঘোষ, সুশোভন সরকার, অমল দাশগুপ্ত প্রমুখ। হিরণকুমার সান্যাল ও গোপাল হালদার সম্পাদনার ভার গ্রহণের পর চতুর্দশ বর্ষের সমস্ত সংখ্যা নাটক নিয়ে পর্যালোচনা ও সমালোচনা প্রবন্ধ একপ্রকার নিয়মিত জায়গা করে নিয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণে

লেখক ছিলেন কালিদাস রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। এই সময়কালে ১৭তম বর্ষে শম্ভু মিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়, সেটি হল- "বাংলা রঙ্গমঞ্চের সংকট"। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে ১৭ বর্ষের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত "মহাত্মা গান্ধী" শীর্ষক প্রতিবেদন। সেকালে এই রচনাটি প্রবল সাড়া জাগিয়েছিল।

এর পর যাঁরা পরিচয় পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অন্যতম। কমিউনিস্ট পার্টির একজন সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে, পার্টিরই নির্দেশে তিনি পরিচয়-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম সম্পাদক হিসেবে ঘোষিত হয় ২০ বর্ষের ২ খণ্ড ৩-৪ (চৈত্র-বৈশাখ ১৩৫৭-৫৮) সংখ্যা থেকে। প্রথম পর্বে সুভাষ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ২২ বর্ষের প্রথম খণ্ডের ৪ (কার্তিক ১৩৫৯) সংখ্যা পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্বে যখন সম্পাদনার দায়িত্ব নেন তখন "পরিচয়" সাঁইত্রিশ বছরে পদার্পণ করেছে, তাঁর নিজের বয়স আটচল্লিশ। দুই পর্বের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান প্রায় পনেরো বছর। কিন্তু স্বল্পস্থায়ী সেই সম্পাদনার কালটিও নানা ভাবে বিড়ম্বিত হয়েছিল। তাই বর্ষপূরণের পূর্বেই তিনি আত্মপ্রত্যাহারে বাধ্য হন।

সুভাষের সম্পাদনাকালে প্রথম পর্বে পরিচয় বিংশ বর্ষের শেষ তিনটি সংখ্যা, একবিংশ বর্ষে বারোটি এবং দ্বাবিংশ বর্ষে তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংখ্যাগুলির সূচিপত্রে অনুসরণ করলে বোঝাই যায়, তাঁর একনিষ্ঠ চেষ্টা ছিল নতুন নতুন লেখকদের পাদপ্রদীপের সামনে তুলে আনা। এই সময় নাজিম হিকমতের কবিতা অনুবাদ তাঁর নিজের সাহিত্য ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে একটা বড়ো রকমের ঘটনা একথা অনস্বীকার্য।

সুভাষের সম্পাদনা কালে যাঁরা সমাজতন্ত্রের যোদ্ধা তাদের সঙ্গে পরিচয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। দেশের মাটিতে শুধু পা রেখে নয়, হাত লাগিয়ে, করতে ফুলিয়ে তুলবার প্রয়োজন দেখা দিল। সুভাষ এই কাজে নেমে পরিচয়কে হাতিয়ার করে তুলতে মনোযোগী হয়ে বুঝেছিলেন, "সে কাজ করবার মতো তৈরি পাকা হাত খুব বেশি ছিল না। তার উপযুক্ত নতুন লেখক পরিচয়কে তৈরি করে নিতে হয়েছিল। প্রথম পর্বে "পরিচয় ছিল কাজের আন্দোলন", দ্বিতীয় পর্বে পরিচয় হল "দোলনের কাজ।" এ পর্বের পরিচয়কে নিজের পথ নিজেকেই তৈরি করতে হয়েছে। তিনি পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করে নতুন লেখক তৈরির দুরূহ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। পাশাপাশি পত্রিকাটি বিন্যাস ও রচনা নির্বাচনে একটা অভিনবত্ব প্রদর্শন করে পাঠক সমাজে যাতে পত্রিকাটি সমাদৃত হয় তার আন্তরিক চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

সুভাষের পরবর্তীকালে, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৮ সাল থেকে) পরিচয় পত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেন। সঙ্গে ছিলেন তরুণ সান্যাল। তিনি যখন পত্রিকার সম্পাদক হন তখন বাজারি পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের পরিসরে জাঁকিয়ে বসেছে। অধিকাংশ লেখক

বাজারের চাহিদার কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর চলা শুরু হল স্রোতের প্রতিকূলে। নিজে পার্টির প্রতি নিবেদিত হলেও সাহিত্যের পরিসরে পার্টির খবরদারির তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। এর প্রমাণ পাওয়া যায় পরিচয় পত্রিকায় তাঁর "ঘাম" শীর্ষক গল্পটি প্রকাশের ঘটনায়। গোপাল হালদার তখন সম্পাদক। গল্পটিতে অস্তিত্ববাদী দর্শনের ছাপ দেখে কট্টরপন্থীর দল সোচ্চার হন। সে যাত্রায় উদারপন্থী জ্যোতি বসুর বদান্যতায় তাঁর রেহাই মেলে। পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এই উদার মনোভাব অব্যাহত থাকে। তা-ই তো মহাশ্বেতা দেবীর "দ্রোপদী", অসীম রায়ের "ভ্যাবাচাকা", সমরেশ বসুর "উৎপাত" ইত্যাদির মতো বিরুদ্ধবাদী গল্প তখন পরিচয় পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

পরিচয়ের১৯৭৭সালে (বর্ষ ৪৬,সংখ্যা১২)র জুলাই সংখ্যাটি সম্পাদক হিসেবে দীপেন্দ্রনাথের অসামান্য যোগ্যতার পরিচয়বাহী। তখন বাংলার বামপন্থী আন্দোলনে নানা জট। সি পি আই, সি পি এম, সি পি আই (এম এল) ইত্যাদি। সব মিলিয়ে বামপন্থী আন্দোলন তখন অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি। সি পি আই তখন কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল। আবার সি পি এম এবং কংগ্রেস ছিল যুযুধান। নকশালদের সঙ্গে সি পি এম দলের অহি-নকুল সম্পর্কের কথা তো সর্বজনবিদিত। এই উত্তাল দ্বন্দ্বমুখর রাজনৈতিক সময়কে ধরা ছিল আশু কর্তব্য। একমাত্র পরিচয় যে সে-দিন সে-ই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল তার পশ্চাতে ছিল দীপেন্দ্রনাথের অসামান্য নেতৃত্ব। তিনি সে-ই সংখ্যায় নির্মল বসু থেকে শিবানীশংকর চৌবে, সৌরেন ভট্টাচার্য, অজয় দাশগুপ্ত, গৌতম ভদ্র এরকম স্বনামধন্য ব্যক্তিদের দিয়ে লিখিয়েছিলেন যাঁদের অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টির লোক নন। নির্মল বসু, ফরওয়ার্ড ব্লকের এম এল এ। তিনি তো সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তব্যকে হাতিয়ার করে কমিউনিস্ট পার্টির সে-কালের অবস্থানকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন তাঁর প্রতিবেদনে। সেকালের ভারতে প্রকৃতই কাদের বামপন্থী বলা হবে তা সেখানে তিনি নিজের মতো করে বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করছেন। এই সংখ্যাই প্রমাণ করে তিনি গোঁড়া কমিউনিস্ট ছিলেন না। এই মানসিক প্রসারতা পরিচয় আজও বহন করে চলেছে। সম্পাদক হিসেবে দীপেন্দ্রনাথের আরেকটি বড় কৃতিত্ব ছিল ১৯৭৫ সালে পরিচয়ের ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংখ্যা প্রকাশ। তখন তাঁর দলের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। দলের মতামতের বিরুদ্ধে গিয়ে এই সংখ্যা প্রকাশ তাঁর অলোকসামান্য চারিত্রশক্তিরই পরিচয়বাহী।

দীপেন্দ্রনাথের অকাল প্রয়াণের পর কথাশিল্পী দেবেশ রায় পরিচয় পত্রিকার হাল ধরেন। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৫, সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত একটানা ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকায়। তাঁর সম্পাদনায় পরিচয় প্রকাশ করে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা। পরবর্তী সংখ্যাটি ছিল কবি বিষ্ণু দে-র সপ্ততিবর্ষ পূর্তি সংখ্যা। পূর্বসূরি দীপেন্দ্রনাথের মতো দেবেশ রায়-ও ছিলেন উদারপন্থী। মার্কসবাদের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর ছিল বহুযোজন দূরত্ব। তাই তো কট্টর মার্কসবাদের সমালোচনায় মুখর থিওডর অ্যাড্রেনোর

বিতর্কিত উপন্যাস "কমিটমেন্ট"এর অনুবাদ এবং প্রকাশ তিনি অনায়াসেই করতে পেরেছিলেন। গোপাল হালদারের উপর একটি সংখ্যা ১৯৮০ সালে তাঁর সম্পাদনায় পরিচয় পত্রিকাগোষ্ঠী প্রকাশ করে। ১৯৮১ সালে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পরিচয় সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা। এছাড়া ১৯৮২সালে তাঁর সম্পাদিত পরিচয় পিকাসো সংখ্যা এবং ১৯৮৪ সালে তাঁর সম্পাদিত কার্ল মার্কস সংখ্যাটি অনেকের আজও স্মৃতিধার্য হয়ে আছে।

কথাশিল্পী দেবেশ রায় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর ১৯৮৬ সালের মার্চ সংখ্যা থেকে কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত পরিচয় পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। তিনি প্রথম সম্পাদকীয়তেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন পরিচয় পত্রিকার উদ্দেশ্য : 'পরিচয় নিছক একটি সাহিত্য-পত্রিকা না হয়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সার্বিক আন্দোলন হয়ে উঠতে চেয়েছে'। [১১] এই সচেতনতা থেকে তিনি সে-ই অভিমুখে নিজস্ব কর্মধারাকে প্রসারিত করেছেন। মানসিকতার দিক থেকে তিনি দীপেন্দ্রনাথের উদারপন্থী ধারার অনুসারী ছিলেন। এর প্রমাণ মেলে পরিচয় তাঁর সম্পাদনায় সুভাষচন্দ্রের শতবার্ষিকী সংখ্যা প্রকাশ করলে। যে কমিউনিস্ট "পার্টি একদা নেতাজীকে "তোজোর কুকুর" বলে অভিহিত করেছিল সেই দল নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা পরিচয় সে-ই তাঁকে নিয়েই সংখ্যা প্রকাশ করল ভাবতেই আশ্চর্য বোধ হয়!

অমিতাভ দা'শগুপ্তের আকস্মিক প্রয়াণের পর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কৃতী অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য পরিচয়ের সম্পাদক নিযুক্ত হন (নভেম্বর২০০৭- এপ্রিল ২০০৮)। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত পরিচয়ের প্রথম সংখ্যাটি হল অমিতাভ দাশগুপ্ত সংখ্যা। এখানে যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুমিতা চক্রবর্তী, হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত পরিচয় বিভিন্ন সময়ে সুশীল জানা, আশপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। সব মিলিয়ে বলব :

'বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের সম্পাদনাকালে "পরিচয়" নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। সে সবের কিছু পরিচয় এই আলোচনায় দেবার চেষ্টা করা হলো। এ কথাই তিনি বিশ্বাস করেন যে, "এই পত্রিকা কোনোদিনই ব্যক্তিগত মুনাফা লক্ষ্যে প্রকাশিত হয়নি, এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুখপত্র। এই থেকে পরিচয় এ সময়ে বিচ্যুত হয়নি, এ কথা প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলা যায়'।[১২]

এই অধ্যায় সম্পর্কে আমার নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে। কারণ, প্রথমত, অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য আমার শিক্ষক। আমি তাঁকে যেভাবে জানি খুব কম জনই তাঁকে সেভাবে জানেন। দ্বিতীয়ত, তিনিই আমাকে হাতে ধরে পরিচয় পত্রিকার দপ্তরে নিয়ে আসেন। ওনার পরিচয় পত্রিকার পুরো সময়টাই আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। তখন প্রয়াত কথাশিল্পী কার্তিক লাহিড়ী ছিলেন সভাপতি। এছাড়া অভ্র ঘোষ, সাধন চট্টোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম কুণ্ডু, অমিতাভ চক্রবর্তী, সুমিতা চক্রবর্তী, অনিল ঘোষ প্রমুখ ছিলেন। কোনোদিন কারও সঙ্গে মনান্তর ঘটতে দেখিনি। তিনি যৌথ দায়িত্বে ছিলেন আস্থাবান। ফলে তাঁর সম্পাদনায় পরিচয় নিজস্ব দীপ্তি ফিরে পেয়েছিল। তিনি জানতেন পত্রিকাকে জীবিতবান রাখতে হলে

নতুন রক্ত প্রবাহিত করতে হবে। সেদিকে লক্ষ রেখে তিনি অনেক তরুণকে সুযোগ দিয়েছেন। প্রতিভাকে লালন করেছেন।

এতো গেল বিগত কালের কথা। এবার ফিরে আসি বর্তমানের কথায়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য স্যার সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে আত্মপ্রত্যাহার করেন। সময়টা ছিল ২০১৮ সালের অক্টোবর মাস। জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যার পর দায়িত্ব গ্রহণ করেন অধ্যাপক, সুলেখক অভ্র ঘোষ। নভেম্বর ২০১৮ থেকে জানুয়ারি ২০১৯ ছিল তাঁর সম্পাদনায় পরিচয়ের প্রথম প্রকাশ। সে-ই সংখ্যার বিষয় ছিল বই : পাঠ ও নির্মাণ। শ্রী অভ্র ঘোষকেও পরিচয়ের দপ্তরে দেখছি বহুকাল ধরে। তিনিও আমার শিক্ষক। একথা অনস্বীকার্য যে অভ্রবাবু আমার শিক্ষক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের মতোই বহুপ্রজ। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সম্পাদক। কোন বিষয় কাকে দিয়ে লেখাতে হবে তা তিনি ভালোই জানেন। নতুন লেখক আবিষ্কারে তিনিও সিদ্ধহস্ত।

ইতিমধ্যে অধ্যাপক ঘোষ এবং যুগ্ম সম্পাদক পার্থপ্রতিম কুণ্ডুর যৌথ প্রচেষ্টায় পরিচয়ের নতুন যৌবন প্রাপ্তি ঘটেছে। বিশ্ববন্ধুবাবুর সময় থেকে পরিচয়ের ঘুরে দাঁড়ানোর সূচনা। আর অভ্র ঘোষের নেতৃত্বে তার পূর্ণতম সিদ্ধি। আশা করি পরিচয় তাঁর পূর্ব খ্যাতি অচিরেই ফিরে পাবে। ফ্রান্সের সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ যেমন প্যারিস রিভিয়্যু তেমনই বাঙালি নাগরিক সংস্কৃতির হৃদপিণ্ড পরিচয় পত্রিকা। তা-ই তার দাপটে বেঁচে থাকা খুবই জরুরি। তা-ই নয় কী! হে, সুধী পাঠক সমাজ,আপনারা কী বলেন? লক্ষ্যনীয়, কল্লোল, কালি-কলম একটা ধারা তৈরি করেছিল, বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। 'পরিচয়' আজও সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিচায়ক। সময়ের স্রোতে তার গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র ঃ

১) সান্যাল হিরণকুমার : পরিচয় এর কুড়ি বছর/পৃ.৩
২) দত্ত সুধীন্দ্রনাথ : "সবিনয় নিবেদন", "পরিচয়" বৈশাখ ১৩৩৮
৩) রায় অন্নদাশঙ্কর : পরিচয়, মে-জুলাই, ১৯৮১,পৃ. ২৬
৪) ধর অমিয় : পরিচয় ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, পরিচয়,মার্চ-জুন ২০২২,পৃষ্ঠা
৫) সান্যাল হিরণকুমার : পরিচয়-এর কুড়ি বছর/পৃষ্ঠা ১০
৬) সরকার সুশোভন : পরিচয়, মে-জুলাই, ১৯৮১,পৃ ২
৭) সান্যাল হিরণকুমার : পরিচয়-এর কুড়ি বছর/পৃ. ২৩
৮) ধর অমিয় : পরিচয় ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, পরিচয় ৯০ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২০২২,পৃষ্ঠা ২১-২২
৯) হালদার নিরঞ্জন : সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পরিচয় ছাড়লেন কেন? http-www.sristisadhan.com
১০) সরকার সুশোভন : পরিচয়, মে-জুলাই ১৯৮১
১১) দাশগুপ্ত অমিতাভ : ভূমিকা, পরিচয়,মার্চ,১৯৮৬
১২) ঘোষাল প্রিয়ব্রত : পরিচয় : বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের সম্পাদনাপর্বে, পরিচয়, ৯০বছর পূর্তি সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৮৫

বুদ্ধদেব বসু ও ‘কবিতা’ পত্রিকা

সু ম ন গু ণ

বুদ্ধদেব বসু ‘প্রগতি’ পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ সংখ্যায় লিখেছিলেন, “অধুনা বাংলা সাহিত্যে একটা পরমবিস্ময়কর ও অভিনব movement শুরু হয়েছে, একথা আমরা বিশ্বাস করি’। অন্য সূত্রে কথাটি বলা, কিন্তু আমার বরাবরই ‘কবিতা’ পত্রিকার প্রকাশপর্বের সঙ্গে মিলিয়ে এই কথাটি পড়তে ইচ্ছে করে। এই ‘কবিতা’ পত্রিকা প্রকাশের মূলে ছিল কবিতাকে ‘সসম্মানে’ ‘সুনির্বাচিত’ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছে। বুদ্ধদেব নিজেই ‘সসম্মানে’ আর ‘সুনির্বাচিত’ কথাদুটি ‘লক্ষ’ করতে বলেছিলেন। ‘কবিতা’র প্রতিটি সংখ্যাই বাঙালি পাঠককে প্রায় তিন দশক ধরে এই কথাদুটির সামর্থ্য বিশেষভাবে লক্ষ করতে বাধ্য করেছে।

‘কবিতা’র চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কবিতার পত্রিকা বাংলায় যে আর ছাপা হয়নি তার কারণও চিহ্নিত করছে ওই দুটি শব্দ। বিশেষ করে কবিতার নির্বাচনে বুদ্ধদেব সবসময়ই সফলতম লেখাটির জন্য উৎসুক থাকতেন। একটি কবিতা বা গদ্যের স্বাধীন পর্যটনটুকুই তাঁর নজরে থাকতো, প্রয়োজনে সেই যাত্রাপথটিকে সম্ভাব্য গন্তব্যে পৌঁছে দেবার মেধাবী ও পরিশ্রমী দায়িত্বটুকুও তিনি সানন্দে পালন করতেন।

এই চিরজাগ্রত মনোযোগেরই ফসল তিরিশ-চল্লিশ দশকের বাংলা কবিতা। সেই সময়ের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ কবিকে লালন করেছে ‘কবিতা’ পত্রিকা। লালন শব্দটি সর্বার্থেই গ্রহণযোগ্য। শুধু কবিতা ছাপিয়ে বুদ্ধদেবের দায়িত্ব শেষ হয়ে যেত না, পছন্দের কবিকে নিয়ে একের পর এক গদ্য লেখায় তাঁর কোনও ক্লান্তি ছিল না। ‘কবিতা’ পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বাংলা কবিতার কয়েকটি দশকের যা কিছু ঐশ্বর্য, সব স্পর্শ করার অভিজ্ঞতা হয়।

মনে রাখতে হবে, তখনও বিস্ময়করভাবে সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেবের সারা জীবনের স্বাগত আশ্রয়। ‘কবিতা’ পত্রিকা বের হবার পর বুদ্ধদেব ভয়ে ভয়ে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। লিখেছিলেন তিনি, ‘... ভয় এজন্যে নয় যে আমাদের ক্ষুদ্র উপচার তাঁর পছন্দ হবে না— সেটা প্রায় প্রত্যাশিত বলা যায়, পাছে, তাঁর অসামান্য সৌজন্য ও কর্তব্যবোধের তাগিদে, তিনি লিখে পাঠান কোনো দায়সারা গোছের সার্টিফিকেট, অথবা তাঁর ঝুলি হাৎড়ে বের ক’রে দেন দু-চার লাইনের কোনো পদ্য-বিন্যাস ...। কিন্তু আমাদের সব দ্বিধা উড়িয়ে দিয়ে দ্রুত এল তাঁর উত্তর— মস্ত একখানা তুলোট কাগজের এপিঠ -ওপিঠ ভর্তি সেই অনিন্দ্যসুন্দর হস্তাক্ষর, যার তুলনা আমি দেখেছিলাম বহুকাল পরে অক্সফোর্ডে এক প্রদর্শনীতে টেনিসন ও রবার্ট ব্রিজেসএর পাণ্ডুলিপিতে, উপরন্তু এল তাঁর আনকোরা নতুন লম্বামাপের গদ্য-কবিতা ‘ছুটি”...’। ‘কবিতা’র দ্বিতীয় সংখ্যা শুরু হয়েছিল এই ‘ছুটি’ কবিতা দিয়েই।

রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন, রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতারও যোগ্যতম আশ্রয় হয়ে

উঠল 'কবিতা' পত্রিকা। সেই সময়ের সফলতম লেখকেরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন 'কবিতা' পত্রিকার সঙ্গে। বুদ্ধদেব নিজেই লিখেছিলেন, "... সে সময়কার ঘনিষ্ঠতম সাহিত্যিক বন্ধু প্রেমেন আমার সঙ্গী, প্রধান উৎসাহদাতা বিষ্ণু দে আর সমর সেন" (আমাদের কবিতাভবন)। সমর সেনও বুদ্ধদেবের সঙ্গে পরিচয়ের পর্ব প্রসঙ্গে লিখেছেন : "বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে আলাপ গভীর হতে সময় লাগেনি। শেষ পর্যন্ত তাঁর আড্ডার কেন্দ্রস্থল হল কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। ত্রৈমাসিক 'কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৩৫-এ। যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেববাবু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, আমি সহকারী সম্পাদক। পাঁচজন পাঁচটাকা করে চাঁদা দিয়ে 'কবিতা'র সূত্রপাত। প্রেমেনবাবু অলস প্রকৃতির লোক, দ্বিতীয় বছরে আমি যুগ্ম সম্পাদক হই, কিন্তু সম্পাদন, প্রকাশন, টাকাকড়ির হিসেবনিকেশ সমস্ত কিছু করতেন বুদ্ধদেববাবু"। তথ্য হিসেবে এখানে জানানো যায়, প্রথম দু'বছর সম্পাদক হিসেবে নাম ছিল বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও, সমর সেন ছিলেন সহকারী সম্পাদক। পরের তিন বছর সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন। তারপর থেকে নাম ছাপা হত শুধুই বুদ্ধদেব বসুর। প্রথম সংখ্যার কবিদের নামের তালিকা তুলে দিলেই বোঝা যাবে কী উদ্দীপনাময় সুচনা ছিল এই পত্রিকার : বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অজিতকুমার দত্ত, প্রণব রায়, স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচি। বুদ্ধদেবের সঙ্গে যে কোনও লেখকের সম্পর্কের মূল ভর ছিল লেখালেখি। জীবনানন্দ থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য পর্যন্ত সমস্ত লেখকের মৌলিক প্রবণতাগুলি ধরে ধরে আলোচনা করেছেন তিনি 'কবিতা' পত্রিকায়। যাকে যে কারণে পছন্দ হয়েছে বা হয়নি, জানিয়েছেন সরাসরি। জীবনানন্দকে নির্জনতম কবি বলেছেন, যে-বিশেষণের রাজকীয় গরিমাটুকু আজ আমরা স্বেচ্ছায় তুচ্ছ করতে শিখছি। সুকান্তর প্রয়াণের পরে যে নিদারুণ লেখাটি লিখেছিলেন তিনি, সেখানে সুকান্ত সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ আর নিরুপায় অনুযোগের কথা সমান আবেগের সঙ্গে জানিয়েছেন। 'পদাতিক'-এর পরে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে 'কাব্যের ক্ষেত্রে আর কিছু করলেন না' বললেন তিনি, তা থেকে বোঝা যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দ্রুত, তৎপর আর সকৌতুক চলনটি মনে ধরেছিল তাঁর, কথার প্রত্যক্ষ আক্রমণ টের পেতেই চাননি। প্রায় এক যুগ পরে, 'কালের পুতুল'-এর ১৯৫৮ সংস্করণের ভূমিকায় নিজের পুরনো লেখাগুলির দিকে ফিরে তিনি জানাচ্ছেন, "লজ্জিত হয়েছি নিজের অমনোযোগে, যখন দেখেছি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুখে' পংক্তিটিতে 'কুয়াশা'র সঙ্গে 'কঠিনে'র ও পূর্বোক্ত 'কমরেডে'র সঙ্গে বাসরের অসংগতি আমি লক্ষ্যই করিনি..."। শব্দ আর নীরবতার মধ্যে যে গরিমাময় সম্পর্ক, তাকে সর্বস্ব দিয়ে স্পর্শ করতেন তিনি। সুকান্ত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তাই আলাদাভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। লিখেছিলেন তিনি, "ভালো লাইন সে মাঝে মাঝেই লিখেছে; ছন্দে ভুল নেই, হাতের লেখা সুন্দর, যা বলতে চায় স্পষ্ট করেই বলে..."। বলার এই একরোখা স্বচ্ছতার জন্যই সুকান্তের লেখা

মনে ধরেছিল তাঁর, এখানেও বিষয়ের প্রতিবাদী উদ্দামতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েই ছিলেন তিনি। বরং লিখলেন, “রাজনৈতিক পদ্য লিখে শক্তির অপচয় করছো তুমি, তোমার জন্য দুঃখ হয়”। লক্ষণীয় ‘পদ্য’ শব্দটি। যে-লেখার বিষয় রাজনীতি, তাকে কবিতা বলতে অসুবিধে ছিল তাঁর। তাঁর ‘কবিতা’ সম্পাদনা পর্বে কত কাণ্ড ঘটে গেছে বাংলায়— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ আর স্বাধীনতা। বুদ্ধদেব কিন্তু তাঁর মায়াবী টেবিল ছেড়ে ওঠেননি, ‘সভ্যতা ও ফ্যাসিজম’ আর ‘সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্পসংস্কৃতি’ নামে দ্রুতপাঠ্য দুটি পুস্তিকা বেরিয়েছিলো তাঁর এই সময়, কিন্তু ‘কবিতা’কে সযত্নে এসবের বাইরে রেখেছেন। এমন কি তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ-পরিচিতিতে ওই দুটি বইয়ের উল্লেখ পর্যন্ত করেননি।

অথচ সচেতন বাঙালি লেখকের ব্যস্ততম উদাহরণ ছিলেন তিনি। পল ভার্লেন থেকে দীনেশরঞ্জন দাশ এমনকি অজয় ভট্টাচার্য-হিমাংশু দত্তের মৃত্যু ‘কবিতা’ -সম্পাদককে আহত করত। সবাইকে নিয়েই লিখেছেন তিনি। দেশ বিদেশের কোনও গুরুত্বপুর্ণ লেখকই বোধহয় তাঁর উৎসুক ও উদ্যমী মনযোগের বাইরে ছিলেন না। এমনকি মানিক বন্দোপাধ্যায়কে নিয়েও লিখেছেন।। সুকান্ত প্রসঙ্গে যে আক্ষেপের কথা তিনি জানান, আশ্চর্যের কথা এই যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে সে কথা উহ্য রাখেন। বরং তর্কাতীতভাবে জানান যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা এইখানে যে “...প্রত্যক্ষ ও সমসাময়িকের মধ্যেই তিনি আজীবন শিল্পের উপাদান খুঁজছেন”।

আসলে, বুদ্ধদেব বসু কোন পূর্ব নির্ধারিত তাগিদ থেকে সাহিত্য বিচার করতেন না। জ্যোতির্ময় দত্ত এই প্রসঙ্গে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন : “সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর স্বাতন্ত্র্য এই যে তাঁর কোনও ইডিওলজি কি থিওরি নেই; আলোচ্য রচনা তাঁর কাছে একটি নতুন আবিষ্কার”। বুদ্ধদেব বসু যাঁদের লেখা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, তাদের নামের নিরীহ একটা তালিকা বানালেও এই কথাটির গুরুত্ব একদিক থেকে বোঝা যাবে। সুকুমার রায়, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে রিলকে থেকে হ্যান্স অ্যান্ডারসন বা জেরম —বোঝাই যায়, সাহিত্য বিচারে মন কতটা খোলা ছিল তাঁর। মায়াকোভস্কি বা পাস্তেরনাকের লেখার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের প্রসঙ্গের কথা এখানে মনে পড়বে। মায়াকোভস্কি প্রথম পড়ে তাঁর অস্থির প্রতিক্রিয়া : “... এই অত হট্টগোলের মধ্যেও বোঝা যায় লোকটা খাঁটি কবি। বলো তো কী জাদু আছে কবিতায়? বুক দুরদুর করে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, আর নিজেকে মনে হয় ব্যর্থ ব্যর্থ ব্যর্থ ব্যর্থ। এই মায়াকোভস্কির লেখা পড়তে হবে”। একজন লেখকের দুর্বলতাগুলো উহ্য রেখে তাঁর শক্তি টের পেয়ে তাঁকে শুধু বরণ করে নিলেন না, নিজের সম্পর্কে অতৃপ্তির সম্ভাবনাটুকুও প্রকাশ করলেন। এমনি আকস্মিক ছিল পাস্তেরনাকের লেখার সঙ্গে পরিচয়টিও। ‘ডক্টর জিভাগো’ কিনে এনে, “বাড়ি এসে প্রথমে কবিতাগুলো পড়লাম, তিনটি বা চারটি, অন্যগুলোর উপর দৃষ্টিপাত করলাম, তারপর আর পড়লাম না। যথেষ্ট, একবারের মতো এই যথেষ্ট, একটিই

যথেষ্ট। একসঙ্গে বেশি নেয়া যায় না, মনের উপর কবিতা যে-কাজ করবে তার জন্য সময় দিতে হয়"।

সাহিত্যপাঠের এই বিনীত ও অনুসন্ধানী মন নিয়ে 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। নিজে আলোচনা করা ছাড়াও নানাজনকে দিয়ে লেখাতে চেয়েছেন পছন্দের বই সম্পর্কে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে তাঁকে লেখা আবু সয়ীদ আইয়ুবের একটি চিঠি, যেখানে বলছেন আইয়ুব: "আমি তো 'গ্রহণের' সমালোচনা লিখতে স্বীকৃত হইনি, আপনার আদেশ বা অনুরোধ নীরবে শুনে গিয়েছিলাম মাত্র"। যে তাগিদে নানাজনকে 'আদেশ বা অনুরোধ' করেছেন বুদ্ধদেব সমর সেনের কবিতা নিয়ে আলোচনার জন্য, সেই তাগিদে তিনি নিজে কবিতায় লিখেছেন 'কয়েকটি কবিতা' (আশ্বিন, ১৩৪৪) এবং 'তিন পুরুষ' (চৈত্র, ১৩৫১) প্রসঙ্গে। 'কবিতা'র ইংরেজি ক্রোড়পত্রে ছাপলেন নিজেরই করা সমর সেনের কবিতার অনুবাদ, নির্বাচিত দশজনের অন্তর্গত (জুন, ১৯৫৩)। শততম আন্তর্জাতিক সংখ্যাটিতেও ছিল সমর সেনের তিনটি কবিতার অনুবাদ। অনুবাদক : সুজিত মুখোপাধ্যায়। আর 'গ্রহণ'-এর সমালোচনা করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, কার্তিক ১৩৪৭ সংখ্যায়। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় করেছিলেন 'খোলা চিঠি'র (পৌষ, ১৩৫০)। মণীন্দ্র রায় লিখেছিলেন 'নানাকথা' (আশ্বিন ১৩৪৯) নিয়ে। সমর সেনের প্রায় সমস্ত কবিতার ধারাবাহিক পরিচিয়টুকু খুঁজে পাওয়া যাবে 'কবিতা'র পাতায় পাতায়। একটা সময় যখন সমর সেন আর সময় দিতে পারছেন না 'কবিতা'য়, তখন বাধ্য হয়ে তিনি বুদ্ধদেব বসুকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন : "কবিতা'র সম্পাদক হিসেবে আমার নাম আর কতোদিন রাখবেন? ব্যাপারটা হাস্যকর দেখায়"।

'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা থেকেই জড়িয়েছিলেন বিষ্ণু দেও। তাঁরও বিখ্যাত কবিতার অনেকগুলোই 'কবিতা'য় ছাপা হয়েছে। প্রথম সংখ্যাতেই ছিল 'পঞ্চ মুখ' নামে কবিতাটি। চৈত্র ১৩৪৪ সংখ্যায় 'চোরাবালি'র সমালোচনা লিখেছেন বুদ্ধদেব নিজে। 'প্রিয়বরেষু' সম্বোধনে চিঠির আকারে লেখা এই রচনাটিতে সাধারণভাবে সাহিত্য প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের ধারণা ছড়ানো আছে। 'চোরাবালি'কে কতটা গুরুত্ব দিতেন বুদ্ধদেব সেটা বোঝা যাবে 'কবিতা'রই একটি সম্পাদকীয় থেকে। আশ্বিন ১৩৬২ সংখ্যায় কুড়ি বছরে পড়ল পত্রিকা। বুদ্ধদেব লিখলেন, "আমরা কবিতা নামক বিষয়টাকে জরুরি বলে মনে করি : মনে করি, ওতে সমগ্রভাবে মানবসভ্যতার অত্যন্ত কিছু আসে যায়— যদিও সেটা কেমন ক'রে ঘ'টে থাকে, 'পুনশ্চ', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বা 'চোরাবালি' নামক কাব্যগ্রন্থ লেখা না হ'লে—যাকে আমরা 'দেশ' ব'লে থাকি সেই দৈনিকপত্র পরিবেশিত জনগণের কোথায় কোন ক্ষতি হ'তো সেটা বুঝিয়ে দেবার স্পর্ধা আমরা রাখি না"। বিষ্ণু দের নিজের লেখাও বের হয়েছে নিয়মিত 'কবিতা' পত্রিকায়। তাঁর প্রথম দিকের পরিচিত কবিতাগুলির প্রায় সবই বেরিয়েছিল 'কবিতা'তে। লিখেছেন গদ্য 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' (কার্তিক,১৩৫০), সম্পাদক সমীপে (বৈশাখ, ১৩৪৫), এটিও বুদ্ধদেবের 'চোরাবালি'র সমালোচনার মত চিঠির আকারে লেখা, প্রত্যুত্তরও

বলা যায়। চৈত্র ১৩৬১ সংখ্যায় র‍্যাঁবোর লোকনাথ ভট্টাচার্য কৃত অনুবাদ নিয়ে সমালোচনা লিখেছেন। অরুণকুমার সরকার বিষ্ণু দের কয়েকটি বইয়ের আলোচনা করেছিলেন 'কবিতা'য়। আশ্বিন ১৩৫৮ সংখ্যায় ছিল 'অন্বিষ্ট', চৈত্র ১৩৬১তে 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' আর ১৩৫৫ সংখ্যায় 'রুচি ও প্রগতি' এবং 'সন্দ্বীপের চর'- এর আলোচনা।

'কবিতা' প্রকাশনারই সম্প্রসারণ ছিল কবিতাভবন-এর আড্ডা আর বই প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যে কবিতা ভবন-এর আড্ডার মতো অমলিন সান্নিধ্যের সম্মিলন মনে হয় আর কখনও হয়নি। কয়েক দশক ধরে বাংলা সাহিত্যের সব বয়সের লেখকদের এই অসূয়াহীন আসরের বর্ণনায় প্রত্যেকেই আনন্দ ও উচ্ছ্বাস জানিয়েছেন। বলা দরকার, এই লেখকদের অন্তর্গত ছিলেন নারীরাও। গভীর রাত পর্যন্ত নানা সময়ের নারীপুরুষের মেধাবী সমারোহে মুখর হয়ে থাকত দক্ষিণ কলকাতার এই আলোকিত ঠিকানাটি। সমর সেন 'বাবু বৃত্তান্ত'তে লিখেছিলেন : "বুদ্ধদেবের 'কবিতা'র আড্ডা ছিল অন্য ধরনের, অনেক বেশি ঘরোয়া, তাত্ত্বিক আলোচনা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। বুদ্ধদেববাবু ছোটোখাটো মানুষ ছিলেন কিন্তু কোনো কারণে যখন হেসে উঠতেন, তখন ঘরে যেন বাজ পড়ত। ওঁর অট্টহাসি দেখে বোঝা যেত যে মনে কোনো ময়লা বা বিদ্বেষ নেই। নবীন লেখকদের অবাধ সুযোগ ও উৎসাহ দিতেন"। কবিতাভবন থেকেই বেরিয়েছিল সমর সেনের চারটি বই : 'কয়েকটি কবিতা'(১৯৩৭), 'গ্রহণ' (১৯৪০), 'নানাকথা' (১৯৪২) ও 'খোলা চিঠি' (১৯৪৩)। প্রথম বইটি সমর সেন এবং কবিতাভবনেরও প্রথম প্রকাশনা। বইটির একটি সুপরিসর বিজ্ঞাপনও ছাপিয়েছিলেন বুদ্ধদেব ঠকবিতা'র চৈত্র, ১৩৪৩ সংখ্যায়, যা থেকে বোঝা যায় একজন তরুণ কবির প্রথম বইয়ের সসম্মান পরিচর্যার দিকেও লক্ষ্য ছিল তাঁর : 'কবিতায় এ পর্যন্ত সমর সেনের যত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, সেই সমস্ত এবং অন্যান্য পত্রে প্রকাশিত এবং ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত অনেক কবিতা একত্র করে 'কয়েকটি কবিতা' নামে একটি বই আগামী ১লা বৈশাখের পূর্বেই বের করা হবে। বইখানার দাম হবে পাঁচসিকা; কিন্তু ১লা বৈশাখের পূর্বে যাঁরা 'কবিতা' কার্যালয়ে এক টাকা মনি অর্ডার করে পাঠাবেন, তাঁরা বই প্রকাশিত হওয়া মাত্র বিনা ডাকব্যয়ে ঘরে বসে একখানা পাবেন। মনি-অর্ডার কুপনে 'কয়েকটি কবিতার জন্য' এই কথা লিখে দিতে হবে এবং নাম ও ঠিকানাও স্পষ্ট করে লেখা থাকা দরকার"। 'খোলা চিঠি' ছিল 'এক পয়সার একটি' গ্রন্থমালার ১২ নম্বর বই। শুধু এই বিজ্ঞপ্তিটিই নয়, 'কবিতা'র বিজ্ঞাপনগুলি ছিল আলাদা করে পড়ার মতো। নানা সময়ে মনস্ক ও মনোরম বহু বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে 'কবিতা'য় যা একটি আলাদা লেখার বিষয় হতে পারে।

'কবিতাভবন' থেকেই বেরিয়েছিল বিষ্ণু দে-র 'পূর্বলেখ', ১৯৪১ সালে। তারও আগে অবশ্য বিষ্ণু দে-র প্রথম বইটিও বেরিয়েছিল বুদ্ধদেবেরই উদ্যোগে। 'গ্রন্থকার মন্ডলী' নামে একটি প্রকাশনা খুলেছিলেন বুদ্ধদেব ১৯৩৩ সালে। বুদ্ধদেবের ভাষায় : 'প্রথমে বেরোল নিরাভরন হলদে মলাটের দুটি ষোলো পৃষ্ঠার কবিতার বই --- অচিন্ত্যর 'আমরা' ও আমার 'একটি কথা'— চার আনা মূল্যে পাঁচশো কপি কেটে গেল কলকাতার স্টলে। তারপর, উজ্জ্বলতরভাবে, বিষ্ণু দে প্রকাশ করলেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ উর্বশী ও আর্টেমিস'।

'কবিতা'র সঙ্গে সেই সময়ের লেখকদের সমারোহময় সম্পর্ক নিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন বুদ্ধদেব বসু 'আমাদের কবিতাভবন'-এ : "আমার কৃতিত্ব হয়তো এটুকু যে উৎসাহের ঝোঁকে দু-একবার ভুল ক'রে থাকলেও মোটের উপর আমি ঠিক ঠিক ঘোড়াগুলিই ধরেছিলাম। জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী; দ্বিতীয় দফায় সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়,— প্রথম দশ বছরে যাঁরা অপর্যাপ্তভাবে প্রকাশিত ও আলোচিত হয়েছেন কবিতায়; আর তারপর তৃতীয় কিস্তির নরেশ গুহ, অরুণ সরকার..."। নরেশ গুহ ছিলেন ১৩৬১ সালের পৌষ সংখ্যা থেকে ১৩৬৫-র পৌষ সংখ্যা পর্যন্ত 'কবিতা'র সহকারী সম্পাদক। তার আগেও, বুদ্ধদেব আমেরিকায় চলে গেলে নরেশ গুহ সম্ভাব্য সব লেখা তাঁর কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠাতেন। 'কবিতা'র আষাঢ় ১৩৬০ সংখ্যায় একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়েছিল এই মর্মে : "নিবেদন করি যে আমাকে এক বছরের জন্য বিদেশে যেতে হচ্ছে। আমার অনুপস্থিতি কালে 'কবিতা'র পরিচালনায় নিযুক্ত থাকবেন শ্রী নরেশ গুহ ও প্রতিভা বসু। আমিও দূর থেকে যথাসম্ভব যোগাযগ রক্ষা করে চলবো"। এই দূরাগত যোগাযোগের স্মারক হিসেবে একটি চিঠি আমার সংগ্রহে আছে। লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, নরেশ গুহকে। বানান ভুল থেকে শুরু করে আগে-পরের নানা সংখ্যার বিষয় সম্পর্কে গভীরতম কথা আছে সে-চিঠিতে। কখনও লিখছেন, 'পুরোনো' বানান লিখো'। বা, '৩০০ ছাপলেই হবে'। কখনও জানাচ্ছেন, "বিষ্ণুবাবু আর জীবনানন্দর লেখা পরের সংখ্যায় অবশ্য থাকে যেন"। বিদেশে বসেও জোগাড় করছেন পত্রিকার জন্য লেখা : "আমি এখানকার কবিদের কিছু ভাল লেখা 'কবিতা'র জন্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি। সবগুলো একত্র করে পাঠাতে দেরি হবে"। সেই সময় অমিয় চক্রবর্তীও বিদেশে। বস্টন থেকেই লিখছেন বিদেশবাসী বুদ্ধদেবকে : "কবিতা'ও বহুদিন পাইনি। নরেশকে লিখব। নতুন ধরনের কিছু কবিতা জমে উঠেছে, আরো কিছুদিন গেলে আবার ছাপাব"। এমনকি 'কবিতা'কে মাসিক করে তোলার পরামর্শও দিচ্ছেন : "... হয়তো মাসিকে পরিণত হলে 'কবিতা' পত্রিকা আরো নানা মহলে সাড়া জাগাবে"। মনে পড়বে, অমিয় চক্রবর্তীর দুর্মূল্য সব লেখার অনেকগুলিই বেরিয়েছিল 'কবিতা'য়, বুদ্ধদেব বসু নিজে আলোচনা করেছিলেন তাঁর 'একমুঠো' নিয়ে, ১৩৪৬ সালের চৈত্র সংখ্যায়। প্রথম বছরেই ছাপা হয়ে গিয়েছিল জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে', 'বনলতা সেন', 'হায় চিল', 'হাওয়ার রাত' সহ দশটি কবিতা। জীবনানন্দ নিজে লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' নিয়ে।

বাংলা সাহিত্যের দু-তিনটি দশকের শিরোধার্য লেখকদের 'কবিতা'র সূত্রে অর্জন করেছিলাম আমরা। এই ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য আর কোনো বাংলা কবিতা পত্রিকারই নেই। পত্রিকাটি বন্ধ করার সিদ্ধান্তেও বুদ্ধদেব বসুর রুচির সততাই প্রমাণিত। তরুণ লেখকদের লেখা 'বুঝতে পারছেন না' বলেই তিন দশকের এই মহাযাত্রায় দাঁড়ি টেনেছিলেন তিনি। পত্রিকার চলায় যেমন, স্তব্ধতাতেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকলেন।

বাঙালির গোর্কি-চর্চা : ‘কল্লোল’ থেকে ‘পূর্ব্বাশা’

ঋ ত ম্ মু খো পা ধ্যা য়

তিনটি মাস টানা রুশ বিপ্লবের খবর মানেই গোর্কীর খবর। গোর্কীর সংবাদ রুশ বিপ্লবের সংবাদ। এ যুগের পাঠকের কাছে গোর্কী ও রুশ বিপ্লব এক। (কেশব চক্রবর্তী, দৈনিক কালান্তর, ২৮ মার্চ ১৯৬৮)

ছোট থেকে বাবা-মা-কে হারিয়ে দাদু-দিদিমার কাছে মানুষ। রূপকথার গল্প শুনতেন দিদিমার মুখ থেকে আর দাদু কাশিরিন শোনাতেন অভিজ্ঞতালব্ধ বিচিত্র ঘটনার কথা। একদিকে কল্পনার জগৎ আর অন্যদিকে বাস্তবের রূঢ় স্পর্শ তাঁর মনের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল শৈশবেই। তাই দোকানের কর্মচারী, বাড়ির চাকর, জাহাজের খালাসি, কুড়ানি, পাখি ধরা, রুটি কারখানার শ্রমিক ইত্যাদি বিচিত্র কাজের মধ্য দিয়ে কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হলেও গল্পের নেশা তিনি ভুলতে পারেননি। পারিপাশির্বক অসুন্দর জগৎকে সহকর্মীদের কাছে গল্প শুনিয়ে সহনীয় করে তুলতে পারতেন আলেক্সি। সেই গল্পের জোগান কেবল শোনা কাহিনিই নয়, কর্মজীবনের মনিব স্মিউরির কাছ থেকে পাওয়া বইপড়ার অভ্যেস তাঁকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলো ক্রমশ। রাশিয়ান অনুবাদে তিনি বিশ্বসাহিত্য, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস যেমন গোগ্রাসে পড়েছিলেন, তেমনি জেনেছিলেন স্বদেশী পূর্বসূরীদের। তবে সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন ফরাসি সাহিত্যের দ্বারা। জীবনের বাস্তব চেহারাকে নিজের চোখে দেখেছেন, বইয়ের পাতায় মিলিয়েও নিয়েছেন এবং বুঝেছেন সব দেশে সব কালে সাহিত্যের কেন্দ্রে থাকে মানুষেরই কথা। মানুষের শঠতা, ছলনা, সারল্য, মহত্ত্ব, কামনা, দেবত্ব বা পাশবিক রূপ সবই দেখেছেন তিনি, তবু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাননি। মাক্‌সিম গোর্কি এই ছদ্মনামে ‘ককেশাস’ পত্রিকায় তাঁর আত্মপ্রকাশ ‘মাকার চুদ্রা’(১৮৯২) গল্পে—জিপসীদের জীবনের বাস্তব কাহিনিকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে উপস্থাপন করলেন তিনি। জীবনের প্রথম প্রকাশিত গল্পে আমরা দেখলাম স্বাধীনতাপ্রিয় লোইকো জোবার আর মোহময়ী রাদ্দার অপূর্ব প্রেম ও মৃত্যুর কথা। যদিও সেই গল্প গোর্কি শোনালেন আরেক বুড়ো জিপসী মাকার চুদ্রার মুখ দিয়ে। সমুদ্রের ভিজে হাওয়ার গন্ধে যে-গল্পের শুরু তার শেষে কুয়াশাঘেরা অন্ধকারে সুন্দরী রাদ্দা, তার বাবা দানিলো আর বীর লোইকোর জন্য আমাদের মন কেমন করতে থাকে। এক ভবঘুরে শ্রোতা হয়ে গোর্কি সেই গল্প শোনেন আর বোঝেন স্বাধীনতার স্বাদ। এই স্বাধীনতার স্বাদ তাঁর গল্পকার হিসেবে অভিষেককে মহিমামণ্ডিত করে। সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসামান্য কবিত্বময় ভাষা, যেখানে বুক দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তবিন্দু হয়ে যায় ‘একঝাঁক ছোট ছোট তারা’, জোবারের চোখ দুটো তারার মতো উজ্জ্বল আর ছিল সূর্যের মতো হাসি, তার গানে বেজে ওঠে দুঃখে ভরা রূপকথা। গতিময় ভাষা আর উদ্দাম জীবনের কাহিনি শুনিয়ে পাঠকের মন জয় করলেন

তিনি। তলস্তয় ও চেকভের পাশেই সমকালীন রুশ কথাসাহিত্যে জন্ম নিলেন নতুন নক্ষত্র—আলেক্সেই ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভ তথা মাক্‌সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬)। পরবর্তীকালে যাঁর বিপ্লবীচেতনাদীপ্ত 'মাদার' (১৯০৬) জন্ম দিয়েছিলো এক নতুন সাহিত্যাদর্শের — সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। 'কেন লিখেছি' শীর্ষক রচনায় গোর্কি একদা জানিয়েছিলেন, একদিকে তিক্ত, দারিদ্র্য-পীড়িত জীবন আর অন্যদিকে ব্যাপক অভিজ্ঞতার জগৎ-এ-দুয়ের তাড়নায় লেখক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাই মানবতাবাদ ও বলিষ্ঠ রোমান্টিসিজমকে এক বৃন্তে ধারণ করে গোর্কি বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে সেই 'ঝড়ের পাখি', যিনি শুনতে পেয়েছিলেন রুশ বিপ্লবের উত্তাল পদধ্বনি। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া তাঁর পক্ষে ততটা সুখকর না হলেও সোভিয়েত সাহিত্যের প্রধান মুখ হিসেবে তাঁকে আমরা ভুলতে পারি না কখনো। আর তাই বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-পরবর্তী পালাবদলের ইতিহাসে রুশ বিপ্লব ও গোর্কির অভিঘাত তাই এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

২.

বাঙালির গোর্কি-চর্চায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য নামটি হলো নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, যাঁর অনুবাদে 'মা' ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর থেকে লেবার-স্বরাজ পার্টির মুখপত্র লাঙল-এ প্রকাশ পেতে শুরু করে ধারাবাহিক ভাবে। এই অনুবাদ বেশ কিছুদিন চলার পর অর্থাভাবে তিনি তা বন্ধ রাখলে কিছুদিন সুরেশ বিশ্বাস তা চালিয়ে নিয়ে যান। তারপর বেশ কিছুদিন তা বন্ধ থাকার পর আবার নব উদ্যমে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ১৯২৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে 'আত্মশক্তি'-তে 'মাদার'-কে হাজির করেন 'বন্দেমাতরম্' নাম দিয়ে। মুখবন্ধে জানান : 'মাদার একদিক দিয়া জগতের নির্যাতিত মানবতার গদ্যকাব্য — আর একদিক দিয়া বিগত যুগের রুষিয়ার সামাজিক বিপ্লবের অন্তরের কাহিনী। এ কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা সবাই অতি সামান্য মানুষ—কুলী, মুটে, মজুর, কৃষক, নিরন্ন ছাত্র''। যদিও এর আগেই ১৯২২-এ হিন্দুস্থান রিভিউ মাসিক পত্রে গোর্কির একটি গল্প বেরিয়েছিলো। আবার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালি ভাইয়া' (নামান্তর : মাটির ঘর) উপন্যাসের শুরুতেই 'মাদার' উপন্যাসের মতোই লোহার কারখানার সিটির বর্ণনা কিংবা তাঁর 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পের নামও ছিল 'মা'। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁদের যথাক্রমে লেনিনের প্রয়াণ এবং বলশেভিকবাদ লেখাদুটিতে গোর্কির প্রতি মুগ্ধতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছিলো। অনুবাদ শুরুর আগেই ১৯২৪-এর 'কল্লোল'-এর পাতায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ লিখলেন 'ম্যাকসিম গোর্কি' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ, যেখানে গোর্কিকে তৎকালীন রাশিয়ার 'সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক' বলতে তিনি দ্বিধান্বিত হননি। 'কল্লোল' (১৯২৩-২৯)-এর পাতায় গোর্কি-চর্চা অব্যাহত থাকে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুবাদের 'তলস্তয়ের স্মৃতি' অনুবাদের ধারাবাহিক প্রকাশের মধ্য দিয়ে (চতুর্থ বর্ষ, দশম সংখ্যা থেকে এটি প্রকাশ পেতে শুরু করেছিলো)। 'মাদার'-এর অনুরাগী হলেও গোর্কির এই বইটি রবীন্দ্রনাথের একেবারেই পছন্দ হয়নি, এর

মধ্যে তিনি গোর্কির আর্টিস্ট চিত্তের ক্ষুদ্রতা লক্ষ করেছিলেন। 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'-তে তাঁর অভিমত ছিলো "গোর্কির তলস্তয়ই কি তলস্তয়? বহুকালের ও বহু লোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংহত করতে পারতেন তাহলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের ও বহু লোকের তলস্তয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হতো।" 'কল্লোল'-এর মূল ভাবাদর্শ ছিলো রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে 'অপজাত-অবজ্ঞাত মানুষের কথা এবং যৌনমুক্তির ছবিকে সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরা। এখানে ঐ অপজাত-অবজ্ঞাত জনের সাহিত্যচিত্রণে গোর্কির একটা প্রভাব তো ছিলই। এমনকি 'কালিকলম'(১৩৩৩)-এ প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘোষণাটিও প্রণিধানযোগ্য : 'জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন-গোর্কির পাঠশালায় গিয়ে থাকি তাতে দোষ কি...গোর্কি হ্যামসুনের জগতে এলে ইউক্লিডেরা ফাঁপরে পড়ে"। আসলে কল্লোল যুগের ধর্মই হলো যৌবনের উদ্দামতা, সমস্ত বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও স্থবির সমাজের ভিত্তিকে আলোড়িত করা। তবে 'কল্লোল যুগ'-এর লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লেখাটি লিখে গেলেও গোর্কির নাম সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে উচ্চারণ করেননি। অথচ কল্লোলের কালে বাংলা ভাষায় প্রলেতারিয়েত সাহিত্যের দীক্ষাগুরু যে গোর্কি, সে বিষয়ে কারোর মনেই কোনো দ্বিধা ছিলো না। শ্রমিক-মজুর জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনায় গোর্কির প্রেরণা সেকালের 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'সংহতি', 'বিজলী', 'আত্মশক্তি' ইত্যাদি পত্রিকার একাধিক লেখায় থাকলেও সরাসরি গোর্কির মত ও পথকে কল্লোল-কালিকলম গোষ্ঠী অনুসরণ করেনি। তাছাড়া সেকালের পরাধীন ভারতে বিপ্লবীদের প্রিয় গ্রন্থ ছিল 'মাদার', ফলে তা ইংরেজদের কাছে মোটেই পছন্দের ছিল না। আইনের কাছে নিষিদ্ধ না করলেও তাঁকে যে বিপদজনক ভাবা হতো, তার প্রমাণ আছে। গোর্কি সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯১৯ সালে তিনি যে প্রকাশনালয় গড়ে তোলেন সেখানেও ভারতীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের স্থান করে দিতে চেয়েছিলেন। অনুবাদ করিয়েছিলেন ভারতীয় সাহিত্য। পরাধীন ভারতের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর কাছে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা, যা তাঁর ডায়েরি ও চিঠিপত্র পড়লেই জানা যায়। ১৯১২ সালে তাঁর একটি লেখার অংশ উদ্ধার করলেই গোর্কির ভারত-ভাবনার আংশিক চিত্র পাওয়া যাবে :

"See how fast the movement for national freedom against Britain's cruel guardianship is growing among the Indians. More and more often does India resound with voices which advocate convincingly that it is high time the Indians took social and political construction in their own hands and that British rule has outlived its days on the banks of the Ganges." (Sovremennik– 1912)

পরাধীন ভারতবাসীর দুরবস্থা কতখানি করুণ হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসনে গোর্কি তার খবর রাখতেন। সাভারকার, কৃষ্ণ ভার্মা, মাদাম কামা এইসব বিপ্লবীদের খোঁজ রাখতেন তিনি; কৃষ্ণ ভার্মা ও মাদাম কামাকে চিঠি লিখেছিলেন তিনি।

এসবেরই সন্ধান পাওয়া যায় রাশিয়ার গোর্কি মিউজিয়ামের আর্কাইভে। সেখানে তিনি চাইছেন তাঁরা রাশিয়ার কাগজের জন্য লিখুন পরাধীন অথচ স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর কথা। আসলে রুশ জনগণের স্বাধীনতাপ্রাপ্তিই তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং প্রতিবেশী আরো একটি দেশের মানুষদের অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত হতে দেখে বিচলিত হচ্ছেন তিনি। চাইছেন তাদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ আর প্রতিবাদ, কারণ তবেই দূরীভূত আর পরাজিত হবে অশুভ শক্তিরা। গান্ধিজিও শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে, বিশেষত তাঁর মানুষের অধিকারের জন্য আপসহীন লড়াকু চেতনাকে। ফলে তাঁর গল্প-উপন্যাস তৎকালীন বাঙালি মানসে একইসঙ্গে বিপ্লবীচেতনা ও অবহেলিত মানুষের জন্য সহানুভূতি জাগিয়েছিলো। বিশেষত, ‘কল্লোল’-এর পাতায় গোর্কির দু’টি গল্পের অনুবাদ আমাদের বুঝিয়ে দেয় পরোক্ষভাবে হলেও কল্লোল-গোষ্ঠী তাঁর ঐ হতমান মানুষের জন্য অনুরাগকে মূল্য দিতে চেয়েছিলো। দেবকুমার বসু ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘কল্লোলের অনুবাদ গল্প’ সংকলনে যে একুশটি অনূদিত বা ছায়ানুসারী গল্পের সন্ধান পাই, তার মধ্যে দুটির লেখক গোর্কি। বিশ্বসাহিত্যের বিরাট সম্ভার থেকে অনূদিত এই গল্পগুলির লেখক ও বিষয় বৈচিত্র্য প্রমাণ করে কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকেরা কেবল ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন কিংবা ন্যাচারিলজমেরই ভক্ত ছিলেন না। তাই জোলা, লিকক, ম্যাকলিয়ড, গদার, মোপাসাঁ, রেমন্ট, মিকস্যাট প্রমুখের পাশে তলস্তয়, চেকভ, তুর্গেনেভ, গোর্কিও সসম্মান স্থান পেয়ে যান।

৩.

গোর্কির গল্পের জগৎ বৈচিত্র্যমণ্ডিত। লোককথার আদল (মাকার চুদ্রা, দাঙ্কোর জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড) থেকে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ গল্প (চেলকাশ, মানুষের জন্ম, কবি, যাত্রাসঙ্গী, ছাব্বিশজন পুরুষ ও একটি মেয়ে) কিংবা রাজনৈতিক আদর্শের সাহিত্যরূপ (কমরেড, বিশ্বাসঘাতকের মা) — সবই তাঁর কলমে সমদক্ষতায় ফুটে উঠেছে। তাই বৈশাখ ১৩৩১-এর কল্লোলে সুকুমার ভাদুড়ীর অনূদিত কাহিনি ‘পিয়াসী’ শোনায় এক রূপবঞ্চিতা নারীর আত্মপ্রতারণার সকরুণ আখ্যান। গল্পের নায়িকা টেরেসা স্থুলকায়া, দীর্ঘাঙ্গী, কিন্তু কুরূপা। অথচ তিনি এক প্রতিবেশী ছাত্রকে দিয়ে প্রণয়ী বোল্‌স-কে প্রেমপত্র লেখান, যা ছাত্র তথা লেখকের হাস্যোদ্রেক করে। আবার কিছুদিন পর টেরেসা তার কাছে আসে বোলসের বয়ানে টেরেসা নামে তার এক বন্ধুর জন্য প্রত্যুত্তর লেখাতে। ছাত্রটি তাঁর চালাকি ধরে ফেলে তাঁকে অপমান করে ঘর থেকে বের করে দেন। যদিও পরে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর বাড়ি গেলে জানতে পারে এই প্রেমপত্রগুলিই এই প্রেমবঞ্চিতা নারীর ভালোবাসার কাল্পনিক জগৎ। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অভিযোগ নারী হিসেবে তাঁর জন্ম কেন রূপের জন্য ব্যর্থ হয়ে গেলো? টেরেসার অশ্রুকাতর উপলব্ধি আমাদেরও স্পর্শ করে : “মনের মধ্যে ভালোবাসার প্রবল বাসনা সত্ত্বেও যে তার সারা জীবনের মধ্যে এমন একটা প্রাণীকেও পায়নি যাকে সে ভালোবেসে তার বুকের মধ্যে অনুভব করতে পারে তার চেয়ে হতভাগিনী বুঝি আর কেউ

নেই"। গল্পটির মধ্যে নারীমনের নিভৃত বেদনার ছবি আছে, যদিও তা খুব জটিল নয়। আবার 'তেপান্তরের মাঠ' (ফাল্গুন ১৩৩৪, অনুবাদ : সুবোধ দাশগুপ্ত) গল্পটিতে মদের দোকান থেকে মারমারি করে পাহাড়তলির শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া তিনজনের পশুসুলভ জীবনের ছবি আছে। এখানে তিনটি পথিক চরিত্র, যারা ক্ষুধার্ত — একজন কথক নিজে, অন্য দুজন সৈনিক ও ছাত্র। নানা জল্পনা, দেশকালের উন্নতি-অবনতি নিয়ে আলোচনা করতে করতে তারা দেখে মাঠেই তাদের রাত কাটাতে হবে। সেখানে একজন অচেনা মানুষের সন্ধান পায় তারা, সে তাদের ভয় পেলেও রুটি দেয়। লোকটির কাছে রিভলভার আছে জেনেও তার বাকি খাবার ও টাকাপয়সা দখল করার জন্য তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা সব খাবার কেড়ে নেয় ও লোকটিকে কাবু করে ফেলে। যদিও পরে জানতে পারে, লোকটি জ্বরাক্রান্ত এবং সরকারি কর্মী, বাড়ি ফিরছিল বউ-ও দুই মেয়েকে দেখতে। লোকটির সব খাবার খেয়ে তাকে যদিও তারা আগুনে গা গরমের সুযোগ দেয়, তবু তাকে গালিগালাজও করে। সে মুমূর্ষু জেনেও সহানুভূতিহীন সৈনিক ও ছাত্রটি, গল্পকথকও তাদের সঙ্গে সহমত হয়ে বিশ্রাম নিতে থাকে। লোকটি যে ভয় পেয়ে গুলি ছুঁড়েছিলো, এটাকে তারা ভয়ংকর অপরাধ বিবেচনা করেছে। যদিও তারপর ঘুম ভেঙে তারা দেখে ঐ লোকটিকে মেরে সব কিছু নিয়ে ছাত্রটি পালিয়েছে। সৈনিক ও কথককেও পালাতে হয়, পুলিশের ভয়ও আছে তাদের মনে। জনহীন তেপান্তরের মাঠে ভোরের আলোয় মানুষের পাপ, লোভ, অন্যায়, নিষ্ঠুরতা—এসবই অসম্ভব বলে মনে হতে থাকে। আর তারপরেই জেগে ওঠে পরদিনের খাওয়ার ভাবনা! গল্পের শেষে দেখা যায় হাসপাতালে ভর্তি থাকা একটি লোক এই গল্প বলেছে, তার কাছে ভবঘুরে ঐ সৈনিকটি ভালো মানুষ, মমতাময়। মৃত মানুষটির মৃত্যুর দায় তার নয়। গল্পের শ্রোতাকে সে বলেছে একটি মর্মঘাতী খাঁটি সত্যকথা : "কেউ-ই কারো জন্য দায়ী নয়, কারণ আমরা সকলেই সমান — বনের পশু"। এছাড়াও রাতের তারার দিকে চেয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সৈনিকটির উপলব্ধি "পরের দাসত্ব কোরো না কোনোদিন।... আমার মন বলছে তাই আমি সুখী" কিংবা "আমার নিজের জীবনের দেহের একমাত্র আমিই প্রভু — কোনো ওপর-আলার ধার ধারি না"—গোর্কির স্বাধীনতাপ্রিয় মনকে চিনিয়ে দেয়। ভবঘুরে জীবনাভিজ্ঞতার স্পষ্ট চিহ্নবাহী এ-গল্পের নির্মোহ বর্ণনা আমাদের কিছুক্ষণ স্তব্ধ করে রাখে। রুক্ষ বাস্তবতাকে এভাবেও চিত্রিত করা যায় তবে? কল্লোলের সাহিত্যে রুশ সাহিত্য-চর্চা অবশ্যই রুশ বিপ্লবের অভিঘাতেই দেখা দিয়েছিলো। পরাধীন ভারতে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগ আনতে চাওয়া কল্লোল-কালিকলমের পাতায় তাই প্রতি বছরেই রুশ সাহিত্য জায়গা করে নিয়েছে, কখনো অনুবাদে, কখনো বা প্রবন্ধে। আর বিপ্লবোত্তর রুশ সাহিত্যে গোর্কিই সব থেকে উজ্জ্বলতম নাম। তাই 'কালিকলম'-এও তলস্তয়ের পাশাপাশি গোর্কির রচনা অনূদিত হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই।

৪.

'দুশমন', 'মরসুমি লোক' ইত্যাদি একাধিক নাটক লিখলেও বিশ্বনাটকের ইতিহাস তাঁকে রাতকুঠরির বাসিন্দাদের অবিস্মরণীয় স্রষ্টা হিসেবে মনে রাখবে। 'মা' উপন্যাস, অসামান্য গল্পগুচ্ছ, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, প্রবন্ধাবলীর পাশে এই নাটক প্রয়োগনির্ভরতার কারণে দর্শককে নাড়া দেয় বেশি। বিদেশে ও ভারতে বারংবার এই নাটক নানা ভাষায় অনূদিত ও অভিনীত হতে দেখি। হিন্দিতে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা যেমন অভিনয় করেছে, তেমনি বুধন থিয়েটার রাস্তার ধারে বস্তি অঞ্চলকেই অভিনয়ের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করেছে। অনুবাদে দেশীয়করণ ঘটে ব্যারন হিন্দিতে হয়েছে প্যাটেল, বাংলায় হয়েছে রাজা; সাতিন - গগন এবং লিউকা - আনন্দ। গণনাট্য-নবনাট্য আন্দোলনের কালে উমানাথ ভট্টাচার্য অনুবাদ করেন 'নীচের মহল', অশোক গুহের অনুবাদে পাওয়া 'নীচের তলার আঁধারে'। পুঁজিবাদী শাসনের মধ্যে নিচুতলার নির্যাতিত মানুষদের যন্ত্রণা, আত্মমর্যাদাবোধ আর সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখার কাহিনি সেকালে বাঙালি নাট্যশিল্পীদের প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। শিবনারায়ণ রায় অনূদিত 'রাতকুঠরি'ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্ব্বাশা'য় (১৩৫২বঙ্গাব্দ/খ্রি. ১৯৪৬) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর কালিকা থিয়েটারে নবনাট্যম গোষ্ঠীর প্রযোজনায় কালিকা থিয়েটারে অভিনীত হয় পাঁচের দশকেই, সেই নাটকের নাম ছিল 'রাতকুঠরির বাসিন্দা'। এছাড়াও উইকিপিডিয়া, ইউটিউব ঘাঁটলে বিভিন্ন দেশে এই নাটকের মঞ্চায়ন হয়েছে দেখা যায়। পাওয়া যাবে রেনোয়ার 'লে বাঁফ' (১৯৩৬), মুরাতার ' সোল অন দ্য রোড' (১৯২১) চিনে জুওলিন পরিচালিত 'নাইট ইন্' (১৯৪৭) ইত্যাদি চলচ্চিত্রগুলি। তবে এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জাপানি চলচ্চিত্র-পরিচালক আকিরা কুরোশাওয়া পরিচালিত 'দনজোকো' (১৯৫৭) — স্থান-কাল-পাত্র বদলে জাপানের প্রেক্ষাপটে সংরূপান্তরিত এই সাদা-কালো চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পুরস্কৃত হয়েছিলেন। হিন্দিতেও চেতন আনন্দ পরিচালিত 'নীচা নগর' (১৯৪৬) আন্তর্জাতিক পুরস্কার গ্রাঁ পি লাভ করে, সেখানেও ভারতীয়করণ করা হয় নাট্যকাহিনিটির। বোঝা যায় 'মা' উপন্যাসের পর এটিই সার্বাধিক অনূদিত ও প্রচারিত জনপ্রিয় টেক্সট্।

৫.

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে চেকভের আগ্রহাতিশয্যে নাটক লিখতে শুরু করলেন গোর্কি। মস্কো আর্ট থিয়েটারে সেসব নাটক মঞ্চস্থও হলো। সেই সময়ে লেখা দুটি নাটক 'পাতি বুর্জোয়া' এবং 'রাতকুঠরি' বা 'নীচের মহল'। প্রথম নাটকে বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকার ফলে, নাটক তেমন জমলো না। কিন্তু সমকালেই লেখা 'দ্য লোয়ার ডেপথস্' (Na Dne)-এ (১৯০২) তাঁর চেনা চরিত্রচিত্রশালা দর্শককে মুগ্ধ করে দিলো। বেশ্যা, অভিনেতা, মিস্ত্রি, মাতাল, ভবঘুরে, আসামী, মজুর, ফেরিওয়ালি, মুচি, বাড়িওয়ালি — এসব নানা শ্রেণির মানুষ মাটির নিচে গুহার মত দেখতে একটা অন্ধকার কুঠরিতে ঘুরে বেড়ায়। সেখানেই তাদের স্বপ্ন-প্রেম-অসুখ-নিরাময়-মৃত্যু; আর এভাবেই ঘুরে চলে

দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানিমাখা জীবনচক্র। নানা বৃত্ত থেকে আসা সেইসব মানুষেরা ছোট ছোট চাওয়া-পাওয়া নিয়ে হিসেব কষে চলে, লড়াই করে প্রেমের অধিকার নিয়ে। তাদের মধ্যে একটু বুঝদার সাতিন আর আশার সুবাতাস নিয়ে আসে ভবঘুরে লিউকা। ব্যারন তার অতীত জীবনের সমৃদ্ধির স্মৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে হাহুতাশ করে চলে। কিন্তু কাতর এই জীবনেও লিউকা তাদের মনে বুনে দিতে চায় প্রতিটি মানুষের ভালো করে বাঁচার স্বপ্নকে। বলে 'মানুষ বড়ো একরোখা জীব'। নাটক যতো এগোয় আমরা দেখি এইসব আঁধারের জীবরা প্রত্যেকেই হৃদয়বান বা হৃদয়বতী; কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি তাদের নির্মম করেছে। অসুস্থ আন্নাকে লিউকা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে শান্তির আশ্বাস শোনান। স্নেহময় মৃত্যুর আশ্রয়ে সব যন্ত্রণা ধুয়ে মুছে যায় — সেখানে ঈশ্বরের বাগানে কেবল অপার শান্তি আর বিশ্রাম। লিউকা যেন আঁধারে আলোকদূত, আমাদের রবীন্দ্র-নাটকের ঠাকুর্দা চরিত্রকে মনে আনে। ঈশ্বর আছে কি নেই, তা গোর্কি স্পষ্ট করে বলেন না। কিন্তু এই দুঃখী সর্বহারা মানুষগুলির জীবনে একটা আস্থার জায়গা ঈশ্বর, তা চিহ্নিত করতেই তিনি বলে ওঠেন লিউকার কণ্ঠ দিয়ে : 'যাতেই বিশ্বাস করবে তুমি তাই আছে'। মাতাল অভিনেতার কণ্ঠেও আলোকের প্রত্যাশা শুনি আমরা। এই অসুখী জীবন থেকে অন্য কোনোখানে তারা যেতে চায়, পথ পায় না। এরই মাঝে মারা যায় অসুস্থ আন্না। জীবন তবু তো থামে না। ন্যায়ের দেশ খুঁজতে চায় সকলেই, পায় না কেউ। নরককুণ্ডের মতো জীবন এই বাসিন্দাদের। ভোর কিংবা রাত্রি—নাট্যকাহিনির সময় হিসেবে যে-কালখণ্ডই চিহ্নিত হোক না কেন, তাদের জীবন-আঁধারে সূর্য ওঠে না। চুরি-চামারি-পরকীয়া- ঝগড়া-মারামারি এসব নিয়েই তারা বাঁচে। সঙ্গে চলে অকথ্য খিস্তি-খেউড়। খুন হয় বুড়োকর্তা কস্তিলিয়ভ। পেপেল নাকি ভাসিয়া - কে খুনি তাই নিয়ে চলে উতোরচাপান। ভবঘুরে লিউকা আশাবাদের মন্ত্র শুনিয়ে, মানতার জয়গান গেয়ে চলে গেছে, তারই ভাবনার প্রতিধ্বনি করে সাতিন বলে 'স্বাধীন মানুষের ধর্ম হলো সত্য' (**'Lies are the religion of slaves and masters. Truth is the God of the free man.'**)। আরো ভালো কিছু ঘটার আশায় মানুষের বাঁচার স্বপ্ন তার কাছে সত্য, তাই শিশুদের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করে সে। আমাদের মনে পড়ে যায় গোর্কির লেখা 'খ্রিস্টের জন্ম' গল্পের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি 'পৃথিবীর সেরা গান হলো শিশুর হাসি'। সাতিনের এই মানবপ্রেম গোর্কিরই আদর্শকে স্মরণ করায়, তার কণ্ঠে আমরা সেই অপূর্ব উচ্চারণ শুনি :

'সব কিছুই মানুষের ভেতরে — সব কিছুর অস্তিত্বই তো মানুষের জন্যে! দুনিয়ায় বেঁচে আছে তো শুধু মানুষ — বাকি সবই তো তার হাত আর মগজের সৃষ্টি। মানুষ! কী অপূর্ব! শুনতে — কী বিরাট! মানুষ শ্রদ্ধার পাত্র, করুণা করে খাটো করার নয় — শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার পাত্র!'

শ্রেষ্ঠতর মানুষ গড়ে তোলার সাধনাই মানুষকে স্বতন্ত্র করেছে অন্য প্রাণিদের চেয়ে। এই আশাবাদের উচ্চারণ সত্ত্বেও নাটকের চতুর্থ তথা শেষ অঙ্কে অভিনেতা আত্মঘাতী হয়।

সাতিন হৃদয়হীনের মতো বলে ওঠে 'গানটাই মাটি করে দিলে'। এই নাট্যকাহিনিতে অনেকেই দেখেছেন বিষণ্ণতা আর অসুখী উপসংহার। এই নাটকের সবচেয়ে মূলানুগত বঙ্গানুবাদক শিবনারায়ণ রায় 'রাতকুঠরি'কে কিং লিয়ার বা রাজা ঈডিপাসের মতোই কালজয়ী ক্ল্যাসিকের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। অনুবাদকের ব্যাখ্যায় তিনি ধরে দিয়েছেন এই নাটকের মর্মকথাটি :

"গোর্কি এখানে নির্ভর করেছেন তাঁর বিশ বছরের বিচিত্র তিক্ত অভিজ্ঞতার ওপরে — যে স্ত্রী পুরুষদের কাহিনী তিনি একেবারে ভিতর থেকে জানেন এবং যাদের সঙ্গে একাত্মতা তাঁকে প্রথম যৌবনে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছিল, তারাই এ নাটকের পাত্রপাত্রী। এদের অতীত এবং বর্তমান তিনি জানেন, কিন্তু এদের ভবিষ্যৎ যে কী কিছুই তিনি দেখতে পান না। সদ্য আকৃষ্ট হয়েছেন মার্কবাদে, মতবাদের প্রভাবে একটা নাটকও লিখে ফেলেছেন, কিন্তু সত্যিই কি এই মানুষদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস কোনোদিন ফিরে আসবে, কোনোদিন কি তারা সংগঠিত হয়ে সমাজের বিপ্লব ঘটাবে? গোর্কি তাঁর ভিতরকার অন্তর্ভেদী প্রশ্নকে এই নাটকের ভিতর দিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। যা সত্য তাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে তারই সঙ্গে স্বপ্নের অবস্থানকে মেনে নিয়ে তিনি এই নাটকের ভিতরে প্রাণ এবং গতির সঞ্চার করেছেন।" (ম্যাক্সিম গোর্কি ও 'রাতকুঠরি')

এরই পাশাপশি নাট্যকারের কৈফিয়ৎ থেকে জানা যায়, লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের পাশাপাশি তিনি কিছু পোড়খাওয়া বুদ্ধিজীবীকেও এখানে রেখেছিলেন সচেতনভাবেই। লিউকা আর সাতিন যার চিহ্ন বহন করেছে। যদিও লিউকা গোর্কি ও তলস্তয়ের মিশেল বলেন অনেকেই, যা তলস্তয়ের পছন্দ ছিল না মোটেই। আসলে এই জাতীয় ঈশ্বরবিশ্বাসী ভবঘুরে চরিত্র নির্মাণের পিছনে তাঁর নিরক্ষর, ধর্মভীরু দিদিমার মুখে শৈশবে শোনা প্রাচীন গল্পের প্রভাবের কথাই মনে আসে।

৬.

রাতকুঠরির মসিকৃষ্ণ অন্ধকারের মতোই চরিত্রগুলির মনের দরজা-জানালা দিয়ে আলো-হাওয়া ঢোকে না আর। তারা বদ্ধ জলার মতো, কূপমণ্ডুক হয়ে বাঁচে, তারপর একদিন মরে যায়। নাটকটি পড়া বা দেখা — সব দিক দিয়েই এক বিষণ্ণতার আবহ রচনা করে। নাটকের পরিণতিও আত্মহননে। গোর্কির যে-কোনো রচনাই প্রথানুগ আশাবাদে উজ্জ্বল নয়। এ-প্রসঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষামন্ত্রী লুনাচারাস্কির মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

Yet Gorky's writings– even his early romantic works– contained very little direct portrayal of happiness— they were done in gold– and vermilion– and purple– but for all that even his semi-fairytale characters tended to come to a more or less unhappy end.

(A Portrait - Anatoly Lunacharsky– ১৯২৮)

এই প্রেক্ষণ অস্বীকার করার হেতু নেই কোনো। যেখানে পাভেলের মায়ের মতো বীরাঙ্গনা দৃপ্তকণ্ঠে বলে চলেন :

"মানুষ মেহনত করে মরে; তার বদলে পায় কী? না, অভাব অনটন, ক্ষিদে, রোগ! সব কিছু আমাদের বিরুদ্ধে। দিনের পর দিন খাটি — আর পড়ে থাকি আঁস্তাকুড়ে। আমাদেরই মেহনতের ফল ভোগ করে অন্যে। আর আমরা গলায় শিকলি-বাঁধা কুকুরের মতো থাকি ওদের হাতের মুঠোয়। ওরা আমাদের বোকা মুখ্যু করে রেখে দেয়। আমরা কিচ্ছু জানি না, কেবল ভয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকি। ভয় করি নে হেন জিনিস নেই। আমাদের জীবনটা একটা আস্ত আঁধার রাত — আর কিছুই না"। (দ্বিতীয় খণ্ড, অন্তিম পরিচ্ছেদ)

লিউকা কথিত ন্যায়ের দেশ তথা সাম্যের রাজ্য হয়তো অধরাই থেকে যায় চিরকাল। তবু নিজের প্রাণ দিয়েও অন্তিম পরিণামে সত্যেরই জয় হবে এই আশায় প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকা। ১৯০১-এ লেখা তাঁর বিখ্যাত 'ঝড়ের পাখি' গদ্যকবিতাতেও আমরা দেখেছিলাম এমনই এক আঁধারজয়ী আলোক উদ্ভাস : "সে স্থির জেনেছে মেঘরাশি সূর্যকে আড়াল করতে পারে না; ঝড়ের মেঘ কখনোই, কোনোকালেই সূর্যকে মুছে দিতে পারবে না।" (অনুবাদ : তরুণ সান্যাল) অন্যদিকে ২১ মার্চ ১৯৬৮তে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গোর্কির জন্মশতবর্ষে 'রাশিয়া' নামের একটি ছোট্ট কবিতায় 'দি লোয়ার ডেপথস্' এবং 'মাদার'কে মনে রেখে গভীর বিশ্বাসে লিখেছিলেন :

"অন্ধকারের মুখগুলি ফেটে পড়ে
কান্নায় আর অশ্লীল চিৎকারে!
রাশিয়া আমার রাশিয়া আমার রাশিয়া
বধির এবং বোবা!
রাশিয়া আমার রাশিয়া আমার
যেন নরকের শোভা!

ঘোলাটে দু-চোখে খড়ের মূর্তিগুলি
শুধু মদ গেলে চুরি করা পয়সায়।
রাশিয়া আমার রাশিয়া আমার রাশিয়া
তোমার কী আসে যায়!
রাশিয়া আমার রাশিয়া আমার রাশিয়া
দূরে মেঘ গর্জায়।
দূরে মেঘ গর্জায় আর বাজ পড়ে
চিৎকারগুলি কোথায় মিলায় ঝড়ে?
রাশিয়া আমার রাশিয়া আমার রাশিয়া
ঝড়ে জলে একাকার!

রাশিয়া আমার জননী আমার রাশিয়া
ছড়ালে ইস্তেহার"।

ঈশ্বরকে যে-গোর্কি মানবসত্তার ফটোগ্রাফ ভাবতেন, মার্কবাদে আস্থাশীল হয়েও যিনি দলতন্ত্রের কঠোর সমালোচক, প্রতিবাদী এবং আদ্যন্ত একজন মানবপ্রেমিক; তাঁর সাহিত্যকর্ম — তা সে গল্প-উপন্যাস কিংবা কবিতা-নাটক যাই হোক না কেন, আমাদের অপ্রাপ্তি ও হতাশার আঁধারকে ক্রমায়ত আলোকিত করার প্রমিতি দিয়ে যেতে থাকে।

৭.

কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির অভাব দূর করতেই জন্ম হয়েছিল 'পূর্ব্বাশা' সাহিত্যপত্রের। ১৯৩২-৭৭ — এই দীর্ঘ, বিড়ম্বিত যাত্রাপথের সূচনায় কিন্তু ছিল ইউরোপীয় প্রথায় সাহিত্য রচনা, যৌনমুক্তির ছবিকে তুলে ধরা, সাংস্কৃতিক চেতনার বিপ্লব ও নবীন প্রতিভাকে সুযোগ দেওয়া। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পূর্ব্বাশার-ই আবিষ্কার। তবে 'পূর্ব্বাশা'র সাহিত্যাদর্শ বারবার বদলেছে। সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতির বাঁকবদলের সঙ্গে সম্পাদক কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু কর্মাধ্যক্ষ সত্যপ্রসন্ন দত্ত 'পূর্ব্বাশা'তে সাহিত্যের পাশাপাশি সমাজ, রাজনীতি, কৃষিভাবনা, অর্থনীতি, অধ্যাত্মচিন্তার প্রকাশ অব্যাহত রেখেছিলেন। 'হার্ড থিংকিং'-কে প্রাধান্য দিতে চাওয়া 'পূর্ব্বাশা' কখনো হিটলার-বিরোধিতা, কখনো বা ট্রটস্কি-পন্থা কিংবা গান্ধিজির আদর্শকে সত্য মেনেছিলো। প্রথম পর্বে পূর্ব্বাশার পাতায় ধারাবাহিক ভাবে অনূদিত হয়েছিলো এরিখ মারিয়া রেমার্ক, দ্বিতীয় পর্বে ম্যাক্সিম গোর্কি। প্রকাশিত হয়েছিল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অনূদিত 'মা' উপন্যাসের গ্রন্থ-সমালোচনাও। ফলত কল্লোল-কালিকলমের পাশাপাশি বাঙালির গোর্কি-চর্চার ধারায় 'পূর্ব্বাশা'র উৎসাহী ভূমিকাকে খাটো করে দেখা চলে না কখনোই।।

কল্লোল

বর্ষ ও সংখ্যা	বিষয়	লেখক / অনুবাদক
২/১	পিয়াসী—ম্যাক্সিম গোর্কি	সুকুমার ভাদুড়ী (অনু)
২/১২	ম্যাক্সিম গোর্কি (প্রবন্ধ)	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
৩/১	গমের দানা ডিমের মত বড় তলস্তয়	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (অনু)
৮/৫	'মানবতা' তুর্গেনেভ অবলম্বনে	শামসুন নাহার
৮/৩	রুশ সাহিত্য ও তরুণ বাঙালি (প্রবন্ধ)	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
৪/১০	তলস্তয়ের স্মৃতি ('লণ্ডন মার্কারি'তে	পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (অনু)
৪/১০	প্রকাশিত গোর্কির প্রবন্ধ)	
৫/১১	লিওনিদ আন্দ্রিব (প্রবন্ধ)	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
	তেপান্তরের মাঠ (গোর্কির 'In the steeppes' অবলম্বনে)	সুবোধ দাশগুপ্ত (অনু)

কালিকলম		
প্রথম বর্ষ বিভিন্ন সংখ্যায়	আন্তন শেহভ (গোর্কি স্মৃতিকথা) লিও তলস্তয় (ঐ) বারাঙ্গনা (ঐ) ভস্তয়ভস্কি (প্রবন্ধ) লিওনিদ আন্দ্রিভ (প্রবন্ধ)	মুরলীধর বসু (অনু) ঐ ঐ সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
দ্বিতীয় বর্ষ	ম্যাক্সিম গর্কি —ক্রমটকিন ঐ —বদ্রেজিন	

ঋণস্বীকার :
ঋণ : ড. শিবশংকর পাল

১. কল্লোলের অনুবাদ গল্প, সংকলন ও সম্পাদনা : দেবকুমার বসু ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মাঘ, ১৪১২ (২০০৬)

২. কল্লোলযুগের ছোটগল্প ও রুশবিপ্লব, ঊনশিবশংকর পাল, পাণ্ডুলিপি, বইমেলা ১৯৯৯ (সারণিটিও এই বই থেকে পাওয়া)

৩. শিল্প ও সংগ্রাম, ম্যাক্সিম গোর্কি, সম্পাদনা : প্রফুল্ল রায়, অগ্রণী বুক ক্লাব, দ্বিতীয় সং : বইমেলা ২০০৭

৪. রাতকুঠরি, ম্যাক্সিম গোর্কি, অনুবাদ : শিবনারায়ণ রায়, প্যাপিরাস, জুলাই ১৯৯৮

৫. পূর্বাশার কথা, সত্যপ্রিয় ঘোষ সম্পাদিত, অনুষ্টুপ, ১৯৯৯

৬. বাংলা সাহিত্যে গর্কির প্রভাব ও নতুন চেতনার সূচনা, সত্যপ্রিয় ঘোষ, জিজ্ঞাসা (ক্রোড়পত্র : মাক্সিম গোর্কি) : মননশীল বাংলা ত্রৈমাসিক, ২০১৯-২০

৭. আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি, ঋতম্ মুখোপাধ্যায়, ঐ

সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যে 'কল্লোল'

স্বপ্নীল সরকার

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রামগতি ন্যায়রত্ন রচিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২)। এর আগেও সাহিত্যের খণ্ড বা আংশিক ইতিহাস লেখার বেশ কিছু প্রবন্ধ-প্রয়াস চলেছে; সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'History of Bengali Works and Writers' (১৮৩০), হরচন্দ্র দত্তের 'Bengali Poetry' (১৮৫২), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২), ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের 'কবিওয়ালাদের জীবনী' (১৮৫৩-৫৫); এছাড়াও 'কবিকলাপ' (১৮৬৬)—হরিশ্চন্দ্র মিত্র, 'কবিচরিত'—(১৮৬৯) হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, 'বঙ্গভাষার ইতিহাস'—(১৮৭০) মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা সাহিত্য'— (১৮৭১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। রামগতি ন্যায়রত্নের পর রাজনারায়ণ বসু, গঙ্গাচরণ সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, সুশীলকুমার দে প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিরা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। কিন্তু এঁদের আলোচনার ক্ষেত্র প্রধানত প্রাগাধুনিক কাল ও উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য।

১৯৩৯ সালে সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' প্রকাশ পেল। তার আগে আগেই ঘটেছে ইতিহাসের নানা ঘটনা, ঘটে গিয়েছে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ রদ, জালিওয়ানবাগের হত্যাকাণ্ড, যতীন দাসের অনশন-মৃত্যু, বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স অভিযান, গান্ধীজির নানা তৎপরতা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ভগৎ সিং-এর ফাঁসি ইত্যাদি। এসবের পরে প্রকাশিত সুকুমার সেন রচিত সাহিত্যের ইতিহাস প্রচুর তথ্যের আশ্রয়ে কালানুক্রমিক বিভাগ সাপেক্ষে বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের উপর দাঁড়িয়ে নির্মিত হল। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা'র পর তিনি রচনা করলেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ), 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' (১৯৫১), 'History of Bengali Literature' (১৯৬০), এরপর নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ চৌধুরী, নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, মণীন্দ্রমোহন বসু, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, জে.সি. ঘোষ প্রমুখের কলমে রচিত হল বাংলা সাহিত্যের নির্দিষ্ট কালপর্বের ইতিহাস।

এরপর স্বাধীনতা লাভ, দেশভাগ, সুখের স্বপ্নভঙ্গ, রাজনৈতিক অরাজগতা, দারিদ্র্য সমস্যা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় ঘটনাগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে প্রভাব বিস্তার করে। তাই পাঁচের দশকে গোপাল হালদার, ভূদেব চৌধুরী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তথ্য ও তত্ত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করলেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে। মার্কসবাদী আদর্শকে সামনে রেখে গোপাল হালদার 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' (১৯৫৪) গ্রন্থ রচনা করলেন। ভূদেব চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'

(১৯৫৫) মানবজীবনের ক্রমবিবর্তনের ঐতিহ্য এবং খুঁটিনাটি ঐতিহাসিক তথ্যের নিবিড় অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করে রচিত। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক কচকচানির বাইরে গিয়ে সচেতন পাঠকের রসাস্বাদনের উপর ভিত্তি করে 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' (১৯৫৯) রচনা করলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১৯৫৯) গ্রন্থে তাঁর রচনার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রথম খণ্ডের 'লেখকের নিবেদন' অংশে লিখেছেন, 'সমাজ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিস্তীর্ণ পটভূমিকায়' 'বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি মানস'কে ভিত্তি করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে দেখতে চান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অষ্টম খণ্ডে তিনি জানিয়েছেন রস বিচারই সাহিত্য ও সাহিত্য সম্পর্কিত ইতিহাস আলোচনার চূড়ান্ত মাপকাঠি। এরপর তারাপদ ভট্টাচার্য, ভবতোষ দত্ত, ক্ষেত্র গুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতেরা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন; কিন্তু অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পরবর্তী সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের রচনায় 'কল্লোল' পত্রিকা সম্পর্কে তেমন বৃহত্তর পরিসরে আলোচনা স্থান পায়নি। এই পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা কল্লোল সম্পর্কে কী কী বলেছেন, সেগুলো সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা যাক।

সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর পঞ্চম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে ১৮৯১-১৯৪১ কালপর্বের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। এই গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদে কল্লোল পত্রিকা ও গোষ্ঠী নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি এবং অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন 'কল্লোল কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি'। নামকরণ থেকেই সাহিত্যের ঐতিহাসিকের কল্লোল-বিরূপ মানসিকতার দিকটি স্পষ্ট হয়; কারণ 'কোলাহল' ধ্বনি সৃষ্টি করলেও তাতে গভীরতা, আদর্শের সত্যতা থাকে না; থাকে অর্থহীন চিৎকারের পুনরাবৃত্তি। সেখানে তিনি কল্লোলের আবির্ভাব প্রসঙ্গে 'উপক্রম' শীর্ষক অংশে শিক্ষার প্রসার, ক্রমবর্ধমান সাহিত্য-পাঠকদের বুদ্ধের পরিচ্ছন্নতা ও মানের উজ্জ্বলতার অভাব, মানুষের শহর-নিবাসী হওয়ার প্রবল প্রবণতা, কলকারখানার প্রসার, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন ইত্যাদির ফলে ভারতীয় নবীন সাহিত্যিকদের 'বাস্তব' প্রবণতা ইত্যাদি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে তুলে ধরতে চেয়েছেন সংক্ষিপ্ত পরিসরে।[১] কিন্তু রবীন্দ্র-অনুরাগী সুকুমার সেন 'কল্লোল' গোষ্ঠীর প্রচ্ছন্ন বিরোধিতাই করেছেন। কারণ, তিনি স্পষ্ট বলেছেন,

"কন্টিনেন্টাল উপন্যাসের প্রভাবে এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের আর্থিক দুর্গতির চাপে রোমান্টিক কল্পনাবিলাস প্রবলতর হইয়া তরুণ লেখকদের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন "বস্তি"-বিলাস ফেশান হইয়া দাঁড়াইল।...এই "বাস্তব" বিলাসিতার বা "বাস্তব" দৃষ্টির প্রথম উন্মোচন ভারতীর আসরে। এবং লালন খানিকটা নারায়ণের পৃষ্ঠায়। স্পষ্ট যৌন-আবেগমূলক রোচক সাহিত্যের গুরু হইলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪)।...ভারতীর আসর ভাঙ্গিয়া আসিলে, দলভাঙ্গা কয়েকজন তরুণ-অতরুণ লেখক ঢাকা গ্রুপের সহযোগিতায় কলিকাতায় 'কল্লোল' পত্রিকা বাহির করিলেন (১৯২৩)।...কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির পোষকেরা

রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে জাত ও পুষ্ট হইলেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমগ্র মহিমা ইঁহাদের গোচর অথবা উপলব্ধ হয় নাই।”[২]

সুকুমার সেন কল্লোল-সাহিত্যের আধুনিকতার বিরোধিতা করেননি; বিরোধিতা করেছেন আধুনিকতার নামে অতিরিক্ত আরোপিত অস্বতঃস্ফূর্ত কৃত্রিমতার। তিনি কল্লোল-সাহিত্যিকদের একদিকে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যপুষ্টতা, অন্যদিকে রবীন্দ্র-বিমুখতা—এই দ্বিচারী ও স্ববিরোধী মনোভাবের বিরোধিতা করেছেন তীব্রভাবে। পাশাপাশি এই রবীন্দ্র বিমুখতার কারণগুলিকে নিজস্ব ভাবনা থেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম কারণ, ‘তাহার একটা প্রধান কারণ, রবীন্দ্র-ঐতিহ্য যে প্রাচীনতর ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নাই সে বোধ তাঁহাদের ছিল না।’; দ্বিতীয় কারণ, ‘নব নব সৃষ্টির অভিমুখে রবীন্দ্র-সাহিত্যের গতিশীলতা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই।’; তৃতীয় কারণ, ‘আধুনিক বিদেশি সাহিত্যের দ্বারা ইঁহারা অনেকটাই অভিভূত ছিলেন এবং সেই প্রভাবের ফলে ইঁহারা যেন এক হাতে শাস্ত্র আর এক হাতে শস্ত্র লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। অর্থাৎ রচনা করিতে লাগিলেন এবং সেই রচনার প্রচারও জোর গলায় করিতে থাকিলেন।...ইঁহারা প্রবল বাধা বলিয়া মনে করিলেন প্রথমেই উপেক্ষিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রচনামুগ্ধ বাঙ্গালী পাঠককে।’; চতুর্থ কারণ, ‘ইহাদের আত্মশক্তিতে অগাধ আস্থা। ইঁহাদের দৃঢ় ধারণা যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘকাল কলম চালাইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন সেইহেতু তাঁহারাও বেশিদিন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার অতিরিক্ত সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।’; পঞ্চম কারণ, শরৎচন্দ্রপ্রীতি।”[৩] বিপরীতে রবীন্দ্র-বিমুখদের কয়েকজনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের উদার-স্নেহবর্ষণের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কাজী নজরুল ইসলাম, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ সাহিত্যিকদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

গোপাল হালদারের সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের নির্দিষ্ট কালপর্বে কল্লোলের বর্ণনা নেই। তবে ভূদেব চৌধুরীর ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা’ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে বিস্তারিতভাবে কল্লোল ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই খণ্ডের উপনাম ‘রবীন্দ্রযুগ : দ্বিতীয় পর্ব। এই গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে কল্লোল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের শিরোনাম “কল্লোল” ও কালোচ্ছ্বাস : রবীন্দ্র-বিরোধ-বরণের বিচিত্রতা’।

কল্লোলকে ভূদেব চৌধুরী মনে করেন ‘রবীন্দ্র-উত্তীর্ণ আধুনিকতার এক অত্যুচ্চারিত আগ্রহ’।[৪] প্রাথমিকভাবে এই ‘অত্যুচ্চারিত’ শব্দ-প্রয়োগের জন্য ভূদেব চৌধুরীকে আপাতভাবে সুকুমার সেনের মতোই কল্লোলের নেতিবাচক সমালোচক মনে হতে পারে; কিন্তু তা নয়। সুকুমার সেন যেখানে কল্লোলের সামাজিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে বাংলার প্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন, ভূদেব আলোচনা করেছেন দেশ ও বৃহত্তর বিশ্বের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে। কল্লোলকে তিনি কালের ফসল হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। আর এই কালের প্রেক্ষাপটে

তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), স্বদেশী আন্দোলনের আকস্মিক অবলুপ্তি, 'জাতীয় তারুণ্যের সার্বিক হতাশা'[৫], কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরের (১৯২২) কারণে বেকারত্ব বৃদ্ধি, যুদ্ধোত্তর কালে দারিদ্র্যের চাপ, 'স্কুলে-কলেজে শিক্ষার ক্রমপ্রসারের ফলে এবং সেই সঙ্গে গান্ধী-আন্দোলনের (অসহযোগ ১৯২২) নৈরাশ্যকর ব্যর্থতার বলি স্কুল-কলেজ ছেড়ে আসা তরুণদলের সংযোজনে দিশেহারা শিক্ষিত বেকার-সংখ্যার অপরিমেয় পরিস্ফীতি, প্রতিবেশী বিহার-উড়িষ্যা কিংবা দূরতর যুক্তপ্রদেশ (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ), না-হয়ত আরো দূরের প্রদেশে প্রদেশে প্রতীচ্য শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের দরুন বাংলাদেশের বাইরে বাঙালি শিক্ষিতের রোজগারের সুযোগ নিঃশেষ হয়ে এসে এক শ্বাসরোধকর অবস্থা তৈরি হয়েছিল। অর্থনৈতিক এই মন্দার অভিঘাতে গড়া বাঙালি শিক্ষিত তরুণের বাস্তবিক অসহায়তার' প্রেক্ষাপটে কল্লোলের আবির্ভাব। তিনি কল্লোলের উদ্ভবের কারণ খুঁজেছেন রুশবিপ্লবের সাফল্যের ফলে 'প্রলোতারিয়েত' শ্রেণির অভ্যুদয়ের নব প্রতিশ্রুতি প্রতিষ্ঠার মধ্যে। তিনি এর সমর্থনে বলেছেন,

"১৩৩২ ভাদ্র থেকে "কল্লোল" পত্রিকাতেও বলশেভিক আন্দোলন ও তার আদর্শ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাহলেও অবদমিত মানসিকতার চাপে উজ্জীবনী উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকতে পারেনি প্রায়ই। অনেক সময়েই বঞ্চনা- লাঞ্ছিত নিচের তলার মানুষদের জীবনের ছকে মধ্যবিত্ত ক্ষীয়মান জীবনাভিজ্ঞতার ঘর্ষণে অভিজ্ঞতাকে জ্বলজ্যান্ত করার আগ্রহ হয়ে উঠেছে প্রখর। প্রেমেন্দ্র মিত্র যাকে বলেছিলেন, 'আদিম পশু', 'বড়' যে-মানুষ, তার তলানি-ছাকা দগদগে ঘায়ের দাগ। ঐখান থেকেই বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মিক ভাঙনের, অবনমনের সুচনা।"[৬]

কিন্তু কল্লোলের সংখ্যাগুলোর দিকে ধারাবাহিকভাবে তাকালে বোঝা যায়, এই বলশেভিক আন্দোলন ও মার্কসীয় আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার উদ্দেশ্য কল্লোল-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের ছিল না। সুকুমার সেনের মতো ভূদেব চৌধুরী পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে। সুকুমার সেন যেখানে বিদেশি সাহিত্যিকদের সাহিত্য-পাঠের অভিজ্ঞতার সঞ্চারকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, ভূদেব চৌধুরী কল্লোলের লেখকদের ইওরোপীয় সাহিত্যধারার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সচেতন বাসনা ও নতুন আগ্রহের যোজনাকে তুলে ধরেছেন। সুকুমার সেন যেখানে কেবল ফ্রয়েডীয় চেতনার কথা উল্লেখ করেছেন এবং যৌনতাকে কল্লোল সাহিত্যে বল-পূর্বক আরোপিত করা হয়েছে বলে মনে করেছেন, ভূদেব চৌধুরী ফ্রয়েডের পাশাপাশি হ্যাভলক এলিস প্রমুখ তাত্ত্বিকদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং যুদ্ধত্তোর কল্লোল-সাহিত্যিকদের এক নতুন প্রত্যয়ে দৃঢ়ীভূত হওয়ার কথা বলেন, যে, 'লিবিডোর উদ্দামনই সকল মানসিক প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস'।[৭] এক্ষেত্রে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'ফ্রয়েড, ইউং এবং পরদেশী সাহিত্যের জ্বালায় আমারা Sex-conscious হয়ে পড়েছি'।[৮]

সুকুমার সেন কল্লোলের সাহিত্যেকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহাশিসের উল্লেখ করেছেন আর ভূদেব চৌধুরী কল্লোল সাহিত্যিকদের মৈথুনবৃত্তির পৌনঃপুন্য' দেখে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা প্রকাশের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তবে ভূদেব চৌধুরীকেও স্বীকার করতে হয়েছে, 'একটা সময়ে মৈথুন-প্রবৃত্তির প্রতি অত্যাগ্রহ-ই ''কল্লোল''-চেতনার প্রধান, প্রায় একমাত্র প্রবণতা বলে বিবেচিত হয়েছিল।'[৯] এখানে এই 'অত্যাগ্রহ' শব্দটা কিছুটা নেতিবাচক দিককেই তুলে ধরে। আসলে উন্নত শিল্পমাত্রই অনারোপিত ও অনতিরিক্ত হয়; অপরিমিতি বোধ শিল্পগুণকে ক্ষুণ্ণ করে। ইংরেজিতে বলা হয়, 'nothing extra is good'; তাই 'আগ্রহ' না বলে ভূদেব চৌধুরী 'অত্যাগ্রহ' শব্দের উল্লেখ করে কল্লোল-গোষ্ঠীর সামান্য বিরূপ সমালোচনাই করলেন; আর এই 'অত্যাগ্রহ'ই সুকুমার সেনের ভাষায় 'অতিআধুনিকতা'র পরিভাষায় বর্ণিত হয়েছিল।

সুকুমার সেন যেখানে রবীন্দ্রনাথের বিপরীত ভাবনা কল্লোলের সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করেছেন বলে মনে করেছেন, ভূদেব চৌধুরী সেখানে মনে করেছেন শেলি, কিটস বায়রন, ব্রাউনিং-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছেন কল্লোলের সাহিত্যিকরা। এরপর ভূদেব চৌধুরী কল্লোলের সম্পাদকদ্বয় সহ লেখকদের জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পাশাপাশি ফোর আর্টস ক্লাব থেকে শুরু করে কল্লোলে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখার নানা বিশ্লেষণ করেছেন পাতার পর পাতা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' গ্রন্থে কল্লোলের উল্লেখ প্রত্যক্ষভাবে নেই। তবে তিনি রবীন্দ্রোত্তর কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্যকে তিনভাগে ভাগ করেছেন ১. রবীন্দ্রানুসারী কাব্য, ২. রবীন্দ্রপ্রভাবনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কাব্য, ৩. বিশেষ উদ্দেশ্য ও রচনারীতি সমন্বিত অতি-আধুনিক কাব্য।[১০] সম্ভবত, এই 'বিশেষ উদ্দেশ্য ও রচনারীতি সমন্বিত অতি-আধুনিক কাব্য'ই হল কল্লোলের কাব্যসাহিত্য। তবে ওই 'বিশেষ উদ্দেশ্যে'র বিস্তৃত ব্যাখ্যা তিনি করেননি। তবে এই নামকরণ থেকেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রপন্থী ও কল্লোল-বিমুখ (সুকুমার সেনের মতোই) তা নির্দ্বিধায় বলা চলে। এই কারণেই নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের উপন্যাসগুলিতে 'গভীরতার অভাব' আছে বলে তিনি অকপট মন্তব্য করেছেন।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আংশিক আলোচনা পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে কল্লোলের উল্লেখ সেখানে থাকার কথা নয়। তবে 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে কল্লোল সম্পর্কিত বিক্ষিপ্তভাবে টুকরো আলোচনা পাওয়া যায়। এই প্রথম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলের 'আধুনিকপন্থী'দের দু-হাত তুলে সমর্থন করলেন।

''কল্লোল' পত্রিকায় একদল নব্য তরুণ সাহিত্যিক ও কবি নতুন সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করলেন যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের, বিশেষত রুশ ও ফরাসি সাহিত্যের নমুনা থেকে।

তাঁরা এমন সমস্ত অভাবনীয় গলিপথে যাতায়াত করতে লাগলেন যে, যাঁরা সনাতনী পন্থায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরা এতে প্রমাদ গুণলেন। সে সময়ে চারিদিকে শরৎচন্দ্রের প্রভাব ছড়িয়ে পড়লেও এই নবীন কথাসাহিত্যিকের দল তৎকালীন য়ুরোপীয় আদর্শে প্রতিদিনের বাস্তব জীবন, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারের ওঠাপড়া নিয়ে অতিশয় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, উপন্যাসেও তার প্রতিফলন দেখাতে চাইলেন।"[১১]

এখানেই কল্লোলের সার্থকতা। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সনাতন পন্থীদের কিছুটা বিদ্রূপ করেই 'প্রমাদ গুনলেন' শব্দবন্ধ ব্যবহার করলেন। তবে সুকুমার সেনের একেবারে বিপরীতে দাঁড়িয়ে 'কল্লোল' সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থানটুকু সুস্পষ্ট হয়ে গেল। তবে তিনিও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 'কল্লোল যুগে'র সাহিত্য নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেননি।

ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস' গ্রন্থে 'কল্লোল' পত্রিকাটির নাম উল্লেখ না করে রবীন্দ্র-সমসাময়িক বিভিন্ন কবি-লেখকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি রূপরেখা দেন। ফলে কল্লোলের সাহিত্যের ইতিহাসচর্চায় এই গ্রন্থটির গুরুত্ব নেই বললেই চলে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্যটীকা'—আধুনিক যুগ, দ্বিতীয় খণ্ড—(১৯৯৯) গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের খুব সংহতভাবে কল্লোল সম্পর্কে নিরপেক্ষ বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কল্লোল কেন 'নতুনত্বের প্রয়াস'—তার চারটি যুক্তিনিষ্ঠ কারণ উদাহরণ সহ বিশ্লেষণ করেন ঃ ১. বিদেশি সাহিত্য অনুকরণ, ২. রবীন্দ্রদ্রোহিতার সুর, ৩. ফ্রয়েড-অ্যাডরার-ইউং প্রভাব, ৩. নিয়মিত সাহিত্য আলোচনা ও দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত সংবাদ পরিবেশন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'অনুকরণ' বা 'অনুসরণ' শব্দ দু-টির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তিনি 'প্রভাব' শব্দটি উল্লেখ করেননি। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণে কল্লোলের অবদানের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতাটুকুও আলোচিত হয়েছে। তিনি কল্লোলের অবদান আলোচনা প্রসঙ্গে চারটি দিক সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। "(১) নীচুতলার মানুষজনের জীবনযাত্রার প্রতি গভীর কৌতূহল এবং নর-নারীর সম্পর্ক-বিচারে সংস্কারমুক্ত ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন। (২) অবিশ্বাস-সংশয় ভরা জিজ্ঞাসা, নৈরাশ্যের গ্লানি ও হতাশা, পরাজয়ের যন্ত্রণা, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ এবং ধর্ম-প্রেম-সত্য-সৌন্দর্য প্রভৃতি প্রচলিত মূল্যবোধে আস্থাহীনতা। (৩) বাস্তব পরিস্থিতির চাপের নিম্ন-মধ্যবিত্তের আর্থিক দুর্গতির প্রতি সহানুভূতি। (৪) ইউরোপীয় সাহিত্যপাঠের ফলশ্রুতিতে অপরিণত রোমান্টিক ভাববিলাস ও আবেগতারল্যকে প্রশ্রয়দান।"[১২] তবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় কল্লোলের সীমাবদ্ধতার নানা যুক্তি অসাধারণভাবে আলোচনা করলেও রবীন্দ্র-বিরোধিতার জায়গাটি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেননি তাঁর গ্রন্থে।

দেবেশ কুমার আচার্যের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড (২০০৪) বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্র নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তার মধ্যে 'কল্লোল' পত্রিকা

নিয়েও একেবারে সংক্ষেপে আলোচনা রয়েছে। তবে এই গ্রন্থের একটিও মৌলিক ভাবনার কথা লেখা নেই। লেখক এই গ্রন্থের এক স্থানে লিখেছেন,

"সৃষ্টি ও প্রচার দুটি কাজ সমান জোর দিয়ে করতে গিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এঁদের রচনায় ও প্রচারে উগ্রতা এবং আতিশয্য দেখা দেয়। এঁদের আত্মশক্তিতে অগাধ আস্থা এবং দৃঢ় ধারণা ছিল যে, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল কলম চালিয়ে সিদ্ধি লাভ করেছেন, সেহেতু তাঁরাও বেশিদিন বেঁচে থাকলে তাঁর অতিরিক্ত সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন। এর প্রমাণ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'আবিষ্কার' কবিতা।"[১৩]

আবার, সুকুমার সেন লিখেছিলেন,

"সৃষ্টি ও প্রচার দুই কাজ সমান জোর দিয়া করিতে গিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ইহাদের রচনায় ও প্রচারে উগ্রতা ও আতিশয্য দেখা দিল। ইহারা প্রবল বাধা বলিয়া মনে করিলেন প্রথমেই উপেক্ষিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রচনামুগ্ধ বাঙ্গালী পাঠককে। ইঁহাদের আত্মশক্তিতে অগাধ আস্থা। ইঁহাদের দৃঢ় ধারণা যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘকাল কলম চালাইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন সেই হেতু তাঁহারাও বেশিদিন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার অতিরিক্ত সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। ইহার প্রমাণ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা আবিষ্কার..."।[১৪]

এইভাবে কোনোরকম উদ্ধৃতি চিহ্ন ছাড়াই সুকুমার সেনের কথার পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যাচ্ছে দেবেশ আচার্যের গ্রন্থে। দেবেশ আচার্যও কল্লোল ও রবীন্দ্র বিরোধিতার অংশটি বিশ্লেষণ করেননি। দেবেশ আচার্য কল্লোলের বস্তুবাদী চেতনার সঙ্গে শরীরজাত যৌন চেতনার বিষয়টিকে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন দু-একটি বাক্যের মাধ্যমে; এই বিষয়টিকেই কল্লোল আবির্ভাবের মুখ্য কারণ হিসেবে দেখালেন শ্রীমন্তকুমার জানা তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের 'ইতিহাস' 'আধুনিক যুগ : দ্বিতীয় পর্ব' (২০১৭) গ্রন্থে। তাঁর মতে,

"প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বাঙালির চিন্তামানস ও সৃষ্টিরাজ্যে একটা আমুল পরিবর্তন আসে। জীবন সম্পর্কে পূর্বের ধ্রুব বিশ্বাস ও আদর্শনিষ্ঠার অবক্ষয় ঘটে আর্থ-সামাজিক কারণে। বাংলাদেশের ইতিহাস যুদ্ধপরবর্তী প্রায় দু'দশকব্যাপী ভাঙনের ইতিহাস তরুণ সমাজের মনে নেই অর্থনৈতিক স্থিতি, নেই সংশয়, হতাশা, দৈন্য, নীতিহীনতা। স্বাধীনতা সংগ্রাম বার বার বিপর্যস্ত হচ্ছে ব্রিটিশের ধূর্তবুদ্ধির চক্রান্ত ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে। যাঁরা সাহিতচর্চা করছেন তাঁদের কাছে এলো পাশ্চাত্যের আধুনিক কাব্যের জনক Elliot-এর 'Waste Land' ও 'Hollowmen' -এর বার্তা। জমির শস্য পুড়ে গেছে কিছু নেই চারদিকে শূন্যতার অগ্নিবলয়। হতাশা থেকে আসে নিঃসঙ্গতা ও নৈরাজ্য। বাঙালি তরুণ লেখকরা ভাবলেন জীবনটা ভাঙাচোরা—এর কোনো উদ্দেশ্য নেই। সংশয়, নৈরাশ্য, একাকীত্বের জীবন নিরর্থক। এ জীবনের কখন পূর্ণচ্ছেদ ঘটবে ঠিক নেই। তাই দেউলিয়া জীবন ঝুঁকে পড়ল সেক্স-এর দিকে। যতদিন পারো যেমন করে বাঁচো, যৌনজীবন ভোগ

করে নাও-এর স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকা মানে মানবজীবন ব্যর্থ, অসার্থক। এইসব হল পশ্চিমী দুনিয়ার নেতিবাচক জীবন-চেতনা। পাশ্চাত্যের এই ভাবধারার ধারক ও বাহক ছিল ১৯২৩ সালে প্রকাশিত 'কল্লোল' পত্রিকা।...বস্তিজীবন, নিষিদ্ধ প্রেমের কাহিনি ও যৌনতায় কল্লোলের পৃষ্ঠা ছিল পিচ্ছিল।"[১৫]

এইভাবে কল্লোলের মূল ভিত্তি হিসেবে শ্রীমন্তকুমার জানা হতাশাজাত দেহ-বাসনাকে নির্দেশ করেছিলেন। সুকুমার সেনের মতো কল্লোল-সাহিত্যের স্থূলতার দিকে নির্দেশ করে কল্লোলের নেতিবাচক দিকগুলো আরও রূঢ় ভাষায় আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে,

"...কল্লোলের মতো পত্রিকা 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'। অবশ্য এ উক্তি অতিশয়োক্তি। কল্লোলের ঐতিহাসিক ভূমিকা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু 'কল্লোল', 'বঙ্গদর্শন' ও 'সবুজ পত্রে'র মতো ঐতিহ্যবাহী যুগান্তকারী ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক ছিল না। লেখকরা পশ্চিমী উত্তেজনায় গা ভাসিয়েছেন বেশি, দেশীয় জীবনের সমাজধর্ম ও সংস্কৃতির অন্তর্দৃষ্টি ছিল না। কল্লোল প্রতিভাশালীদের লালন করেছে, নতুন প্রতিভা সৃষ্টি করতে পারেনি।...সাত বছরের আয়ুষ্কালের কল্লোল কোনো সৃষ্টির মর্যাদা পাবে কিনা তা যথেষ্ট বিতর্কের ব্যাপার।"[১৬]

অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোল' পত্রিকার অবদানকে সংশয়াত্মক প্রশ্নচিহ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন শ্রীমন্তকুমার জানা। তবে কল্লোলের হাত ধরে নানা নতুন সাহিত্যিকদের আগমন ঘটে বাংলা সাহিত্যের জগতে, একথা তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। সুকুমার সেনের কল্লোল-বিমুখ মানসিকতার সঙ্গে শ্রীমন্তকুমার জানার কল্লোল-বিরোধী মানসিকতার পার্থক্য আছে। সুকুমার সেন তাঁর রবীন্দ্র-অনুরাগের সাপেক্ষে কল্লোলের ইতিহাস রচনায় খড়্গহস্ত হয়েছেন, কিন্তু শ্রীমন্তকুমার জানা কল্লোলের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণের পশ্চাতে রবীন্দ্র সেনটিমেন্টকে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপিত করেননি; বরং তথাকথিত স্থূল যৌনতার দিকটি নিয়েই তাঁর ঘোর আপত্তি। আবার, পার্থ চট্টোপাধ্যায় যেখানে বলতে চেয়েছেন, 'প্রচারের জোরে কল্লোল যুগ কথাটি সুপরিচিত হলেও কোন লেখকই এই পত্রিকায় প্রথম লিখে খ্যাতি অর্জন করেননি।'[১৭] কিন্তু শ্রীমন্তকুমার সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোল যুগে'র ধারণাটিকে নাকোচ করে দিতে চেয়েছেন; স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'সাহিত্যে কল্লোল যুগ বলে কিছু নেই। কল্লোলে আকর্ষণ করার মতো উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। অন্যান্য পত্রিকার মতো খাড়াবড়িথোড় থোড়বড়িখাড়া ছাড়া কিছু নয়।'[১৮]

অশোককুমার মিশ্র তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (২০০৮) 'বাংলা সাময়িক পত্র' শীর্ষক অধ্যায়ে বলছেন, 'কল্লোল' পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছিল যে এই কালটি 'কল্লোলের কাল' রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে।'[১৯] অর্থাৎ 'কল্লোল যুগ বা কাল' এই পরিভাষাটির প্রতিষ্ঠা নিয়েও সাহিত্যের ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

অশোককুমারর মিশ্রের কল্লোলের আবির্ভাবের মুখ্য কারণ হিসেবে রবীন্দ্র-বিপরীতে

হাঁটার কথাই বলতে চেয়েছেন। পাশাপাশি যেখানে শ্রীমন্তকুমার জানা বাংলা সাহিত্যে কল্লোলের অবদানকে অস্বীকার করছেন, সেখানে অশোককুমার মিশ্র ঠিক বিপরীত কথা বলছেন, “কল্লোল পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের দিক পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। মানবজীবনকে সহজ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখা কল্লোলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।”[২০]

উল্লিখিত ‘কল্লোল যুগ’-পরিভাষাটি নিয়ে যে সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের যে মতবিরোধ, তাতে অংশ নিয়েছেন দিলীপ কুমার মিত্র। তিনি তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয়’ (২০০৯) গ্রন্থের স্পষ্টই বলেছেন, ‘কল্লোল একটা যুগ সৃষ্টি করেছে যা ‘কল্লোল যুগ’ রূপে অভিহিত হয়েছে’।[২১] অর্থাৎ ‘কল্লোল যুগ’ কয়েনেজটিকে প্রতিষ্ঠা দিলেন দিলীপ কুমার মিত্র। পাশাপাশি ভূদেব চৌধুরীর উদ্ধৃতিকে সমর্থনে রেখে তিনি কল্লোলের আবির্ভাবকে ঐতিহাসিক মূল্যের সাপেক্ষে বিচার করতে চেয়েছেন। সুকুমার সেন বা শ্রীমন্তকুমার জানা কল্লোলের কোলাহলকে মিথ্যে আস্ফালন হিসেবে বর্ণনা করছেন; তিনি দিলীপ কুমার মিত্র কল্লোলকে ঐতিহাসিক সত্যের মাপকাঠিতে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, “কল্লোল পত্রিকা ইতিহাসের স্রষ্টাকালের নির্ভুল দলিল। তরুণ উদ্ধত যৌবনের ভাবনা—যা সে সময়ে ছিল অনিবার্য, কল্লোলে রূপঋদ্ধ হয়েছে। নিরাবরণ উন্মুক্ত জীবনের রূপ পত্রিকায় পাওয়া যায়; ভাবের মিথ্যামোহ ও বিদ্যমানতাকে পরিহার করে সত্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন এর স্রষ্টারা; ব্রাত্য জীবন মূল্য পেয়েছে, তাদের দুঃখবেদনা দারিদ্র্য বিকৃতি ব্যভিচার সবই রূপ পেয়েছে কল্লোলের সাহিত্যে; দেহকেন্দ্রিক কামনা বাসনা যতই অনাস্বাদ্য হোক সত্য বলেই গ্রহণীয় হয়েছে।”[২২]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২০০৪) গ্রন্থে তপন কুমার চট্টোপাধ্যায় ‘সাময়িক পত্র’ অধ্যায় কল্লোল পত্রিকার সম্পর্কে একেবারে সংক্ষেপে ছাত্রপাঠ্য উপযোগী আলোচনা করেছেন। সেখানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুকুমার সেনের উদ্ধৃতির পুনরাবৃত্ত হয়েছে। নিজের ভাষায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কল্লোল সম্পর্কিত মূল্যায়ণের দিকটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি কল্লোলের সাহিত্যিকদের চিহ্নিত করতে চেয়েছিন ‘নিম্নগত মধ্যবিত্ত নাগরিক’ হিসেবে।[২৩] কিন্তু কল্লোলের সাহিত্যিকদের মধ্যবিত্ত তকমা দেওয়ার আগে প্রত্যেক সাহিত্যিকদের অর্থনৈতিক স্টেটাসের পরিসংখ্যান তাঁর সংক্ষিপ্ত সাহিত্যের ইতিহাসে নেই। তবে কল্লোলের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি নতুন কথা কিছুই বলেননি; অর্থাৎ মৌলিক ভাবনার পরিসর তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না।

সাম্প্রতিক সময়ে ‘বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাস’ (২০১৮) শীর্ষক গ্রন্থে অধ্যাপক দীপঙ্কর মল্লিক ও দেবারতি মল্লিক সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন। সেখানে কল্লোলের অবদান আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি নতুন দিকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এই বইতে বলা হয়েছে, “জমিদারের অত্যাচার, ব্যাভিচার, সুবিধাভোগের বিরুদ্ধে এই পত্রিকায় লিখেছেন প্রিয়কুমার গোস্বামী, মণীশ ঘটক, জগদীশ গুপ্ত। পণপ্রথার নিদারুণ ছবি তুলে ধরেছেন

বিমলাদেবী, নিলীমা বসু, সুকুমার ভাদুড়ী। উল্লেখযোগ গল্প হল, সুকুমার ভাদুড়ীর 'পারুল', সুরুচি বালার 'আত্মদান', নীলিমা দেবীর 'ডায়েরীর একপাতা'"।[২৪] এছাড়াও তিনি কল্লোলের সাহিত্যের দাম্পত্য প্রেম প্রসঙ্গ, নিষিদ্ধ প্রেমের গল্প, শিক্ষিত যুবকের জীবনযন্ত্রণা, ও সার্বিক অনিশ্চয়তা, সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের কল্লোলের পাতায় আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন। তবে রবীন্দ্র-বিমুখতার দিকটি তাঁরা এড়িয়ে গেছেন।

এইভাবেই নানা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা তাঁদের সাহিত্যের ইতিহাসে কল্লোল গোষ্ঠী, সাহিত্য ও যুগের কথা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন; ফলে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের জন্য ইতিহাসের আবেদনও বদলে বদলে গিয়েছে। এই প্রবন্ধে উল্লেখিত সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থগুলি ছাড়াও কল্লোলের ইতিহাস নিয়ে নানা গ্রন্থে চর্চা হয়েছে; যেমন, কল্লোলকে জানতে গেলে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দু-টি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ' ও জীবেন্দ্র সিংহরায়ের 'কল্লোলের কাল'। এছাড়া পরবর্তীতে পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাময়িকপত্র প্রসঙ্গে', রবিন পালের 'কল্লোল কালিকলমের ছোটগল্প', শম্পা চৌধুরীর 'বিষয় : বাংলা সাময়িক পত্র', দেবকুমার বসুর 'কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্যে', দীপক বর্মণের 'কল্লোল যুগের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় জীবন' ইত্যাদি নানারকম চর্চা হয়েছে। সমালোচকরা নিজস্ব বিশ্লেষণে, অনুভবে, অনুধ্যানে দেখছেন 'কল্লোল'কে।

তথ্যসূত্র :

১. সুকুমার সেন, 'কল্লোল কোলাহল জাগে', বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, নবম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ২৭৩

২. তদেব

৩. তদেব, পৃ. ২৭৫

৪. ভূদেব চৌধুরী, 'কল্লোল ও কালোচ্ছ্বাস : রবীন্দ্র-বিরোধ-বরণের বিচিত্রতা', বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, চতুর্থ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ২৬১

৫. তদেব

৬. তদেব, পৃ. ২৬৩

৭. তদেব

৮. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, এপ্রিল ২০২২, পৃ. ৯০ (টীকা অংশ)

৯. ভূদেব চৌধুরী, 'কল্লোল ও কালোচ্ছ্বাস : রবীন্দ্র-বিরোধ-বরণের বিচিত্রতা', বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, চতুর্থ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ.২৬৪

১০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, দ্বিতীয় খণ্ড, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৯, পৃ. ১৮৯

১১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্বিন্যাস সংস্করণ, ২০১৫-২০১৬, পৃ. ৪৯৩

১২. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, এপ্রিল ২০২২, পৃ. ৯০ (টীকা অংশ)

১৩. দেবেশ কুমার আচার্য্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৯, পৃ. ১৬৫

১৪. সুকুমার সেন, 'কল্লোল কোলাহল জাগে', বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, নবম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ২৭৩-২৭৫

১৫. শ্রীমন্তকুমার জানা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ : দ্বিতীয় পর্ব), ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ আগস্ট ২০২২, পৃ. ২৭০

১৬. তদেব

১৭. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, এপ্রিল ২০২২, পৃ. ৯১ (টীকা অংশ)

১৮. শ্রীমন্তকুমার জানা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ : দ্বিতীয় পর্ব), ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ আগস্ট ২০২২, পৃ. ২৭০

১৯. অশোককুমার মিশ্র, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ সংস্করণ, ৯ মে ২০১৪, পৃ. ১৬৩

২০. তদেব

২১. দিলীপ কুমার মিত্র, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয়, দিশারী প্রকাশনী, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০২২, পৃ. ২৩৬

২২. তদেব

২৩. তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০০৪, চতুর্থ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০২২, পৃ. ১৮৫

২৪. দীপঙ্কর মল্লিক. দেবারতি মল্লিক, বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাস, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, মার্চ ২০২৩, পৃ. ৯৭৪

বিশ্বকবি ও কল্লোল

বাপ্পাদিত্য ঘোষ

বিশ্বকবি আর কল্লোল! এই দুটি বহুল প্রচলিত শব্দ। শুনলেই আমাদের চোখের সামনে দুটি সীমানা চিহ্নিত হয়। দুটি যেন পৃথক স্পষ্ট রেখা। একটি যখন শেষ, আরেকটির শুরু। একটির যখন প্রায় তিরোধান, অপরটি আবির্ভাব। একটির যখন পশ্চিমকোণ-সূর্যাস্ত, অপরটির তখন সূর্যোদয়। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বকবি আর কল্লোল আপাত দুটি বিরোধী শব্দ। বিরোধী শব্দ বলতে বোঝাতে চাইছি দুটি পৃথক যুগ। একটির অবসান আর আরেকটির প্রারম্ভ। অথচ বিস্ময়ের বিষয় একটির প্রবল প্রতাপ আরেকটির জন্মক্ষণের চাবিকাঠি। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিস্ফারে, রবিরশ্মির গোলকধাঁধায় বাংলা সাহিত্য যখন রবীন্দ্রময় হয়ে উঠেছিল, বড় বড় প্রতিভাও যখন রবীন্দ্র প্রভাবে ম্রিয়মান হয়ে পড়ছিল, পৃথক পথ অস্তিত্বের ঠিকানাহীন পথে হুড়মুড়িয়ে পড়ছিল, তখন সত্যিই প্রয়োজন ছিল আরেকটি যুগের, অন্য আরেকটি পথ, ভিন্ন সাহিত্যিক গোষ্ঠী। একঘেয়েমি প্রকৃতির পরম স্পর্শ পেতে পেতে কোথাও যেন এক ধরণের অপূর্ণতা আমাদেরকে শুধুই গ্রাস করছিল। যাঁরা সত্যিই কিছু বলতে চাইছিলেন বা যাঁদের সত্যিই কিছু বলার জায়গা থাকতে পারতো রবীন্দ্র চুম্বকের প্রবল শক্তিতে সেই আত্মশক্তি তাঁরা হারাতে বসেছিলেন। রবীন্দ্র প্রতিভার পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে তাঁদের অস্তিত্ব হারিয়ে গিয়েছিল তাঁরা নিজেরাই টের পাননি। বলাবাহুল্য ‘কল্লোল’ রবীন্দ্র ঘরানার বাইরে নূতন এক পথকেই চিহ্নিত করেছিল। দেখিয়েছিল নূতন দিশা। একঘেয়েমি অন্ধকার ভেদ করে সূচনা করেছিল নূতন এক যুগ—বিচ্ছুরিত নতুন আলো।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন জাগে কে এই রবীন্দ্রনাথ! তাঁর কাছ থেকে বেরোনোর উপায়ই বা ছিল না কেন? তিনি কি সত্যিই কোনো জাদুকর? তিনি কোন কাঠি ছুঁইয়ে আমাদেরকে এমন করে মোহিত করতেন? ইত্যাদি একাধিক প্রশ্ন। এ সব প্রশ্ন জাগাটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন উনিশ শতকে ষাট-এর দশকে। আর জন্মেছিলেন পরাধীন ভারতে, ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক আলোয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা বলা ভালো বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর তেমন ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন মূলত স্বভাব-কবি। ‘ভোরের পাখি’ বিহারীলালকে অনুসরণ করে কবিতা রচনা করতে করতে তৈরি করেছিলেন উজ্জ্বল এক স্বতন্ত্র সাহিত্য ধারা। এবং প্রায় আমৃত্যু কবিতার পাশাপাশি অসংখ্য উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, গান আর কত কী লিখতে লিখতে নিজেই হয়ে উঠেছিলেন স্বতন্ত্র এক প্রতিষ্ঠান। এই বিপুল সাহিত্যসৃষ্টি, প্রতিভার বৈচিত্র, বিশাল কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তিতে ও বিশিষ্টতায় প্রকৃতপক্ষেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন মধ্যাহ্নের রবি। তারপর নোবেল প্রাইজ লাভ তাঁর প্রতিভাকে বিশ্বকবির আখ্যায় ভূষিত করে। স্বাভাবিকভাবেই এমন এক প্রতিভাকে অনুসরণ করা ছাড়া বাংলা কবিদের

আর কোনও পথ ছিল না। বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়:

"তাঁদের কাছে, রবীন্দ্রনাথের পরে, কবিতা লেখা কঠিন হওয়া দূরে থাক, সীমাহীনরূপে সহজ হ'য়ে গেলো; ছন্দ, মিল, ভাষা, উপমা, বিচিত্ররকমের স্তবক বিন্যাসের নমুনা সব তৈরি আছে, আর-কিছু ভাবতে হবে না, অন্য কোনো দিকে তাকাতে হবে না, এই রকম একটা পৃষ্ঠপোষিত মোলায়েম মনোভাব নিয়ে তাঁদের কবিতা লেখা আরম্ভ এবং শেষ।"[১]

রবীন্দ্র-কবিতার গভীরে অবগাহণ করলেই সত্যিই আমরা দেখি রবীন্দ্র-কবিতা দুর্গম নয়, নিগূঢ় নয়। একবার পড়লে বারবার পড়তে ইচ্ছে জাগে। না আছে কোন কঠিন শব্দ, না আছে কোন অপ্রচলিত শব্দ। না আছে মস্তিষ্কপীড়িত কোন শব্দজাল। প্রকৃতির নরম সবুজ ছবি, শান্ত সুন্দর সৌম্য এক মূর্তি। এই পার্থিব বিশ্ব তাঁর কাছে ছিল সুন্দর সুশীতল পরম করুণাময় ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আর এই কারণেই রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করা বিশ শতকের শূন্য দশকের কবিদের পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছিল। এর বাইরেও যে কিছু থাকতে পারে, এর বাইরেও যে ভাবনার প্রয়োজন তা কবিদের মস্তিষ্কে তখনও পর্যন্ত আসেনি বা এলো না।[২]

অবশ্য না আসারও যে কারণ ছিল না এমনটি নয়! বিশ শতকের নানান সংকট, নানান সমস্যা, রাজনৈতিক নানান ঘূর্নাবর্ত ইত্যাদি একাধিক কারণ 'কল্লোল'-এর পথ নির্বাধ আর সহজসাধ্য করেছিল। প্রায় দেড়শ' বছর ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকতে থাকতে ভারতীয়রা বুঝতে পেরেছিল তাদের ইচ্ছা পূরণ হওয়ার নয়। স্বাভাবিকভাবে ইংরেজদের প্রতি যে মোহগ্রস্ততা তা পরে পরেই আলগা হতে শুরু করেছিল। আর বিংশ শতাব্দী সূচনায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ব্রিটিশদের প্রতি ভারতীয়দের নঞর্থক মানসিকতাকেই প্রকট করে। ভেতরে ভেতরে জাতীয় কংগ্রেসের কার্যাবলী নিয়েও মানুষের মনে নানান সন্দেহ জাগে। শুধু জাতীয় সমস্যা নয়, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সব কিছুকেই যেন নূতন করে ভাবতে শেখায়। আমাদের দেশে যে মধ্যযুগীয় দৈব নির্ভরতা এতদিন পর্যন্ত রাজত্ব করছিল উনিশ শতকেও যার অবসান হয়নি। বলাবাহুল্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে যেন তার সমাপ্তি ঘটল। এই যুদ্ধের পথ ধরেই এলো রুশবিপ্লব, যার আঁচ পড়ল ভারতবর্ষসহ একাধিক দেশে। কংগ্রেস নেতা বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতায় ধরা পড়ল কম্যুনিজমের কথা। পরে পরেই প্রতিষ্ঠা পেল কমিউনিস্ট পার্টি। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদ করলেন 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। 'সমাজতন্ত্রবাদ' নামক গ্রন্থ লিখলেন গোপাললাল সান্যাল। ১৯২৩ সালে বোম্বাই থেকে 'সোসালিস্ট' এবং 'জনবাণী' পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করল। পাশাপাশি গান্ধীবাদী চিন্তাও ভারতীয়দের মনে স্থান পেতে শুরু করল। তবে সব শ্রেণির মানুষকে এই চিন্তা আশ্রয় দিতে পারেনি। ভেতরে ভেতরে সশস্ত্র বিপ্লববাদ সক্রিয় হতে শুরু করে। খুব গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় আন্তর্জাতিক নানান ভাবনাস্রোত সচেতন শিক্ষিত মানুষকে নূতন করে ভাবতে শেখায়। সঙ্গে যুক্ত হয় বিজ্ঞানের ক্রমাগ্রসরতা। যন্ত্রসভ্যতার প্রয়োজনীয়তা

দিনে দিনে বাড়তে থাকায় বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের নির্ভরতা যেন ক্রমশ বাড়তে থাকে। সংস্কারের খোলস ছেড়ে মানুষ ক্রমশ যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে। মার্কস, বিজ্ঞানের পাশাপাশি আসে মনোবিজ্ঞান। বিশেষ করে ফ্রয়েডের প্রভাব পড়ে ব্যাপক। জাতীয় আর আন্তর্জাতিক স্তরে এমন টালমাটাল পরিস্থিতি, বিজ্ঞানের বিপুল আবিষ্কার, মানুষের দর্শনকে নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত করে, আর তারই প্রভাব পড়ে সাহিত্যে।

"শুধু শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি নয়, মানুষকে মর্যাদা দিতে, সমানাধিকার দিতে রুশবিপ্লব বা পাশ্চাত্য সাহিত্য আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। প্রমত্ত ভক্তি, বিশ্বাসের বদলে এসেছে জড়বাদী দর্শনের শিক্ষা। সোপেনাওয়ার, নীটে, সার্ত প্রমুখের দর্শন-তত্ত্ব বাঙালী লেখকদের চেতনায় বিপ্লব এনেছে। ফ্লবেয়ার, জোলা, হামসুন, লরেন্স, গোর্কি, ইবসেন, ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয় প্রমুখের লেখার মধ্যে জীবনের অন্যরূপ, নতুন ভাবনা, আঙ্গিক দেখে বাঙালী লেখকরা বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছে। যে বোদলেয়ারকে রবীন্দ্রনাথের 'আসবাবের কবি' মনে হয়েছিল, তাঁকেই বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবিরা গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। তাঁর 'ক্লেদজ কুসুম'-এর গন্ধে আচ্ছন্ন হলো বাংলা কাব্য।"[৩]

আমরা পেলাম আধুনিক কবিতা। রবীন্দ্র-কবিতার পাশাপাশি সৃজিত হল নতুন ধারা, নতুন বিষয়, নতুন আঙ্গিক আর নতুন ঘরানা। আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর 'আধুনিক কবিতা সংকলন'-এ আধুনিক কবিতার একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিলেন "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী আর ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কবিতা বলে গণ্য করেছি। বলাবাহুল্য নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতা, বর্তমান জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ, আত্মবিরোধ ও অনিকেত মনোভাব, অবচেতন মনের ক্রিয়া, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাব, মননধর্মীতা, ভগবান ও প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস। সর্বোপরি রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নূতন সৃষ্টির পথ সন্ধান এই ছিল আধুনিক কবিতার সাধারণ লক্ষণ। প্রকরণেও আধুনিক কবিরা নিয়ে এলেন বহুল পরিবর্তন। বাক্রোক্তি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ, প্রচলিত উপমা আর বর্ণনার পরিবর্তন, উপমা প্রয়োগে স্বতন্ত্রতা, অর্থঘনত্ব, শব্দপ্রয়োগ, মিতব্যয়তা, গদ্যছন্দের আমদানী, শব্দালংকার অপেক্ষা অর্থালংকারের গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি আধুনিক কবিতার প্রকরণগত বৈচিত্র স্বতন্ত্র এক কবি গোষ্ঠির ভাবনা চিন্তায় জায়গা পেল।"

আর তারই মাধ্যম হয়ে উঠল কল্লোল। আর এই কল্লোল যুগের সূচনায় যাঁদের ভূমিকা স্মরণযোগ্য তাঁরা হলেন চারজন নক্ষত্র মোহিতলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ আর নজরুল। এঁদেরকে আমরা রবীন্দ্র-স্বতন্ত্র কবিগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করি। সত্যেন্দ্রনাথে যার উৎস নজরুলে তারই পরিণতি।

"নজরুল ইসলাম নিজে জানেননি যে, তিনি নূতন যুগ এগিয়ে আনছেন। তাঁর রচনার সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই। যে-প্রক্রিয়া

অবচেতনভাবে তাঁর মধ্যে শুরু হ'লো, তা সচেতন স্তরে উঠে আসতে দেরি হ'লো না। যাকে 'কল্লোল'-যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে-বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"[৪]

অবশেষে মাসিক পত্র রূপে 'কল্লোল' বের হয়। যুগ্ম সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ আর দীনেশরঞ্জন দাশ। অবশ্য সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হয় দীনেশরঞ্জন দাশের আর সহকারী সম্পাদক গোকুচন্দ্র নাগ।

দীনেশরঞ্জন লিখেছেন, "নাম ঠিক করিয়া ফেলিলাম কল্লোল। গোকুলের ব্যাগে ছিল এক টাকা আট আনা। আমার কাছে ছিল টাকা দুই এই সম্বল লইয়া দোকান হইতে কাগজ কিনিয়া একটা ছোট প্রেসে কল্লোলের প্রথম হ্যাণ্ড বিল ছাপা হল।"[৫]

কল্লোলের কার্যালয় স্থাপিত হয় দীনেশরঞ্জনের দাদার বাড়ি ১০/২ পটুয়াটোলা লেনের দু'খানা ঘরে। কিন্তু ভাদ্র ১৩৩১ থেকে ২৭ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। আবার ১৩৩২ সালের মাঘ মাস থেকে পটুয়াটোলা লেনের বাড়িতে দীনেশরঞ্জন 'কল্লোল'কে সরিয়ে আনেন। মাত্র সাত বছরের পরমায়ু নিয়ে কল্লোলের জন্ম হলেও পত্রিকাটি উনিশ শতকের বিশের দশকে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। সম্পাদকের স্বীকারোক্তি—

"আশা আছে তবু যদি কোনদিন শত শত যুগ পরে
  বধির শিলার ফেটে যায় বুক
গুঁড়াইয়া যায় তার নিজ সুখ
    জল- কল্লোল তুলি ভীমরোল বক্ষ তাহার ভরে!"[৬]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এই যে কল্লোলের আদর্শ সম্বন্ধে অনেকের মনে ধোঁয়াশা ছিল। কেউ কেউ একে অশ্লীল পত্রের পর্যায়ে ফেলতেন বা হাল্কা ধরণের গল্প মাসিক বলে মনে করতেন। কিন্তু 'কল্লোল' তেমনটি ছিল না; ছিল কল্লোল কর্তৃপক্ষের সিরিয়াস কিছু আদর্শ

"যে সুর যেদিন বাজিয়া উঠিবে, তাহা সময়ের হৃদয়বার্তা কল্লোলের তাহা অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং ধ্রুবত্ব ও সৌন্দর্য শুধু কল্লোলের আকাঙ্ক্ষিত ছিল না, যুগের ফসলের প্রতি আগ্রহ ছিল প্রচুর।"[৭]

'কল্লোল যুগ'-এ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোলের প্রসঙ্গে বলেছেন, "কল্লোল বলতে বুঝতে পারি সেটি কি। উদ্ধত্ত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা সমস্ত বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।"[৮]

মাত্র সাড়ে তিন টাকাকে সম্বল করে 'কল্লোল' হামাগুঁড়ি দিতে শুরু করল। কল্লোলের আকার ছিল ডিমাই সাইজের পনেরো ফর্মার মতো। আর প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল প্রথমে চার আনা, পরে বেড়ে দাঁড়ায় পাঁচ আনা। বলাবাহুল্য সেকালের বিশিষ্ট যে পত্র পত্রিকাগুলি প্রবাসী বা ভারতবর্ষ এদের আকার ছিল ডবল ক্রাউন সাইজের। আর ছিল রঙিন ছবি। কল্লোলের সাইজ ছোট হওয়ায় বিক্রির জন্যও তাকে আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়।

কারণ বিজ্ঞাপনের জায়গা এতে ছিল না বললেই চলে। পরে কল্লোল চতুর্থ বর্ষ হতে (গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পর, বৈশাখ ১৩৩৩) থেকে ডবল ক্রাউনের আকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে আমৃত্যু। 'কল্লোল'-এর হয়তো আভিজাত্য ছিল না, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য ছিল। আরো অন্যান্য পত্রিকার মতো রঙিন ছবি এতে ব্যবহার করা হয়নি অন্তত গোকুলচন্দ্রের জীবদ্দশায়। গোকুলচন্দ্র ছিলেন আর্ট কলেজের ছাত্র, রঙিন ছবির বদলে ফটোচিত্র ও সাদা-কালো স্কেচই তাঁর কাছে ছিল প্রিয়। বিভিন্ন মনীষীদের ফটোচিত্র ছাড়াও কল্লোলে জায়গা নিতো ব্যঙ্গচিত্রও। আসলে দুজন সম্পাদকই ছিলেন চিত্রশিল্পী। রূপে নয়, ব্যতিক্রমী ভাবনায় কল্লোল সেকালে মানুষের মন জয় করেছিল। কিন্তু কল্লোল সাত বছরের মাথায় বন্ধ হয়ে যায়।[৯]

অবশ্য 'কল্লোল'-এ যে প্রবল উচ্ছ্বাস ভাবের দিক থেকে এসেছিল তা নয় ভাষায়, প্রকরণে ও কল্লোল এনেছিল নবতর প্রয়াস। এ প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মূল্যবান মন্তব্য স্মরণীয় :

"কল্লোলকে' নিয়ে যে প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস এসেছিল তা শুধু ভাবের দেউলে নয়, ভাষার নাটমন্দিরে। অর্থাৎ 'কল্লোলের' বিরুদ্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে। ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায়। রীতি ও পদ্ধতির প্রকৃতিতে। ভাষাকে গতি ও ভাবকে দ্যুতি দেবার জন্যে ছিল শব্দসৃজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনাশৈলী বিচিত্রতা। এমনকি বানানের সংস্করণ। যারা ক্ষুদ্র, মূঢ়মতি, তারাই শুধু মামুলি হবার পথ দেখে আরামরমণীয় পথ যে পথে সহজ খ্যাতি বা কোমল সমর্থন মেলে, যেখানে সমালোচনার কাঁটা-খোঁচা নেই, নেই বা নিন্দার অভিনন্দন। কিন্তু 'কল্লোলের' পথ সহজের পথ নয়, স্বকীয়তার পথ।"[১০]

সেক্স বা যৌনজীবন কল্লোলগোষ্ঠীর একটা প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। কল্লোলগোষ্ঠী মনে করতেন সেক্স জীবনেরই একটা অঙ্গ। শারীর ধর্মের প্রকাশ সম্ভোগস্পৃহা ও প্রজননবৃত্তি। প্রাক-কল্লোলপর্বে সেই দিকে নজর দেওয়া হয়নি। আর বলাবাহুল্য কল্লোল গোষ্ঠীকে এ সাহস জুগিয়েছিল বাঙালি লেখকদের যৌন বাস্তবতা। আর বিদেশি লেখকদের যৌন স্বাধীনতা। কল্লোলের নানা গল্পে তাই প্রাধান্য পেল দেহগত বর্ণনা, কল্লোলীয় রচনায় তাই শারীরিক তৃষ্ণারই জয়জয়কার। বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা' বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পঞ্চস্বর'-এ গভীরভাবে এলো কামাতুরতা আর সম্ভোগ। শুধু এতেই কল্লোল সীমাবদ্ধ থাকলো না; কল্লোলের পাতা ভরে উঠল অত্যাচার আর বিদ্রোহের বিস্ফোরণে দরিদ্র আর নিপীড়িত মানুষের আত্মস্বরের ধ্বনিতে। কল্লোলের পৃষ্ঠায় নানা জাতির মানুষ, নানা শ্রেণির মানুষ, নানা ধর্মের মানুষ পেল প্রবেশাধিকার। জীবনের নানা রহস্য, নিঃসঙ্গ, গভীর মনোজগৎ, তীক্ষ্ণাগ্র ভাষা ও সূক্ষ্মতাধর্মী বিশ্লেষণে ফুটে উঠল। বলাবাহুল্য যা আমরা এতদিন পাইনি। কল্লোল নিয়ে এল পালাবদলের হাওয়া রবীন্দ্র সাহিত্যে বা রবীন্দ্র ভাবনাবৃত্তের বাইরে আরেকটি চলন, আরেকটি ছন্দ। দৃশ্যগন্ধস্পর্শময় জীবনানন্দ আর মননপ্রধান অবক্ষয় চেতন

সুধীন্দ্রনাথের মতো কবিরা সরাসরি সংগ্রামে নামলেন। আর তাঁদের শক্তি জোগাল কল্লোল। একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণ সরে এসেছিল কল্লোল। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তের দুবেলা খেতে না পাওয়া সংসারে। কয়লাকুঠির খোলা বস্তিতে বা ফুটপাতে। প্রতারিত আর পরিত্যক্ত মানুষের এলাকায়।" আসলে রবীন্দ্র ভাবাদর্শ আর কল্লোনীয় দর্শনের মধ্যে পার্থক্য এখানেই চিহ্নিত হয়েছিল। রবীন্দ্র ভাবনায় যে শান্ত, সুন্দর, সৌম্য, শ্লীলতা, শোভনতা ধরা পড়েছিল কল্লোলীয় গোষ্ঠীরা তাকে মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। কল্লোল কবিগোষ্ঠী কখনোই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের বিরোধী ছিলেন না। বরং কল্লোল সম্প্রদায় মন থেকে রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা ও সন্মান করতেন। আর এই আধুনিকতা নিয়ে দুই দলেরই মতানৈক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আধুনিক কাব্য'-এ সুস্পষ্টভাবে তাঁর মতার্দশকে চিহ্নিত করেছেন—

"কিন্তু আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালো পাহাড়ি তাল-ঠেকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করি নে। ইনফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বলব না, ইনফ্লুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ বাহ্য। ইনফ্লুয়েঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার ভদ্গাতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞানে যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।"[১১]

রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতাকে শ্রদ্ধাসহকারে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন। বাস্তবতাকে অবমানিত করে সমস্ত আব্রু ঘুচিয়ে দেওয়াকে সাধনার বিষয় বলে চিহ্নিত করতে চাননি। আর এই কারণে য়ুরোপ সায়েন্সে কৃতিত্ব দেখালেও রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সাহিত্যে শীর্ষে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। কল্লোলগোষ্ঠী অতিরিক্ত যৌনমত্ততাকে শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়; সেকালে অনেকেই পছন্দ করেননি। সেক্স নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি অন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছেও 'অরুচিকর' বলেই ধিকৃত হয়েছিল। আর এই যৌনতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ফলে কল্লোলের পাতায় জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি ধরা পড়েনি। তবে রবীন্দ্রনাথকে যেমন কল্লোলগোষ্ঠী শ্রদ্ধা ও সন্মান করতেন পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথও অন্তর থেকে এই কল্লোলের পুত্রসম লেখকগোষ্ঠীকে স্নেহ করতেন। নজরুল থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখেরা ছিলেন স্নেহধন্য লেখক। রবীন্দ্রনাথ একদিন শিশির কুমার ভাদুড়ির নাট্যনিকেতনে

'শেষরক্ষা' নাটকের অভিনয় দেখতে আসেন। সে অভিনয়ে কল্লোলেরও নিমন্ত্রণ ছিল। অভিনয় শেষে শিশির ভাদুড়ি নাটক সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলে রবীন্দ্রানাথ তাঁকে তাঁর বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানান। এমনকি কল্লোলের সাহিত্যগোষ্ঠীকেও নিমন্ত্রণ জানাতে ভোলেননি। আমরা দেখেছি কল্লোলগোষ্ঠীর পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছবিও স্থান পেয়েছে। লক্ষ করলে আমরা দেখি সজনীকান্ত দাশ যখন কল্লোলের বিরোধী হয়ে আদা জল খেয়ে মাঠে নেমেছেন। 'কল্লোল' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জানায়—

"উৎকর্ণ হইয়াই ছিলাম, শ্রবণ মাত্র একটু চকিত হইয়াই বুঝিতে পারিলাম, গিরি-প্রপাতেরই কল্লোল সমুদ্র নহে। পূর্বগামী অন্য এক নির্ঝরণী পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক স্থানে স্খলিত হইয়া একটা বড় রকমের পতনের ফলে "ফলের" (falls) সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা সর্বৈব "ফল" (false) সমুদ্র কল্লোল। আমরাও নাগাল ধরিয়া ফেলিলাম, ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল।"[১২]

বা শনিবারের চিঠিতে কল্লোলের অশ্লীলতা, যৌনতা, দুর্নীতি ও পারিবারিক সম্পর্কের অবস্থান, ফর্ম ও স্টাইলের বিশৃঙ্খলা নিয়ে সজনীকান্ত যখন প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন এবং সুবিচারের আশায় রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন, তখনও রবীন্দ্রনাথ থাকেন নীরব, নিরুত্তর। তবে এর জবাব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ পরে। সেখানে হট্টগোল ছিল না।[১৩] পরে অবশ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে পত্র বিনিময়ের সময়ে লেখেন যে, তা শনিবারের চিঠির শাসনের দ্বারাই অপরপক্ষে সাহিত্যের বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্ছে। আমরা বেশ বুঝতে পারি কল্লোলের প্রতি কোন বিরূপতা তাঁর ছিল না। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্থিরীকৃত ভাবনা থেকে সরে আসতেও কোনোদিন পারেননি।

কল্লোলগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে পৃথক সাহিত্যধারা সৃজন করলেও রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের একাধিক লেখা কল্লোলে জায়গা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বারোটি কবিতা এখানে স্থান পায়। 'শেষ অর্ঘ্য' কবিতা প্রকাশিত হয় ১৩৩১ সালের বৈশাখে। এই বছরই চৈত্র সংখ্যায় বের হয় 'অন্ধকার' কবিতাটি ১৩৩৩ সালে। ১৩৩২ সালের বৈশাখে 'মুক্তি' কবিতা আর আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয় 'শেফালী' কবিতা। ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'কবির কামনা'। ১৩৩৪ সালে আমরা পেলাম 'স্বাক্ষর' কবিতাটি। 'নূতন' এবং 'নবীন সাধক' কবিতা দুটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ সালের বৈশাখে। ১৩৩৬-এর শেষে 'দুয়ার' কবিতটি। এমনকি গোকুলচন্দ্র রবীন্দ্র সংগীতকে ব্যবহার করলেন কল্লোলের পাতায়। এছাড়াও কল্লোলে রবীন্দ্রনাথের চিঠি প্রথম চৌধুরী 'বীরবল' ছদ্মনামে আলোচনা করেন। ভবানী ভট্টাচার্য রবীন্দ্র-বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ এতে প্রকাশ করেন। এমনকি শুধু রবীন্দ্রনাথ নন; ঠাকুরবাড়ির একাধিক লেখক অবনীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন সত্যিই কি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বকবি কল্লোলকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য

করতে পেরেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি অবশ্যই অশ্লীলতাকে প্রবেশ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। জীবৎকালে লেখা একাধিক প্রবন্ধ তারই প্রমাণ দেয়। সাহিত্য শাশ্বত সত্যের অংশীদারী হোক এটাই তিনি চেয়েছিলেন। তিনি চাননি ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারাকে বাংলা সাহিত্যে ফোকাস করতে। যৌনতা বা অশ্লীলতার বাড়াবাড়ি তাঁর চিন্তাস্রোতে কোনদিনও প্রশ্রয় পায়নি। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে হয়তো রবীন্দ্র কবিতায় অশ্লীলতা আসেনি। কিন্তু 'চোখের বালি', 'যোগাযোগ'-এ সামান্য হলেও শারীরিক সম্পর্কের ইঙ্গিত লক্ষ করা গেছে। আমাদের মনে হয় বিশ্বকবি কল্লোলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেননি। যৌনতা ছাড়াও কল্লোলীয় চেতনার একাধিক দিক যেমন বস্তির জীবন, সাধারণ মানুষের দুঃ খ- দারিদ্র্যের প্রসঙ্গ তাদের জীবনচর্চা, জীবনসংগ্রাম বিশ্বকবি এড়িয়ে যেতে পারেননি। পাশাপাশি কল্লোলগোষ্ঠীর একাধিক লেখকের মাটির কাছাকছি মানুষদের বর্ণনায় তিনি খুশি হয়েছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ প্রমুখের বাস্তবতা, নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রশংসা না করে পারেননি।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের একাধিক রচনা কল্লোলীয় আদর্শের বুননেই নির্মিত। 'পুনশ্চ' পর্বের একাধিক কবিতা 'ছেলেটা', 'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে', 'বাঁশি'-র মতো কবিতায় কবির দৃষ্টি পড়েছে তলিয়ে যাওয়া পিষ্ট হওয়া প্রাণের 'পরে। স্নেহার্দ্র চিত্তে কবির পরম প্রেমে প্রতিটি চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবিতার কাকলি নয় এই পর্বে ধরা পড়ে বাংলা গদ্যে কবিতার রস। যে অপূর্ণতা, যে অতৃপ্তি, যে অভিযোগ এতদিন বিশ্বকবিকে আঘাত করেছিল তা যেন পূর্ণতার পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণচ্ছায়ায় ঝলমলিয়ে উঠল। 'পুনশ্চ' অর্থাৎ পুনরায় নিজেকে আবিষ্কার। রবীন্দ্রনাথ যেন আত্ম-আবিষ্কারের আগ্রহে ব্যাকুল হলেন। শেষ পর্বের গল্প 'রবিবার', 'ল্যাবরেটরি', 'শেষকথা'য় পাঠকবিশ্ব খুঁজে পায় নব্যধারা। বিশ্বকবি আর কল্লোলের মধ্যে যে আপাত-বিরোধ পুঞ্জীভূত ছিল তা ক্রমে ক্রমেই অপসৃত হয়। রবির বিশ্বকবি হয়ে ওঠার পেছনে কল্লোলের আবির্ভাবকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

১. বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যচর্চা, চতুর্থ সংস্করণ জুন ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.১০৫

২. রবীন্দ্রনাথ যা করেননি, তাঁদের কাছে করবারই যোগ্য ছিলো না সেটা কিংবা তেমন কিছুর অস্তিত্বই ছিলো না; রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন, ক'রে যাচ্ছেন, তাঁরাও ঠিক তা-ই করবেন, এত বড়োই উচ্চাশা ছিলো তাঁদের। আর এই অসম্ভবের অনুসরণে তাঁরা যে এক পা এগিয়ে তিন পা পিছনে হ'ঠে যাননি, তারও একটি বিশেষ কারণ রবীন্দ্রনাথেই নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথে কোনো বাধা নেই আর এখানেই তিনি সবচেয়ে প্রতারক তিনি সব সময় দু হাত বাড়িয়ে কাছে টানেন, কখনো বলেন না 'সাবধান! তফাৎ যাও!"১ বুদ্ধদেব

বসু, সাহিত্যচর্চা, চতুর্থ সংস্করণ জুন ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.১০৫
৩. তরুণ মুখোপাধ্যায়, একালের কবিতাঃ পাঠকের দর্পণে, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০২, পুস্তক বিপণি, পৃ. ১৩
৪. বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যচর্চা, চতুর্থ সংস্করণ জুন ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১১১-১১২
৫. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কল্লোলের কাল, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৭
৬. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কল্লোলের কাল, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.১৮
৭. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কল্লোলের কাল, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.২২
৮. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৯৫৭, এম.সি.সরকার এণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ.৩০
৯. "কল্লোলের আয়ুষ্কাল প্রায় সাত বছর। তার প্রথম সংখ্যা বার হয় ১৩৩০ সালের বৈশাখে, শেষ সংখ্যার প্রকাশ ১৩৩৬ সালের পৌষে। পত্রিকাটির প্রকাশ ও পরিচালনার পেছনে একদল তরুণের অক্লান্ত উদ্যম ছিলো বটে কিন্তু কোনো সাহিত্যোৎসাহী বিত্তবানের সাহায্য বা সমর্থন ছিলো না। কল্লোলের কোলাহলে এমন কি প্রবীণ সমাজে সাড়া জাগলেও তার আর্থিক স্বাচ্ছল্য কোনোদিনই বেশী ছিলো না।" জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কল্লোলের কাল, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.৪৩
১০. "কেমন ক'রে রবীন্দ্রনাথকে এড়াতে পারবো অবচেতন কখনো বা চেতন মনেই এই চিন্তা কাজ ক'রে গেছে এঁদের মনে; কোনো কবি, জীবনানন্দের মতো, রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে স'রে গেলেন, আবার কেউ- কেউ তাঁকে আত্মস্থ ক'রেই শক্তি পেলেন তাঁর মুখমুখি দাঁড়াবার। এই সংগ্রামে সংগ্রামই বলা যায় এটাকে এঁরা রসদ পেয়েছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে, পেয়েছিলেন উপকরণরূপে আধুনিক জীবনের সংশয়, ক্লান্তি, বিতৃষ্ণা।" বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যচর্চা, চতুর্থ সংস্করণ জুন ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.১১২
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবন্ধ সমগ্র, দ্বিতীয়খণ্ড, 'আধুনিক কাব্য', পুর্ণমুদ্রণ জানুয়ারী ২০১১, বিকাশ সংস্করণ, পৃ.৮৫৫
১২. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কল্লোলের কাল, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.৪০
১৩. "প্রথম দিন রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ (সাহিত্যরূপ, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৫) দিলেন তাতে জোর ছিলো রূপ সৃষ্টির ওপর। তাঁর মতে সাহিত্যের আধুনিকতা বিষয় নিয়ে নয়, নবরূপ নিয়ে। তিনি বললেন, 'পূর্বযুগের সাহিত্যই হোক, নবযুগের সাহিত্যেই হোক, চিরকালের প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে; হে গুণী, কোনঅপূর্ব রূপটি সকল কালের জন্য সৃষ্টি করলে।"১৩ জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কল্লোলের কাল, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.৪১-৪২

'রবীন্দ্রেতর কবি' ও বিষ্ণু দে : প্রসঙ্গ কল্লোল

গ ণে শ ব সু

"কবিতা আসলে লেখকের ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ নয়—আসলে তা ব্যক্তিস্বরূপ থেকে নিষ্ক্রমণ। কবিতা তো আসলে লেখাই হয় শব্দের ছন্দে আর অবচেতন Subconscious -এর তাড়নায়।"[১] কথাগুলো কবি বিষ্ণু দে-র। বলেন, স্বকথিত জীবনী 'ছড়ানো এই জীবন'-এ। আরো খানিকটা এগিয়ে 'রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে সম্ভবত একমাত্র সর্বন্ধর, বিশ্বতোমুখী কবিপ্রতিভা' ছবির মতো এঁকেছেন তাঁর কবি হয়ে উঠবার সময়টিকে। জানাতে ভোলেননি "স্কুলে থাকবার সময়েই প্রগতি, কল্লোল, ধূপছায়া, পূর্বাশা এই সব পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলুম। বাবা মাঝে মাঝে একটু বিচলিত হতেন—'তুমি কাদের সঙ্গে মেশো'? তারা তো বয়সে তোমার থেকে অনেক বড়ো। তুমি রাত আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে বাড়ি ফেরো না—এটা ঠিক নয়।' আমি বললুম, 'না, আমি তো আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই বাড়ি ফিরি।' এবং ফিরতুমও। প্রগতির জন্য চাঁদা তুলে পাঠাতুম ঢাকায় বুদ্ধদেববাবুর কাছে।"[২] এখানেই আরও বলেন,"প্রেমের কবিতা লেখা তো সব থেকে সহজ, আর আমি তো নানারকম ছন্দ নিয়ে বাংলায় এক্সপেরিমেন্ট করছি—ট্রিওলেট, ভিলানেল, বালাদ—এই রকম নানা ফরাসি ও অন্যান্য ছন্দের ফর্ম্।"[৩]

এর থেকে বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে কবির পুরোপুরি কবি হয়ে ওঠার আগের থেকেই বিষ্ণু দে ছিলেন খুবই আত্মসচেতন। স্বপ্নে দেখতেন কবিতার ভুবন। সেখানে তিনিও স্বাতন্ত্র্যদীপিত একজন অভিযাত্রী। এ ব্যাপারে তাঁর আবিশ্ব আকাঙ্ক্ষা, আতত আগ্রহ তাঁকে করে তোলে পরম পরিশ্রমী। বিদেশি কবিতার ছিলেন অনুরক্ত, সতর্ক পাঠক। অনুশীলনে, চর্চায় রাখতেন না একফোঁটাও খামতি। বলেন, "মিত্র স্কুলে পড়বার সময়েই 'সন্দেশ' পত্রিকায় একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। একটি ছবির ওপর কবিতা লিখলে দশ টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। কবিতা পাঠিয়ে দিলুম। পুরস্কার অবশ্য পাইনি—কিন্তু মজা লেগে গেল কবিতা লেখা বিষয়ে, তাই লিখতে লাগলুম।...পুরস্কারটা না পেলেও কবিতা লেখার মজাটা পেয়ে লিখে গেছি নিজের খুশিতে নানা রকম কৌতূহলে—যদিও তখন স্বাভাবিক ভাবেই মুগ্ধ ছিলুম সত্যেন দত্তের ছন্দের বাহারে। আত্মীয় বন্ধুর বিবাহের পদ্যও লিখেছি অন্য এক তাগিদে বা ফরমায়েশে। একটি রচনা মনে পড়ে 'প্রবাসী'র মতো উচ্চবর্ণ পত্রিকাতে পাঠিয়েছি—এবং একটু অবাকই হয়েছিলুম, যখন ডাকটিকিটি সত্ত্বেও ফেরৎ আসেনি। উল্টোদিকে আবার অবাক হয়ে যাই কান্তিচন্দ্র ঘোষের স্বতঃপ্রবৃত্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। তখন লিরিক্যাল কবিতাই বেশি—সত্যেন দত্তের ভক্ত। হঠাৎ স্কুলে পড়তেই নিজের এই ধরনের কবিতার বিষয়ে, নিজের লেখার বিষয়ে বিতৃষ্ণা আসে— শ'দুয়েক কবিতা ড্রামাটিক ভাবে ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিই। শ্যামল রায় ছদ্মনামে গল্পও লিখেছি। তার পর ছেড়ে

দিলুম। মনে হলো— 'দে কেম সো প্যাট'—ইংরেজিতে যেমন বলে—সহজে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না।"[৪]

ব্যক্তিসর্বস্ব অনুভূতি-প্রকাশক রচনাকে তিনি জোলো বলেই এক সময়ে মনে করতেন। কৈশোরক ভাবোচ্ছ্বাস বর্জনে তিনি বেশ কড়া হ'য়ে যান। এই বোধের মূলে হয়তো ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। প্রাণিত হন তরল পরিহাসপ্রিয়তার পরিবর্তে বক্রোক্তিভাষিতা ও বস্তুতন্ত্রপ্রিয়তায়। 'বীরবলী' ঘরানায় বিষ্ণুবাবু লিখতে শুরু করেন শ্লথতাবর্জিত ছোটোগল্প। কবিতায় ফরাসি আঙ্গিক। নিজত্বের তাগিদে আসে অভিনবত্ব। ছন্দের আত্মশক্তি ধরা পড়তে লাগলো, ঘ'টে থাকে স্পন্দের সঞ্চারণা। জড়িয়ে-মিশিয়ে রইলো দেশ-কাল-সমাজ- সংস্কৃতি মননের আততি, দ্বান্দ্বিকতায় মনের স্বরূপত্ব, সচেতনতার বিরল বিশ্ব। এই ভাবেই তাঁর সঙ্গী হয়ে ওঠেন একদা আত্মসচেতন এলিয়ট, পল এলুয়ার, পাবলো নেরুদা ও মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা। আরাগঁর উক্তি-ও তাঁর কাছে মনে হ'তো ধ্রুব—"কবিতার ইতিহাস তার টেকনিকের ইতিহাস।"....তিনি বলতেন "ও আমি তো আজ অবধি কবিতার প্রতিটি অঙ্গ বিষয়ে না ভেবে, আগের লেখা আর পড়া কাব্যাবলি বিষয়ে সচেতন না হয়ে কবিতা লিখিনি।"

'কল্লোল' (১৩৩০ বঙ্গাব্দ/১৯২৩ খ্রি.) হলো মাসে-মাসে বেরুনো সাহিত্যপত্র, তবে গল্পেরই প্রাধান্য ছিল এতে বেশি। বাংলায় প্রকাশিত সামরিকপত্র[৬] হিসেবে এই ম্যাগাজিনটির ভূমিকা বিশেষ গৌরবের। কালান্তরের খানিক সাক্ষ্যও।

বাংলা কবিতায় তৃতীয় আধুনিকতার সঞ্চার ঘটে, আমাদের মতে, বিশ শতকের তিরিশের দশকে। এখনও তারই রেশ চলছে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা, আঙ্গিকের বিচিত্রতা, বহুতর স্বরগ্রাম, আপাত উত্তর-আধুনিকতার দোহাই পেড়ে। রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে দেওয়া এই একুশ শতকের প্রথম সিকিতেও পুরোপুরি সম্ভব হয়নি, যদিও চেষ্টার কোনো খামতি ছিল না কবিদের। বা নেই। 'ঠাকুরকে টপকে যাওয়া গেল না', (ফরহাদ মজহার-এর 'রক্তের দাগ মুছে রবীন্দ্রপাঠ'; পৃ. ২২; ২০১০)।

তবে, বিশ শতকের প্রথম আড়াই দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রীয়স্বরগ্রামের পাশাপাশি অন্তত দুটি অনুপর্ব রয়েছে রবীন্দ্রেতর কবিদের দখলে। অন্যটিকে শিথিলভাবে বলতে পারি রবীন্দ্রস্বানুরঞ্জিত কবিতার পর্যায় হিসেবে। এঁরাও যে সকলে মিলে কোরাস গেয়েছেন তা নয়। ভুলতে পারি না যে, কবিতা মাত্রই কমবেশি সচেতন বাক্‌শিল্প ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। মন্দ কবিতা অবশ্যই এর উল্টো। 'Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the expression of personality, but an escape from personality. But, of course, only those who have personality and emotions know what it means to want to escape from these things." কথাগুলো টি. এস. এলিয়টের, ১৯১৭-য়, Points of View-তে)। এই বিচারবিশ্লেষণ সহজে মেলে না তৃতীয় আধুনিক-পূর্ব কবিতায়।

তবু, ব্যতিক্রমী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী। স্বাতন্ত্র্যদীপিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রকরণে ও সমকালীনতায়। প্রাক্-বলাকার রাবীন্দ্রিক মুগ্ধতার ছাপ কমবেশি নিজস্বতা নিয়েই পড়েছিল যতীন্দ্রমোহন-কুমুদরঞ্জন-করুণানিধান-কালিদাস রায়- জসীমউদ্দিন- প্রমথনাথ রায়চৌধুরীতে। এঁদের অভিহিত করা যায় প্রাক্-রবীন্দ্রেতর কবি হিসেবে। অবশ্য সত্যেন দত্ত-কে প্রেরণাদায়ক হতে দেখি নজরুলে, জীবনানন্দে—একেবারে গোড়ার দিকে। এমনকি শঙ্খ ঘোষেও (সত্যেন দত্তের 'কয়াধু', নজরুলের 'লিচু চোর' যদি প্রাকরণিক দিক দিয়ে আমাদের স্মরণে আনে, ভিন্ন বাস্তবতায়, যথাক্রমে 'যমুনাবতী' ও 'লজ্জা'কে; এমনকি ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিকম্মন্যতাও তাঁর নানা কবিতায়)। তা হলেও পঞ্চাশের কবির খ্যাতির হেরফের ঘটেনা। টপিক্যাল শঙ্খ ঘোষ তো কালের প্রহরী, বহুচারী সত্তা।

তৃতীয় আধুনিকতার ঠিক আগের কয়েকজন কবিকে বলেছি 'রবীন্দ্রেতর কবি'। যে-কবিরা সচেতনভাবেই রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্নতার অনুসারী বা ভিন্ন পথ-সন্ধানী তাঁরাই রবীন্দ্রেতর (রবীন্দ্র + ইতর। ছান্দস। ✓ই + তর। অনুরূপ লাতিনে iterum; হিব্রুতে iter. মানে হল—ভেদাশ্রয়, অন্য, অপর, অন্যতর, একতর, ভিন্ন।)। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়ার্ধে—আধুনিক বাংলা কবিতার তৃতীয় পর্বের প্রস্থানভূমি নির্মাণে এঁদের ভূমিকা ছিল অনেকটাই সেতুবন্ধের। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলাম এই পর্যায়ের প্রোজ্জ্বল প্রতিনিধি, অভিনব অভিজ্ঞতা। আস্তিক্য দর্শনকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করান 'দুঃখীবাদী যতীন্দ্রনাথ'। রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসার মরিয়া চেষ্টায় তাঁর কবিতা অনেকটা হতাশা ও জরায় আচ্ছন্ন, মরুময়তায় পাণ্ডুর, মূল্যবোধহীনতায় পীড়িত, অবক্ষয়ে হতমান। সবরকম ছুঁতমার্গের বাইরে গিয়ে সহমর্মী হবার চেষ্টা করেছেন নেতির দিক থেকে, আর্ত মানুষের দুঃখ-বেদনা-হতাশ্বাসের। কসুর করেননি লোকসাধারণের জীবন সমাজের শরিক হতে।

> "ঠাঁই ঠাঁই ঠাঁই কাঁদিছে নেহাই আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
> শ্রান্ত সাঁড়াশি ক্লান্ত ওষ্ঠে আলগোছে ছেনি চুমে।
> দেখগো হোথায় হাপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি;
> ক্লান্ত নিখিল, করগো শিথিল তোমার বজ্রমুঠি।"

অবশ্য, প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে খানিকটা বদলে গিয়েছিলেন তিনি—

> "আজ মনে হয় এ দগ্ধ ভালে সেই ছিল মোর প্রেম।
> যারে বলেছিনু—নাই
> চেতনার কূলে বসি চিতামূলে গায় মাখি তার ছাই।"

রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্নতার অর্থী ছিলেন মোহিতলাল মজুমদারও। শোপেনহাউয়েরকে তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় উল্টো দিক থেকে। মনন ও আবেগের রসায়নে তিনি ছিলেন

আত্মঘোষণায় সোচ্চার। বুদ্ধদেব বসুর কথায়, "মনে হয়, যজন-যাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কারসাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর (মোহিতলালের) কবিতায়।"
অলজ্জ উচ্চারণে তিনি ছিলেন দীপ্র—

"ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা।"

কিংবা,

"জানিতে চাহি না আমি বাসনার শেষ কোথা আছে,
ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি জ্বালি কামানল।"

কিংবা,

"দেহ-অরণিরে মন্থন করি লভি যে অগ্নি-কণা—
সেই দহনের মিঠা-বিষে মোর মদনের আরাধনা।"

মোহিতমানসের এই দিকটির ছায়া কি আরো প্রলম্বিত ও আরো তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে বুদ্ধদেব বসুর কোনো কোনো লেখায়, পঞ্চাশের সুনীল-শক্তির মধ্যে অথবা হাংরির ক্ষুৎকাতরতায় আভাসিত হয়নি? তবে, তাঁর অধিকাংশ কবিতাই ভাস্কর্যধর্মী, চিন্তা ও তত্ত্বের রসায়নে ধ্রুপদী।

নজরুল ঝড়ের পাখি, শুধু বিদ্রোহী নন। শোষণমুক্ত মানবসমাজের স্বপ্নদ্রষ্টা, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মুক্ত মানবিকতার কণ্ঠস্বর, সাম্যবাদী বাক্‌শিল্পী। চির নবীনের, চির যৌবনের কবি। মানুষ, মানুষ আর মানুষই গড়ে তোলে তাঁর কবিতার ভুবন। তিনি সময়ের অভিজ্ঞতা, বর্তমানের কবি। তিনি 'অগ্নিবীণা', 'সর্বহারা'র সাত সমুদ্র, দশ দিগন্ত। তিনি 'বিষের বাঁশী' আবার 'প্রলয় শিখা'। তিনি সাম্যবাদী। অকপটে বলেন, "আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জল-ও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে তাঁর ক্ষুধাদীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতেও দেখেছি।" প্রায় সমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও জীবনানন্দের প্রথম দিকের কবিতায় নজরুলের আলতো ছায়া কি দেখি না? সুকান্তের কবিতাও কি ভাবের ও স্বরের দিক থেকে সত্যিই যোজন দূরত্বে অবস্থিত?

এ সব মেনে নিয়েও মানতে হয় 'কল্লোল' করে 'সবুজ পত্রে'র ব্যূহভেদ। মূলত, গল্পের কাগজ, তবে হাত ধরল অল্পস্বল্প কবিতারও। নান্দনিক আড্ডার শিল্পিত অভিপ্রায় থেকেই এর উদ্ভব। ৮৮বি হাজরা রোডের একটি ঘরে বসত বৈঠক, পরে ১০/২ পটুয়াটোলা লেনে। পোশাকি নাম 'ফোর আর্টস ক্লাব', কয়েক মাস ছিল তার আয়ু। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রশিল্প ও কারুশিল্পের, সমঝদারি চার সাহিত্যশিল্প-প্রাণ, স্বপ্নচারী ব্যক্তিত্বের বৈঠক সাড়া ফেলল তরুণ, অনতিতরুণ কবিলেখকদের মধ্যে। শুরু হয় আনাগোনা, সাহিত্য আলোচনা, বিচার বিশ্লেষণ। নতুনত্বের মৌতাতে সকলেই মশগুল। কাগজ বেরুলো, তবে, 'ভারতী'র

বিষণ্ণ বিদায় থেকে 'সবুজ পত্র' ধরনের নয়। অতগম্ভীর, মননশীল, প্রগতিশীলতার ঝাঁঝ যেন কড়া না হয়। সম্পাদক হলেন দীনেশরঞ্জন দাস। গল্পকার। এক হিসেবে কল্লোল তাঁরই ব্রেন চাইল্ড। এমনিতে কোনো কাজ করতেন না তিনি। করতেন 'কল্লোলে'র সম্পাদনা। উজাড় করে দিতেন সময়, সম্বল, উদ্যম। 'মাঠের নেশা', 'পথিক বন্ধু', 'ভুঁইচাঁপা' গল্প-সংকলনের দৌলতে তখন তিনি যথেষ্ট পরিচিত। সহযোগী হিসেবে জুটলেন গোকুলচন্দ্র নাগ। শিল্পী মানুষ, দিলদরিয়া মেজাজ, মজলিসের নিপুণ নায়ক। তিনিও গল্পলেখক। 'পথিক', 'মায়ামুকুর' তাঁর অন্যতম সৃষ্টি। আবেগপ্রবণ গোকুল ছিলেন উদারতায় উজ্জ্বল, বন্ধুতায় বিমোহন। বিদেশি লেখকদের রচনার সঙ্গে পরিচিতি ঘটানোর প্রয়োজনে মৌলিক গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি পশ্চিমি কবি-সাহিত্যিকদের রচনার ভাষান্তর এখানে বেরোতে থাকে। বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী উতলা হল,' প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' প্রকাশিত হলে হৈ-চৈ পড়ে যায়। 'কল্লোল' কেবল তর্কের তরঙ্গই তোলেনি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নজরুল, হেমেন্দ্রকুমার, মণীন্দ্রলাল বসু, বিষ্ণু দে, মণীশ ঘটক, জসীমউদ্দিন, রাধাচরণ চক্রবর্তী, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, অপরাজিতা দেবী, অজিতকুমার দত্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, সরোজকুমার রায়চৌধুরীরাও একেবারে নিত্যনতুন ঝড়ের কেন্দ্র করে তোলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় না কি 'কল্লোল'কে করে তোলেন একরকম জীবনসঙ্গী। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচী, কালিদাস নাগ, ধূর্জটীপ্রসাদ, জগদীশ গুপ্ত, ভূপতি চৌধুরী, মুরলীধর বসু, নলিনী সরকার-ও আসতেন, লিখতেন মনের মতো করে।

জমাটি আড্ডায় কল্লোল ছিল সততই কল্লোলিত। স্বল্পকালীন 'ফোর আর্টস ক্লাব' হয়ে উঠেছিল কবি-সাহিত্যিকদের সৃজনশীল বৈঠকখানা। 'কল্লোল'-এর অমোঘ আকর্ষণ ছিল ম্যাজিকের মতো। কেউ কেউ অবশ্য আসতেন মাঝেমধ্যে। অতুল বসু, যামিনী রায় আসতেন খোলা হাওয়ার টানে, শিল্পিত স্বভাবে। আসতেন, আসর জমাতেন মীরা সান্যাল, নিরুপমা দাশগুপ্ত, উমা দাশগুপ্ত, সুনীতি দেবী, সতীপ্রসাদ সেন, শিবরাম চক্রবর্তী। কবিতা লেখেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কুসুমকুমারী দেবী, যতীন্দ্রমোহন—মাঝে মাঝে 'কল্লোলে'র আড্ডায় আসতেন, লিখতেন জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়। নেই নেই করে জীবনানন্দ-ও (এখানে প্রকাশিত হয় ১২টি কবিতা; ১৩৩২-এর ফাল্গুন থেকে ১৩৩৬-এর বৈশাখ সংখ্যা পর্যন্ত)।

তবে, একথা মানতেই হবে 'ভারতী'র শেষ লগ্নে 'সবুজ পত্র' ঝড় তুলেছিল বাঙালির মননে, মেধায়, যথার্থ আধুনিকতার উপস্থাপনে, বিশ্বসাহিত্যের সদর্থকতার সঞ্চারণে। তারও অবসান যখন সূচিত প্রায়, এসেছিল 'কল্লোল' মাসিকটি। মন হালকা হলো পাঠকের। বিতর্কও শুরু হয়। স্তুতি-নিন্দার তোয়াক্কা না করে তরুণ-অনতিতরুণ কবি-লেখকেরা এক ধরনের মুক্ত বাতাস বইয়ে দেন। খানিকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন মধ্যমেধার পাঠকেরা।

সেকালের ইউরোপীয় সাহিত্যের আবেগতাপিত, ছুঁতমাগহীন, আপাত বিদ্রোহ-মনস্কতার চল্‌তি ঘরানার আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে 'কল্লোল'। ভাবের, বিষয়ের, রূপরীতির দিক থেকে বিশেষত ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে। একে অবশ্য আঁভা-গার্দ বলা যায় কিনা সন্দেহ রয়েছে। দুঃসাহসিকতা অটুট ছিল সেদিনের প্রেক্ষিতে। রুচিশোভনতা দাঁড়িয়ে পড়ে প্রশ্নের মুখে। বিদ্রোহ যতটা না সার্থকতা পায় নেতিবাচকতার, তার চেয়ে বেশি পেয়ে যায় প্রচারগরিমা। রবীন্দ্রনাথ যে এঁদের প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি তা সত্য। এঁরাও ওপর-ওপর রবীন্দ্রবিরোধিতাকে প্রায়-শ্লোগানে পরিণত করেন, যদিও ঠাকুরকে এড়ানো সম্ভব হয়নি মাটি-জল-আকাশ-বায়ু থেকে। রবীন্দ্রনাথও পরে লেখেন (জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ১১-সংখ্যক কবিতায়)

> "সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
> নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে
> সেটা সত্য হোকে,
> শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
> সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
> ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে শৌখিন মজদুরি।"

তা সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত বাঙালি পাঠক 'কল্লোলে'র মধ্যস্থতায় পেতে শুরু করে এক ধরনের নতুন ভুবনের পরিচয়। গল্প তৃষ্ণাতুররা পান অভিনব স্বাদ। ট্রিটমেন্টের অভিনবত্ব। কিছু কিছু কবিতায়-ও তা আস্বাদিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবেগসর্বস্বতা আধিপত্য বিস্তার করে। 'সবুজ পত্রে'র মননশীলতা, আধুনিকতাকে পাশ কাটিয়ে, কিংবা তার প্রতিক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে এসেছে 'কল্লোল'। দল হয়। গোষ্ঠীবদ্ধতা শুরু, যদিও যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলরাও পুরোপুরি অপাংক্তেয় হন নি। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালের নঙর্থক প্রভাবজারিত একাংশের হতাশা, বৈরাগ্য, বেকারত্ব, অনিশ্চয়তা, অনীহা, অনিকেত অবস্থা তীব্র তীক্ষ্ণ সংবেদনা, অভিমান—সংক্ষেপে সার্বিক বিপন্নতা 'কল্লোল'কে করে রেখেছিল কল্লোলিত। রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসার আরোপিত যুদ্ধ তো ছিলই। তবে 'কল্লোল'-এর ঢেউ বেশি দূরে এগোতে না এগোতেই ঢেউ ভেঙেও যায়। 'কালি কলম' আসে, 'প্রগতি'।[৩] 'ধূপছায়া' থেকে যায়। আশ্রয়হীনের আশ্রয় হয়ে ওঠে এ সব পত্রপত্রিকা।

হ্যাঁ, 'কল্লোলে'র কোলাহল একদিন থমকে যায়। কিন্তু রেশ তার রয়ে গেল অল্পবিস্তর অনেক দিন। অজিত দত্ত সম্পাদিত 'দিগন্ত' পত্রিকার প্রথম বর্ষে বেরোয় 'কল্লোলের দিন'। সুকুমার সেন অভিহিত করেন 'কল্লোলের দল'। অন্নদাশঙ্কর রায়-ও ১৯৩০-এ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে একটি চিঠিতে লেখেন "ভালো কথা 'কল্লোলে'র দলের কেউ বা কারা কিছুকালের জন্য ইউরোপে আসেন না কেন?" মাহবুবুল আলম 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে

(দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০৮) জানান, 'কল্লোল' সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট পত্রিকা। দীনেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে এই মাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি অতি আধুনিক লেখকগোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে ১৩২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ......কল্লোল প্রায় সাত বছর চলেছিল, কিন্তু এই অল্প সময়েই একটা প্রগতিশীল লেখক গোষ্ঠীর[৯] সমাবেশ ঘটাতে পেরেছিল।" (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য' গ্রন্থে প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৬৯; পৃ. ৪৩০) গোপাল হালদার ও তাঁর 'আড্ডার আশ্রয়' রচনায় 'কল্লোলের দল' বলে উল্লেখ করেন। বুদ্ধদেব বসু একাধিকবার 'কল্লোল-দল' বলতে কসুর করেনি তাঁর 'কালের পুতুল'-এ— (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ২৩-২৪)। যেমন, আমরা সকলে 'কল্লোলের দল' নামে "পরিচিত ছিলুম"; কিছুদিন পরে দেখা গেল 'কল্লোল' -দলের ঐকান্তিকতা আর টিকছে না।" একবার মাত্র 'কল্লোল'-যুগ শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন ঐ 'কালের পুতুলে', ২৫ সংখ্যক পৃষ্ঠায়। ভূদেব চৌধুরী 'কল্লোল গোষ্ঠী' বলেও একবার লেখেন 'কল্লোল-কালি কলমের যুগ', আবার বলেন 'কল্লোল-ধারা', 'কল্লোলের কাল' ইত্যাদি ইত্যাদি।

'কল্লোল যুগ' নামে আস্ত একটা বই লিখলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৫৭)। নামটি বাজার পেল ভালো, গোগ্রাসে গিললেন পাঠকেরা। হয়তো এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন 'কল্লোল' পত্রিকাকে ঘিরে বাংলা সাহিত্যে গড়ে ওঠা আবেগতাপিত এক ধরনের যুগ-মানসিকতা। এবং আমাদের মতে তা একপেশে। তা খণ্ডিত।

নৈয়ায়িকও প্রশ্ন তুলতে পারেন 'যুগ'[১০] কেন? বরং জীবনানন্দের মূল্যায়ন অনেক বেশি সত্যের কাছাকাছি। "উত্তরবৈরিক যুগ 'কল্লোলের" সময় থেকে আরম্ভ হয়েছিল।.....এ যুগ বাংলাকাব্যের ইতিহাসে কয়েকটি ধারাসমাবেশের যুগ বলে—সাহিত্যে অনুত্তরণ নামে যে দীর্ঘ নদী আছে তার এক মহৎ অববাহিকার মতো ছড়িয়ে থাকবে—যেখানে কোনো একজন রবীন্দ্রনাথ নেই, কিন্তু এমন কয়েকজন কবি আছেন যাঁরা সকলে মিলে একসঙ্গে উপস্থিত আছেন বলে কোনো দ্বিতীয় একক রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন নেই।"[১১]

আমাদের মতে, অনেক রবীন্দ্রনাথই এক সময়ে হয়ে ওঠেন 'উত্তররৈবিক' যুগের স্থপতি।

অবশ্য, একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হলেও 'বহু রবীন্দ্রনাথ' মনের ভিতর উঁকি দিলেও দিতে পারের 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডের 'অঙ্গদের রায়বার' পড়লে। যেমন—

"অঙ্গদ বলে সত্য করে কওরে ইন্দ্রজিতা।
এই যত বসি আছে সব কি তোর পিতা।।
তারি জন্য এত তেজ গুরু লঘু না মানিস।
তোর বাপের এত তেজ ইন্দ্রে বেঁধে আনিস।।
ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্য রে তোর মাকে।

এক যুবতী এত পতি ভাব কেমনে রাখে।।"

কবি দিনেশ দাস কি সেজন্য 'প্রণমি'তে স্বীকার করেন—

"আকাশে বরুণে দূর স্ফটিক ফেনায়
ছড়ানো তোমার প্রিয় নাম
তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা
কোনখানে রাখবো প্রণাম।"[১২]

গণেশ বসু লেখেন—

"তিনি জীবনের সংগীত
তিনি সত্তার নির্ভর
তিনি মুক্তির পথ নির্দেশ
তিনি চলমান সুন্দর।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথ লেখেন, (বৈশাখ ১৩৩৫) "সাহিত্যের যুগ বলতে কী বোঝায় সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েছে। কয়লার খনি বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে। এইরকমের কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে চিহ্নিত করা যায়, এ কথা মানতে পারব না। সাহিত্যের মতো দলছাড়া জিনিস আর কিছু নেই। বিশেষ একটা চাপরাশ-পরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। কোনো একটা চাপরাশের জোরে যে-সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার গৌরব খুব চড়া গলায় প্রমাণ করতে দাঁড়ায়, জানব, তার গোড়ায় একটা দুর্বলতা আছে। তার ভিতরকার দৈন্য আছে বলেই চাপরাশের দেমাক বেশি হয়। য়ুরোপের কোনো কোনো লেখক শ্রমজীবীদের দুঃখের কথা লিখেছে, কিন্তু সেটা যে-ব্যক্তি লিখেছে সেই লিখছে। দীনবন্দু মিত্র লিখেছিলেন 'নীলদর্পণ' নাটক, দীনবন্ধু মিত্রই তার সৃষ্টিকর্তা। ওর মধ্যে যুগের তকমাটাই সাহিত্যের লক্ষণ বানিয়ে বসে নি। আজকের দিনে বারো-আনা লোক যদি চরকা নিয়েই কাব্য ও গল্প লিখতে বসে তা হলেও যুগসাহিত্যের সৃষ্টি হবে না —কেননা তার পনেরো আনাই হবে অসাহিত্য। খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে বলেই করেন; সেটা সৃষ্টি করবার তাগিদ, সেটা ভিন্ন লোকের ভিন্নরকম। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খনি আপনিই এসে পড়ল তো ভালোই। কিন্তু সেই এসে পড়াটা যেন যুগধর্মের একটা কায়দার অন্তর্গত না হয়। কোনো একটা উদ্ভটরকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গি বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি এ কথা বলবার চেষ্টা হয় যে, যেহেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয় নি সেইজন্যেই এটাতে সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা হল, সেও

অসংগত। পাগলামির মতো অপূর্ব আর কিছুই নেই, কিন্তু তাকেও ওরিজিন্যালিটি বলে গ্রহণ করতে পারি নে। সেটা নূতন কিন্তু কখনো চিরন্তন নয়—যা চিরন্তন নয় তাকে সাহিত্যের জিনিস বলা যায় না। ....এক যুগ আর এক যুগকে লুপ্ত না করে আপনার স্থান পায় না, এইটেই যদি সত্য হয় তবে তাতে কেবল কালেরই পূর্বাপরতা প্রমাণ হয়; তার চেয়ে বেশি কিছু নয়....এ কথা মনে রাখা দরকার, সাহিত্যের সম্পদ চিরযুগের ভাণ্ডারের সামগ্রী—কোনো বিশেষ যুগের ছাড়পত্র দেখিয়ে সে আপনার স্থান পায় না।”[১৪]

এটাও তো ভোলা যায় না যে, ‘যুগ’ শব্দে সাধারণত গণ্ডিবদ্ধ থাকে উত্তর-মাধ্যমিক ও চতুরঙ্গের বিভাজন। আমাদের মতে ‘কল্লোল যুগ’ নয়। তা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের আবেগ-আপ্লুত অতিশয়োক্তি। এমনকি, বাংলা সাময়িকপত্রের ভুবনে ‘কল্লোল’ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ লিটল ম্যাগাজিন, তবে হঠাৎ আলোর ঝলকানি কিংবা ঝড়বাদলের মধ্যিখানে ঠাডার ধমক এবং চমক-ও নয়। বস্তুত যুক্তির চেয়ে ‘কল্লোল’ হল খানিক পরাক্রম, যৌবনের রোমান্টিক জোয়ার। উৎস উন্মোচনে তার গৌরব হলেও একই ভূমিকায় ঋদ্ধ ‘কালি-কলম’, ‘প্রগতি’-ও। কল্লোলের মূল্যায়ন সঙ্গীহীনতায় অকৃতার্থ, তা একই সঙ্গে কালিক ও পশ্চিমি ঘরানার আংশিক আশ্রয়। বলাই বাহুল্য; ‘কল্লোলে’র সমকালীন অন্যান্য পত্রিকা ছিল শ্রমজীবীদের মাসিক মুখপত্র ‘সংহতি’, ‘শনিবারের চিঠি’, ‘উত্তরা’, ‘পূর্বাশা’, ‘প্রগতি’, ‘ধূপছায়া’, ‘বিচিত্রা’ প্রভৃতি।

‘ছড়ানো এই জীবনে’র দৌলতে আমরা জেনে গেছি যে স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর অনেক আগের থেকে বিষ্ণু দে পদ্য লেখার মকশো করতেন। লিখেছেনও অগণন। কোনো কোনোটা কবিতা হয়ে উঠতো, আবার কয়েকটা কবিতা না হয়ে মুখ থুবড়ে পড়তো। ছন্দের কানটা তাঁর সজাগ ছিলো বরাবরই। লিরিকের প্যাঁচ-পয়জারও করায়ত্ত। বাংলার পাশাপাশি ইংলিশ কবিতারও গুণগ্রাহী হয়ে গিয়েছেন। বিশেষ করে কবি ও কবিতা বিষয়ে যা-ই পেতেন তা থেকে রসাস্বাদনে কোনো খামতি থাকতো না।

তাঁর গ্রহিষ্ণু চেতনার রূপ পেতে থাকে বেশি-বেশি করে কবিতার নির্মিতিতে এবং প্রবন্ধে। গল্প লেখারও ঝোঁক পেয়ে বসে। লিখতেও থাকেন একে একে। অর্থাৎ সমন্বিত হলো কবিতা-প্রবন্ধ-গল্পের ত্রিভুজ। ‘প্রগতি’তে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প ‘পুরাণের পুনর্জন্ম’। ‘প্রগতি’তেই ছাপা হয় ‘ফিরে ফিরতি’, ‘হিরো’, ‘বাসররাত্রি’; ‘কল্লোলে’র কার্তিক সংখ্যায় (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) ‘পৌরাণিক প্রশাখা’, ‘ধূপছায়া’য় ‘সুররসিক’ (কার্তিক ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ)। ‘সৌর ট্রাজিডি’ও মুদ্রিত হয় ‘ধূপছায়া’য়। এ সব গল্প ঠিক বিষ্ণু দে-র মানসভুবনের মানানসই ছিল না। তিনি তা কবুল-ও করেন পরবর্তী সময়ে। ‘গল্পগুলি বাজে, লজ্জাকর ভাবে বাজে’ বলে ঘোষণা করেন। ভাবের দিক থেকে জোলো রোমান্টিকতাই এখানে প্রধান। সত্যি কথা বলতে গেলে, গল্পগুলি ছিল ‘কল্লোলীয়’ ঘরানার, আর টেকনিকের দিক

থেকে ছিল অনেকটা প্রমথ চৌধুরীয়। তবে, বিষ্ণু দের কবিতায় মিথ-প্রসিদ্ধি-র বিরল বিকিরণ এখানেও খানিকটা বিচ্ছুরিত।

প্রখর আত্মসচেতন, মননদীপিত কবির কলমে এরকম তরল রোমান্টিকতা বেমানান। আত্মস্থতার প্রকট অভাবও বিস্ময়কর বটে। বীরবলী ব্যক্তিবাদ-ও তাঁকে যে একসময় আচ্ছাদিত করে রেখেছিল তাও মূর্ত হয় এই সব গল্পে। তবে, তিনি স্ব-মূল্যায়নে অনুভব করেন গল্প লেখা তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। তিনি সরে আসেন একরকম গল্পরচনার ভুবন থেকে মননবৈচিত্র্যে, টেকনিকের অদ্বয়ে, ব্যক্তির আততিতে, বিশ্ববোধে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, ‘কল্লোলে’ তিনি আকৃষ্ট ছিলেন, দুর্বল ছিলেন না। আবার, তিনি শিল্প-সাহিত্যে যান্ত্রিক মার্কসবাদেও স্বস্তি খোঁজেননি। তিনি জানতেন, আমাদের প্রত্যয়, “Each class creates an art that corresponds to its class interests and aesthetic requirements. But among works of art there are many which have survived their class and age. These are works which vividly and truthfully reflect nontransient, general traits inherent in people of the most diverse eras and also works which make it possible to understand the essence of an era or a class. Among them are the finest sculptures of ancient Greek masters, paintings of the Renaissance, music of Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, the writings of Shakespeare, Goethe, Balzac, Pushkin, Lev Telstoi, Romain Rolland, Maxim Gorky, and many other works of art which long ago became the possession of all mankind. From this follows another distinction of art, continuity of its development. The art of each new era preserves all that was progressive and good in the art of the preceding eras.”[১৫]

যাইহোক আতশকাচের নিচে ‘কল্লোল’ পত্রিকাকে রাখলে তার রচনার বিষয়গুলো যেভাবে পাওয়া যেতে পারে তা মোটামুটি এরকম—

আমাদের মতো অনেকের কাছে প্রশ্ন হতে পারে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র কবিতা কি প্রকাশিত

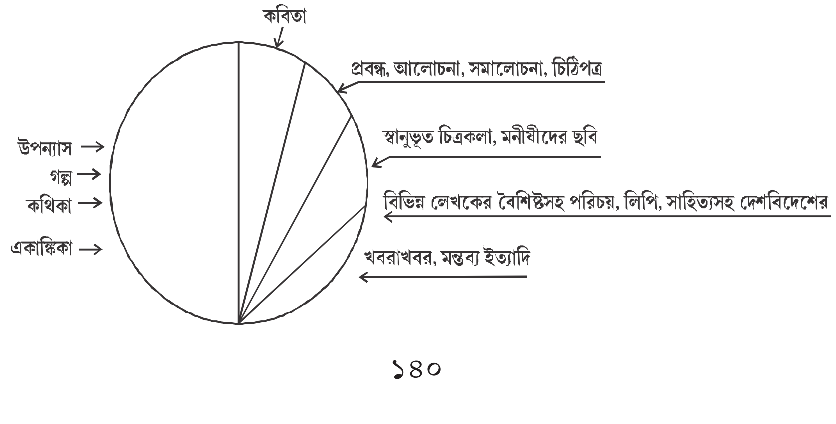

হয়েছে 'কল্লোলে' কখনো! যদি না হয়ে থাকে, কেন নয়? উত্তর খুঁজি, মেলে না। বিষ্ণু দে-রও কবিতা বেরিয়েছে সম্ভবত একটি। জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, মণীশ ঘটক থেকে খ্যাত-অখ্যাত, তরুণ-অতিতরুণ, প্রবীণ বরিষ্ঠ অনেকেরই কবিতা, অথচ সুধীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত!

"১৯৩১ সালে 'পরিচয়' প্রথম প্রকাশিত হয়, শ্রাবণ মাসে, ত্রৈমাসিক হিসেবে, পরে ১৯৩৬ থেকে মাসিক। একক সম্পাদক হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন ১৯৪০ পর্যন্ত। পরে যুক্ত হন হিরণকুমার সান্যাল। তার আগে নীরেন্দ্রনাথ রায় হন "পরিচয়" পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগী...। পত্রিকার 'নামকরণ' ও সম্পাদকীয় ভূমিকা তাঁরই রচনা'....। সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে আপসহীনভাবে তিনি তাঁর জীবনে ও কর্মে আমৃত্যু বহন করেছেন।....তাঁর সাহিত্য-বিচারে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রয়োগ অনিবার্য ছিল....। নীরেন্দ্রনাথ মার্কস, এঙ্গেলস্, বেলিন্‌স্কি, লুনাচারস্কি, চের্নিশেভস্কি এবং কড্‌ওয়েল, আরাগঁর ধারাকে বিশেষভাবে মান্য করেছেন। জ্‌দানভের নির্দেশও তৎকালে অমান্য করেননি। অর্থনৈতিক সংকট আর সাংস্কৃতিক সংকটকে পৃথক পৃথক মানদণ্ডে বিচার করেননি।"[১৬]

সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য 'পরিচয়'-এর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেন ১৯৪৩-এ। স্বত্বের হাত বদল করেন নীরব যন্ত্রণায়। আত্মসচেতন শুধু নয়, বিশ্ববোধে ঋদ্ধ কবি প্রতি শুক্রবারে বসাতেন কবি-শিল্পী-লেখক-বিজ্ঞানী-চিন্তকদের আড্ডা। সেই আড্ডাতেই নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রথম নিয়ে যান বিষ্ণু দে-কে। চৈতন্যের সহোদর পেলেন সুধীন্দ্রনাথ। 'বন্ধুস্মৃতি ঃ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত'—('স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' কাব্যগ্রন্থ) কবিতায় বিষ্ণু দে লেখেন—"বহু উষ্ণ দ্বিপ্রহরে, বহু সন্ধ্যা, অনেক সকাল/ মনে মনে বেয়ে চলি, আনি চেনা চল্লিশ বছর;/কানে শুনি, অভিন্ন মননে কিংবা উচ্চ মতান্তরে/সানুকম্প্র অগ্রজের, সহকর্মী সৌহার্দ্যের স্বর—/ আকৈশোর বন্ধুস্মৃতি প্রৌঢ় এই বদ্বীপে মুখর।"

"একের পর এক প্রবন্ধ লেখালেন, পুস্তক সমালোচনা করালেন সুধীন্দ্রনাথ অনুজপ্রতিমকে দিয়ে। অগ্রজ কবি উদ্দীপিত। 'পরিচয়' এর প্রথম সংখ্যাতেই মর্যাদাবান হয়ে যান বিষ্ণু দে। দেবেশ রায়—লেখেন "আত্মসচেতনতা ছিল 'পরিচয়'-এর লক্ষ্য ও লক্ষণ দুই-ই। সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব বসু-বিষ্ণু দে-র মতো কবি, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো বিজ্ঞানী, ধূর্জটিপ্রসাদের মতো সমাজ-বিজ্ঞানী, সুশোভন সরকারের মতো ঐতিহাসিককে এই আত্মসচেতনতাই মিলিয়েছিল। এঁরা প্রত্যেকেই তখন নিজ নিজ বিষয়ে তরুণ বিশেষজ্ঞ। কিন্তু বিশেষজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসা বা বিশেষজ্ঞতা উত্‌রোনোর আর একটা সতর্ক তাড়াও ছিল।"[১৭]

'কল্লোল' কল্লোলিত হবার আগে থেকেই সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লেখেন, যদিও সব সময়ে সেইসব কবিতায় যে সুধীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছিল তা নয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী' প্রকাশিত হয় ১৩৩৭-এর ৩১ জ্যৈষ্ঠ, (উৎসর্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্ঘ্য ঋণশোধের জন্য নয় ঋণ স্বীকারের জন্য)। এখানেই কবি সুধীন্দ্রনাথ জানাতে ভোলেননি, "এই গ্রন্থের

কয়েকটি কবিতা বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি মাসিক-পত্রে বেরিয়েছিল। ৯ মার্চ ১৯৩০-এ লেখেন এই বইটির পরিচয়জ্ঞাপক শিরোনামশূন্য ৩০ পংক্তিবিশিষ্ট কবিতা। এতেই রয়েছে "তন্বী সে যে।/জীবনের রুদ্র বহ্নি তাই কি নিস্তেজে/জ্বলে ক্ষুদ্র চক্ষুদীপে তার?/ জগতে যা হেয়,/নিতান্ত নশ্বর দীন তুচ্ছ অবজ্ঞেয়,/তাদের সবার/ নিঃসার নির্যাসে রচা সে-ভঙ্গুর কায়া।" এই গ্রন্থে মুদ্রিত কবিতাগুলির রচনা/প্রকাশ কাল ১৯২০ থেকে ১৯৩০। 'তাঁর কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়েছিলো' 'যে দুটি প্রাথমিক খাতা'য় তার সর্বপ্রথম খাতাটির তারিখ বঙ্গাব্দ ১৩২৯, অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসুর মতে ১৯২২। 'কবি' ২০ (জুলাই ১৯২৬) রচনার শেষ পংক্তিদুটি প্রসঙ্গত উদ্ধার করা যাক।—"পাথেয় যার স্মৃতি কেবল, পন্থা যাহার অনাদ্যন্ত, /কবি ব'লে আখ্যা পাবার যোগ্য তো সেই ভাগ্যবন্ত।"

কিন্তু, 'কল্লোলে'র কাছে তিনি মান্যতা পাননি (হয়তো সে সময়কার রচনা কৈশোরক মানের বলে 'কল্লোল' নিয়ন্ত্রকদের কাছে মনে হয়েছিল, হয়তোবা মনে হয়েছিল বাংলা না-জানা বাঙালির লেখা; হয়তোবা ধারণা হয় কল্লোলীয় ধারার লেখা নয়, অথবা রবীন্দ্র ঘেঁষা। এমনও হতে পারে তাঁর কবিতা বোঝার অক্ষমতা, কিংবা প্রখর মনস্বিতা, বোধের তীক্ষ্ণতা, বহুভাষার চর্চক, পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতার অধিকারী, যথার্থ আধুনিক, অতিসচেতন ব্যক্তিত্বের কল্লোলের আড্ডায় না-যাওয়া, কিংবা আভিজাত্যের ঔজ্জ্বল্যে তিনি লেখা পাঠাননি 'কল্লোলে' কোনোদিন)। পক্ষান্তরে, তাঁর রচনা কল্লোলীয়দের নজরেই পড়েনি। সবটাই হয়তো অনুমানমাত্র। প্রসঙ্গত মনে আসে বুদ্ধদেব বসুর কথা। তিনি জানান, "শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তের সৌজন্যক্রমে সুধীন্দ্রনাথের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি-পুস্তক দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। ছাপার অক্ষরে তাঁর যে-সব কবিতার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেগুলির আদি ও পরবর্তী লেখন সবই রক্ষিত আছে, তা ছাড়া আছে দুটি প্রাথমিক খাতা, যাতে তাঁর কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়েছিল।....হস্তলিপিও কাঁচা, এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অক্ষরগুলি কোণবহুল ও বিশ্লিষ্ট, তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একেবারেই নেই, এবং আমাদের পক্ষে তা সুধীন্দ্রনাথের বলে ধারণা করা সহজ নয়। এটা কেমন করে সম্ভব হ'লো যে সুধীন্দ্রনাথ একুশ বছর বয়সে, যখন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' পর্যন্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রায় সমগ্র কাব্য বেরিয়ে গেছে, তখন এ' রকম কাঁচা লেখা লিখেছিলেন?.....

সুধীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে বাংলা ভাষা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল না। তাঁর বাল্যশিক্ষা ঘটেছিল কাশীতে; আনি বেসান্ট কর্তৃক স্থাপিত সেই বিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি ভালোভাবে শিখেছিলেন, কিন্তু বাংলা চর্চার তেমন সুযোগ পাননি। শুনেছি কৈশোরে কলকাতায় ফিরে মাঝে মাঝে মাতার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতেন।"[১৮] যে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে প্রতিটি শব্দই ছিল এককালে স্বাতন্ত্র্যদীপিত, ব্যক্তিত্ব নিহিত, তাঁর বিশ্ববীক্ষার প্রস্তুতি ও সমৃদ্ধির সময়টি অস্বীকৃত থেকে যায় আশ্চর্যভাবে 'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠায়। মননজাত দার্শনিক প্রতীতি তাতে অবশ্য শিথিল হয়নি। তাঁর নৈরাশ্যবাদিতা, নাস্তিক্যবোধ আপন

উপলব্ধি উদ্গত নয়, সেটা সময়েরই অন্তর্গত টানাপড়েন। মানুষের আস্থান যে অসহায়তায় আর্ত সেটা মেনে নিয়েছিলেন অনিবার্যতায়। হয়তো এর শিকড়ে জল দিয়েছিল বৈদান্তিকতা, হয়তো বিশ্বাস হয়েছিল "মনুষ্যধর্মের স্তবে/নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে/যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।"

'কল্লোলে'-র আড্ডায় মাঝে মধ্যে আসতেন বিষ্ণু দে। গল্প-ও লিখেছেন মাসিক পত্রটিতে, কিন্তু বিশেষ কোনো দুর্বলতা ছিল না। দুর্বলতা থাকার কী চৈতন্যদীপিত কারণ ছিলো? একটু খুঁটিয়ে যদি বিচার করা যায় তাহলে 'কল্লোল'-ও কি একালের পাঁচমিশেলি পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকার মতো ছিল না? কেবল সাইজটা ছিল ছোটো পত্রিকার, পৃষ্ঠাসংখ্যা নয়। বরং এলিয়ট-প্রীতিতে মননের বিস্তার ও প্রশান্তি পান সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'পরিচয়ে'র আড্ডায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়ের সৌজন্যে। প্রথম সংখ্যার 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিষ্ণু দে অনুবাদিত প্রুস্ত্। উপরন্তু দুটি কবিতা। দ্বিতীয় সংখ্যায় লরেন্স-কে নিয়ে আলোচনা করেন। একের পর এক পুস্তক সমালোচনা যেমন করেন তিনি 'পরিচয়'-এ, তেমনি কবিতাও লেখেন। সত্যিকথা বলতে কি "সুধীন্দ্র-বিষ্ণু দে সংযোগ নিঃসন্দেহে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ নানা বৈদেশিক বইয়ের রিভিউয়ে। এই তিরিশের দশক জুড়ে অজস্র বইয়ের সমালোচনা করেছেন তিনি—তাতে তাঁর মনীষার ব্যাপ্তির যেমন স্বাক্ষর আছে, তেমনি বোঝা যায় 'পরিচয়ে'র তাগিদ ও চেহারাটা।"[১৯]

আগেই বলা হয়েছে, বিষ্ণু দে-র একটিমাত্র কবিতাই 'কল্লোলে' ছাপা হয়। নাম 'তেপাটী' (Triolet)। 'ট্রিওলেট' শব্দটির অনুবাদ হিসেবে 'তেপাটী' নামটি পেয়ে যান প্রমথ চৌধুরীর থেকে। বিষ্ণুবাবু, আট লাইন ব্যবহার করেছেন এক একটি স্তবকের ক্ষেত্রে। এখানে কবির মৌলিকত্বই স্পষ্ট।

এই কবিতাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল বিষয়কে মান্যতা দিয়ে আঙ্গিকের অভিনবত্বে। এই মনোভাবে ধরা পড়ে লুই আরাগঁ-র প্রতি বিষ্ণু দে-র অনুরক্তির প্রবলতা। আরাগঁ-র অন্যতম বিশ্বাস ছিল, বলেওছেন, কবিতার ইতিহাস টেকনিকের ইতিহাস। বিষয় ও আঙ্গিকের একাত্মতায়, যথার্থ রসায়নে কবিতা হয়ে ওঠে সত্য, সুন্দর, সময়-সমাজ-ব্যক্তিত্বের আত্ম-আবিষ্কার। তবে, টেকনিক ও বিষয় কেউ কারো থেকে আলাদা নয়। আঙ্গিক বা প্রকরণ যেমন বিষয়-বিচ্ছিন্ন নয়, তেমনি বিষয়ও টেকনিক-নির্বাসিত নয়। কবিতা কবিতা হয়ে ওঠে বিষয় ও টেকনিকের অদ্বয়ে, শিল্পিত সুষমায়।

ট্রিওলেট হচ্ছে মধ্যযুগের ফরাসি কবিতার এক ধরনের প্রকরণ বা ফর্ম্। এটি দুরকমের অন্ত্যমিল বা শব্দমিল বিশিষ্ট আট লাইনের কবিতা। এতে সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত হয় পংক্তি-শেষের শব্দ, সংগতভাবেই মিল। এই ফরম্যাটে বা ছকে অবিকৃত থাকে প্রথম পংক্তি, তৃতীয় পংক্তি, চতুর্থ পংক্তি, পঞ্চম পংক্তি, সপ্তম পংক্তির অন্ত্যমিল। কেবল সেটাই

নয়, প্রথম পংক্তি, চতুর্থ পংক্তি, সপ্তম পংক্তির অন্তিম শব্দটি পুর্নপ্রযুক্ত হয়। আর, দ্বিতীয় পংক্তি, পঞ্চম পংক্তি ও অষ্টম পংক্তির মধ্যে সুরক্ষিত থাকে অন্ত্যমিল। উপরন্তু, দ্বিতীয় পংক্তির শেষ শব্দটি (বা লাইনটি) পুনরায় ব্যবহৃত হয় অষ্টম পংক্তিতে। অনেকটা হল নিম্নরূপ—

A B a A a b A B

(ক্যাপিটাল লেটারগুলো ব্যবহার করা হ'ল লাইন এবং পুনরুদ্ধার বোঝাতে)। ট্রিওলেট বা 'তেপাটি' নামের গোড়ায় রয়েছে প্রথম পংক্তির তিন বার ব্যবহার (প্রথম, চতুর্থ ও সপ্তম লাইন)। আট লাইনের কবিতা (সাধারণত ৮-সিলেবেল্ড্)।

কেউ কেউ মনে করেন এই আঙ্গিকটি বা ছন্দের কাঠামোটি রঁদেল-এরই সহজতর চেহারা বা সরল রূপ। এর উদ্ভাবন ঘটে সম্ভবত তেরোর শতকে। এবং যে দুজন কবি এই আঙ্গিকের চর্চা মধ্যযুগে সিরিয়াসলি করেন তাঁরা হলেন Adent le Roi এবং Jean Froisart. পনেরো-ষোলো শতকের ফরাসি কবিতায় ট্রিওলেটের নমুনা বিশেষ পাওয়া যায় না। সতেরো শতকে আবার দেখা গেল। Jean de La Fontaine একে ফিরিয়ে আনেন আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে লেখন Alphonse Daudet এবং Théodore de Banville. ফরাসি সাহিত্যে ট্রিওলেটের ব্যবহার আকছার চলল। সংবাদপত্রেও ঘটেছে বহুল ব্যবহার। উজ্জ্বলতা পায় লক্ষ্য পূরণে, ঠিকরে পড়ে স্যাটায়ারের দ্যুতি।

ইংরেজিতে ট্রিওলেট হাজির হয় ভক্তিভাবের রচনা নির্মিতিতে। সেটা ঘটে বেনিডিক্ট সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী Patrick Cary-র দৌলতে Douai-তে, ১৬৫১-য়। রবার্ট ব্রিজেস ট্রিওলেট লেখনে ১৮৭৩-এ। তবে অনেকের মতে, ইংরেজি ভাষায় এই আঙ্গিকে কবিতা রচনায় সফলতম কবিপুরুষ হলেন Austin Dobson। তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হল 'Rose kissed Me today,' 'I Intended an Ode', এবং 'In the school of Coquettes'।

জার্মানিতে ট্রিওলেটের সংকলনগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় Halberstadt-এ, ১৭৯১-তে। তার পরে Brunswick-এ, ১৭৯৬-তে। ফ্রেডেরিক রাসমান-ও সংকলন বের করেন ১৮১৫ ও ১৮১৭-য়। সেখানে তিনি তিন ধরনের ট্রিওলেট উপস্থাপন করে গঠনগত দিক থেকে পার্থক্য দেখাতে কসুর করেন নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই জার্মান রোমান্টিক কবিরা ট্রিওলেটের নিখুঁত আঙ্গিকটি ব্যবহার করেন।

'কল্লোলে' বেরুনো 'তেপাটি' কবিতাটি বিষয়ের দিক থেকে প্রেমের, আবার বলা যেতে পারে ভক্তিরও। ধর্ম (?) অনেকটাই যেন এ ধরনের কবিতায় শর্তহীনভাবে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে প্রেমের উপলব্ধিতে, দিব্যতায়। ভক্তিদর্শনের পিছনে মানবিক মনস্তত্ত্ব, কিংবা, মানবিক অনুভূতির আলোয় ভক্তির বিস্তার। 'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পুজা'।

বাংলায় প্রচলিত ছন্দ বিশ্লেষণে কবিতাটি কলাবৃত্তে রচিত। পংক্তিবিন্যাসে ৬+৫-এর আধিক্য, ৬+৬-ও রয়েছে। ব্যতিক্রম-ও যে নেই তা নয়, শেষ স্তবকটি অন্তত সে-কথাই বলবে।

আপাতত মৌনতাই অক্ষমের স্বস্তির শিবির—বিষ্ণু দে-র কোমলগান্ধার ছুঁয়ে পড়ে থাক 'জ্যৈষ্ঠের ট্রিয়োলেটগুচ্ছ' ন'টি স্তবকের—যেখানে প্রথম ও নবম স্তবকটিতে মিল রক্ষা পেয়েছে সৃষ্টি-লগ্নের আট লাইনের, আর দ্বিতীয় থেকে অষ্টম স্তবকটি রক্ষিত হয়েছে ছ'টি করে পংক্তির।

<u>তথ্যসূত্র, টীকা।।</u>

১. বিষ্ণু দে; কবিতাসমগ্র (খণ্ড ২), আনন্দ পাবলিশার্স; ১৩৯৭; পৃষ্ঠা ৪০৪
২. ঐ
৩. ঐ; পৃ. ৪০৫
৪. ঐ; পৃ. ৪০৩-৪০৪
৫. সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড; ১৯৭৬; পৃ. ২৫৯)-এ জানান "১৩৩০ সালে গোকুলচন্দ্র দীনেশরঞ্জন দাশের সহযোগী হইয়া 'কল্লোল' পত্রিকা বাহির করেন।" বুদ্ধদেব বসু 'কালের পুতুল' (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭)-এর 'কল্লোল' ও দীনেশরঞ্জন দাশ' (পৃ. ২৩)-এ লেখেন, "তাঁর (দীনেশরঞ্জন দাশ) প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'কল্লোল' পত্রিকা সেই সব লেখকদের প্রথম লীলাক্ষেত্র, যাঁরা, আমার মতো প্রায় পনেরো বছর আগে অতি আধুনিকতার শীলমোহরে চিহ্নিত হ'য়ে আজ প্রায় অনাধুনিক হ'তে চলেছেন। গল্পসর্বস্ব সিকি মূল্যের মাসিকপত্র হিশেবে জীবন আরম্ভ ক'রে 'কল্লোল' যে ক্রমে-ক্রমে নতুন লেখকদের মুখপাত্র হ'য়ে উঠেছিলো তার পিছনে ছিলো গোকুলচন্দ্র নাগের প্রেরণা, যিনি তাঁর হ্রস্ব জীবনের শেষ বছরগুলিতে 'কল্লোলে'র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।" শিশিরকুমার দাস 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' (২০০৩-এর ৪৭ সংখ্যক পৃষ্ঠায়) জানান, 'কল্লোল'-এর "সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ ও দীনেশরঞ্জন দাশ।" আবার, ৬৬ সংখ্যক পৃষ্ঠায় বলেন "১৯২৩ সালে দীনেশরঞ্জন দাশের সহযোগিতায় কল্লোল পত্রিকা প্রকাশ করেন।" ফের এই একই সংস্করণে ৯৯-সংখ্যক পৃষ্ঠায় বললেন, "দীনেশরঞ্জন দাশ (২৯.৭.১৮৮৮—১২.৫.১৯৪১) কল্লোল পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।"
৬. অর্থাৎ কালোপযোগী বিষয়, বর্তমানে যা ঘটেছে সেই প্রসঙ্গ; বর্তমান ঘটনাবলি সংক্রান্ত বা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে প্রকাশ্য; সময়োপযোগী বিষয়; সময় সম্বন্ধী;সময়কৃত লেখ্য। অর্থান্তরে বা অর্থবিস্তারে a journal published periodically; a periodical; মাসিক পত্র, সাময়িকপত্র, ম্যাগাজিন (অস্ত্রাগার/বারুদঘর/টোটাঘরা তাৎপর্যে নয় কিন্তু)। সাময়িকপত্র, ম্যাগাজিন, পিরিওডিক্যালসের দিকে একবার যদি তাকানো যায় তাহলে

অনিবার্যভাবে আসে মুদ্রণী বা মুদ্রণযন্ত্রের প্রসঙ্গটি। আসে কাঠখোদাইয়ের কথা, কাষ্ঠখণ্ড থেকে ছাপ-ছবিরও প্রসঙ্গ।

যদ্দুর জানা যায়, কাঠখোদাইকরা টাইপ বা তা থেকে ছাপানোর প্রথম ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছিল জাপানে এবং চিনে। সময়টা আট-নয়ের শতক। এগারো শতকে এই ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে চিনে। চিনের শিল্পীরা কাঠের টুকরোর ওপর উঁচু অক্ষর, ছবি খোদাই করে কালি মাখিয়ে তাতে কাগজ চেপে ছাপার কাজ করতেন।

এলো হরফের সঞ্চলনযোগ্যতা। তবে, চিনা ভাবলিপি, বিমূর্ততা, ইডিওগ্রাফিক ভাষার দরুন এর টেকনিক তেমন আর উন্নত হয় না। জটিলতার ঘেরাটোপে থমকে পড়ে। জাইলোগ্রাফি থেকে ছাপানোর ব্যাপারটা ইউরোপে আসে চোদ্দোর শতকে। মুদ্রণব্যবস্থা নিয়ে চলতে থাকে নানান পরীক্ষানিরীক্ষা। দারুহরফের সঞ্চলনযোগ্যতা অনুসৃত হ'য়ে এলো ধাতব হরফ। নরম ধাতু থেকে তৈরি হল মাটির ছাঁচ, কালক্রমে কোমল ধাতুর হরফ। প্রিন্টিং প্লেট নির্মিত হয়। ফুস্ট ও শোয়েফার নামে দুজন লোকের সঙ্গে মিলে তাক লাগিয়ে দেন ইয়োহানস গুটেনবার্গ (১৪০০-১৪৬৮ খ্রি.)। জার্মানির মাইনৎসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতির কৃতিত্ব তাঁকে দেওয়া হতে থাকে। এটা ১৪৫০ সালের কথা। বেয়াল্লিশ লাইন কলামে বাইবেল ছাপিয়ে তিনি চমৎকৃত করেন ১৪৫৫-য়। লাতিনে মুদ্রিত তিন খণ্ডের বাইবেলটি গুটেনবার্গ বাইবেল/ বেয়াল্লিশ লাইনের বাইবেল/ মাৎসারিন বাইবেল নামে পরিচিতি পায়। তবে, এই বাইবেলটির কত কপি ছাপা হয়েছিল তা আজো অজানা রয়ে গেছে।

আমাদের দেশে পোর্তুগিজরাই প্রথম নিয়ে আসেন মুদ্রণযন্ত্র। গোয়া থেকে পোর্তুগিজ ভাষায় রোমান হরফে ১৫৫৭-য় পহেলা ছাপা হয় Conclusoes, আর ভারতীয় ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তকটি হল ক্রীষ্ট্য বন্নকনম। মালাবর-তামিলে এটি ছাপানো হয়। এবং এর-ও আগে বাইরে থেকে আসা পোর্তুগিজরা না কি ভারতবর্ষের তৃতীয় মোগল সম্রাট আকবর-কে (আকবর আবুল ফতে জালালউদ্দিন মহম্মদ, ১৫৪২-১৬০৫) মুদ্রাযন্ত্র উপহার দিতে চেয়েছিলেন। দুরদর্শী বাদশাহ তা সবিনয় প্রত্যাখ্যান করেন।

এ কথা মেনে নিতে অসুবিধে নেই যে, সমস্ত ম্যাগাজিন বা সাময়িকী বা সাময়িকপত্রেরই শিকড় ছিল এক হিসেবে ছাপানো ইশতিহারে, ব্রডসাইডে, জনপ্রিয় ছড়া- কাহিনি- উপাখ্যান-ব্রতকথা-পাঁজি পুঁথি ইত্যাদি সংবলিত পথেঘাটে বিক্রি করা চ্যাপবুকে, অ্যালমান্যাক-এ। ধীরে ধীরে নিয়মিত বিরতিতে তা এলো নানা লেখকের বিচিত্র রচনায়, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, সন্তোষ বিধানে, আত্মবিকাশ-প্রচার-আত্মবিলাসে।

আরবিক ma k zin> ইতালীয় magazzino> ফরাসি magasin থেকে শব্দটি হয়ে যায় ম্যাগাজিন। আবার, সাময়িকী বা সাময়িকপত্রে বা পিরিওডিকালস এলো ফরাসি périodique + al থেকে । মতান্তরে গ্রিক periodikas থেকে লাতিনের মধ্য দিয়ে

এসেছে। উষালগ্নের একখানা ম্যাগাজিন হিসেবে নাম করা যায় জার্মান প্রকাশনা Erbaulice Monaths-unterredunge (১৬৬৩-১৬৬৮)-কে। ১৬৭০-এর দশক থেকে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালিতে বেরুতে থাকে একের পর এক চিত্তবিনোদক সাময়িকপত্র। বেরোয় Le Mercure Galant (১৬৭২)। পরে নামের বদল ঘটে, পরিচিত হ'লো Mercure de France নামে। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয় জোসেফ অ্যাডিশন ও রিচার্ড স্টিলের The Tatler (১৭০৯-১১, সপ্তাহে তিনদিন), The spectator (১৭১১-১২, দৈনিক)। ধীরে ধীরে পাঠক সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিষয় বৈচিত্র্যও দেখা দিতে শুরু করে। রাজনীতি থেকে সমসাময়িক ঘটনার উপর আলোচনা ব্যাপকতা পায়। গদ্য হয়ে ওঠে শিল্পিত স্বভাবের, আবেগতাপিত, মননদীপিত। Gentleman's Magazine (১৭৩১-১৯০৭)-টি বেঁচে ছিল দীর্ঘকাল। এবং সারা পৃথিবীতে প্রচলিত সাময়িকপত্রের সংখ্যা কমবেশি ১৫.০০০-টি।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে এখানেই আসে নির্দিষ্টভাবেই লিটল ম্যাগাজিনের কথা।

লিটল ম্যাগাজিন অনেকটাই আভাঁ-গার্দ। তা শুধু সিরিয়াস-ই নয়—মনের খোরাক, মননের যোগান, সৃজনশীলতার আশ্চর্য আশ্রয়। আত্মসম্মানবোধে প্রখর, নান্দনিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় প্রদীপ্ত, সংগ্রামী চেতনায় ঋদ্ধ। ছকভাঙা, অবাণিজ্যিক এ সব সাময়িকপত্র শহিদত্বের ভ্রূ-ভঙ্গি মেনে নিয়েও, ব্যবস্থাপনায় অপেশাদারিত্ব ও সম্পাদনায় খানিকটা অদূরদর্শিতা সত্ত্বেও নিয়মিত-অনিয়মিত বেরোয়, আড্ডা জমে, কোলাহল চলে। কীথ প্রেস্টনের কথায়—

Of all the literary seems
Saddest this sight to me:
The graves of little magazines
Who died to make verse tree....

এ সব ম্যাগাজিন মূলত ক্ষণজীবী হয় অস্তিত্বে, রেখে যায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব সাহিত্য-সংস্কৃতির ভুবনে প্রায়শই। প্রেমেন্দ্র মিত্র একদা 'স্ফুলিঙ্গ' পত্রিকার জন্য লেখা আশীর্বাণীতে পরিবেশন করে দিয়েছিলেন একেবারে ক্ষীরটুকু।—

কাল কী হবে কে জানে
এই স্ফুলিঙ্গে সুষুপ্ত কোন্ সূর্য!
আজ হয়তো নিভবে জ্বলেই,
কালকে ধ্রুবতারার মতো
অমর হবে জ্যোতি ও মাধুর্য।

মোটামুটিভাবে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এ সব ম্যাগাজিনের অভিযাত্রা শুরু হয় বিশ্ব জুড়ে। বিশ শতকেই অকল্পনীয় শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ফরাসি লেখকদের প্রভাবে ইংল্যান্ডে,

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে; বিশেষত সিম্বলিস্ট কবি, কথাকার, চিন্তাশীল আলোচকদের দৌলতে। জার্মান সাহিত্যও হলো এঁদের কাছে ঋণী, সমৃদ্ধ। বলে রাখা ভালো, অনেক সময়ে ফারাক করা যায় না ম্যাগাজিন ও লিটল ম্যাগাজিনকে।

সামরিকপত্রের ভুবনে অন্যান্য উল্লেখ্যর মধ্যে পড়ে Poetry : a magazine of Verse (১৯১২)। হ্যারিয়েট মোনরোর অপরিসীম শ্রমে ও উদ্যোগে এটি প্রকাশিত হয় আমেরিকায়। মার্গারেট অ্যান্ডারসনের Little Review (১৯১৪-২৯) এক সময় জবরদস্ত আলোড়ন ঘটায়। Egoist (১৯১৪-১৯), Blast (১৯১৪-১৫), ইউজিন জোলা-র transition (১৯২৭-৩৮), নারীবাদী সাময়িকী The New Freewoman (১৯১৩), ব্রিটিশ সমালোচক ও ঔপন্যাসিক ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড সম্পাদিত Transatlantic Review (১৯২৪-২৫), Partisan Review (১৯৩৪), Left Review (১৯৩৪-৩৮), New left Review; Ole 5; Le surr alisme au service de la r volution; Greek Poetry now; Boston Review; Harvard Review; The American Poetry Review; Evergreen Review; Broken Bridger Review; Poetry Review; Two cities; Between Worlds; জন ক্রো র‍্যানসম প্রতিষ্ঠিত The Kenyan Review (১৯৩৯), এফ. আর লিভিস সম্পাদিত (১৯৩২-৫৩); Scrutiny প্রভৃতি ম্যাগাজিনগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

তবে, আমাদের মতে, ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ বাংলা মুদ্রণার সূচনাবর্ষ; কলকাতায় ছাপার জন্য মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং জেমস অগাস্টাস হিকির মালিকানা-প্রকাশনা-সম্পাদনায় প্রথম সাপ্তাহিক [এক হিসেবে চার পাতার ট্যাবলয়েড। Bengal Gazette or the Calcutta General Advertiser (২৯ জানুয়ারি ১৭৮০)], ইণ্ডিয়া গেজেট, হরকরা, দিগদর্শন (১৮১৮), সমাচার দর্পণ (১৮১৮), বাঙ্গাল গেজেট (১৮১৮, প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র, প্রকাশ করেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য), সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২), বঙ্গদূত (১৮২৯), সংবাদ প্রভাকর (গোড়ায় সাপ্তাহিক, পরে দৈনিক)—সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ১৮৩১-এর ২১ জানুয়ারি প্রথম প্রকাশিত। ৬৯টি সংখ্যা বেরোনোর পরে বন্ধ হয়। ১৮৩৬-এ বারত্রয়িক হিসেবে, ১৮৩৯-এর ১৪ জুন থেকে দৈনিক হয়। এই পত্রিকাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এক লেখকগোষ্ঠী—যা পরবর্তী কালে দেখা যায় অনেকটা অবাণিজ্যিক লিটল ম্যাগাজিনের পরিচালনায়, পরিবেশে, বৈঠকে, আড্ডায় এবং ব্যবস্থাপনায় অপেশাদারিত্বে। দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী প্রমুখের প্রথম রচনা, তাঁদের ছাত্রাবস্থাতেই এখানে প্রকাশিত হয়, যেমন ছাত্রাবস্থাতেই বিষ্ণু দে-র কবিতা গল্প বেরোয় 'কল্লোলে'। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, নীলরত্ন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এখানে নিয়িমিত লিখতেন। এখানেই প্রথম প্রকাশিত হয় রামপ্রসাদের

জীবনী সহ তাঁর কালীকীর্তন, ধারাবাহিকভাবে বেরোয় হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাইদাস বৈরাগীর জীবনচরিত)।

ধর্মীয় ভাবনার ঘেরাটোপেও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩)-য় সমাজ, সাহিত্য বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা ছাপা হতো। এখানেই বেরোয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' (১৮৬১) —বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম আধুনিক রীতির আত্মচারী রোমান্টিক গীতিকবিতা।

বঙ্গদর্শন (১৮৭২) হলো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক পত্র। 'রচনার মান, বৈচিত্র, সৌন্দর্য ও রুচির দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে যুগান্তকারী পত্রিকা'। এর ঐতিহাসিক ভূমিকাটি অবিস্মরণীয়। এই কাগজে বেশিরভাগ লেখকের নাম ছাপা না হলেও এতে নিয়মিত লিখতেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র আর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র প্রমুখ। এই পত্রিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সাহিত্য-সমালোচনা, যা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় পরবর্তীকালের 'পরিচয়' পত্রিকাকে। অবশ্য, সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ও প্রতিষ্ঠিত পরিচয় পত্রিকায় ছাপ ছিল সবুজ পত্রের চারিত্র্যই অনেকটা।

প্রসঙ্গত বলা যায়, আমাদের লিটল ম্যাগাজিনের প্রেক্ষিতে 'সংবাদ প্রভাকর' যেন উষার আগমনের প্রতীক্ষায় রত রাত্রির শেষ প্রহর, 'বঙ্গদর্শন' হলো ভোরের প্রথম আলো বা উষার নরম আলোর প্রথম মরমি দ্যুতি, আর 'সবুজ পত্র' হলো রোদে ঝলমলে ভোরের আকাশ, সেখানে যেন শোনা গেল—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।"

'সবুজ পত্র' (১৯১৪) ছিল তারুণ্যের জয়গানে মুখর। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় ও প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় এই ম্যাগাজিনটি প্রকাশিত হয়। কূপমণ্ডূকতা নয়, আন্তর্জাতিকতা; ভাবালুতা নয়, যুক্তিবাদ; আবেগ সর্বস্বতা নয়, মননশীলতা; সাহিত্যিক গদ্যের বাহন হিসেবে সাধুরীতি নয়, চলিত রীতি; কেবল সাহিত্য নয়, ইতিহাস- দর্শন- অর্থনীতি- অলংকারশাস্ত্র -রাষ্ট্রনীতি-সমাজতত্ত্ব-এসব নিয়েই 'সবুজ পত্র' বুদ্ধির মুক্তি ঘটায়। এখানে সমবেত হন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী সহ অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হারীতকৃষ্ণ দেব, সতীশচন্দ্র ঘটক, বরদাচরণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো সৃজনশীল সারস্বত ব্যক্তিত্ব, মণীষার মণি-মাণিক্য।

৭. কল্লোল (√কল্ল + ওল)। বৈয়াকরণের কাছে 'কল্ল' হলো অব্যক্ত শব্দ করা, আর 'ওল' (কর্তৃ) যে অব্যক্ত শব্দ করে; জলের কলকল ধ্বনি; জলস্রোতের কলকল রব; নদীপ্রবাহ শব্দ (প্রাকৃত শব্দমহার্ণব অনুসারে)। 'অমর কোষ' বা 'অমরার্থ-চন্দ্রিকায়' মহাতরঙ্গবাচক শব্দ বলে উল্লেখিত—মহৎ সূল্লোণকল্লোল্লৌ। সাধারণভাবে বলা যায় 'ঢেউ' বা 'তরঙ্গ'; 'কলরব', 'কোলাহল'।

'কল্লোল' মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখে অর্থাৎ প্রথম সংখ্যায় জানাতে ভোলেন নি কেন কল্লোল।—

"আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা দিশাহীন
অজানা জানায় নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি ফিরে আসি নিশিদিন।
....
আশা আছে তবু যদি কোনোদিন শত শত যুগ পরে
বধির শিলায় ফেটে যায় বুক
গুড়াইয়া যায় তার নিজ সুখ
জল-কল্লোল তুলি ভীমরোল বক্ষ তাহার ভরে।"

৮. কল্লোলের প্রাণভোমরা ছিলেন এক হিসেবে গোকুলচন্দ্র নাগ। আশ্চর্য উদার এই শিল্পী ছিলেন কল্লোলীয় আড্ডায় মহাকর্ষক ব্যক্তিত্ব। ছিলেন দিলদরিয়া, সিংহহৃদয়। মিছরির দানা বাঁধার সুতোর মতো সকলের প্রিয়। 'পথিক' তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস। সুকুমার সেনের মতে 'পথিক' 'আধুনিক উপন্যাসের পথ দেখাইয়াছে।' তাঁর উদারতায়, বন্ধুত্বের উষ্ণতায়, সকলের প্রতি অমায়িক অন্তরঙ্গ আচরণে তিনি হয়ে ওঠেন সকলের আত্মজন, পরম সুহৃদ। তাঁর অকাল প্রয়াণে নজরুল একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। লিখেছেন—

"আজ তুমি নাই
মোরা তব পায়ে-চলা-পথে শুধু তাই
এসেছি খুঁজিতে সেই তপ্ত পদ-রেখা
এইখানে আছে তব ইতিহাস লেখা।...."

আড্ডার ছবি আঁকতেও ভোলেননি প্রিয়জন বিয়োগের আর্ততায়।

"সে কল-কল্লোল,
সে হাসি-হিল্লোল নাহি চিত উতরোল।
আজ সেই প্রাণ-ঠাসা একমুঠো ঘরে
শূন্যের শূন্যতা বাজে বুক নাহি ভরে।"

সত্যতায় সোচ্চারিত হয়—

"কথার ফানুষ
ফাঁপাইয়া যারা যতো করে বাহাদুরি,
তারা তত পাবে মালা যশের কস্তুরী।"

৯. প্রগতিশীল অর্থাৎ Progressive. চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে নেওয়া লাতিন

Progressivus থেকে ফরাসি progressif হয়ে ইংরেজিতে প্রোগ্রেসিভ (সং- প্র + গতি = প্রগতি + শীল)। উন্নতি বা অগ্রগতি করতে চায় বা করছে এমন। বস্তুত Moving forward, proceeding step by step; successive; expressing in advance. "যে সব ব্যক্তি বা সংস্থা উপস্থিত সমাজব্যবস্থা থেকে অগ্রবর্তী সমাজব্যবস্থা তথা আদর্শ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবে বা বাস্তবায়িত করে তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে আখ্যায়িত করে থাকি। অত্যন্ত সহজ করে বলা যায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সংগঠনের উন্নতি বিধানে যদি মানব পরিবেশের উন্নতি ঘটে তা হলে তাকে প্রগতি বলে চিহ্নিত করা যায় এবং যারা এই কার্য সম্পাদন করে তাদের প্রগতিশীল বলা হয় ('ভাবনা কোষ'; এন. বি. এ; প্রথম প্রকাশ ৫ আগষ্ট ২০১৮; পৃ. ১৯৬-৯৭)।" সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রেও অগ্রগমন-ই প্রগতিশীল, সাহিত্যের, বিশেষ করে কবিতা পড়া একেবারে আলাদা ধাঁচের রসাস্বাদন। তা ব্যক্তিক ও জনমানসেরই রসায়ন ও তার প্রতিফলন—তারই স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ। অবশ্য, প্রগতিশীলতা এক দিক থেকে আপেক্ষিকও বটে। প্রাক্ ফরাসি বিপ্লবের তুলনায় ফরাসি বিপ্লব ছিল প্রগতিশীল, আবার তার তুলনায় রুশ বিপ্লব শুধু প্রগতিশীল-ই নয়, যুগান্তকারী। একই 'কল্লোল' পত্রিকায় দু-তিন ধারার কবিদের কবিতা কি বেরুতো না? 'সবুজ পত্র'-র রচনা কি ঢের বেশি প্রগতিশীল ছিল না বিশ শতকের প্রথম দু-দশকের অধিকাংশ কবিদের থেকে? 'সবুজ পত্রে'র কবি লেখকদের বড়ো অংশই প্রেরণায় ছিলেন সন্দেহাতুর, এমনকি অবিশ্বাসী। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে দোলাচল থাকা সত্ত্বেও বহু কবিতায় মেলে চিন্তার প্রগতিশীলতা, তাই বলে তিনি তো আর মাইকেলের মতো প্রগতিশীল, প্রথম আধুনিক কবি হতে পারেননি। আবার, রবীন্দ্রনাথ আরো বেশি প্রগতিশীল, আরো বড়ো আধুনিক। এই একুশ শতকেও তাঁকে অনাধুনিক, অপ্রগতিশীল বলার দুঃসাহস বা বোকামি কি কেউ দেখাবেন? চলমান সৃজনশীলতা একার্থে প্রগতি মনস্কতার স্বাক্ষর। গদ্যলেখকের বহুবিধ সুযোগ থাকলেও কবিও নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না সামাজিক-রাজনীতিক-জনজাতিক-আন্তর্জাতিক বিচার বিশ্লেষণের বোধ থেকে। পটবিচার উপেক্ষা করে তা থেকে দূরে সরে থাকা কোনো কাজের কথা নয়।

১০. যুগ্মবাচক তাৎপর্যে 'যুগ' ক্লিবলিঙ্গ। অমরকোষ বা অমরার্থ চন্দ্রিকায় ১৬৮ পৃষ্ঠায় (১৯৮৮ সংস্করণ; সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা) উল্লেখিত 'দ্বন্দ্বং (ন) যুগ্মন্তু যুগলং যুগম্।" আবার ৩৩৭ পৃষ্ঠায় যানাদির অঙ্গ (পুং)-এর সমার্থক হিসেবে 'যুগ'-এর প্রয়োগ মেলে যানাদ্যঙ্গে যুগ ঃ পুংসি যুগ ঃ যুগ্মে কৃতাদিযু (ন)। অর্থাৎ যানস্য রথাদে ঃ, আদিনা লাঙ্গলাদেরপি। কৃতাদিযু সত্যত্রেতাদ্বাপরাদিযু। যুগং যুগ্মে চ সত্যাদৌ চতুর্হস্তরথাঙ্গয়োরিত্যজয় ঃ।" যুগ (যু + গক্/, মতান্তরে √ যুজ্ + অ)। পুরাণে কাল-বিভাগ হিসেবে মান্য—সত্য,

ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত কাল-পরিমাণ, সময়, age হিসেবেও 'যুগ' শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়। Generation হিসেবেও আবার যেমন 'যুগ' ব্যবহৃত, তেমনি epoch তাৎপর্যেও প্রচলিত। epoch হচ্ছে Begining of era in history, science, life etc.। বিশেষ ঘটনা ইতিহাসের, জীবনের সময়সীমা বলতে যুগ/ epoch শব্দটির মূল হলো epokh . সংস্কৃত-'যুগ' আরবিতে য-গ্; ফারসিতে য; ঠ জু; গ্রিকে zugon; লাতিনে jugum; ফরাসিতে joug; ড্যানিশে, গথিকে juk; সুইডিশে, আইসল্যান্ডিকে ok; অ্যাংলো-স্যাকসনে geoc.

১১. জীবনানন্দ দাশ; 'কবিতার কথা'-র 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য'; প্রথম সংস্করণ, ৪ ফাল্গুন ১৩৬২; পৃ. ৩৮।

১২. 'দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র 'প্রণমি', ভারবি; এপ্রিল ১৯৭২; পৃ. ৭০।

১৩. 'গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ' (প্রথম খণ্ড); 'রবীন্দ্রনাথ'; দিয়া পাবলিকেশন, জানুয়ারি, ২০২০; পৃ. ১৮৫।

১৪. 'সাহিত্যের পথে'-র 'সাহিত্যরূপ' নিবন্ধে (রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড; ঐতিহ্য সংস্করণ, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৪; পৃ. ৫৪০।

১৫. V. Afanasyev; Marxist philosophy; Progress Publishers, Moscow; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৮ পৃ. ৩৪৯।

১৬. দেবীপদ ভট্টচার্য সম্পাদিত 'সাহিত্য-বীক্ষা' সংকলনে 'নতুন পৃথিবীর পথসন্ধানী নীরেন্দ্রনাথ রায়'; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ; ১৯৮৩, পৃ. ix-xii।

১৭. ধ্রুব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিষ্ণু দে ঃ জীবন ও সাহিত্য' সংকলনে দেবেশ রায়-এর আলোচনা 'চৈতন্যের সহোদর ঃ 'পরিচয় ও বিষ্ণু দে' নিবন্ধ; পুস্তক বিপণি, জুলাই ১৯৯১; পৃ. ২০।

১৮. বুদ্ধদেব বসুর ভূমিকা সমৃদ্ধ 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ'; ২০০৩-এ পুনর্মুদ্রিত, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৭-৮।

১৯. অরুণ সেন; 'বিষ্ণু দে-র নন্দনবিশ্ব'-র 'বিষ্ণু দে ঃ জীবন, কবিতা ও নন্দন'; 'অবসর' ১৯৬৬ সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০; পৃ. ১২.।

অন্ধকার সময় : কবিতা-পাখির ডানা ঝাপটানো — কল্লোলের কবিতা

পা র্থ চ ট্টো পা ধ্যা য়

গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলা কবিতায় নানা ধরণের প্রবর্তনা আমরা লক্ষ করেছি। এই বিষয়টিকে আমরা বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অভিনব প্রয়াস বলে কেউ কেউ মনে করলেও সেই সময়কার যুগ পটভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা যদি ভাবতে শুরু করি তবে সহজেই বোঝা যায়, তার পরিণামে যাই হোক, সেই সময়কার যুবকদের কবিতায় পুরানো ধারাকে পেছনে ফেলে নতুন একটি ধারণার জন্ম দিতে চাওয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। সেই সমস্ত কবিদের চোখে পুরাতনের এক ও অদ্বিতীয় শিল্পীর নাম রবীন্দ্রনাথ। এই বিরাট রবীন্দ্রনাথকে ডিঙিয়ে নতুন কোন্ নদীতে বাইতে হবে নৌকো - এই-ই ছিল তখনকার যুবক কবিগোষ্ঠীর মূল কথা, মূল লক্ষ্য। তবে এই রবীন্দ্র- উত্তরণের স্বরূপটিকে কবিরা খুব যে স্পষ্ট ধারণা থেকে আনতে চেয়েছেন, তা একেবারেই নয়। সেই সময়ের কবিতায় একটি অনতিস্পষ্ট কিন্তু অনেকদিনের বাঁধন থেকে মুক্তির নিঃশ্বাসের জন্য কবিরা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। চোখে মুখে ধারণ করেছেন রোমান্টিক তেষ্টা। তাঁদের কবিতায় তাঁরা কী বলবেন তার স্পষ্ট বোধি তাঁদের অনেকটা অজানা। কিন্তু বাঁধনের থেকে মুক্ত হবার বাসনায় তাঁরা উদগ্রীব ছিলেন। পুরানো মূল্যবোধকে ভেঙে একটা নতুনের মাঠ পুকুর খুঁড়তে চাইছিলেন কবিরা। একটা দ্বিধাময় দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে তাঁদের দৃপ্ত পদচারণা আমরা লক্ষ্য করেছি। এই সময়ের কবিরা কাব্যের নৌকো জলে ভাসালেন। গন্তব্য জানা নেই। তাঁরা জানেন পিছনের তীরভূমি তাঁদের জন্য নয়। এই কবিদের ধারণ করেছে যে পত্রিকাগুলি সেগুলি হল :

'কল্লোল'(১৩৩০ বঙ্গাব্দ), 'কালিকলম' (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ), 'প্রগতি'(১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)। এই পত্রিকাত্রয়ীর ভেতর থেকেই বেজে উঠেছিল রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতার প্রথম প্রতিধ্বনি। এই পত্রিকাগুলির সাথে সাথে ওই সময় পর্বের আরো ক'য়েকটি পত্রিকার কথাও উল্লেখ করা যায় — 'উত্তরা', 'আত্মশক্তি', 'ধূপছায়া', 'সংহতি' প্রভৃতি।

তবে আমরা এই সময় পর্বের ধারক পত্রিকা হিসেবে যে পত্রিকার কথা সবার আগে স্মরণ করি সেটি আবশ্যিকভাবে 'কল্লোল'। 'কল্লোল'-এর নামেই এই সময় পর্বের কবি, কথাকাররা চিহ্নিত হন কল্লোলগোষ্ঠীর সৃজনকার হিসেবে। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক'-এ কবি বুদ্ধদেব বসু লিখছেন,

"যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ , আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"

এক বিরাট সমুদ্র-প্রতিভা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সর্বগ্রাসী প্রতিভার নাম। তাঁর প্রভাব থেকে কেনই বা অন্য পথে হাঁটতে চাইলেন কল্লোলগোষ্ঠীর সৃজনকারেরা? আসলে সেই সময়ে সামগ্রিক মূল্যবোধের একটা পরিবর্তন সমাজে এসেছিল। সেই সময়

পর্বের সমাজ জীবনে, সেই সময়ের রাজনৈতিক জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবনে, সেই সময় পর্বের নৈতিক জীবনে এসেছিলো বদলের বাতাস। একটা সংশয় আশ্রিত নতুন মনবীজের জন্ম হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তার অন্যতম কারণ বটেই। আমরা যদি উনিশ শতকের কথা ভাবি তবে দেখতে পাবো আমাদের সনাতন ভাবনার ওপরে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ এবং মানবতাবাদ একটা ঝড়ের মতন এসেছিল। কিন্তু উনিশ শতকেরই দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রাচ্য ভাবনা আর পাশ্চাত্যের দর্শনের একটা সমন্বয়বাদ গড়ে উঠেছিল। তারই জন্য একটা সুস্থ স্বচ্ছন্দের বোধি বিন্দুতে পৌঁছেছিল সময়। এক অখন্ড মানব ধর্মের শঙ্খ বেজেছিল প্রাচ্য পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব মিটে গিয়ে।

কল্লোলগোষ্ঠীর স্রষ্টাদের কাছে মনে হতে থাকলো যে পুরাতন মূল্যবোধের দিন শেষ। একদিকে ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙালির মননে, বোধে এক অন্যতর ভুবনের জন্ম দিল। কার্জনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামলো দেশের মানুষ। একটা দেশ কেন্দ্রিক ঐক্যবোধের সুতো মানুষকে গেঁথে দিল। বিপ্লবের আগুন জ্বললো হৃদয়ে হৃদয়ে। ১৯০৮। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীর বিপ্লব আর মৃত্যু মানুষকে আগুনের মন্ত্র দিল। ১৯১১-র শেষে বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত রহিত হল। কিন্তু আলিপুর বোমা মামলার পরে অরবিন্দের অন্য জীবনে চলে যাওয়া, বিপ্লবীদের জেল আর দীপান্তরে বিপ্লবের আগুন রুদ্ধ হল অনেকটাই। হতাশায় আক্রান্ত বাঙালি যুব সমাজ। ১৯১৪। বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজতেই শুরু হল বিদেশের সহযোগিতায় দেশকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টা। ১৯১৫। বাঘা যতীনের যুদ্ধ, পরাজয় আর মৃত্যু বিপ্লবী আন্দোলনের অনেকটা গতি রুদ্ধ করলো। নিরাশা গ্রাস করলো যুব সমাজকে।

বিশ্বযুদ্ধের রক্তস্নান প্রত্যক্ষ করলো ভারতের মানুষও। বাজারে আগুন। বাঙালি দিশেহারা। বিশ্বযুদ্ধকে বলা হল গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই। গান্ধীজীও ইংরেজের সপক্ষে ভারতীয়দের মৈত্রী সেনা বাহিনীতে যোগ দিতে বললেন। ইংরেজ লোভ দেখালো বিশ্বযুদ্ধে সাহায্য করলে স্বরাজ পাবে ভারত।

ফল হল উল্টো। যুদ্ধ থামলো। স্বরাজ তো এলোই না, পরিবর্তে ১৯১৯-এ ডিসেম্বরে মন্টেগু চেমসফোর্ডের সংস্কার পরিকল্পনা। কিছু প্রদেশে স্বায়ত্ত শাসন এলো বটে, কিছু প্রদেশের ওপর বাড়লো চাপ। বাংলার ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়ানো হল। বাঙালিদের বেকার যুবকেরা কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে যেতে শুরু করলো। হতাশা গ্রাস করলো বাংলাকে। তার ওপর রাওলাট অ্যাক্টের মধ্য দিয়ে বিপ্লবীদের দমনের খেলা শুরু হল। এরই ভেতর জালিয়ানওয়ালাবাগের রাক্ষুসে হত্যালীলা। ১৯২০। গান্ধীজী আরম্ভ করলেন অসহযোগ আন্দোলন। আপামর ভারতীয়দের দলে বাংলাতেও ইংরেজের বিরুদ্ধে নতুন করে আন্দোলনে ঝাঁপালো মানুষ। শহরের যুবকেরা স্বদেশী জিনিস নিয়ে ফেরী করতে গেল গ্রামে। গ্রাম আর নগর একাকার হয়ে ইংরেজ বিরোধী অসহযোগে নামলো। এরই

ভেতর চৌরিচৌরাতে অহিংস আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠলে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। যুবকদের হৃদয়ে আবার গ্রাস করলো হতাশা। এরপর ১৯৩০। আইন অমান্য আন্দোলনকে আশ্রয় করে মানুষ খানিকটা হতাশা মুক্ত হয়ে স্বদেশ প্রেমে মগ্ন হল। মাস্টারদা সূর্য সেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনার পরে বাঙালির বিপ্লবী চেতনাটা যেন আবার জাগরিত হল। এই সময় পর্বের ভেতর ১৯২০-র অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারে যুবকদের গ্রাস করেছিল হতাশা। অনিশ্চয়তা।

'বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশী লিখলেন —

"বাঙালীর মানসিক জগতে স্বদেশী আন্দোলন প্রকান্ড একটি চিহ্ন, ইহাকে বলা যায় বাঙালীর সংস্কৃতির Water shed —ইহার দুই দিকে সংস্কৃতির দুই বিভিন্ন মূর্তি, একদিকে আশা, অন্যদিকে আশাভঙ্গ, একদিকে উদ্যম, অন্যদিকে অবসাদ, একদিকে আত্মপ্রত্যয়, অপরদিকে আত্মঅনাস্থা ...।"

বাঙালীর এই যে নিরাশার অন্ধকারে ডুবতে থাকা, এর মূলে ছিল অর্থনৈতিকভাবে বাংলাকে হাতে না মেরে ভাতে মারার চেষ্টা। যে মধ্যবিত্তরা উনিশ শতকের বাংলার সংস্কৃতির মূল ধারক ছিল তাদের নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস'-এ দুটি রূপের কথা বলেছেন। প্রথমটি চাকরি করা মধ্যবিত্ত। দ্বিতীয়টি কিছু জমি জমার মালিক মধ্যবিত্ত।

এই যে উনিশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্ত, এরা অনেকে ভিন রাজ্যে গেছে চাকরি বা ব্যবসার জন্য। বাংলাকে কেরানির কাজের দিকে ক্রমে নিয়ে গেছে ব্রিটিশ। শহরমুখী হতে শুরু করেছিল বাঙালী। জমি নিয়ে, জমি সংগ্রহে নিজেদের ভেতরে ক্রমে লড়েছে বাঙালি। চাকরিকেই জীবনের একমাত্র ধন করতে চেয়েছে বাঙালি। গ্রাম থেকে চাকরির জন্য শহরমুখী বাঙালি নিজের হাতেই তার ঐতিহ্যের একান্নবর্তী পরিবারগুলিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করেছে। মেয়েদের ছোট বেলায় বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ভাঙতে শুরু করলো আর্থিক সংকটের কারণে। মেয়েদের ক্রমে এনে ফেলা হল শিক্ষার আঙিনায়। খোলা নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেল মেয়েরা। মেয়েদের এই যে ঘুরে দাঁড়ানো তা সত্যিকারের নতুন বাংলার জন্ম দিল বিশ্বযুদ্ধের পর পর। বিশ্বযুদ্ধের পরে কমতে থাকলো চাকরির বাজার। বাড়তে থাকলো বেকারত্ব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থামলো ১৯১৮- তে। এবার মন্টেগু চেমসফোর্ডের সংস্কার পরিকল্পনায় বাঙালি দিশেহারা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ল বাংলা। উল্টে শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যা বর্ধমান। বিহার, উড়িষ্যা অন্য প্রদেশ হল। সেখানে বাঙালিকে চাকরি দতে নারাজ। আর ব্রিটিশ চাইছিলো না বাঙালি অন্য প্রদেশে গিয়ে চাকরি পাক। তাহলেই বিপদ। বিপ্লবী বাঙালি উত্তাল করে দিতে পারে স্বদেশী আন্দোলন। অর্থনৈতিকভাবে পিছোতে থাকে বাংলা। এরই ভেতর ১৯২৯ থেকে ১৯৩০ নাগাদ আমেরিকার ব্যবসার সেয়ারে ধ্বস। ক্ষতিগ্রস্ত হল ইংল্যান্ড। ভারতে পড়ল তার প্রভাব। সমস্ত দেশ ছেয়ে গেল বেকারে।

১৯২৩। 'কল্লোল' বের হল। তার লেখক প্রকাশক সম্পাদকরা এই সময়ের ফসল। কল্লোলের কবি নজরুল ইসলামের জন্ম ১৮৯৯, অচিন্ত্যকুমার জন্মাচ্ছেন ১৯০০। প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯০৪। বুদ্ধদেব বসু ১৯০৮। এঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন দেশের বিপর্যয়। তাঁদের মনোবীজে ধরা ছিল এই সময়ের দগদগে ঘা। বুদ্ধদেব বসু তো লিখছেনই অতি আধুনিক সাহিত্য poet war। আধুনিক লেখকরা বেড়ে উঠছেন এর ভেতরে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় তাঁরা দেখছেন। উনিশ শতকের চাইতে বদলে গেল এই সময়ের লেখকদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য। বদলে গেল ভাবনাচিন্তা। জীবন সংগ্রামের কঠিন অবস্থার, প্রতিযোগিতার বাজার, খাবারের জন্য দ্বন্দ্ব, দারিদ্র্য, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, আনন্দ, আয়ু, পরকাল প্রসঙ্গে ভাবনা বদলে গেল। যৌথ পরিবার টুকরো হল এই বাইরের বদল মননে প্রভাব ফেললো। এতেই বদলে গেল সাহিত্যের বোধ। এলো disillusionment। তার ভেতর এলো rational হয়ে ওঠার ভাবনা। কেটে গেল যুক্তিহীন ভক্তি। বিশ্বাস জন্মালো বিজ্ঞানে। ভগবানে আস্থা হারালেন লেখক। ভূতের ধারনা বদলালো। ভালোবাসা ভাঙলো। এ কথা তিনি বলছেন, 'অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য' লেখায়। কল্লোলের চৈত্র সংখ্যায় বের হল।

হতাশার অন্ধকারে জীবন নুয়ে মূল্যবোধগুলি ভেঙে গেল। নেতিতে গ্রাস হল সাহিত্য। এলো সংশয়। এক রোমান্টিক অন্ধকারকে বেছে নিলেন সৃজনকারেরা। এই তীব্র হতাশায়ও সৃজনকারেরা ভাসলেন রোমান্টিক স্বপ্নে। যৌবন চায় রোমান্টিকতা বাঙালি যুবক সৃজনকাররা তাই-ই করলেন। জটিল এক মানসিক প্রত্যয় গ্রাস করলো কল্লোলকে। পুরানোকে ভেঙে নতুন মূল্যবোধ গঠনে কবিরা এগিয়ে এলেন আসলে নৈরাশ্যের ভেতরও হতাশ হলেন না, তাঁরা প্রথমে যে উনিশ শকের মূল্যবোধ ভাঙছিল ক্রমে তাই নিয়ে অবচতনে লড়াই শুরু হল। সেই নীটশের ভাষ্যে Transvaluation যেন। জীবনের মূল্যবোধগুলির তারা যাচাই করলেন রোমান্টিক মানবধর্ম তাঁরা তাড়িত হেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখলেন, 'সেই সময়টা আসলে সাহসের সাথে রোমান্টকতার পীঠে চড়ে বসা।

১৯১৭। ঘটল রুশ বিপ্লব। প্রলেতারিয়েতা জয়ী হল। পৃথিবীর সাহিত্যিকদের আলোড়িত করলো এই বিপ্লবের সাফল্য।ইউরোপে যতটা না যুদ্ধ প্রভাব ফেললো। তার চেয়ে বেশি প্রভাব ফেললো রুশ বিপ্লবে শ্রমজীবীদের বিজয়।

১৯১৭। ভি ভি আই লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লবের সাফল্য এলো রাশিয়ায়। এই বিপ্লবের জন্য কার্ল মার্কসের সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের বিশ্বের সর্বহারা মানুষকে যেভাবে আলোড়িত করলো, একইভাবে পৃথিবীর ছাত্র যুব শ্রেণির মনের ভেতর ফেললো গভীর ছাপ। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'নূতন ও পুরাতন'-এ বলছেন, "য়ুরোপের যুবক মনে যুদ্ধের প্রভাব যতটা, ততটা প্রভাবই রুশিয়ান বিপ্লবের আমাদের দলের মনের ওপর। তার চেয়ে বেশী বললে অত্যুক্তি হয় না।" আসলে তিনি সেই সময়কার যুবকদের মনের ওপর রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাবের কথাই বলতে চেয়েছেন। ইতিহাস বলছে ১৯১৭-তে রুশ

বিপ্লবে সাফল্য এলো। কিন্তু ১৯১০ নাগাদই বাঙালীর মননের সাথে রুশ যোগসূত্র রচিত হচ্ছিল। এটা হচ্ছিল বইপত্রের মাধ্যমে। রুশ বিপ্লবের পরে বাঙালির ভেতর সেখানকার আর্থ সামাজিক অবস্থার সাথে আমাদের পার্থক্যটা বুঝতে পারছিল। বাংলা তথা ভারতে সাম্যবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবনার বীজ প্রোথিত হল। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে ১৯১৯ নাগাদ সাম্যবাদী ভাবনার তরঙ্গ আমাদের দেশে এসে পৌঁছলো। ১৯২১, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের চেষ্টা শুরু হল। ১৯২৭-১৯২৮। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। ১৯২৯। কমিউনিস্ট বিরোধী মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। এর জন্য সমস্ত দেশ জুড়ে কমিউনিস্ট ভাবনা ছড়িয়ে পড়লো। তখনকার সাহিত্য শিল্পে মার্কসবাদ বিরাট প্রভাব ফেললো। 'কল্লোল' -এর সময়েই ১৯২৩-এ শ্রমিক শ্রেণির পত্রিকা 'সংহতি' প্রকাশ পেল। মার্কসবাদী ভাবধারায় বের হল বেশ কিছু পত্রিকা। যেমন 'লাঙল' , 'গণবাণী', 'গণকশক্তি'। যদিও সাম্যবাদী দর্শনকে সামনে রেখে বিনয় সরকার সম্পাদিত 'গৃহস্থ'(১৯১১-১৯১৫), রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উপাসনা'(১৯১৩ - ১৯১৮) রুশ বিপ্লবের সাফল্যের আগে থেকেই প্রকাশ লাভ করেছিল। এই 'গৃহস্থ' পত্রিকাতেই রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯২৪-এর ভাদ্র সংখ্যায় লিখলেন 'সোশিয়ালিজম' নামের প্রবন্ধ।

একদিকে ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলন, বিপ্লবপন্থী সহিংস আন্দোলন এবং একই সাথে মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক আন্দোলনে আন্দোলিত হতে থাকলো ভারতবর্ষ। এই পর্বেই 'কল্লোল' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। ১৯২২ নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতায় মার্কসবাদী ভাবনার প্রকাশ 'কল্লোল' প্রকাশের আগেই ঘটে গেল। মার্কসবাদী ভাবনার দ্বারা তখন মূলত প্রভাবিত হয়েছেন শিক্ষিত যুব সমাজ।

'বিনয় সরকারের বৈঠকে' ২য় ভাগ / ৩২৬ পৃষ্ঠায় বিনয় সরকার লিখেছেন — "১৯৩১-৩৫ সনে মার্কস দর্শন আর লেনিন নীতি বাঙালী লিখিয়ে পড়িয়েদের মহলে কিঞ্চিৎ কিছু চলতে শুরু করে।" উল্লেখ করা যায় মার্কসবাদ বাঙলার বৌদ্ধিক মহলে ব্যাপক প্রভাব ফেলে ১৯৩৬ নাগাদ। বাংলা সাহিত্যে কল্লোল যুগে সাম্যবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবনার প্রভাব এসেছে মানবতাবাদী গণচেতনার অঙ্গ হিসেবে। কবিদের কবিতায় গণজীবনের কথা এসেছে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাকে সঙ্গে নিয়ে।

বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফ্রয়েডের মনোবিকল তত্ত্বও প্রভাব ফেলেছিল বিশ্বের সাহিত্য শিল্পে। ফ্রয়েডের 'The Interpretation of Dreams.' 'The Psychology of Everyday life'(১৯১৪), 'On Dreams'(১৯১৪) গ্রন্থগুলির ভেতর অবচেতন মন নিয়ে যে আলোচনা তাতে প্রভাবিত হল পৃথিবীর সৃজনকারেরা। Ego–Id এবং Super Ego নামে মনকে এবং মনের অস্তিত্বকে তিনি চিহ্নিত করলেন। তার ভেতর Id বা অবচেতন মনের চরম বিশৃঙ্খল অরাজকতার লীলাভূমি নিয়ে তাঁর চিন্তা প্রভাব ফেললো সাহিত্য শিল্পে। তিনি যেভাবে বললেন, 'Sex is the main spring of our unconscious life'. এই চিন্তা শিল্প সাহিত্যের দেহাতীত প্রেমের ভুবনে আনলো পরিবর্তন।

আমরা 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার ভেতর আমাদের আলোচিত যুগ চেতনার পূর্ণ প্রতিভাসকে লক্ষ্য করি সচেতনভাবেই।

প্রথমত রবীন্দ্রনাথের যে সত্য সুন্দরের পৃথিবী, আর মহাযুদ্ধ-ইংরেজ অত্যাচার- রুশ বিপ্লব, বেকারত্বের যন্ত্রণায় দগ্ধ বাংলা তথা বিশ্বের অবস্থা এক ছিল না। তারই জন্য সময়ের দগদগে ঘা প্রভাব ফেলেছিল বাংলা কবিতার ভেতর মহলে। মার্কসবাদী সাম্যবাদের ছায়া এলো কল্লোলে। একইভাবে ফ্রয়েডের প্রভাবও কল্লোলের সাহিত্যকারদের ওপর পড়েছিল। যৌবনের মন্ত্রে কল্লোলের কবিরা তন্ময় হলেন। তারুণ্যের প্রাবল্যে তাঁরা ভেসে চললেন। প্রাজ্ঞতার প্রকাশের বদলে আবেগের তাড়নায় তাঁরা এগিয়ে চললেন। যৌবনের এক বাধাহীন আবেগে ভাসলো কল্লোলের কবিতা।

প্রথমেই বলতে হয় কল্লোলের পাতায় যৌবনের জয়গানে মুখরিত 'পথিক' উপন্যাসের স্রষ্টা গোকুল নাগের কথা। তাঁর সে যৌবনের উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে সুনীতি দেবী 'কল্লোল' কবিতায় লিখলেন-

"বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে জাগল তরুণ প্রাণ;
জমাট করা অন্ধকারের বিশাল প্রাচীর টুটে
উৎসারিত আলোর পানে বেরিয়ে এল ছুটে
চক্ষে তাহার নবীন দীপ্তি কণ্ঠে নূতন গান।"

কল্লোল মানেই বুদ্ধদেব বসু। তাঁর লেখা 'শাপভ্রষ্ট' কবিতায় তিনি লিখলেন-

"যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
বসে আছি আমি।
দগ্ধ স্বর্ণরেণুসম বালুকণারাশি
লুটায় চরণপ্রান্তে অকৃপণ বিপুল বৈভবে।"

কল্লোলে মনে হয় সবচেয়ে বেশি কবিতায় ছিলেন নজরুল ইসলাম। তাঁর 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতায় তিনি লিখলেন-

"আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে-
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।
আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বাণ ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার ভাঙা কল্লোলে।"

কল্লোলীয় কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথাও বলতেই হবে। তিনি তাঁর 'কবি-নাস্তিক' কবিতায় লিখলেন,

"আজ দরজায়
তাই ত' কবি ডাক দিয়ে যায় -

ফাল্গুন ফুরায়—
আগুন জুড়ায় !
মধু- মাসের মহোৎসবে দস্যু হ'য়ে লুটবি কে আয়।
ছিনিয়ে নেবার সাহস যে চাই—
বিনিয়ে কাঁদিস কার ভরসায়?"

কল্লোলের শিরোমণিদের একজন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। তিনি তাঁর 'সূর্য' কবিতায় লিখলেন—

"তব দগ্ধ আতপ্ত চুম্বনে
যৌবন উঠুক দুলি" উচ্ছ্বসিয়া ধরিত্রীর স্তনে।
সঙ্কোচ- সজ্জিতা ম্লান যত ব্যথা জমেছিল শীতে,
বাষ্প হয়ে যাক উড়ে তব সৌম্য নয়ন-ইঙ্গিতে!
আন আন অগ্নির ঝটিকা,
মরণের যজ্ঞে জ্বাল যৌবনের হোমশিখা
হে পবিত্র!"

কল্লোলের যৌবনের উন্মাদনায় আকৃষ্ট হয়ে কল্লোলের বহু আগের কবি নরেন্দ্র দেব 'তারুণ্য' কবিতায় লিখলেন—

"তোমার সংহার মূর্তি জরাজীর্ণ জড়তা জঞ্জাল
দলি যায় দৃপ্ত পদতল,
প্রাচীরে পশ্চাতে ফেলি নব-পথে ওগো মহাকাল,
তোমার প্রলয়- রথ চলে।....
হে তরুণ ! নবমনু ! আজি তব অরুণ উদয়ে
তোমারে জানাই মোর নতি!"

আমরা আগেই বললাম ফ্রয়েডের ভাবনা কল্লোলের ওপর ছায়া ফেলেছিল। প্রেমের শরীরী রূপকে রবীন্দ্রনাথের বিপরীত দৃষ্টি থেকে দেখলো কল্লোল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'গাব আজ আনন্দের গান', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পঞ্চশর' অথবা বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'ল উতলা' কবিতা গুলির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। 'রজনী হ'ল উতলা'-তে বুদ্ধদেব বসু লিখছেন—

"তারপর হঠাৎ আমার মুখের উপর কি কতগুলো খসখসে
জিনিস এসে পড়ল - তার গন্ধে আমার সর্বাঙ্গ রিমঝিম
ক'রে উঠল। প্রজাপতির ডানার মত কোমল দু'টি গাল,
গোলাপের পাপড়ির মত দু'টি ঠোঁট, চিবুকটি কি কমনীয়

হ'য়ে নেমে এসেছে, চারুকণ্ঠটি কি মনোরম, অশোক গুচ্ছের
মত নমনীয়, স্নিগ্ধ শীতল দু'টি বক্ষ - কি সে উত্তেজনা,
কি সর্বনাশা সেই সুখ তা তুমি বুঝবে না নীলিমা।"

কল্লোলে ভোগতৃষ্ণাময় শরীরী বর্ণনার সম্ভোগচিত্র এসেছে বুদ্ধদেব বসু, মোহিতলাল মজুমদারের মতন অনেকের লেখায়। আবার ভোগতৃষ্ণা থেকে অমৃতজগতে পৌঁছবার ঈঙ্গিতও আছে এঁদেরই লেখায়। যেমন মোহিতলাল মজুমদারের 'পান্থ' কবিতাটি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সহিংস, অহিংস রূপ। উত্তাল দেশ। এ সমস্ত কিছুর প্রভাব কল্লোলের ওপর পড়েছিল। দীনেশরঞ্জন দাশ, নজরুল ইসলাম, বিভাবতী দেবী, সুধীরকুমার চৌধুরীর মতন অনেকেই মুখর হয়েছেন বিপ্লব আর বিদ্রোহে। নজরুলের প্রখ্যাত 'ঝড়', দীনেশরঞ্জন দাশের 'ওঠ বীর', যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'কান্ডারী', বিভাবতী দেবীর 'বিদ্রোহ', সুধীরকুমার রায়চৌধুরীর 'বিদ্রোহ' কল্লোলেই প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা দীনেশরঞ্জন দাশের 'ওঠ বীর' কবিতার কিছুটা অংশ প্রসঙ্গক্রমে চয়ন করছি। তিনি লিখেছেন-

"ওঠ বীর, মুছে ফেল নিয়তির লিখা
আপন ললাট হ'তে;
যারা আসে ধেয়ে
পীড়নের আঘাত সহিয়া,
তাহাদের ক্ষতমুখ বাহি
যে শোণিত ঝরে অনিবার,
তব তপ্ত ভালে
সেই রক্ত- চিহ্ন আঁকি লহ।"

মার্কসের সাম্যবাদী দর্শন রুশ বিপ্লবের পরে সামগ্রিক বিশ্ব শিল্প সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। কল্লোলেও সমাজের অন্ত্যজ মানুষেরা নানাভাবে গদ্যে এবং কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে। জনচেতনার প্রতিভাসে রঙিন হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বেনামী বন্দর'। প্রসঙ্গত দীনেশরঞ্জন দাশের 'লক্ষ্মীছাড়া' কবিতাটিকে উপেক্ষা করা যায় না। কবি লিখছেন—

"সে যে ধরায় লক্ষ্মীছাড়া কোন যুগের এ কপাল পোড়া;
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে,
ভাগ্য-লেখা মুছে ফেলে,
সব হারাবার জয়টীকা পেরেছে সে কপাল-জোড়া।"

আবার 'সার্বজনীন' কবিতায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখছেন—

"ধূলিরুক্ষ রাজপথে নিরাশ্রয় যারা পরিশ্রমী,
যুগ্মকরে তাহাদেরে নমি :
মরণের স্নেহ যেন, -সর্ব অঙ্গে করিতেছে স্বেদ,

জীবনে ঘুচালো যারা মৃত্যু আর মৃত্তিকার ভেদ,
শির পাতি" লয় যারা একচক্ষু বিধাতার অমোঘ কুঠার,
তাদের জানাই নমস্কার।।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'বেনামী বন্দর'-এ লিখেছেন-

"মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
জগতের যত হতভাগদের ভীড়ে ;
মাল ব'য়ে ঘাল হ'ল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয় নীড়।'

কল্লোলের প্রসঙ্গে, এই পত্রিকার সাহিত্য মোটিভ প্রসঙ্গে 'কল্লোলের কাল' গ্রন্থে জীবেন্দ্র সিংহরায় লিখছেন—

"কল্লোলের লেখকরা উনিশ-শতকী জীবন ভাবনা চক্রে আবর্তিত হতে চান নি- আনন্দসন্ধানী বিশ্বাস ও জীবন্মুক্তিবাদের পোষ্ট ছিলেন না। তাঁরা কতকটা বয়সোচিত কৌতূহল নিয়ে, কতকটা তৎকালবিস্তৃত অভিজ্ঞতার উপকরণের দ্বারা তাড়িত হয়ে জীবনের 'অপর পৃষ্ঠা' দেখতে চেয়েছিলেন। সমাজের যে স্তর থেকে তাঁরা এসেছিলেন তা এ-যাবৎ অল্প দেখা সেই অপর পৃষ্ঠাকে দেখার বাস্তব দৃষ্টিও জুগিয়েছিলো।"

আমাদেরও মনে হয় কল্লোলের সাহিত্যে বর্ণগত এবং অর্থগত সাধারণ আরোপে মানুষেরা ফিরে ফিরে এসেছেন। তাঁদের কান্না হাসি, বিকৃতি, ব্যভিচার, তাদের জড়ত্ব, তাদের সংস্কার, তাদের লাঞ্ছনা ফিরে ফিরে এসেছে। আমরা আলোচনার শুরুতে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক কবিদের সময়ের অন্ধকারজাত নৈরাশ্যের কথা বলেছিলাম সে প্রসঙ্গের অবতারণা প্রয়োজন। কল্লোলে এই কারণেই রোমান্টিসিজম এবং রিয়ালিজমের দ্বন্দ্বে মুখর। রোমান্টিক দুঃখ বিলাস এসেছে সম সময়ের বেকারত্ব, ইংরেজ অত্যাচারে জর্জরিত, বাংলা ভাগের চক্রান্তে মুখর সময়কে সঙ্গে নিয়ে। আসলে কল্লোলের কবিতা এখানে এসে শেষ পর্যন্ত অসন্তোষের আক্ষেপ বলে মনে হয়। যেমন দীপঙ্করের লেখা 'বসন্ত বিলাপ' কবিতাটি। সেখানে কবি লিখছেন—

"স্বপনের জাগরণ সমীরণ বহে,—
মনে হয় যেন কার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস !
ডাকে পিক, যেন কার বেদনা উচ্ছ্বাস
সুর উঠে বাজি আচম্বিতে।'

সুধীরকুমার চৌধুরীর 'অম্লান পুষ্প'-তে কবি লিখছেন —
"তামস - গভীর রাত্রি, অজানা দিগদেশ যাত্রী ঝড়,
আমার বক্ষের' পরে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ রোষে ভেঙে পড়,
আহত শত্রুর মত।"
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'অনাগত কবি' কবিতায় লিখছেন—
"আমাদের যদি কভু পড়ে মনে,
একবিন্দু অশ্রু শুধু এনো ডাকি"
থাকি' থাকি'
নয়নের কোণে,—
এই শুধু সাধ,
হে সনাতন, তব তরে এই আশীর্বাদ।"
জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'সিন্ধু' কবিতায় লিখছেন—
"নিঃস্ব নীল ওষ্ঠ তুলি নিতেছ চুমিয়া
মোর রক্ষকপোতের কপোতিনী পিয়া
কোথা কবে উড়ে গেছে, পুড়ে আছে আহা
নষ্ট নীড়, -ঝরা পাতা,-পূবালির হাহা !
বুদ্ধদেব বসু 'কাল' কবিতায় লিখছেন—
"কাল সে না আসে যদি! যদি আসে, ভালো নাহি বাসে!
তেমন না হয় যদি তা'র প্রেম, তোমার যেমন!
যদি সে বাসেও তোমা, যত ভালো বাসিতে সে পারে,
তবু তব ভালো নাহি লাগে!"
অজিত দত্ত তাঁর 'রুদ্রলীলা' কবিতায় লিখছেন—
"বাসুকীর ফণাশীর্ষে ধরণী সে বিষ-দীপ্তা নীলা,
মুগ্ধ করে সত্য, তবু দগ্ধ করা সেই তা'র লীলা।
কালকূট বহ্নিতেজে মহাকাশ দগ্ধ হ'য়ে যায়
মুক্তির মরীচি-তীর্থে বাসুতপ্ত মরুভূমি প্রায়।"

দুঃখ বিলাসের জন্ম সাধারণত সাজাজিক অবক্ষয় থেকে আসে। এ প্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পূর্ণভাবে রবীন্দ্র আনন্দবাদী দর্শনের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে দুঃখ বিলাসকে নিয়ে মগ্ন ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'দুঃখবদী' কবিতাটির কথা বলা আবশ্যিক। তিনি লিখছেন—

"তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে মাঝে রাস্তার দুলাল ছেলে,
পরের দুঃখে কেঁদে কেঁদে যায় শত সুখ পায়ে ঠেলে।

কবি-আরাধ্য প্রকৃতির মাঝে কোথা আছে এর জুড়ি।
অবিচারে মেঘ ঢালে জল, তাও সমুদ্র হ'তে চুরি।
সৃষ্টির সুখে মহাখুশি যারা, তারা নয় নহে, জড়;
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল, তারাই শ্রেষ্ঠতর।
মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ;
সত্য, সত্য, সহস্রগুণ সত্য,—জীবনের দুঃখ।
সত্যদুখের আগুনে বন্ধু, পরাণ যখন জ্বলে,—
তোমার হাতের সুখ- দুখ-দান ফিরায়ে দিলেও চলে।'

এই কবিতাটি 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদী দর্শনের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সময়ের দুঃখ যাপন, অস্থিরতা আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে যেভাবে তুলে এনেছেন তাতে সম সময়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। এই কল্লোল পত্রিকারই আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৩৪-এ ধনঞ্জয় শর্মা প্রতিবাদ করে 'দুখবিবাদী' নামের একটি কবিতা লিখলেন। সমস্ত সমালোচনাকে মান্যতা দিয়ে 'কল্লোল' -এর শ্রাবণ সংখ্যা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'প্রাপ্তিস্বীকার' নামের কবিতায় লিখলেন-

"এবার বুঝিনু খুবই-
যত মার খাও,-চেঁচিয়ে কান্না বেরসিক বেয়াদুবী।
মার রহস্য তাঁরি রসিকতা, খাঁটি ভগবতগীতা,
শত্রুর হাতে মিছরির ছুরি, বেত্রহস্ত মিতা।
মোটের উপর জগৎ যখন সুখে হেসে কুটোকুটি,
দুখবাদী-বৈরাগী-আহ্বানে কে আর আসিবে ছুটি?"

আমরা কল্লোলীয় সাহিত্যের যে গতি প্রকৃতিকে একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করলাম তাতে এ কথা স্পষ্ট করেই বলা যায় কল্লোল তার সময়ে যুগ যন্ত্রণা থেকে নতুন এক পথ সন্ধানে মগ্ন হয়েছিল। সজনীকান্ত দাশের মতন মানুষও রবীন্দ্র দরবারে কল্লোলের কবিতার ধর্ম নিয়ে নালিশ জানিয়েছেন তা সত্য। কল্লোলের লেখাকে তিনি উচ্ছৃঙ্খলও আখ্যা দিতে ছাড়েন নি। আসলে এখানেই তো মজা। এখানেই কল্লোলের নতুনত্ব।

যদিও কল্লোলে স্তবক - অক্ষর - মাত্রা -মিলকে ঠিক রেখেও কবিতা লেখা হয়েছে। সে কবিতাগুলির শৈলী প্রচলিত। কিন্তু কল্লোলের যে সমস্ত কবিতায় রবীন্দ্র—ছক ভেঙে ভাব এবং আঙ্গিকে নতুনের চেষ্টা ঘটেছে, তার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে জন্মেছে রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিকতা। প্রেমেন্দ্র মিত্র ধীরে ধরে গদ্যের দিকে ফিরেছেন। নজরুলের

দ্রোহাত্ম ধরণ, জীবনানন্দের আঙ্গিক, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গণচেতনা, বুদ্ধদেব বসুর আলো অন্ধকারের খেলা, ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ নিয়ে মেতে ওঠা, রুশ বিপ্লবের সাম্যবাদের ভাবনায় নজরুল, সময়ের দুঃখবাদী অবস্থার প্রকাশ কল্লোলকে ভিত্তি করে। এর ওপরই গড়ে উঠেছে পরবর্তী সময়ের পূর্ণ আধুনিক কবিতার ভুবন।

কল্লোল পত্রিকায় যে সমস্ত কবিতা যে সমস্ত সংখ্যাতে বেড়িয়েছিল তা এইরকম:

প্রথম বছর। ১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

১. বৈশাখ / ১ম সংখ্যা / ১৩৩০।দীনেশরঞ্জন দাশের

'কল্লোল', দীপঙ্কর ছদ্মনামে কালিদাস নাগের — 'বসন্তবিলাপ'।

২. জ্যৈষ্ঠ / ২য় সংখ্যা / ১৩৩০।

নজরুল ইসলামের 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'। রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের - অশ্রু। দীনেশরঞ্জন দাশের - লক্ষ্মীছাড়া।

৩. আষাঢ় / তৃতীয় সংখ্যা / ১৩৩০।জীবনময় রায়ের - কল্লোল। নরেন্দ্রনাথ দেবের- ধরা ছোঁয়া।

৪. শ্রাবণ / ৪র্থ সংখ্যা। নজরুল ইসলামের -অভিশাপ।পুলকচন্দসিংহের - বিদ্রোহ।

৫. ভাদ্র / ৫ম সংখ্যা। ১৩৩০। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের - হেঁয়ালি। কালিদাস নাগের দীপঙ্কর ছদ্মনামে - জীবন।

৬. আশ্বিন / ৬ষ্ঠ সংখ্যা। নজরুল ইসলামের আশান্বিতা। গিরিজাকুমার বসুর - **অগোচর।**

৭. কার্তিক / ৭ম সংখ্যা / ১৩৩০। সুধীরকুমার চৌধুরীর - শিশু।

৮. অগ্রহায়ণ / ৮ম সংখ্যা / দীনেশরঞ্জন দাশের - শ্রাবণ - শেষে।নজরুল ইসলামের - মরমী।

৯. পৌষ / ৯ম সংখ্যা। ১৩৩০। নজরুল ইসলামের - আলতা - স্মৃতি। সুধীররঞ্জন রায়চৌধুরীর - চিরকুমার।বনফুলের - মানুষ চাই

১০. মাঘ / ১০ম সংখ্যা / ১৩৩০। দীনেশরঞ্জন দাশের - ওঠো বীর। সুনীতি দেবীর - **প্রেম**।

১১. ফাল্গুন / ১১ তম সংখ্যা / ১৩৩০। সুধীরকুমার রায়চৌধুরীর - বিদ্রোহ।

১২. চৈত্র / ১২ তম সংখ্যা/ ১৩৩০। নজরুল ইসলামের - রৌদ্র- দগ্ধের গান।

২য় বছর। ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

১. প্রথম সংখ্যা। ১৩৩১। বৈশাখ।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের - শেষ অর্ঘ্য। কালিদাস নাগের ছদ্মনাম দীপঙ্কর নামে লেখা - বসন্ত।

২. ২য় সংখ্যা / জ্যৈষ্ঠ / ১৩৩১। সুবোধ রায়ের -প্রত্যয়।শৈলবালা সেনের-নীরব।

৩. আষাঢ় / তৃতীয় সংখ্যা / ১৩৩১। নজরুল ইসলামের - ঝড়।

৪. শ্রাবণ / ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩১ / সুধীরকুমার রায়চৌধুরীর -অভাবিত। দীনেশরঞ্জন দাশের - কে লইবে।

৫. ভাদ্র / ৫ম সংখ্যা /১৩৩১/ সুধীরকুমার চৌধুরীর - অম্লান পুষ্প। দীপঙ্করের - **মেঘদূত**।

৬. আশ্বিন / ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৩১। কোন কবিতা এই সংখ্যায় ছিল না।

৭ . কার্তিক / ৭ম সংখ্যা / ১৩৩১। সুবোধ রায়ের - ওরে পথিক। নজরুল ইসলামের সর্বনাশের ঘন্টা।

৮. অগ্রহায়ণ।১৩৩১ / ৮ম সংখ্যা।অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের - চাষা। জসীম উদ্দীনের - **ভাটির মায়া**।

৯. পৌষ / নবম সংখ্যা / ১৩৩১। সুবোধ দাশগুপ্তর - অমর সমাধি। সুবোধ রায়ের **মুক্তি পথে**।

১০. মাঘ / ১০ম সংখ্যা /১৩৩১। প্রেমেন্দ্র মিত্রের - কবি নাস্তিক।

১১. ফাল্গুন সংখ্যা / ১১ তম সংখ্যা / ১৩৩১। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা - অনাগত কবি। দীনেশরঞ্জন দাশের - যৌবন বিদায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা সৃষ্টির প্রথম প্রাতে বিধাতার মনে যে কথাটি ছিল সঙ্গোপনে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা ফাল্গুনের গান।

১২. ১২ তম সংখ্যা। চৈত্র। ১৩৩১। রবীন্দ্রনাথের লেখা অন্ধকার। প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা জীবন-শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোলা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখা - ধরাতে চরণ চরণ রাখি আকাশেরে লইব মাথায়।

তৃতীয় বর্ষ। ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

১. বৈশাখ / ১ম সংখ্যা / ১৩৩২। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন - মুক্তি। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা - যাত্রা। নজরুল ইসলামের লেখা চৈতী হাওয়া।

২. জ্যৈষ্ঠ /২য় সংখ্যা / ১৩৩২। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর লেখা রেল- ঘুম। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখা সূর্য।

৩. আষাঢ় / তৃতীয় সংখ্যা / ১৩৩২। সুরেশচন্দ্র ঘটকের লেখা- আখাঢ়ক মাহ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা বিরহ। প্রেমেকুমার চক্রবর্তীর লেখা নিশীথ- রাতে।

৪. শ্রাবণ। ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩২। প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা আজ আমি চ'লে যাই। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর সেনগুপ্তের লেখা সুদূর। কুসুমকুমারী দেবীর লেখা মিনতি। নজরুল ইসলামের লেখা রাজ ভিখারী। নিরুপমা দেবীর লেখা দেশবন্ধু। বীণাপানি দেবীর লেখা নবীন বুদ্ধ। নরেন্দ্র দেবের লেখা বন্ধু হারা। বিশ্বপতি চৌধুরীর লেখা মহাপ্রয়াণ। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা চিত্ত স্মারক। নলিনীকান্ত সরকারের লেখা চিত্ত - তীর্থ।

৫. ভাদ্র / ৫ম সংখ্যা / ১৩৩২। মোহিতলাল মজুমদারের লেখা - পান্থ। সুরেশচন্দ্র ঘটকের লেখা ব্রজগাথা।

৬. আশ্বিন / ৬ষ্ঠ সংখ্যা/ ১৩৩২। রবীন্দ্রনাথের লেখা -শেফালি।

৭. কার্তিক / ৭ম সংখ্যা / ১৩৩২। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখা ঝটিকা। বিভাবতী দেবীর লেখা বিদ্রোহ। সুশীলাসুন্দরী দেবীর লেখা আশাতীত। রাধাচরণ চক্রবর্তীর লেখা-মনে মনে। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের লেখা প্রশ্ন।

৮. অগ্রহায়ণ / ৮ম সংখ্যা / ১৩৩২। বুদ্ধদেব বসুর ঝরবে না আঁখিজল। জগৎবন্ধু মিত্রর লেখা যৌবনপথিক। মোহিতলাল মজুমদারের লেখা প্রেতপুরী। অজিতকুমার দত্তর লেখা নিকস কালো আকাশ তলে। নজরুল ইসলামের লেখা গোকুল নাগ।

৯. পৌষ / ৯ম সংখ্যা / ১৩৩২। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখা রম্যাঁ রল্যাঁ। প্রেমেন্দ্র মিত্রর লেখা সে কবে আমার মনে।

১০. মাঘ সংখ্যা।১০ ম সংখ্যা। ১৩৩২। প্রিয়ংবদা দেবীর লেখা দেবী হয়ে ছিনু বটে। হুমায়ূন কবিরের লেখা মানসী। জিতেন বকসীর লেখা গোকুলচন্দ্র নাগ স্মরণে।

১১. ফাল্গুন / ১১ তম সংখ্যা / ১৩৩২। বিভবতী দেবী লিখেছেন- এস। অজিতকুমার দত্ত লিখেছেন - কোন এক স্বপ্নে ঢাকা মায়াময় দেশে। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন - অন্ধ কবি। এই কবিতাটি আরব কবি Kahlil Gibran এর কবিতা The Blind Poet এর অনুবাদ। জীবনানন্দ দাশগুপ্ত লিখেছেন নীলিম নামের কবিতাটি।

১২. চৈত্র / ১৩৩২/ ১২ তম সংখ্যা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন মরুভূমি নামের কবিতা। নির্মলকুমার ঘোষ লিখেছেন আখেরী নামের একটি কবিতা। জ্যোৎস্নানাথ চন্দ লিখেছেন যৌবন- প্রভাতে নামের কবিতাটি।

চতুর্থ বর্ষের কল্লোলের কবিতা / ১৩৩৩

১. বৈশাখ / ১ম সংখ্যা / ১৩৩৩। অজিতকুমার দত্ত লিখেছেন ধরণী নামের কবিতাটি। জীবনানন্দ দাশগুপ্ত লিখেছেন বেদূঈন। কল্লোল নামের কবিতাটি লিখেছেন সুনীতি দেবী।

২. জ্যৈষ্ঠ/ দ্বিতীয় সংখ্যা।১৩৩৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকু লিখেছেন কবির কামনা। অজিতকুমার দত্তর কবিতা মানব। জীবনানন্দ দাশগুপ্তর কবিতা আধারের যাত্রী।

৩. আষাঢ়/৩য় সখ্যা/ ১৩৩৩। জীবনানন্দ দাশগুপ্তের কবিতা মো আঁখিজল। হেচেনচন্দবাগচীর কবিতা রৌদ্র।অজিতকুমার দত্তর কবিতা লিপি। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কবিতা রূপ ও আঁখি।

৪. শ্রাবন / ৪র্থ সংখ্যা / ১৩৩৩। গোকুলচন্দ্র নাগ লিখেছেন স্বপ্নকথা। কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য লিখেছেন জীবনের জয়যাত্রা। মোদাস্ম সফিয়া খাতুন লিখেছেন চলার ভাষা। জীবনানন্দ দাশগুপ্ত লিখেছেন নাবিক।

৫. ভাদ্র / ৫ম সখ্যা /১৩৩৩। অজিতকুমার দত্তর কবিতা অন্ধকার। হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতা রাজ শক্তি। নির্মলকুমার ঘোষের কবিতা চরম গোধুলি। সুশীলাসুন্দরী দেবীর কবিতা অধিকার। শৈলেশরঞ্জন ঘোষের কবিতা বড় ছোট। ভক্তিসুধা হারের কবিতা প্রেম।

৬. আশ্বিন / ৬ষ্ঠ সংখ্যা / ১৩৩৩। জসীম উদ্দীনের কবিতা রাখালী। গোকূলচন্দ্র নাগের কবিতা কবির বিয়ে। সুরেশ বিশ্বাসের কবিতা রক্তসাঁঝে সোনার ফসল এল চাষীর ঘরে।

৭. কার্তিক / ৭ম সংখ্যা। ১৩৩৩। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা শাপভ্রষ্ট। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কবিতা কান্ডারী। রাধাচরণ চক্রবর্তীর কবিতা ঝড়। সৈয়দউদ্দীনের কবিতা মাঠের হরফ। গোপাললাল দে কবিতা শারদ সঙ্গীত।যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতা ব্যথার পূজা। প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা তোমার কথাটি।

৮. অগ্রহায়ণ/৮ম সংখ্যা / ১৩৩৩। নজরুল ইসলামের কবিতা দারিদ্র্য। প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা তোমরা চলিয়া গেছ। ক্ষিতীন্দ্র মোহন সাহার কবিতা মৃত্যু দূত। হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতা শুভদিন গোপাললাল দের কবিতা পরী-স্থান। হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতা ব্যবধান।

৯. পৌষ / ৯ম সংখ্যা। ১৩৩৩। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর কবিতা আদি যুগ আন ফিরাইয়া। জীবনানন্দ দাশগুপ্তর কবিতা শ্মশান। হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা রাত্রী। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা তান্ত্রিকের গান। সরোজিনী নাইডুর কবিতা স্বর্গ -তোরণ। এবং আর একটি কবিতা গ্রাম্যসঙ্গীত রাধারম চক্রবর্তীর কবিতা গৈরী।

১০. মাঘ / ১০ম সংখ্যা / ১৩৩৩। হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতা মহাক্ষুধা। জসীমউদ্দীনের কবিতা বংশী-হারা। সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ওরে সোনার পাখী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কবিতা রবীন্দ্রনাথ। সুনির্মল বসুর কবিতা অশ্রুজল। সারদাচরণ রায়ের কবিতা পরীক্ষা।

১১. ১১ তম সখ্যা/ ফাল্গুন / ১৩৩৩। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা বন্দীর বন্দনা। জসীম উদ্দীনের কবিতা শাক- তুলুনী। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কবিতা দুঃখবাদী। অজিতকুমার দত্তর কবিতা রুদ্রলীলা। রাধারমন চক্রবর্তীর কবিতা মনের পাগল। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কবিতা গতি।

১২. ১২ তম সংখ্যা / চৈত্র/ ১৩৩৩। হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতা ব্রাহ্মণ। অজিতকুমার দত্তর কবিতা যৌবন বিদায়। সারদাচরণ রায়ের কবিতা বিধি-লিপি। জীবনানন্দ দাশগুপ্তর কবিতা দক্ষিণা। আব্দুল কাদেরের কবিতা লীলা অভিযাপ। অজিতকুমার দত্তর কবিতা-কবির আত্ম দর্শন।

পঞ্চম বছরে কল্লোলের কবি ও কবিতা / ১৩৩৪

১. বৈশাখ / ১ম সংখ্যা/ ১৩৩৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা - স্বাক্ষর। গোপাললাল দের কবিতা - নববর্ষের গান। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা - নব-পন্থা। নজরুল ইসলামের কবিতা দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জির। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কবিতা - আমারে ভুলিও ভাই। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতা - আমি- হারা।

২. জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা / ২য় সংখ্যা/ ১৩৩৪। হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতা অ-ধরা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কবিতা - ধর্মঘট। রাধাচরণ চক্রবর্তীর কবিতা মাতাল। প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা কবেকার কথা। জীবনানন্দ দাশগুপ্তর কবিতা সিন্ধু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা লেখা। বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ কবিতা বৃদ্ধ পরীক্ষক। কবিতাটি জাপানি কবি আজুমি রিয়োসাইয়ের কবিতার অনুবাদ।

৩. আষাঢ় / ৩য় সংখ্যা / ১৩৩৪। নজরুল ইসলামের কবিতা -আজি হ'তে শতবর্ষ আগে। অজিতকুমার দত্তর কবিতা মাধুকরী। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা - ওগো বিদ্যুল্লতা। ধনঞ্জয় শর্মার কবিতা দুঃখবিবাদী। সুনীতি দেবীর কবিতা বাংলার মেয়ে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কবিতা - সেকালে।

৪. শ্রাবণ / ৪র্থ সংখ্যা / ১৩৩৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কবিতা সকলি যে তুলিয়াছি।হেমেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা আব্দার। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কবিতা - প্রাপ্তি স্বীকার। হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা -সঞ্চয়। হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতা মৈত্রেয়। চামেলীপ্রভা ঘোষের কবিতা নারী- আঁখি। কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা জমিদার। কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা প্রার্থণা।

৫. ভাদ্র / ৫ম সংখ্যা / ১৩৩৪। রাধাচরণ চক্রবর্তীর কবিতা অন্ধের দৃষ্টি। অজিতকুমার দত্তর কবিতা রুদ্ধঘর। বিমলা দেবীর কবিতা এস।

৬. আশ্বিন / ৬ষ্ঠ সংখ্যা / ১৩৩৪। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ব্যথিত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কবিতা বিধাতার মত ভাই। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ভোরের আলোকে এই বন্দরখানি। রাধাচরণ চক্রবর্তীর কবিতা অভিসার। চামেলীপ্রভা দেবীর কবিতা দেবতা কোথায়? ক্ষিতিরঞ্জন মজুমদারের কবিতা ছবি ও মায়া।

৭. কার্তিক / ৭ম সংখ্যা / ১৩৩৪। সেই অর্থে এই সংখ্যায় কোন কবিতা ছাপা হয় নি। একটি গাথা ছাপা হয়েছিল। চন্দ্রকুমার দে'র পাষাণ মানব।

৮. অগ্রহায়ণ / ৮ম সংখ্যা / ১৩৩৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কবিতা সব পুড়ে হল ছাই। হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতা লতাময়ী উর্বশী। গোপাললাল দে-র কবিতা দরিদ্রের ভগবান। সৌরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা অশ্রুজল।

৯ম সংখ্যা/ পৌষ / ১৩৩৪। হেমচনদ্র বাগচীর কবিতা রমা। নজরুল ইসলামের কবিতা দীওয়ান - ই - হাফিজ। প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা এলো শীত ঘিরে কুয়াসা।

১০. মাঘ / ১০ম সখ্যা / ১৩৩। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কবিতা আমার প্রিয়ার ঘরের অতিথি।যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কবিতা বাস্তু। নজরুল ইসলামের কবিতা সুরের দুলাল। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা মহাকাল।

১১. ফাল্গুন / ১১ তম সখ্যা / ১৩৩৪। হেমচন্দ্র রায়ের কবিতা মানুষ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কবিতা নহেক প্রথমত। জীবনানন্দ দাশের কবিতা আদিম।

১২. চৈত্র। ১২ তম সংখ্যা / ১৩৩৪। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কবিতা খেজুর বাগান। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপতর কবিতা রোগশয্যায় অকা শুয়ে আছি। নিরুপমা দেবীর কবিতা অন্তর পারাবার। বীণাপাণি রায়ের কবিতা অসময়ে।

ষষ্ঠ বছরে কল্ললের কবি ও কবিতা / ১৩৩৫

১. বৈশাখ / ১ম সংখ্যা / ১৩৩৫। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কবিতা আরণ্যক। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কবিতা যদি কোন দিন। হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতা অস্ফুট স্মৃতির সুর। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ছায়।

২. জ্যৈষ্ঠ / ২য় সংখ্যা / ১৩৩৫। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা তবু তোমা ভুলি নাই। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা তোমারে বেসেছি ভাল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা বন্দনা। জগৎ মিত্রর কবিতা প্রশস্তি। রাধারাণী দত্তর কবিতা তোমার ঐ ঝরণাতলার নির্জনে। চামেলীপ্রভা ঘোষের কবিতা মন্বন্তর।

৩. আষাঢ় / ৩য় সংখ্যা/ ১৩৩৫। হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতা প্রথম বারিধারা। জসীম উদ্দীনের কবিতা সিঁদুরের বেসাতি। সুকুমার সরকারের কবিতা বহুরূপী। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পূর্ণমা।

৪. শ্রাবণ / ৪র্থ সংখ্যা / ১৩৩৫। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কবিতা নারী। জ্যোতি সেনের কবিতা অনাগত প্রিয়া। সুকুমার সরকারের কবিতা সে শুধু চাহিয়াছিল।বুদ্ধদেব বসুর কবিতা উৎসর্গ।

৫. ভাদ্র / ৫ম সংখ্যা। ১৩৩৫। জগৎ মিত্রর কবিতা শরৎপ্রশস্তি। জ্যোৎস্নাময়ী দত্তর দু"টি কবিতা ১. সেদিন হারায়ে গেছে ২. স্বপ্ন যদি সত্য হোত। প্রফুল্লশঙ্কর গুহর কবিতা কবির মুক্তি। কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আমি যে প্রবাসী ভাই।

৬. আশ্বিন / ৬ষ্ঠ সংখ্যা / ১৩৩৫। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আজ শরতে। হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতা দীপান্বিতা। মহমুদ হোসেনের কবিতা বিজলী। সুকুমার সরকারের কবিতা ধরণী। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কবিতা দোসরা আশ্বিন।

৭. কার্তিক / ৭ম সংখ্যা / ১৩৩৫। এই সংখ্যায় কোন কবিতা ছাপা হয়নি।

৮. অগ্রহায়ণ / ৮ম সংখ্যা / ১৩৩৫। প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা তোমার লাগিয়া। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কবিতা দুঃখের পার। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা তোমারে ভুলিয়া গেছি। জসীম উদ্দীনের কবিতা শরতের বিদায়। সুকুমার সরকারের কবিতা - সহজ প্রেম।

৯ম সংখ্যা / পৌষ / ১৩৩৫। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা তব মুখ পানে।রাধারাণী দত্তর কবিত প্রেম প্রশস্তি। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কবিতা সিন্ধুজল। জ্যোৎস্নাময়ী দত্তর কবিতা কামনা। সন্ন্যাসী সাধুখাঁর কবিতা শ্মশানচারী।

১০. মাঘ / ১০ম সংখ্যা / ১৩৩৫। অজিতকুমার দত্তর কবিতা গৌরবান্বিত। সুকুমার

সরকারের কবিতা বিরহ মিলন। কনকলতা ঘোষের কবিতা মিনতি। হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতা পার্বণ।

১১. ফাল্গুন / ১১ তম সংখ্যা / ১৩৩৫। রাধারাণী দত্তর কবিতা ফাল্গুন মাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে। বিশ্বেশ্বর দাশের কবিতা পত্রলেখা। সরোজবালা ঘোষের কবিতা জবা। জসীম উদ্দীনের কবিতা কাল সে আসিবে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কবিতা তখনও তুমি আস নাই ভাই। নিকুঞ্জমোহন সামন্তর কবিতা কল্পনা।

১২ . চৈত্র / ১২ তম সংখ্যা / ১৩৩৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা নবীন সাধক। জসীম উদ্দীনের কবিতা একখানি হাসি। সারদাচরণ রায়চৌধুরীর কবিতা টমাস হার্ডি। কুমুদ ভট্টাচার্য্যের কবিতা তুমি কাঁদো আর আমি কাঁদি। জগৎবন্ধু মিত্রর কবিতা রক্ত করবী। প্রণব রায়ের কবিতা স্মরণ। কনকলতা ঘোষের কবিতা প্রিয়- সন্দর্শনে।

কল্লোলের সপ্তম বর্ষের কবিতা : ১৩৩৬

১. বৈশাখ / ১ম সংখ্যা / ১৩৩৬। রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুয়ার। নজরুল ইসলামের কবিতা শীতের সিন্ধু। হেমেন্দ্রচন্দ্র বাগচীর কবিতা আকাশেরে ভাষা দাও কবি। জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাখীরা।

২. জ্যৈষ্ঠ / ২য় সংখ্যা / ১৩৩৬। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কবিতা সার্বজনীন। ভবানী ভট্টাচার্য্যের কবিতা ওষ্ঠের জ্যোৎস্না এক কথা। অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতা সৌন্দর্য্য পিপাসা। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা মুক্তি নির্ভর। অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতা পূর্ণমনস্কাম।

৩. আষাঢ় / ৩য় সংখ্যা /১৩৩৬। জগৎ মিত্রর কবিতা অখ্যাত। নজরুল ইসলামের কবিতা আড়াল।অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতা দূর। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা কাল।ভবানী ভট্টাচার্য্যের কবিতা এত ঘৃণা করি তবু।

৪. শ্রাবণ / ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩৬। মৈত্রেয়ী দেবীর কবিতা লেখাপড়া। অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতা সমাপ্তি। সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা শাশ্বত। নরেন্দ্র দেবের কবিতা তারুণ্য। জসীম উদ্দীনের কবিতা কাল সে আসিয়াছিল।

৫. ভাদ্র / ৫ম সংখ্যা/ ১৩৩৬। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কবিতা লীলাকীর্তন। অন্নদাশংকর রায়ের কবিতা সাবিত্রী। বিমলা দেবীর কবিতা পাহাড়ী। ভবানী ভট্টাচার্য্যের কবিতা কালো চোখে এত আলো। বিষ্ণু দে-র কবিতা তেপাটি।

৬. আশ্বিন / ৬ষ্ঠ সংখ্যা / ১৩৩৬। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতা পান্থবাস। জিতেন্দ্র বক্সীর কবিতা এ সুন্দর ধরণীরে লাগিয়াছে ভাল।

৭. কার্তিক / ৭ম বরষ / ১৩৩৬। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা আবিষ্কার। সুকুমার সরকারের কবিতা সৃজন। কার্তিক শীলের কবিতা অচেনা।

৮. অগ্রহায়ণ / ৮ম সংখ্যা / ১৩৩৬। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা দুটি কথা।

বন্দে আলী মিয়ার কবিতা ঝপঝপের দহ। অন্নদাশংকর রায়ের কবিতা যোগ্যতা। মনোজ বসুর কবিতা মায়া।

৯. পৌষ / ৯ম সংখ্যা / ১৩৩৬। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কবিতা সঙ্কেতময়ী। নীলিমা রায়ের কবিতা মালা। হেমচন্দ্র বাগচীর কবিতা ভিক্ষুক। প্রণব রায়ের কবিতা তোমাকে। অন্নদাশংকর রায়ের কবিতা-ভবিষ্যত।

আমরা জানি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাত ‘কল্লোল’ পত্রিকার ভেতর দিয়েই শুরু হয়েছিল। কল্লোলের কোলাহলেই জেগে উঠেছিল সাহিত্যের নতুন ভাষা এবং আঙ্গিক। আমরা ‘ফোর আর্টস’ নামের প্রতিষ্ঠানটির কথা জানি। এর মূল লক্ষ্য ছিল আধুনিক রুচিসম্মত একটা বোধকে তৈরি করা। এর মূল ভাবক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগের মতন অনেকে। দু’বছর টিকে ছিল এই ক্লাব। এই ক্লাবের মনন থেকেই গড়ে উঠেছিল ‘কল্লোল’। কল্লোলের মূল ভাবনার সুর নিয়ে দীনেশরঞ্জনের কবিতা—

“আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা নিশিদিন,
অজানা জানার নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি’ ফিরে আসি নিশিদিন।”

কল্লোলের কবিতার মুলেই ছিল এই কথা। রবীন্দ্রনাথের সত্য সুন্দর আনন্দের পৃথিবীতে যখন বিশ্বযুদ্ধ, ক্ষুধা, বেকারত্ব, পরাধীনতার গ্লানিতে বাংলা তথা দেশ ভয়ার্ত, তখন কল্লোলের সাহিত্য, কল্লোলের কবিতা ঘুমহারা রাত্রিদিনে আছাড় খেয়ে পড়েছিল বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়।

তথ্যঋণ -

১. রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক / সাহিত্য চর্চা / বুদ্ধদেব বসু।
২. বাঙালী ও বাংলাসাহিত্য / প্রমথনাথ বিশী
৩. বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস / নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য
৪. বাংলাদেশের ইতিহাস / ৪র্থ খন্ড / ১৯৮২ সংস্করণ / ৫৫৬ পৃষ্ঠা / রমেশচন্দ্র মজুমদার
৫. অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য / বুদ্ধদেব বসু / কল্লোল / চৈত্র ১৩৩৪।
৬. কল্লোলের কা / অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত।
৭. নূতন ও পুরাতন / ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৮. বিনয় সরকারের বৈঠকে / ২য় ভাগ / বিনয় সরকার।
৯. ফোর আর্টস ক্লাব / সুনীতি দেবী / প্রবাসী ষষ্ঠ বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ / ১৩৬৭।
১০. কল্লোল ও দীনেশরঞ্জন দাশ / বুদ্ধদেব বসু / কবিতা / কার্তিক / ১৩৪৮
১১. বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস / সুকুমার সেন / ৪র্থ খন্ড / ১৯৫৮
১২. কল্লোলের কাল / জীবেন্দ্র সিংহরায়।

কল্লোলের সমকাল : কাজী নজরুল ইসলাম

দে ব শ্রী ঘো ষ বি শ্বা স

সাময়িকপত্র বা সংবাদপত্র কেবলমাত্র দেশের জনসাধারণের চিন্তা-চেতনা বা রাজনৈতিক জনজাগরণের ঘটনাকেই প্রতিফলিত করে না, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ জনমানসে সঞ্চারিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব পালন করে। পাশ্চাত্যে The Spectator তার চিরন্তন দৃষ্টান্ত। মানুষের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে সাময়িক পত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সমকালীন সমাজবাস্তবতা, পরিবর্তন, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, ধর্ম ভাবনা, সমস্ত কিছুর তথ্যনিষ্ঠ দলিল হয়ে থাকে সাময়িকপত্রগুলি। সর্বোপরি বৌদ্ধিক চর্চার বিস্তৃত পরিসর তৈরী করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্যের পথ চলা শুরু, যদিও তা সীমিত ছিল কিছু পাঠ্য পুস্তক রচনার মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে (১৮১৯) শ্রীরামপুরের মিশনারী জন ক্লার্ক মার্সম্যানের সম্পাদনায় 'দিগদর্শন' নামে বাংলা ভাষায় প্রথম একটি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্য চর্চার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। পরবর্তী কালে একে একে, প্রকাশিত হয় 'সমাচাদর্পণ', 'সম্বাদকৌমুদী', 'সমাচারচন্দ্রিকা', 'বঙ্গদূত,' 'সংবাদপ্রভাকর', 'তত্ববোধণী' প্রভৃতি পত্রিকা, প্রথিতযশা, দিকপাল বাঙালী লেখকদের হাতে হয়ে ওঠে সাহিত্যসহ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আকর। সেই সঙ্গে চর্চিত হত সমকালীন সমাজ, ধর্মবোধ, নারী শিক্ষার প্রচার, ইতিহাস-ভুগোল, নীতিমূলক শিক্ষা বিষয়ক বিষয়। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত 'মাসিক পত্রিকার' ভূমিকায় লেখা হয়—

এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে। যে ভাষায় সচরাচর আমাদিগের কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচিত হইবেক।

বিজ্ঞ পন্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই'।

অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে নারী জাগরণের যে মুক্ত বাতাস প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল তারই ফলশ্রুতি 'মাসিক পত্রিকা'। ১৮৫১খ্রিষ্টাব্দে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ইংরেজী 'পেনি' ম্যাগাজিনের আদলে প্রকাশিত হয়। এভাবেই বিভিন্ন ধরনের সাময়িক পত্রের পথ পরিক্রমা চলতে থাকে ধারাবাহিকভাবে আর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়, সমকালীন সমাজ ও বহুবিধ বিষয়ে উৎকর্ষ সাধিত হয়।। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 'সোম প্রকাশ' পত্রিকায় সামাজিক সমস্যা সহ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, বিধবা বিবাহ বহুমুখী বিষয় চর্চা স্থান পায়। সাময়িক পত্রের ইতিহাসে নব দিগন্তের সূচনা হয় ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে। বাঙালী মনীষার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়

—'বঙ্গদর্শন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ' এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিনী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দ বেগে ধাবিত হইতে লাগিল"।

পরবর্তীকালে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার নেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সাময়িক পত্রগুলি যুগলক্ষণের নির্ভরযোগ্য দলিল হয়ে আছে এবং বাংলা গদ্য ক্রমশ কাঠিন্য, রুক্ষতা বর্জন করে কোমল ও সরস হয়ে উঠেছে। ১৮৭৭-এ প্রকাশিত 'ভারতী' মূলত ঠাকুরবাড়ীর পত্রিকা। পরিবারের সদস্যরাই লিখতেন। বাংলা গদ্য চর্চার ধারাবাহিকতায় 'ভারতীর' অবদান অতুলনীয়। পত্রিকা সাহিত্যের ঐতিহাসিক গুরত্ব নির্ণয় করে ড. সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন,

"১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ অবধি দেখিতেছি যে বাংলা গদ্য সাহিত্য এবং (বাংলা আধুনিক সাহিত্য) প্রধানতঃ সাময়িক পত্রিকার আশ্রয়েই বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলা গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের বাহন হইয়াই সংবাদপ্রভাকর, তত্ত্ববাধনী পত্রিকা, বিবিধার্থসংগ্রহ, সোম প্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ভারতী, জ্ঞানাঙ্কুর, আর্য দর্শন, বান্ধব, নবজীবন, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ও সবুজ পত্র ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়াছে"।

কেবলমাত্র গদ্য সাহিত্যই এই সব পত্রিকা গুলিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠেনি, গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন বিষয়গুলোর চর্চা হত। সব কালেই সাময়িক পত্র যুগ মানসের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয় 'কল্লোল' পত্রিকা। গোকুল চন্দ্র নাগ ও দীনেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায়। আগে 'ফোর আর্টস ক্লাব' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। তাঁদের সঙ্গে মুক্ত ছিলে মনীন্দ্রলাল বসু এবং সুনীতি দেবী। গোকুল চন্দ্র আসলে ছিলেন চিত্র শিল্পী। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল একটি মাসিক পত্রিকা বের করার। গোকুলচন্দ্র বলেছেন—

"আমার ব্যাগে দেড় টাকা, আর দীনেশের ব্যাগে টাকা দুই—ঠিক করলুম 'কল্লোল' বের করব। সেই টাকায় কাগজ কিনে হ্যান্ডবিল ছাপালাম। চৈত্র সংক্রান্তির দিন রাস্তায় বেজায় ভিড়, জেলে পাড়ার সং দেখতে বেরিয়েছে সেই ভিড়ের মধ্যে আমরা দুজনে হ্যান্ডবিল বিলোতে লাগলাম"।

১০/২ পটুয়া টোলা লেনে কল্লোলের অফিস। যে পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের গতিমুখ পরিবর্তন করে দিয়েছিল, এক নতুন সাহিত্য ধারার জন্ম দিয়েছিল সেই আঁতুড় ঘরের বর্ণনা—

"ছোট্ট দোতলা বাড়ি, একতলায় রাস্তার দিকে ছোট্ট বৈঠক খানায় কল্লোল অফিস! বাঁয়ে বেঁকে দুটো সিঁড়ি ভেঙে উঠে হাত দুই চওড়া ছোট একটু রোয়াক ডিঙিয়ে ঘর**** একজনের শোয়ার মতো ছোট এক ফালি তক্তপোষ শতরঞ্জির উপর চাদর দিয়ে ঢাকা, পশ্চিম দিকের দেওয়ালের আধখানা জুড়ে একটি আলমারি, বাকি আধখানায় আধা সেক্রেটারিয়েট টেবিল******। ফাঁকা জায়গা টুকুতে খান দুই চেয়ার আর একটি ক্যানভাসের

ডেক চেয়ার। ঐ ডেক চেয়ারটিই সমস্ত কল্লোল অফিসের আভিজাত্য। প্রধান বিলাসিতা' কল্লোল পত্রিকার উদ্দেশ্য বা নামকরণ নিয়ে কিছু জানা না গেলেও প্রথম সংখ্যাতেই দীনেশরঞ্জনের কল্লোল নামে একটি কবিতা এবং বিজয় চন্দ্র মজুমদারের কল্লোল নামে একটি কথিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তবে কল্লোলের যুগধর্ম নিয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

"বস্তুত কল্লোল যুগে এ দুটোই প্রধান সুর ছিল, এক প্রবল বিরুদ্ধতাবাদ, দুই বিহ্বল ভাববিলাস এক দিকে অনিয়মাধীন উদ্দামতা, অন্যদিকে সর্বব্যাপী নিরর্থকতার কাব্য। এক দিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী। আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নির্বারিত হচ্ছে। এই যন্ত্রণাটা সেই যুগের যন্ত্রণা।.. তাই একদিকে যেমন তার বিপ্লবের অস্থিরতা, অন্যদিকে তেমনি বিফলতার অবসাদ। যাকে বলে-'ম্যালাডি অফ এজ' বা যুগের যন্ত্রণা তা কল্লোলের লেখায় স্পষ্ট রূপে উৎকীর্ণ"।

উল্লেখ্য এই পত্রিকার লেখার ধরণ অনুয়ায়ী বিভিন্ন বিভাগ ছিল, যেমন সংগ্রহ, সমাচার, আলোচনা, প্রবাহ, ডাকঘর, ছবি, কাহিনী, পরিচয়লিপি প্রভৃতি। সমকালে প্রকাশিত 'কালিকলম', 'প্রগতি' বা অন্যান্য পত্র পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত লেখকরাও কল্লোল গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। আসলে একটা সময়কাল, যুগকে চিহ্নিত করা হয়। একটা বিষয় লক্ষণীয় পূর্বকাল থেকেই বিপরীত ভাবধারার পত্রিকা গোষ্ঠীর উদ্ভব। যেমন 'সমাচার দর্পণে'র রক্ষণশীলতার পরিবর্তে প্রগতিশীল 'সম্বাদকৌমুদি', 'বঙ্গদর্শনে'র বিপ্রতীপে 'সোম প্রকাশ'। 'সাধনা' বনাম 'সাহিত্য', ঠিক তেমননি কল্লোলের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী শনিবারের চিঠি। তেমনই এক পত্রিকা 'নবশক্তি'র সম্পাদক বিদ্রুপ করে বলেছিলেন সবাইকে এক এক করে বিয়ে দিতে কারণ অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ, গোকুল, দীনেশরা উচ্ছনমতি যুবক। তাই এঁরা শচীনের পাল্টা নাম রেখে ছিলেন 'সাচ ইন সেন'। 'পাঁক' ও 'পটল ডাঙার পাঁচালী' প্রকাশিত হলে অভিজাত সমালোচকরা গলার শির ফুলিয়ে চোখ কপালে তুলে গেল গেল রব তুলছিলেন এই বলে, তাঁরা নাকি নালা নর্দমার নোংরা পাঁক নিয়ে ছোঁড়াছুড়ি করে সাহিত্যের অধঃপতন ঘটাচ্ছে। যদিও পরবর্তী কালে এরাই 'কল্লোল', 'কালি কলমে' নিজেদের লেখা ছাপাতে অনুরোধ জানায়।

কল্লোল এর সঙ্গে একই বছরে একই মাসে জন্ম নেওয়া আর একটি পত্রিকার কথা না বললেই নয়, মুরলীধর বসুর 'সংহতি'। কল্লোল সাত বছর চললেও দু বছরের মধ্যেই 'সংহতি' বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আর এক নতুন ধারার পত্রিকার পূর্বজ। বাংলাদেশে শ্রমজীবী মানুষদের প্রথম মাসিক পত্রিকা। 'লাঙল','গণবানী','গণশক্তি'র অগ্রনায়ক। বিপিনচন্দ্র পালের উৎসাহ ও সহযোগিতায় গড়ে ওঠে 'সংহতি'। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল আর্শীবাদ বাণী লিখে পাঠালেন, অপ্রত্যাশিতভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ এল, ছাপা হয় পরের সংখ্যায়। শৈলজানন্দের 'বাঙালী ভাইয়া' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় সংহতিতে। পরে 'মাটির ঘর' নাম

বই আকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু মূল সুরের সঙ্গে মিলিয়ে লেখক গোষ্ঠী তৈরী না হওয়ায় ‘সংহতি’ বন্ধ হয়ে গেলেও আগামীর বীজ রোপন করে যায়।

কল্লোলের প্রায় সমকালে তিন বছর আগে ১৯২০ সালে মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায় বাংলার সাহিত্যাকাশে এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দেখা মেলে। সৈনিক, কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, সুরস্রষ্টা, সাংবাদিক ও পত্রিকা সম্পাদক-কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘বাঁধনহারা’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই কালে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা ‘প্রবাসী’ নজরুল বলতেন-‘প্রকৃষ্ট রূপে বাসি - প্রবাসী’। ১৯০১ সালে এলাহাবাদ থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। অর্ধশতক ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। কল্লোলের সময়েও তা সমানভাবে আদৃত। যেহেতু মহিলাদের লেখায় উৎসাহিত করা হত তাই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত স্বনামে লেখা দিয়ে মনোনিত না হওয়ায়, নীহারিকা দেবী নামে একই লেখা পাঠান এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত হয়। নজরুল, রবীন্দ্রনাথ শুরু করে সে কালের সব প্রোথিতযশা সাহিত্যিকরা লিখতেন। স্বভাবতই সমকালের সব লেখক-কবিদের সঙ্গে পারস্পারিক পরিচয় ছিল। ‘বিজলী’ পত্রিকায় ১৯২২ সালে ‘বিদ্রোহী’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক আলোড়ন ওঠে এবং তিনি ‘বিদ্রোহী কবি’ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। কল্লোলের লেখক শৈলজানন্দের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়। আসানসোলে পাশাপাশি দুটি স্কুলে একই শ্রেণীতে পড়তেন তাঁরা, এবং এন্ট্রান্স পরীক্ষার আগে দু জনেরই এক সঙ্গে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। নজরুল পারলেও পারিবারিক আপত্তির কারণে শৈলজানন্দ পারেননি ফলে তাঁরই সূত্র ধরে অন্যদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। আর ইত্যোমধ্যেই নজরুল বিদ্রোহী কবি। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর সমগ্র দেশ অগ্নিগর্ভ, অন্যদিকে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের উত্তাল পরিস্থিতিতে ১৯২০ সালের ১২ই জুলাই মুজাফফর আহমেদ, নজরুল যুগ্ম সম্পাদনায় দৈনিক পত্রিকা ‘নবযুগ’ প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে।” নজরুলের জোরালো লেখার গুণে প্রথম দিনেই কাগজ জনপ্রিয়তা লাভ করল’। মুজফর আহমেদ যুগোচিত সমাজচেতনা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তিনি ‘নবযুগ’ পরিচালনা করতেন। স্বাভাবিকভাবেই রাজরোষে পড়ে ১০০০ টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল। পরে তিনি ‘নবযুগ’ ত্যাগ করেন, ‘মোসলেম ভারতের’ সম্পাদক আফজালুল হকের পরামর্শে। ‘ধূমকেতু’ সাংবাদিক নজরুলের পত্রিকা পরিচালনার প্রথম স্বাধীন প্রয়াস, তাঁর বিপ্লবী রূপের পরিচয় পাওয়া যায় ধূমকেতু প্রকাশের পর। ১৯২২ সালের ১১ই অক্টোবর প্রথম প্রকাশিত হয়। মূল্য এক আনা। এই পত্রিকাতেই নজরুল প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করে তাঁর বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনার স্বাক্ষর রাখেন। তাই ধূমকেতু হয়ে উঠেছিল চরমপন্থী বিপ্লবীদের মুখপত্র। এই বছরই প্রথম আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মালিক শ্রী মৃণালকান্তি ঘোষ (শিশির কুমার ঘোষের ভ্রতুস্পুত্র) নজরুলকে খুব স্নেহ করতেন। নজরুল তাঁর কাছে একট বিজ্ঞাপন পেতে চাইলে তিনি বলেন-

"তার আগে তুমি আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যার জন্য একটি আগমনী কবিতা লিখে দাও"।

লিখেছিলেন বিখ্যাত কবিতা 'আনন্দময়ীর আগামনে', স্বভাবতই আনন্দবাজারে ছাপা হয় নি, হয়েছিল 'ধূমকেতু' পত্রিকায়। এই কবিতার জন্যই তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ১২৪ক এবং ১৫৩ ধারা অনুযায়ী রাজদ্রোহের মামলায় এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। নজরুলের বন্দী দশাতেই কল্লোল প্রকাশিত হয়। হুগলি জেলে থাকাকালে তিনি সুপারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে টানা উনচল্লিশ দিন অনশন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলং থেকে একটি টেলিগ্রাম করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে পত্রে জানান—

"নজরুল ইসলামকে প্রেসিডেন্সি জেলের ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম। লিখেছিলুম,

Give up hunger strike– our literature claims You. জেল থেকে Memo এসেছে, the address not found অর্থাৎ ওরা আমার বার্তা ওকে দিতে চায় না। কেননা নজরুল প্রেসিডেন্সি জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয় জানে সে কোথায় আছে। অতএব নজরুলের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না"।

নজরুল ইসলাম যখন হুগলি জেলে বন্দী, তখন রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং একটা কপি জেলে তাঁর কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পড়েছিল পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের এর উপর। যিনি 'প্রবাসী'তে কাজ করতেন এবং অজাতশত্রু, সবার বন্ধু, মুসকিল আসান ধরনের যুবক। নজরুলের এক গুনমুগ্ধ ভক্ত সিটি কলেজে আই এ, পড়া ছাত্র নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নজরুলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বাগচি বাড়ীতে (যতীন্দ্র মোহন বাগচি)। তাঁরা দুজন 'বসন্ত'র কপি নিয়ে পৌঁছলেন হুগলি জেলে। অনেক কষ্টের পর পাঁচিল টপকে নজরুলের হাতে বই দেওয়া হয় এবং সঙ্গে দুটি অনুরোধ, অনশন ভঙ্গ করার এবং কল্লোলের জন্য কবিতা লেখার। প্রথমটি রাখতে পারবেন না জানিয়ে দেন কিন্তু দ্বিতীয়টি রাখেন। জেলে বসেই লেখেন -'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' লাল কালিতে লেখা। সম্ভবত দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, এবং কবিকে পাঁচ টাকা পাঠান হয়েছিল পবিত্র'র হাতে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন—

"নৃপেনের মতো আমিও ফাস্ট ইয়ারের ছাত্র সপ্তাহান্তে বিকেল বেলা আরো অনেকের সঙ্গে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে ধূমকেতুর বান্ডিল নিয়ে আসে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাগজের জন্যে। কালির বদলে রক্তে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লেখা সে সব প্রবন্ধ।"

কাজেই পরের বছর প্রকাশিত কল্লোলের মানসভূমি গঠনে ধূমকেতুরও পরোক্ষ অবদান অনস্বীকার্য। সমকালে সব দিকপাল কবি সাহিত্যিকরাই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কল্লোল

যুগ বলতে তাই শুধুমাত্র এই পত্রিকাকেই বোঝায় না, একটা সময়, ভিন্নতা নিয়েও সবাই কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখক। পূর্বজদের ঋণ স্বীকার কল্লোল ভিন্ন পথ ধরেছিল, সেটা সময়েরই দাবী। উৎকর্ষের শেষ সীমার পৌঁছে নতুন পথের সন্ধান করা এক ঐতিহাসিক সত্য। তাই 'ফজলীতর' আম নয়, 'আতাফলের' সন্ধান করতেই হয়।

"কল্লোলের সমকাল আসলে নীবিড় বন্ধুত্বের, সহমর্মিতার যুগ। বাঁধভাঙা এক সৃজন উল্লাস। বাংলা সাহিত্য মনন, মেধায় ঋদ্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। নতুন মত ও পথের সন্ধান করছেন একদল স্বপ্ন দর্শী যুবক । তাদের প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন হলেও ছন্দ এক। আর এদের মাঝে বসে নজরুল ইসলাম 'বিষের বাঁশি' বাজাচ্ছেন। সবার রক্তে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাচ্ছেন—

"প্রখরতার মধ্যে সে যে কি প্রবলতা, কার সাধ্য তা প্রতিরোধ করে! কার সাধ্য সে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা না নেয় মনে মনে"!

"বিষের বাঁশি"র ভূমিকায় দীনেশরঞ্জনকে উল্লেখ করেছিলেন-"আমার ঝড়ের রাতের বন্ধু" বলে। কল্লোলের বিদ্রোহ ছিল জীবনবাদের, আর নজরুলের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক চেতনা। তাঁর সম্পাদনায় ফজলুল হক 'নবপর্যায় নবযুগ' প্রকাশ করেন। এখানে নজরুল সাংবাদিকতার সাক্ষর রাখেন। পত্রিকাটিতে সমকালের বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থাপন ছিল লক্ষণীয়। 'সেবক' নামে আর একটি দৈনিক পত্রিকা, যার সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মুহম্মদ আকরম খান, রাজদ্রোহের অপরাধে এক বছর কারাদণ্ডে দন্ডিত হয়েছিলেন। নজরুল এই পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। হুগলি জেলে থাকাকালীন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মারা যান। 'সেবক' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তিনি গভীর শোক জ্ঞাপন করেন। কিন্তু 'ধূমকেতু' পত্রিকার সত্ত্বাধিকারী ছিলেন নজরুল স্বয়ং। সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত নিজের নামে ছাপা হলেও অষ্টম সংখ্যা থেকে 'সারসী' নামে তাঁর নাম ছাপা হয়। রবীন্দ্র নাথ স্বয়ং লিখেছিলেন—

'আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
****
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ চেতন'।

মুজাফফর আহমেদ 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে নিয়ামত লিখতেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 'ত্রিশূল' নামে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ধূমকেতু নিজের পরিচয় জানায় এই ভাবে—

"আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু এই শস্তার শনি মহাকাল ধূমকেতু"

সামাজিক আচার- অনুষ্ঠানের অচলায়তনকে চুরমার করে নতুন যুগ চেতনায় পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করার আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ধূমকেতুর চালক বিদ্রোহী

নজরুলের জয়যাত্রা শুরু হয়। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় ঝিমিয়ে পড়া নৈরাশ্যপীড়িত বিপ্লবীদের চাঙ্গা করার জন্য ধূমকেতু যে উন্মাদনা সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করে, তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষের পটভূমিতে তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। 'ধূমকেতু'র জন্য যাঁরা সক্রিয়ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব—ভূপতি মজুমদার, বারীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ রায়, নলীনিকান্ত সরকার, মঈনুদ্দিনখান প্রমুখ। ব্যক্তি নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রকাশ পায়, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক কবিতা ও প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে প্রচারিত হতে থাকে। অর্থাৎ শৃঙ্খলিত মানবাত্মার শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রামে নির্ভীক নজরুল সর্বদাই অগ্রগামী সৈনিক। ১৯২২ সালের ৩০ শে আগস্ট অমৃতবাজার পত্রিকায় ধূমকেতুর আর্বিভাবকে স্বাগত জানিয়ে লেখা হয়—

'*********** we hope 'Dhoomketu' or comet will not simply be an embleum– of destruction in the hands of the soldier– poet but will create something that is beautiful– something that is abiding and holy'.

ধূমকেতু প্রকৃতই নজরুলের সৃষ্টিশীল ও সমাজসচেতন সাহিত্যিক মনের পরিচায়ক। সেই সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণদের কাছে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও আবেদন পৌঁছে দিতে। তাই 'যুগান্তর' দলের সদস্যেরা বলতেন ধূমকেতু তাঁদের পত্রিকা। (১৯২০ সালে প্রকাশিত) 'ইসলামদর্শন' পত্রিকা ধূমকেতুর তীব্র সামালোচনা করে বলে 'অমঙ্গলের অগ্রদূত', এবং নজরুলকে 'উহার স্বেচ্ছাচারি সারথি' আখ্যা দেওয়া হয়। মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমেদের 'লোকটা মুসলমান না শয়তান দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে তীব্র আক্রমণ করা হয়—

'হিন্দুয়ানী মাদ্দায় ইহার মস্তিস্ক পরিপূণ—মুসলমানের ঔরসেও অনেক নাস্তিক শয়তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মুসলমান সমাজ তাহাদিগকে আস্তাকুঁড়ের আবর্জনার ন্যায় বর্জন করিয়াছে, সুতরাং এ যুবক কোন ছার।— নরাধম ইসলাম ধর্মের জানে কি? খোদাদ্রোহী নরাধম শয়তানের পূর্ণাবতার।—একটা ধর্ম জ্ঞান শূন্য বুনো বর্বরের নিকট-আকাট মুর্খ পাষণ্ডের নিকট আর কি আশা করা যাহইতে পারে—"

সমকালে স্বজাতীয় একশ্রেণীর মানুষের দ্বারা চরম লাঞ্চিত ধিকৃত হয়েছিলেন। 'শনিবারের চিঠি'ও কোন অংশে কম ছিল না। কল্লোলসহ রবীন্দ্র- নজরুলের চরম বিরোধী ছিল। 'প্রতি শনিবার প্রেয়সী গালি দেয় তুমি হাঁড়িচাচা' এমন অজস্র উদাহরণ আছে। এ ভাবে বারংবার রক্তাত্ব হতে হতে কল্লোলের অফিসের এক কর্মচারী, মনীন্দ্র চাকীর ঘরে বসে লিখেছিলেন 'সর্বনাশের ঘন্টা' কবিতাটি। ১৩৩১ এর কার্তিক সংখ্যার কল্লোলে প্রকাশিত হয়েছিল। কল্লোলীয় ঘনিষ্টতার জন্যই নজরুলের কারণে কল্লোল অফিসে খান্না তল্লাসী হয়। বৃটিশ

পুলিশ মনে করেছিল এরা সবাই রাজনৈতি সন্ত্রাসবাদী। চিন্তায় ও প্রকাশে এক বিরুদ্ধতাবাদের জন্ম হয়। নতুন বিদ্রোহী বাণী। সত্য ভাষণের নগ্নতার তীব্র আয়োজন চলছিল। নজরুলের ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অন্যদের স্থবির অচলায়তন সমাজের বিপক্ষে।

"রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে,খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়। প্রমথ চৌধুরী প্রথম এই সরে আসা মানুষ, বিষয়ের দিক থেকে না হোক, মনোভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে। আর দ্বিতীয় মানুষ নজরুল।"

কল্লোলের কলেবর যখন বাংলা সাহিত্যে কোলাহল সৃষ্টি করেছে তখন ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক "লাঙল" পত্রিকা। এখানেই প্রকাশিত হয় 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ। যা অনেকটাই "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্ট" র ভাবানুবাদে রচিত। তাই পত্রিকার শিরনামের নিচে লেখা থাকত—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'লাঙল' পত্রিকার জন্যও আর্শীবাদ বাণী লিখে পাঠিয়েছিলেন, যা নজরুলকে আরো উদ্বুদ্ধ করে ছিল।

'ধর হাল বলরাম
আনো তবে মরু ভাঙা হল
বল দাও, ফল দাও
স্তব্ধ হোক ব্যর্থ কোলাহল'-

রাজনৈতিক কারণে কয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর নাম পরিবর্তন করে ১৯২৬ সালে আগস্ট মাসে 'গণবানী' নামে প্রকাশিত হয়। এখানেই সাম্যবাদী, মানবতার পূজারী, আন্তর্জাতিক চেতনা সম্পন্ন কাজী নজরুল ইসলামের এক নব্য পরিচয় উদঘাটিত হয়।

কল্লোল সাহিত্য গোষ্ঠীর লেখকদের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যা সমকালে আলোড়ন তুলেছিল এবং একটা যুগ হিসাবে চিহ্নিত। মূলত পূর্ববর্তী সামাজিক সংস্কার ও নিষিদ্ধ যৌন মনোস্তত্ত্ব এবং সমাজের প্রকৃত শ্রমজীবী মানুষের টিকে থাকার লড়াই বাস্তব ভিত্তিতে উঠে আসে কল্লোলের পৃষ্ঠায়। সেই সঙ্গে আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় পাশচাত্য প্রভাব। ইংরেজী সাহিত্যের বিষয় বহু পূর্ব থেকেই চর্চিত। বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাবে রুশ সাহিত্য বিশেষ প্রভাব ফেলে। ম্যাক্সিম গোর্কী, টলস্তয়, চেকভ, গোগল, পুশকিন, দস্টায়ভস্কি প্রমুখ, এ বিষয়ে উল্লেখ্য নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যে যুগের রুশ সাহিত্য চর্চার শেষ কথা। এছাড়াও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য অবলীলায় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে মিলে যায়। এ বিষয়ে সজনীকান্ত দাসের মন্তব্য স্মরণীয়—

"তাঁদের ছাত্র জীবনে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, নরওয়েজীয়ান, পোলিশ, ডেনিশ, আইসল্যান্ডিক গল্প উপন্যাস ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশিত হত। এ সব সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ করে, পরিচয় দিয়ে কল্লোল একটা অভিনবত্ব প্রদর্শন করতে পেরেছিল।"

কল্লোলের লেখক সমকালে প্রায় সবাই ছিলেন। তা সত্ত্বেও কল্লোল গোষ্ঠী বলতে নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক সাহিত্যিকদেরেই বোঝায়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, শৈলজানন্দ, নৃপেনকৃষ্ণ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব প্রমুখ। সেই সময় লগ্নে কেউ বাদ যান নি কল্লোলের কলতান থেকে। এঁদের মধ্যে অনেকেই নিজস্ব পত্রিকা সম্পাদনা, প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত থেকেও ছিলেন কল্লোলীয়ান। এমনই এক জন নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কাব্য জগতে প্রথম 'মৌলিক কবি'। কল্লোলের অনেক বিশেষত্বের মধ্যে একটি ছিল ইংরেজী ছাড়াও সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ একাধিক ইউরোপীয় ভাষার সাহিত্য চর্চা। ঠিক তেমনিই নজরুল প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষত আরবী, পার্শী, উর্দু ভাষার চর্চা করেন। "শত ইল আরব" তাঁর বিখ্যাত রচনা, যাতে

সমকালে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত যাবতীয় কুৎসার জবাব দিয়েছেন। গোর্কির উপন্যাস 'মা' (অনুবাদ) ধারাবাহিক ভাবে 'লাঙল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৬ সালে 'গণবাণী'তে কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গায় বিক্ষুব্ধ হয়ে 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধে জাতি ও ধর্মের নামে এই ভন্ডামীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। এই সব পত্রিকায় সাম্যবাদী, মানবতার পূজারী, আন্তর্জাতিক চেতনা সম্পন্ন কাজী নজরুল ইসলাম কল্লোল যুগের, কল্লোল পত্রিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থেকেও ভিন্ন পথ ও মতের সন্ধান করেছেন। কল্লোলের সাহিত্যিক বিদ্রোহ, সময়ের দাবী মেনেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। নজরুলের জীবন প্রতিবেশ তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাই পরিশেষে বলা যায় শতবর্ষে কল্লোলের সমকাল নজরুল চর্চাকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হয় না। কল্লোলের পথ যেমন স্বকীয়তার, তেমনি নজরুলও এক স্বতন্ত্র সাহিত্যিক, কবি হিসাবে ভাস্বর হয়ে আছেন, থাকবেন।

তথ্যসূত্র :

১) কল্লোল যুগ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
২) কল্লোল গোষ্ঠীর কথা সাহিত্য- ড. দেবকুমার বসু।
৩) কেউ ভোলে কেউ ভোলে না—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
৪) নজরুল চরিত মানস—ড. সুশীল কুমার জানা
৫) কাজী নজরুল স্মৃতিকথা—মুজফফর আহমেদ।

‘একগাদা প্রাণভরা একমুঠো ঘর’ আর নজরুল

স্ব রূ প দ ত্ত

এ প্রবন্ধের শিরোনাম হতে পারতো ‘দুয়ার-ভাঙার গান’ কিংবা এমনও নামকরণ করা যেতে পারতো ‘বাঁধ ভাঙার সমার্থকতা’। আসলে কল্লোল আর নজরুল যেন একই সঙ্গে উচ্চারিত এক শ্লাঘনীয় যুগলবন্দি, যার প্রকৃতিতে আছে এক স্বতঃসিদ্ধ উদ্দামতা, প্রথাবিরুদ্ধতা, স্বভাবজ উত্তাল প্রবৃত্তি, বিদ্রোহ, সাহিত্য আর জীবনভাবনার সর্বক্ষেত্রে এক নতুনত্বের সন্ধান। জীবনের ফেনিল উচ্ছলতা যার প্রতিটি পরতে পরতে রঙ ছড়ায় সপ্তবর্ণের, বয়ে আনে নতুন কালের দক্ষিণা বাতাস, নতুন সুরের গুঞ্জরণ। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কাব্যের ভুবনে রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ছিন্ন করে তাই যে নজরুলের আগমন “বিদ্রোহী’ কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ-হৈ করে”[১], নতুন যুগের বার্তাবহ পটুয়াটোলা লেনের কল্লোলের সেই ছোট্টো ‘একগাদা প্রাণভরা একমুঠো ঘর’[২]টিতে যে তাঁর জন্য জড়ির কাজ করা এক স্থায়ী আসন পাতা থাকবে সকলের হৃদয়ের স্বর্ণসিংহাসনে, সে কথা তো আর বলবার অপেক্ষা রাখে না। তাই তো উত্তরজীবনে কল্লোলের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক-বন্ধন হবে এক নিবিড় আলিঙ্গনে, বাংলার সংস্কৃতি জগতের ইতিহাসে রচিত হবে এক নতুন ইতিহাস।

লেখক হিসাবে ‘কল্লোল’-এ নজরুলের প্রথম আগমন ‘কল্লোল’-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০), কিন্তু সেই আগমনেরও একটা ইতিহাস আছে। আর সেই ইতিহাসের মূল সূত্রধর সর্বপ্রিয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। নজরুলের সঙ্গে পবিত্রর প্রথম পরিচয় করাচি থেকে লেখা নজরুলের এক অপ্রত্যাশিত চিঠির সূত্রে, সঙ্গে ‘সবুজ পত্র’-এ প্রকাশের আর্জি নিয়ে একটি ছোট্ট কবিতা। সে কবিতা ‘সবুজ পত্র’-এ প্রকাশিত হয়নি, নজরুলের বিনা অনুমতিতেই পবিত্র তা প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন ‘প্রবাসী’তে। প্রকাশিতও হয়। নবীন আগন্তুককে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশের পথে পবিত্রর এই যে সাহায্য, তাই যেন এক নিবিড় বন্ধুতা কায়েম করল দু’জনের মধ্যে। পবিত্র-নজরুলের এই বন্ধুতার সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ পবিত্রকে জোড়াসাঁকোয় ডেকেছিলেন নজরুলকে তাঁর উৎসর্গিত ‘বসন্ত’ নাটকটি জেলখানায় তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের দুয়ারে সে দেব-দুর্লভ উপহার পৌঁছেও দিয়েছিলেন তিনি নজরুলের হাতে, আর সঙ্গে আদায় করে নিয়েছিলেন ‘কল্লোল’-এর জন্য কবিতা লেখার প্রতিশ্রুতি। একদিন জেল থেকে এল সেই কবিতা, লাল কালিতে লেখা — যেন রক্তের অক্ষরে শোনালেন তিনি ‘কল্লোল’-এর প্রাণবাণী, ‘সৃষ্টি—সুখের উল্লাসে’। —

“আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে —
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে !
আস্‌ল হাসি, আস্‌ল কাঁদন,
মুক্তি এলো, আস্‌ল বাঁধন,

মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে।
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে —
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !৩

কবিতাটির জন্য নজরুলকে দেওয়া হয়েছিল পাঁচ টাকা। জেলে নজরুলের কাছে সেই টাকা পৌঁছেও দিয়েছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

পবিত্র-নজরুল বন্ধুতার সূত্র ধরে কল্লোলে এই যে নজরুলের পদার্পণ, সেই ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলেছে পরবর্তী সাতটি বছরে কল্লোলের সামগ্রিক জীবদ্দশায়। 'কল্লোল' পত্রিকায় নজরুলের রচনা প্রকাশের সংখ্যাভিত্তিক একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল —

বছর সংখ্যা — রচনা (সংরূপ)

১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ — সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে (কবিতা)। শ্রাবণ — অভিশাপ (কবিতা)। আশ্বিন — আশান্বিতা (কবিতা)। অগ্রহায়ণ — মরমী (গান)। পৌষ — আলতা-স্মৃতি (কবিতা)। চৈত্র — রৌদ্র-দগ্ধের গান (কবিতা)।

১৩৩১ আষাঢ় — ঝড় (কবিতা)। শ্রাবণ — পুবের হাওয়া (কবিতা)। কার্তিক — সর্বনাশের ঘণ্টা (কবিতা)।

১৩৩২ বৈশাখ — চৈতী-হাওয়া (কবিতা)। শ্রাবণ — রাজ-ভিখারী (গান : চিত্তরঞ্জন)। অগ্রহায়ণ — গোকুল নাগ (কবিতা : স্মৃতিতর্পণ)।

১৩৩৩ অগ্রহায়ণ — দারিদ্র্য (কবিতা)। মাঘ — গজল গীত (গান)। ফাল্গুন — গজল গীত (গান)। চৈত্র — দরদী (গান)।

১৩৩৪ বৈশাখ — দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর (কবিতা)। জ্যৈষ্ঠ — গজল গীত (গান), বুলবুলি (গান)। আষাঢ় — আজি হতে শতবর্ষ আগে (কবিতা)। ভাদ্র — গজল গীত (গান)। পৌষ — দীওয়ান-ই-হাফিজ (কবিতা)। মাঘ — সুরের দুলাল (কবিতা)। চৈত্র — দোল-পূর্ণিমা (গান)।

১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ — গজল গীত (গান)। আষাঢ় — গজল গীত (গান)।

১৩৩৬ বৈশাখ — শীতের সিন্ধু (কবিতা)। জ্যৈষ্ঠ — কীর্তন (গান)। আষাঢ় — আড়াল (কবিতা)। শ্রাবণ — গান। ভাদ্র — গান।

কখনো কবিতা, কখনো বা গান, বিশেষত গজল — লিখে 'কল্লোলে'র পাতা ভরিয়েছেন নজরুল। কখনো তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তাঁর ব্যক্তিজীবন, কবিজীবনের বহুবিচিত্র ঘটনাবলি, বহুবিধ বিতর্ক, পুলিশি নিপীড়নের ইতিবৃত্ত।

'শনিবারের চিঠি' থেকে প্রতি সপ্তাহে নজরুল নিন্দা বেরোনো শুরু হয়, নজরুলের নামকরণ করেন তাঁরা 'গাজী আব্বাস বিটকেল'। সজনীকান্ত 'বিদ্রোহী' কবিতার প্যারোডি রচনা করেন 'ব্যাঙ' নামে। যদিও মোহিতলাল মজুমদারকে কল্লোলে নিয়ে এসেছিলেন নজরুল, স্বীকৃতি দিয়েছিলেন নিজের গুরু বলে, তথাপি 'বিদ্রোহী' কবিতাকে কেন্দ্র করে

উভয়ের মধ্যে চাপা অসন্তোষ দানা বাঁধলে, ‘ব্যাঙ’ মোহিতলালের রচনা মনে করে তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন নজরুল কার্তিক ১৩৩১-এর ‘কল্লোল’-এ, কবিতার নাম ‘সর্বনাশের ঘণ্টা’। এ কবিতা নজরুল লিখেছিলেন কল্লোলের আড্ডায় এসে, মণীন্দ্র চাকীর ঘরে বসে। এ প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একটি বেশ মজার ঘটনার উল্লেখ করেছেন, নজরুল নিয়মিত সময়ে কবিতা না দিলে তাঁকে নাকি মণীন্দ্র চাকীর ঘরে বন্ধ করা হত, কবিতা লেখা শেষ হলে তবে ছিটকিনি খুলে দেওয়া হবে। এভাবেই লেখা এই ‘সর্বনাশের ঘণ্টা’ কবিতা। গোকুল নাগের অকাল তিরোধানে নজরুল লিখেছেন ‘গোকুল নাগ’ কবিতা, ‘কল্লোল’-এ প্রকাশিত হয়েছিল অগ্রহায়ণ ১৩৩২ সংখ্যায়। যার মধ্যে আছে ‘কল্লোল’ সম্পর্কে নজরুলের সুগভীর অনুভবের কথাও। এছাড়াও কল্লোলে ছাপা হয়েছে নজরুলের ছবি। পত্রিকায় আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছে তাঁকে নিয়ে।

‘শনিবারের চিঠি’র কথা যখন উঠল তবে এ প্রসঙ্গেই সেরে নেওয়া যাক ‘কল্লোল’-এর ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো বিতর্কের কথা। আর তা বোধহয় ‘শনিবারের চিঠি’-‘কল্লোল’ বিরোধ, সাহিত্যে নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব। সজনীকান্তের মূল অভিযোগ ছিল ‘কল্লোল’, ‘কালিকলম’-এ প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার অশ্লীলতা, রুচিহীনতা নিয়ে। তাতে নজরুলও জড়িয়ে পড়েছিলেন ‘কালিকলম’-এ প্রকাশিত তাঁর ‘মাধবীপ্রলাপ’ ও ‘অনামিকা’ এবং আরও কিছু রচনার সূত্রে। সজনীকান্ত অবশ্য এক্ষেত্রে কেবল রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতা মেনেই হয়েছিলেন ক্ষান্ত। কিন্তু অন্যান্য তথাকথিত সমাজপ্রেমীরা এ বিষয়কে নিয়ে গিয়েছিলেন লালবাজার পর্যন্ত। সেক্ষেত্রেও অভিযুক্ত হয়েছিল নজরুলের লেখা — গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল মুরলীধর বসু, শিশিরকুমার নিয়োগী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে।

কল্লোলে এই লেখার সূত্র ধরেই নজরুল হয়ে উঠেছিলেন কল্লোলীয়দের একজন। অবশ্য কল্লোলের পূর্বসূরি ‘ফোর আর্টস ক্লাব’-এর সঙ্গেও ছিল নজরুলের যোগাযোগ। মাঝে মধ্যেই হাজির হতেন তিনি সেখানে, গাইতেন গান, শোনাতেন কবিতা। জীবনরসিক নজরুলের প্রাণোচ্ছলতা আর উদ্দামতা স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে নিয়ে এসেছিল কল্লোলের আড্ডায়। ‘দে গরুর গা ধুইয়ে’ ধুয়ো তুলে ঝড়ের গতি নিয়ে নজরুল এসে উপস্থিত হতেন সেখানে। মাতিয়ে তুলতেন সকলকে গানে-গল্পে একাই, আড্ডার মধ্যমণি হয়ে উঠতেন তিনি। শুধু কি পটুয়াটোলা লেনের সেই ছোট্টো ঘরের আড্ডা ? আড্ডা জমেছিল নজরুলের বড়ো ছেলের ‘আকিকা’ উৎসবেও, নজরুলের হুগলির বাড়িতে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন —

মুরলীদা, শৈলজা, প্রেমেন আর আমি চারজন ভবানীপুর থেকে এক দলে, আর অন্য দলে ডি-আর, গোকুল, নৃপেন, ভূপতি, পবিত্র, সুকুমার — সকলে সদলবলে হুগলিতে এসে উপস্থিত হলাম। প্ল্যাটফর্মে স্বয়ং নজরুল। “দে গরুর গা ধুইয়ে” অভিনন্দনের ধ্বনি উঠল। পূর্ব-পরিচয়ের নজির এনে ব্যবধানটা কমাবার চেষ্টা করা যায় কিনা সে-কথা ভেবে নেবার আগেই নজরুল সবল আলিঙ্গনে বুকে টেনে নিলে — শুধু আমাকে নয়, জনে জনে প্রত্যেককে।

দিনের বেলা গানবাজনা, হৈ-হল্লা, রাতে ভুরিভোজ। ফিরতি ট্রেন কখন তারপর ? "দে গরুর গা ধুইয়ে।" ফিরতি ট্রেনের কথা ফিরতি ট্রেনকে জিগগেস করো।

একবার গান আরম্ভ করলে সহজে থামতে চায় না নজরুল। আর কার এমন ভাবের অভাব হয়েছে যে নজরুলকে নিবৃত্ত করে। হারমোনিয়ামের রিডের ওপর দিয়ে খটাখট করে ক্ষিপ্তবেগে আঙুল চালায় আর দীপ্তস্বরে গান ধরে :

মোরা ভাই বাউল চারণ মানি না শাসন বারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।
দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি হাসি জোর জয়ের হাসি
অ-বিনাশী নাইক মোদের ডর রে।।

সেই রাত্রে আর গান নেই, শুরু হল কবিতা। প্রেমেন একটা কবিতা আবৃত্তি করলে — বোধহয়, "কবি নাস্তিক"। "বুক দিলে যে, ভুখ দিলে যে, দুখ দিতে সে ভুলল না, মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পিছে পিছে।" আমিও অনুসরণ করলাম। "দে গরুর গা ধুইয়ে।" এরা আবার কবিতাও লেখে নাকি ? সবাই অভিনন্দন করে উঠল এই প্রথম ও অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারে। বলো, আরো বলো — আরো যটা মুখস্থ আছে।

ফিরতি ট্রেন কখন চলে গিয়েছে। নেমে এসেছে ক্লান্তিহরণ স্তব্ধতা। কিন্তু নৃপেন কাউকে ঘুমুতে দেবে না। যেন একটা ঘরছাড়া অনিয়মের জগতে চলে এসেছি সবাই। দেখলাম, বাড়ি ফিরে না গেলেও চলে, দিব্যি না ঘুমিয়ে আড্ডা দেওয়া যায় সারারাত। প্রতিবেশী হৃদয়ের উত্তাপের পরিমণ্ডলে এসে নবীন সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করা যায়, কেননা আমরা জেনে নিয়েছি, আমরা সব এক প্রাণে প্রেরিত। এক ভবিষ্যতের দিশারী।"[৪]

'কল্লোল'-এর চড়ুইভাতিও হয়েছে নজরুলের বাড়িতে। কিংবা মোহনবাগানের খেলার মাঠে — দীনেশরঞ্জন, সোমনাথ সাহা, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নজরুল মিলিত হয়েছেন খেলা দেখতে, জমেছে আড্ডা। 'কল্লোল'-এর সমকালেই কল্লোলীয়দের আড্ডা জমেছে 'কালিকলম'-এর দপ্তরেও, 'কালিকলম'-এর গুরুগম্ভীর আড্ডায় মন না ভরলে কখনো বা লাগোয়া ঘরে আর্য্য পাবলিশিং-এর 'বারবেলা ক্লাব'-এ। সর্বত্রই প্রায় উপস্থিত থেকেছেন নজরুল। আসলে সেই যুগটাই ছিল 'কল্লোল'-এর যুগ, সব আড্ডাতেই তাই তাদেরই আধিপত্য। কেবল আড্ডার প্রকৃতিগত ভিন্নতা ছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

এরই সূত্র ধরে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও কল্লোলের অন্যান্য সকলের সঙ্গেও এক গভীর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল নজরুলের, বিভিন্ন সময়ে। কেবল এই সূত্রে বললে ভুল হবে, এর পূর্বেও যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার প্রমুখের সঙ্গে নজরুলের ব্যক্তিগত সূত্রে বা 'মোসলেম ভারত' কিংবা 'ধূমকেতু' সম্পাদনার সূত্রে পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা ছিল না, তা নয়। বস্তুত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে 'কল্লোল'-এ নিয়েই এসেছিলেন নজরুল।

আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তো ছিলেন নজরুলের বাল্যবন্ধু। বুদ্ধদেব বসুর ঢাকার পুরানা পল্টনের বাড়িতেও মাঝেমধ্যেই কাটিয়ে এসেছেন তিনি বেশ কিছুদিন, গানে-গল্পে-হাসিতে মাতিয়ে তুলেছেন সকলকে। সেসব বন্ধুতায় ছিল এক অনাবিল স্নিগ্ধতা, হৃদয়স্পন্দী আনন্দের উত্তালতা, আত্মভোলা নিবিড়তার স্বাদ, যার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র 'কল্লোল যুগ'-এর পাতায় পাতায়।

নজরুলের সঙ্গে কল্লোলের সম্পর্ক কেবল এই বন্ধুতার মধ্যে বা লেখক-সম্বন্ধেই আবদ্ধ ছিল না। নজরুল ছিলেন কল্লোলের অন্যতম প্রধান বাণীবাহক। আসলে বিদ্রোহের অপর নামই তো নজরুল। এই বিদ্রোহ প্রচলিত সমাজকাঠামোর বিরুদ্ধে, এই বিদ্রোহ রাজনৈতিক আর যেখানে সাহিত্যিক, সেখানে একার্থে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাবীন্দ্রিক মোহপাশ ছিন্ন করে সরে এসেছেন, নির্মাণ করেছেন নিজস্ব পথ। এখানেই তো তিনি কল্লোলের সঙ্গে একাত্ম। তাঁর এই বলদর্পী মনোভাব, দৃপ্ত অন্তঃশক্তিই প্রেরণা জুগিয়েছে কল্লোলের কবিদের। একথা ঠিক, নজরুলের সে বিদ্রোহের যথাযথ সুর কল্লোলীয়দের পক্ষে সার্বিকভাবে আত্মসাৎ করা সম্ভব হয়নি সর্বক্ষেত্রে, তবুও তাঁদের কণ্ঠস্বরও উচ্চকিত করে তোলে আমাদের। —

ওঠ বীর, মুছে ফেল নিয়তির লিখা
আপন ললাট হ'তে;
যারা আসে ধেয়ে
পীড়নের আঘাত সহিয়া,
তাহাদের ক্ষতমুখ বাহি
যে শোণিত ঝরে অনিবার,
তব তপ্ত ভালে
সেই রক্তচিহ্ন আঁকি লহ।"— 'ওঠ বীর', দীনেশরঞ্জন দাশ

নূতন ভাঙনে সনাতন পথ গেছে বা কোথাও ফাটি;
মাঝে মাঝে 'লিক এমন গভীর, বুকে ঠেকে যাবে মাটি।
তথাপি বন্ধু, হতাশ হয়ো না, — গরুর গাড়ীর গরু,
জাওর কাটিয়া পার হতে পারে মরীচিকাহীন মরু।"— 'কাণ্ডারী', যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নজরুলের 'ঝড়ের রাতের বন্ধু' কল্লোলের প্রাণপুরুষ দীনেশরঞ্জন দাশ 'কল্লোল' সম্পর্কে বলতেন, "যে আসবে এ ঘরে তারই পত্রিকা।"[৫] আর নজরুলের সঙ্গে তো কল্লোলের আত্মিক বন্ধন, কী চরিত্রে, কী ভাবে। তাঁর বোহেমীয় জীবনযাপন, স্বভাবজ উচ্ছৃখলতা, বিদ্রোহী প্রকৃতিই তো নতুন কালের নতুন জীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলেছিল কল্লোলীয়দের। বিশ শতকের আধুনিকতায় কল্লোল সাহিত্যে তাই যৌবনের জয়পতাকা উত্তোলনের প্রথম ধ্বজাধারী নজরুলই। তাঁর সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কত কথা লিখেছেন—

বিস্তীর্ণ জনতার মাঝেও সহজে চিহ্নিত হত সে, এত প্রচুর তার প্রাণ, এত রোধবন্ধহীন তার চাঞ্চল্য। সব সময়ে উচ্চরোলে হাসছে, ফেটে পড়ছে উৎসাহের উচ্ছলতায়। বড়-বড় টানা চোখ, মুখে সরল পৌরুষের সঙ্গে শীতল কমনীয়তা। দূরে থাকলেও মনে করিয়ে দেবে অন্তরের চিরন্তন মানুষ বলে।

এই অস্থির এলোমেলোমি নজরুলের শুধু পোশাকে-আশাকে নয়, তার লেখায়, তার সমস্ত জীবনযাপনে ছড়িয়ে ছিল। বন্যার তোড়ের মত সে লিখত, চেয়েও দেখত না সেই বেগ-প্রাবল্যে কোথায় সে ভেসে চলেছে। যা মুখে আসত তাই যেমন বলা তেমনি যা কলমে আসত তাই সে নির্বিবাদে লিখে যেত। স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতার জন্যে বিচার করে দেখত না বর্জন-মার্জনের দরকার আছে কিনা। পুনর্বিবেচনায় সে অভ্যস্ত নয়। যা বেরিয়ে এসেছে তাই নজরুল, 'কুবলা খান'-এ যেমন কোলরিজ।"[৬]

তাই এ তো শুধু নজরুলের কথা নয়, কল্লোলেরও কথা, সেই যুগটার কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সেই সংশয়বাদের পোড়োজমিতে এই তো ছিল স্বাভাবিক। সেই বাস্তবকে সঙ্গী করে কল্লোল যে সহমর্মিতা, সহকর্মিতার আবহ নিয়ে এসে সমকালীন মানবমনের বন্ধ্যাভূমিতে দাঁড়িয়েছিল আত্মার আত্মজনের মতো — তাতে ছিল না কোনো জিজ্ঞাসা, পরীক্ষা, আর না তো কোনো ব্যবধান। "সৃজন-সমুদ্রের ঊর্মিল উত্তালতায় এক ঢেউয়ের গায়ে আরেক ঢেউ — ঢেউয়ের পরে ঢেউ। সব এক জলের কলোচ্ছ্বাস ! বাঁধভাঙা এক বন্যার বল।"৭ সেদিনের সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ববিকীর্ণ পরিবেশে তাই 'কল্লোল' আর নজরুলের যুগলবন্দি সন্ধান দিয়েছিল এক নতুন পথের, নতুন জীবনভাবনার, এক সূর্যোকরোজ্জ্বল নতুন দিনের। সে পথ তাই মানববন্ধনের, সে জীবনভাবনা সকলকে নিয়ে চলার, সে দিন সামাজিক-মানসিক সমস্ত বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে এক নতুন মুক্তির স্বপ্নে বিভোর।

তথ্যসূত্র :

১. বুদ্ধদেব বসু, "রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক", 'প্রবন্ধ সংকলন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২৭, পৃ. ৭২

২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মাঘ ১৪২৬, পৃ. ৪৩

৩. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সঞ্চিতা', কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, মে ২০১৮, পৃ. ২৫

৪. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মাঘ ১৪২৬, পৃ. ৩৪—৩৬

৫. তদেব, পৃ. ২২

৬. তদেব, পৃ. ৪৮—৪৯

৭. তদেব, পৃ. ৩৪—৩৫

‘কল্লোল’ — কবিতায় এক ব্যতিক্রমী পালাবদল

গু রু প দ অ ধি কা রী

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন বাংলা সাহিত্যের বিকাশে এক ব্যতিক্রমী পথ দেখাল ‘কল্লোল’ পত্রিকা। ১৩৩০ এর ১লা বৈশাখ পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। পত্রিকাটির যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ এবং গোকুলচন্দ্র নাগ। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় দীনেশরঞ্জন দাশ লিখলেন, ‘কল্লোল’ শীর্ষক কবিতা,

“আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা নিশিদিন
অজানা জানার নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি’ ফিরে আসি নিশিদিন”।[১]

‘বাংলার মাসিক গল্প সাহিত্য পত্রিকা’ হিসেবেই ‘কল্লোল’ আত্মপ্রকাশ করেছিল। কল্লোলের কবিতায় ছিল একটা আপসহীন মনোভাব এবং প্রচলিত রবীন্দ্রানুগত্য থেকে সরে আসার প্রবল প্রয়াস। ইতিমধ্যেই নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে জগৎজোড়া সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁকে ঘিরে বাংলা কবিতায় প্রভাববিস্তার করেছিল একদল কবিগোষ্ঠী। কিন্তু তাঁর কাব্যের সৌন্দর্যময়তা, আস্তিক্যবাদ, অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তা, ব্যঞ্জনাধর্মিতা, সত্য-সুন্দর-মঙ্গলভাবনা সেসময়ের অনেক কবিই মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা রবীন্দ্রসৃষ্টিকে অস্পষ্টতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্রসৃষ্টির অক্ষম অনুকারকদের প্রতি। যাঁরা কেবল রবীন্দ্র কবিতার ভাবাবেগ এবং বহিরঙ্গের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছিল। রবীন্দ্রনাথকে স্বীকৃতি জানিয়েও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ‘কল্লোল’ পত্রিকায় লিখলেন:

“সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর”![২]

এতে বোঝা যায়, রবীন্দ্র ভাবধারা থেকে ‘কল্লোল’ এর প্রকাশ এক তরঙ্গ-উত্তাল স্বতন্ত্র ধারায় অন্তর্মুখ।

রুশ বিপ্লব, কমিউনিজমের উত্থান, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ঘটনার পাশাপাশি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, অসহযোগ আন্দোলন, নরমপন্থী, চরমপন্থী দলের উন্মেষ, সশস্ত্র বিপ্লববাদের অভ্যুত্থান, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাংলা তো বটেই, গোটা দেশে একটা অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। যুবমানসিকতায় এসেছিল পরিবর্তন। প্রচলিত ধর্ম-নীতি ও মূল্যবোধের পরিবর্তে তাদের মধ্যে এক ধরনের ঘোর সংশয়ী ও নাস্তিক্যবুদ্ধির উদ্ভব ঘটে। সমকালীন এই রূঢ়, রুক্ষতাকে তাঁরা সাহিত্যে প্রতিফলিত

চাইলেন, বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন রবীন্দ্রসৃষ্টির বিরুদ্ধে, সমকালীন ভাব-ভাষা ও আঙ্গিকের বিরুদ্ধে। এইসময়েই আত্মপ্রকাশ করেছিল 'কল্লোল'। ফলে তাদের যৌবনের সজীবতা, উদ্দামতা হয়ে উঠল পত্রিকাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নরনারীর যৌনতা, শারীরিক কামনা-বাসনাকে তাঁরা লেখালিখির বিষয় হিসেবে প্রকাশ্যে তুলে ধরেছিলেন। ১৩৩৩ এর ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশ পেল বুদ্ধদেব বসুর কবিতা 'বন্দীর বন্দনা'। তিনি লিখলেন,

"বাসনার বক্ষ মাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন।
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর"।[৩]

কৃত্রিমতা ছেড়ে আদিমতার দিকে যাত্রা করেছিল 'কল্লোল' পত্রিকা। ১৯২৫ সালে পত্রিকাটি প্রকাশনার দায়িত্ব নেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০০-১৯৭৬)। ১৯৫০-এ প্রকাশিত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে তিনি লিখলেন, "যেখানে দাহ সেখানেই দ্যুতির সম্ভাবনা, যেখানে কাম সেখানেই তো প্রেমের আবির্ভাব। এভাবেই এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের পথ থেকে সরে এসে আধুনিক পথ খননের প্রয়াস দেখা দিল এবং তা হয়ে উঠল নব্যপন্থীদের ম্যানিফেস্টো। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী এই পত্রিকা মধ্যবিত্ত সমাজের অস্তিত্ব সংকট, যৌনতার অতিরেক উচ্ছ্বাস, দারিদ্র্যতার প্রসারিত রূপ তুলে ধরেছিল।" 'দারিদ্র্য' কবিতায় নজরুল এই দারিদ্র্যকে দেখলেন ভিন্ন চোখে। লিখলেন, 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে ক'রেছ মহান।/তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান/ কন্টক-মুকুট শোভা'।[৪] কবিতাটি প্রকাশ পেল কল্লোলে অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ সংখ্যায়। যুগের সংশয়, জিজ্ঞাসা ও নৈরাশ্যজনিত যন্ত্রণা বা মৃত্যুর প্রতি প্রেম হয়ে উঠল এইসময়ের কবিতার প্রধান লক্ষণ। প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের স্বতন্ত্র আবির্ভাব ঘোষণা করলেন তিন কবি। এরা হলেন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং নজরুল ইসলাম। বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গিতে তাঁরা একটা নতুন মাত্রা যোগ করলেন।

ঔপনিষদিক আনন্দবাদের পরিবর্তে দুঃখবাদ বা নৈরাশ্যবোধের চিত্র ফুটে উঠল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭-১৯৫৪) কবিতায়। 'কল্লোলে'র দ্বিতীয় বছরে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা, 'অন্ধকার'। এছাড়াও তাঁর 'রেলঘুম', 'রূপ ও আঁখি', 'কাণ্ডারী', 'দুঃখবাদী' প্রভৃতি কবিতা প্রকাশ পেয়েছিল 'কল্লোলে'। বাংলা কবিতার জগতে তিনি পরিচিত হলেন 'দুঃখবাদী কবি' হিসেবে।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) ছিলেন কল্লোলের পুরোধা, 'আধুনিকোত্তম'। তিনি কল্লোলের প্রাণপুরুষ দীনেশরঞ্জন দাশের সমবয়সী ছিলেন। 'কল্লোল' প্রকাশের আগেই তাঁর 'অঘোরপন্থী', 'পাপ' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর উগ্র পৌরুষ, ভোগবাদ এবং জীবনপ্রেমের বাণী সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছে। রবীন্দ্র-কক্ষচ্যুত এই কবিপ্রতিভার কাছেই কল্লোলপন্থী আধুনিক কবিরা নতুন আশাবাদে দীক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। এ সম্পর্কে দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'বলাবাহুল্য ১৩৩০ সাল থেকে ১৩৩২ সাল পর্যন্ত 'কল্লোল' পত্রিকা ভাবে

ও ভাষায় যে আদর্শ অবলম্বন করেছিল তাতে যে-কোনো শক্তিমান তরুণ সাহিত্যিক আকৃষ্ট না হয়ে পারতেন না। কল্লোল-লেখকগোষ্ঠীর মোহমুক্ত সত্যসন্ধ দৃষ্টি, দুর্মদ প্রাণশক্তি এবং বক্তব্য ও প্রকাশের একটি অভিনব ভঙ্গি সংস্কারমুক্ত, শাক্ততান্ত্রিক মোহিতলালকেও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাছাড়া মোহিতলালের 'স্বপনপসারী' কাব্যের কিছু কবিতায় যে ভাববৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল তাতে সেকালের শিক্ষিত, প্রগতিবাদী তরুণ সাহিত্যিকেরা বিস্মিত উল্লসিত হন। মোহিতলালের এইসব ভক্তের দল যখন তাঁকে 'কল্লোল'-এ লিখবার জন্য আহ্বান জানালেন তখন তিনি সে-ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেননি'।[৫] 'কল্লোলে'র সঙ্গে মোহিতলালের ঘনিষ্ঠতা ১৯২৩ সাল থেকেই, তবে এই পত্রিকাতে ১৯২৫ সালে প্রকাশ পেয়েছিল মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা 'পান্থ' এবং 'প্রেতপুরী'।

বাঙালি পল্টনের হাবিলদার কবি নজরুলের কবিতায় ফুটে উঠল তপ্ত প্রাণের সজীবতা। 'ভাঙার গান' লিখলেন তিনি। 'বসন্ত' নাটিকা উৎসর্গ করে নজরুল ইসলামকে বরণ করে নিলেন রবীন্দ্রনাথ, 'আয় চলে আয় রে ধূমকেতু/ আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু/ দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।' হুগলি জেল থেকে লাল কালিতে কল্লোলের জন্য কবিতা লিখে পাঠালেন নজরুল, 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'।

"আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে—
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে।
আসল হাসি আসল কাঁদন, আসল মুক্তি আসল বাঁধন;
মুখ ফুটে আজ, বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে,
রিক্ত বুকের দুখ আসে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে"।[৬]

ছাপা হলো 'কল্লোলে'র দ্বিতীয় সংখ্যায়। এরপর তিনি কল্লোলের সপ্তম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা (ভাদ্র, ১৩৩৬) পর্যন্ত নিয়মিত লিখে গেছেন।

'কল্লোলে'র কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন দীনেশরঞ্জন দাস, কালিদাস নাগ, নজরুল ইসলাম, জীবনময় রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, গিরিজাকুমার বসু, সুধীরকুমার চৌধুরী, বনফুল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুবোধ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র ঘটক, জসীমউদ্দীন, নলিনীকান্ত সরকার, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, মোহিতলাল মজুমদার, জগৎবন্ধু মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অজিতকুমার দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, গোপাললাল দে, হুমায়ুন কবীর, জীবনানন্দ দাশ, হেমচন্দ্র বাগচী, রাধাচরণ চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুনির্মল বসু, আব্দুল কাদের, হেমেন্দ্রলাল রায়, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সরকার, কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রণব রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, ভবানী ভট্টাচার্য, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, জিতেন্দ্র বক্সী, বন্দে আলী মিঞা, মনোজ বসু প্রমুখ। মহিলা কবিদের

মধ্যে কল্লোলে লিখতেন, সুনীতি দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, নিরুপমা দেবী, বীণাপাণি রায়, রাধারানী দেবী, কনকলতা ঘোষ, মৈত্রেয়ী দেবী, চামেলীপ্রভা ঘোষ প্রমুখ।

কল্লোলের কাছাকাছি 'সংহতি' (১৯২৩), 'শনিবারের চিঠি' (১৯২৪) 'কালি কলম' (১৯২৬), 'প্রগতি' (১৯২৭), 'ধূপছায়া' (১৯২৭), পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। কল্লোলের এই উত্থান ও প্রাণের সজীবতাকে মেনে নিতে পারেনি 'শনিবারের চিঠি'। 'কল্লোল' ও 'শনিবারের চিঠি' দুই পত্রিকার মাধ্যমে মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুল ইসলামের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ বাংলা সাহিত্যে কিংবদন্তী হয়ে আছে। যদিও 'শনিবারের চিঠি'-র মহৎ কোনো আদর্শ ছিল না। সাহিত্যের শুচিতা রক্ষার নাম করে তরুণ সাহিত্যিকের আক্রমণ করাই ছিল সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের প্রধান লক্ষ্য। প্রথম সংখ্যাতেই আক্রান্ত হলেন নজরুল। তাঁর নাম হলো গাজী আব্বাস বিটকেল। 'মানসী'-র ১৩২১ এর পৌষ সংখ্যায় মোহিতলালের 'আমি' শীর্ষক গদ্য প্রবন্ধটি প্রকাশ পেয়েছিল এবং তিনি তা নজরুলকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। 'বিজলী' ১৩২৮ এর পৌষ সংখ্যায় 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশ পেলে তার সাথে গঠনগত এবং উপাদানগত প্রচুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নজরুল মোহিতলালের প্রভাব স্বীকার না করায় মোহিতলাল মনে মনে বিক্ষুব্ধ হলেন। সজনীকান্ত দাস "শনিবারের চিঠি" পত্রিকায় ১৯২৪ এ নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার প্যারডি প্রকাশ করলেন "ব্যাঙ" নামে। প্যারডি রচনার ফলে নজরুল আহত হলেন এবং তিনি বুঝতে না পেরে দোষারোপ করলেন মোহিতলাল মজুমদারের উদ্দেশ্যে। তাঁকে আক্রমণ করে ১৩৩১ এর কল্লোলে নজরুল লিখলেন 'সর্বনাশের ঘন্টা'। এই কবিতায় নজরুল মোহিতলালকে গুরুরূপে স্বীকার করে লিখলেন:

"তুমি ভিড়িওনা গো-ভাগাড়ে পড়া চিল-শকুনের দলে,
শতদলদলে তুমি যে মরাল শ্বেত সায়রের জলে।
উঠ গুরু, বীর ঈর্ষা- পঙ্ক শয়ন ছাড়িয়া পুনঃ,
নিন্দার নহ নান্দীর তুমি, উঠিতেছে বাণী শুন
উঠ গুরু উঠ, লহ গো প্রণাম বেঁধে দাও হাতে রাখী,
ঐ হের শিরে চক্কর মারে বিপ্লব — বাজপাখী।"

আর্ট সম্পর্কে তিনি লিখলেন, 'আর্ট মানে শুধু বাঁদরামি আর মুখ ভ্যাঙচানো নয়'। তিনি আক্রমণ করে লিখলেন,

"তোমার আর্টের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবে না এরা
প্রয়োজন- বাঁশে তোমার আর্টের আর্টশালা হবে নেড়া"।[৭]

জবাবে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার কার্তিক ১৩৩১ সংখ্যায় মোহিতলাল লিখলেন 'দ্রোণগুরু' কবিতা। ফলে দুজনের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠলো। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যা এক গভীরতর বিপর্যয়।

সেইসময় সজনীকান্ত দাস লাল ও নীল কালিতে তখনকার দিনে প্রকাশিত 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি', 'ধূপছায়া' প্রভৃতি পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলোর নীতি-দুর্নীতি বা অশ্লীলতা বিচার করে সাহিত্যকে অনাচার মুক্ত করার কাজ শুরু করেছিলেন। এইসময় 'কল্লোলে' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা গল্প', 'বন্দীর বন্দনা' কবিতা এবং 'কালি-কলমে' প্রকাশিত নজরুল ইসলামের 'মাধবী প্রলাপ' ও 'অনামিকা' নামক দুটি কবিতার বিরুদ্ধে নীতি-দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ করলেন।

বাংলা কবিতার ইতিহাসে এইসময় সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) হয়ে উঠেছিলেন একটি বিতর্কিত চরিত্র। এই সময় তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু কবিগুরু অসুস্থতার অভিযোগ দেখিয়ে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছিলেন। যদিও এক বছর বাদে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে ১৩৩৪ এর চৈত্র মাসে দুইদিনব্যাপী জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে রক্ষণশীল এবং আধুনিকদের মধ্যে সালিশী নিয়ে একটি বিতর্কসভা বসে। প্রথম দিন অনুপস্থিত ছিলেন সজনীকান্ত দাস। দ্বিতীয় দিন শনিবারের চিঠির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, নীরদ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, গোপাল হালদার, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। কল্লোল তথা প্রগতিশীলদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, রাধারানী দেবী, দীনেশরঞ্জন দাস প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রশান্ত মহলানবীশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অপূর্বকুমার চন্দ প্রমুখেরা নিরপেক্ষ থেকে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন মৌলিক সৃষ্টি বা creativity র ওপর।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে আধুনিক বা রক্ষণশীল কোনো দলই সামাজিক বা সাহিত্যে শুচিতা রক্ষার বিষয় নিয়ে যথেষ্ট মতৈক্যে পৌঁছাতে পারলেন না। রক্ষণশীলরা মনে করলেন অতি আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন আছে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ১৯২৩ সালে তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছিলেন নজরুলকে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি আধুনিক লেখকদের তিনি বিভিন্ন সময়ে অন্তরের সমর্থন জানিয়েছিলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ বে-আব্রুতা বা বিকৃতির বিপক্ষে ছিলেন। কল্লোলগোষ্ঠীর এই বস্তুনিষ্ঠতা বা রিয়ালিজমের প্রতি আগ্রহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে লিখেছেন, "আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে — অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে, রিয়ালিটির কারি পাউডার। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম"।[৮] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পথের মিল হয়নি। তাই "রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়"।[৯]

তাই দেখা যায়, 'ভারতী' ও 'মানসী'-র কবি এবং রবীন্দ্রগোষ্ঠীর কবি হওয়া সত্ত্বেও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতাতেও কখনো কখনো উত্তপ্ত দেহরসের পরিচয় পাওয়া যায়। কল্লোলে ১৩৩২ এর নবম সংখ্যায় প্রকাশ পেল তাঁর কবিতা 'যৌবন- চাঞ্চল্য'।[১০]

"সহজ স্বচ্ছন্দ মনোরথ
ভুটিয়া যুবতী চলে পথ।
টসটসে রস- ভরপুর
আপেলের মত মুখ
আপেলের মত বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর
যৌবনের রসে ভরপুর"।[১০]

যথার্থ কল্লোলীয়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১) এবং কনিষ্ঠ ছিলেন বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)। তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ঢাকাগোষ্ঠীর লেখক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। দীনেশরঞ্জন সম্পাদক হলেও কল্লোলের আসল কর্ণধার ছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫)। কল্লোলের লেখকগোষ্ঠীর কাছে তিনই ছিলেন একটি মূর্ত প্রেরণা। বাংলায় এক নব্য লেখকগোষ্ঠী গড়ে তোলার কাজে তাঁর উৎসাহ ছিল অসীম। 'কল্লোল' যখন মধ্যগগনে সেই ১৯২৫ সালে মাত্র ৩১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু পত্রিকাটির স্বাভাবিক শক্তিতে এগিয়ে চলার ব্যাপারে এক বড়সড় বিপর্যয় দেখা দিল। গোকুলচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণা 'ঝরবে না আঁখিজল' যা প্রকাশ পেল ১৩৩২ এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। এরপর তিনি 'অন্ধকবি', 'শাপভ্রষ্ট', 'বন্দীর বন্দনা' প্রভৃতি কবিতা লিখে কল্লোলগোষ্ঠীর একজন লেখক হয়ে উঠলেন। বুদ্ধদেব বসুর পাশাপাশি 'কল্লোলে' আত্মপ্রকাশ করছেন অজিত দত্ত এবং জীবনানন্দ দাশ। 'দাশগুপ্ত' পদবি নিয়ে কল্লোলে আত্মপ্রকাশ করলেন জীবনানন্দ দাশগুপ্ত (১৮৯৯-১৯৫৪), পরে কল্লোলে থাকতেই তিনি 'গুপ্ত' পদবি বর্জন করেছিলেন। ফাল্গুন, ১৩৩২ সংখ্যায় তার প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'নীলিমা' এবং বৈশাখ, ১৩৩৬ এ প্রকাশিত তাঁর শেষ কবিতা 'পাখিরা'। 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন কল্লোলের আর এক শক্তি। নীহারিকা দেবী ছদ্মনামে তিনি প্রবাসীতে লেখালেখি করতেন। ১৩৩৬ সালের পৌষ সংখ্যায় কল্লোলে প্রকাশিত তার কবিতা 'সংকেতময়ী'। পাশাপাশি বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তীর কথাও উল্লেখ করতে হয় যাঁরা কল্লোলে লেখালেখি করেছিলেন।

'কল্লোল'-কে ঘিরে জমে উঠেছিল সাহিত্যিক আড্ডার আসর। কল্লোলের আড্ডায় যারা আসতেন তাঁদের বেশিরভাগই ছিল কলেজ পড়ুয়া যুবক। বয়সের দিক থেকে প্রায় প্রত্যেকেই তরুণ। কাজী নজরুল ইসলাম আসরে এলে গল্পে গানে উচ্চহাস্যে আড্ডা এক ভিন্ন মাত্রা পেত। জেল থেকে মুক্তির পর নজরুলকে আড্ডায় নিয়ে আসেন পবিত্র

গঙ্গোপাধ্যায়। ‘দে গরুর গা ধুইয়ে’ বলে তিনি অফিসের দরজায় এসে দাঁড়াতেন। এছাড়াও আসতেন মণীশ ঘটক—তিনিও খুব হাসিখুশি স্বভাবের সদালাপী লোক ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু এবং অজিত দত্তকে প্রায় একসঙ্গেই দেখা যেত। স্মিতবাক জীবনানন্দ দাশ কিংবা সদাহাস্যময় হুমায়ুন কবীর কল্লোলের অফিসে এসেছিলেন কিনা জানা নেই। মোহিতলাল মজুমদার দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতা সুন্দরভাবে আবৃত্তি করতেন। নবীন সাহিত্যিকদের প্রাণরসে ভরা উচ্ছ্বাসবহুল লেখা, কল্পনা, রোমান্টিকতাই ছিল ‘কল্লোল’ পত্রিকার সম্পদ। পত্রিকার মান বৃদ্ধি করার জন্য মাঝে মাঝে প্রবীণদের লেখাও ওই পত্রিকায় স্থান পেত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেইসব প্রবীণদের মধ্যে অন্যতম। ‘কল্লোল’ কর্তৃপক্ষ তাঁর কবিতাগুলোকে নতুন সংখ্যার শিরোভূষণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ১৩৩১ এর বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কবিতা ‘শেষ অর্ঘ্য’ কবিতা ছাপা হয়। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নয়টি কবিতা প্রকাশ পেয়েছিল।

কল্লোলের নিয়মিত লেখক হলেও প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দের মতোই কল্লোলের অতিরেক উচ্ছ্বাসপ্রবণ কাব্যচেতনার প্রয়োগ থেকে মুক্ত ছিলেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে লিখেছেন, “কাব্যের আতিশয্য বিষয়ে তিনি অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেব হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। কল্পনাবিলাস বা কাব্যচর্চার লেশমাত্র বাষ্প তাঁহার উপন্যাসে নাই”।[১১] ‘কল্লোলযুগ’ গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমারকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, “আসল কথা কি জানিস অচিন, ভালো লাগেনা সত্যি ভালো লাগেনা।.... বন্ধুর প্রেমে আনন্দ নেই, নারীর মুখেও আনন্দ নেই, নিখিল বিশ্বে প্রাণের সমারোহ চলেছে তাতেও পাই না কোনো আনন্দ।”[১২] তাঁর কবিতাতে ফুটে উঠেছে মানুষ ও জীবন সম্পর্কে আর্তি, ভালোবাসা। ১৩৩২ এর ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশ পেল এমনই কবিতা ‘বেনামী বন্দর’,

“মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড়”।[১৩]

আবেগ, উচ্ছ্বাসবর্জিত একপ্রকার বুদ্ধিপ্রধান জীবন সমালোচনার অধিকারী ছিলেন তিনি। ত্রুটি, বিচ্যুতি, অসঙ্গতির প্রতি তিনি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন। ‘কল্লোল’ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে শৈলজানন্দের মতো প্রেমেন্দ্র মিত্রও ‘কালিকলমে’র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন (১৩৩৩)।

সবশেষে জানাই, কল্লোলে স্পষ্টত দুটি ধারা ছিল। একটি শহুরে কৃত্রিমতা এবং অন্যটি গ্রাম্য সারল্য। গ্রামজীবনের কবি হিসেবে লিখতেন এমনই একজন সাদামাঠা, আত্মভোলা, খেতখামারের ছেলে জসীমউদ্দীন। “কোনো ইজমের ছাঁচে ঢালাই করা নয় বলে তাঁর কবিতা হয়তো জনতোষিণী নয়, কিন্তু মনোতোষিণী।” ১৩৩২ এর আষাঢ় সংখ্যার কল্লোলে বের হল তাঁর অন্যতম কবিতা ‘কবর’। যা প্রকৃতপক্ষে ‘বাংলা কবিতার দিগদর্শন’। কল্লোলের

পাতা থেকে সেই কবিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার সিলেবাসে মুদ্রিত হল। কিন্তু তখনও অনভিজাত পত্রিকা হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পত্রিকার নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করল না। এখানেই তথাকথিত অভিজাত মহলে পত্রিকাটির ট্র্যাজেডি।

তথ্যসূত্র :

১। জীবেন্দ্র সিংহরায়, 'কল্লোলের কাল', দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা- ৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৮, পৃষ্ঠা, ২৯

২। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, একাদশ প্রকাশ, আশ্বিন ১৪২১, এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ। ৮৪

৩। বুদ্ধদেব বসু, বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে- ১৯৬০, নাভানা, কলিকাতা-১৩, পৃষ্ঠা, ১৪

৪। নজরুল ইসলাম, 'সঞ্চিতা', ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা-৬, যটচত্বারিংশ সংস্করণ, জুলাই -১৯৯৫, পৃষ্ঠা, ১৩৮

৫। দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, 'মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস', করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, আষাঢ়, ১৪০২, পৃষ্ঠা, ২৪

৬। নজরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৭

৭। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯-৫০

৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, জুলাই, ১৯৫৮, পৃঃ ৪১১

৯। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭

১০। তদেব, পৃ ৮০

১১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ১৩৪৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা -৭৩, পৃষ্ঠা-৪৭৫

১১। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ১২

১২। প্রেমেন্দ্র মিত্র, কবিতা সমগ্র, গ্রন্থালয়, কলিকাতা -৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা, ৭

১৩। তদেব, 'বেনামী বন্দর' পৃ.

১৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, একাদশ প্রকাশ, আশ্বিন ১৪২১, এমসি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১০৪

অহর্নিশি জ্বলে আছে যে নক্ষত্ররা : কল্লোলের কবিকথা

সু র জি ৎ প্রা মা ণি ক

বাংলা কবিতা যুগ যুগান্তরব্যাপী প্রবহমান ধারায় কতখানি সাবালক হয়েছে, কিংবা আদৌ তা সাবালকত্বের ঠিকানা ছুঁতে পেরেছে কিনা, তা গভীর পর্যালোচনার বিষয়। এ বিষয়ে বহু কথাবার্তা অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত হয়েছে, হচ্ছেও। কাজেই বিতর্কের অবসান নেই স্বাভাবিকভাবেই। এইসব তর্কাতীত প্রশ্নের বহু-অর্থপূর্ণ অথবা অর্থহীন জাল বিস্তারে না গিয়ে, কবিতার সক্ষ্ম অভিভবের কাছে পৌঁছতে পারাটাই বোধ হয় মূল বিষয়। ছেঁড়া প্লাস্টিকে ঢাকা বর্তমান সময়ের অবক্ষয়ের মাঝেও, অকস্মাৎ স্তোত্র গান বেজে ওঠে কোথাও কোথাও। দিগন্তের দিক থেকে ভেসে আসে মহীয়ান হওয়ার স্তব। তাই ইহলৌকিক পৃথিবীর খাঁচা বন্দি জীবনে গুমরে গুমরে পোড়ার বদলে পুরনো দোতারার তানে কান দিয়ে বসে থাকা ভালো। যে আলাপে প্রেমের প্রতিধ্বনি আছে, যে কথায় একাগ্রতার অঙ্গীকার আছে, যে ভাবনা নিভৃতে বিভোর হওয়ার কথা বলে আমাদের। আদতেই গান যেখানে সত্য, অনন্ত গোধূলি লগ্নে সেখানেই যেমন বয়ে চলে ধলেশ্বরী, একইভাবে কবিতাও নিত্য প্রবহমান স্রোতের মতো আমাদের বয়ে নিয়ে চলে, সূক্ষ্ম বোধের তরঙ্গে।

বিগত শতাব্দীর ঐতিহ্য পরম্পরায় যে সমস্ত সাহিত্য আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে প্রকাণ্ড পরিবর্তনের বার্তা এনে দিয়েছিল, সেগুলির মধ্যে তিরিশের দশকের কল্লোল গোষ্ঠী যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে, নিশ্চিতভাবেই তা বাংলা সাহিত্যের পাঠক অবগত। ১৯২৩ সালে দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুল চন্দ্র নাগের সম্পাদনায় প্রকাশিত কল্লোল গোষ্ঠীর মুখপত্র 'কল্লোল' পত্রিকা ২০২৩ সালে আক্ষরিক অর্থে শতবর্ষ ছুঁয়ে ফেলল। কাজেই এক শতাব্দী আগে সাহিত্যের গতানুগতিক ধারা ডিঙিয়ে যে একতারা নতুন সুর ধ্বনিত করতে সমর্থ ছিল, তা বাংলা সাহিত্যের আকাশে অবিকল্প রামধনুময় বর্ণের মতো উজ্জ্বল। যা পাঠকের অভিব্যক্তিতে এখনও অনুরণিত হয়।

জীবনানন্দ দাশ, নজরুল ইসলাম, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখেরা কল্লোলের বিশিষ্ট মুখ হয়ে উঠেছিল এবং সার্বিকভাবে বাংলা সাহিত্য বা নির্দিষ্ট করে বললে বাংলা কবিতায় এক একটি মহীরূহপ্রতিম কবি-মনীষা। রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্যাহ্নকালীন দীপ্তিতে আবির্ভূত হয়েও, আদতেই রবীন্দ্রনাথের আদিগন্ত সৃষ্টির মোহ-মায়ায় আচ্ছন্ন হলেন না তাঁরা। পাশাপাশি সাহিত্যের পাতায় স্বতন্ত্র ঘরানা প্রতিস্থাপন করে গেলেন স্বকীয় চিন্তা চেতনায়। তবে রবীন্দ্রনাথকে যে তাঁরা অস্বীকার করেছেন, বিষয়টা ঠিক এরকম নয়, রবীন্দ্রনাথকে স্বীকৃতি দিয়েও রবীন্দ্রনাথে তাঁরা আচ্ছন্ন হয়ে যাননি। অভিনবত্ব এখানেই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার মোহিনীমায়ায় বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে চোরাবালিতেই যে ডুবে যাওয়া অনিবার্য, তা কল্লোলের যোদ্ধারা বিশেষভাবেই উপলব্ধ ছিলেন। পাশাপাশি

এও অনুভূত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের অন্ধ অনুকরণে মেতে ওঠে যারা, পাঠক তাদের সৃষ্টিকে বিস্মৃতির ডাস্টবিনে ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। এ বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর বিস্তৃত কথাবার্তা আছে আমরা জানি 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' শীর্ষক আলোচনায়। তাই কল্লোলের সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথে মজে যেতে চাইলেন না সমালোচকের অভিমত। তবে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারও করলেন না। তাহলে কবিতার নিগূঢ় ব্যপ্তিতে তাঁরা নতুন করে কী দেখালেন! প্রশ্ন এটাই।

রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতার আলোচনায় প্রায় সর্বাগ্রেই উঠে আসে জীবনানন্দ দাশের নাম। 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রথম দিকে তিনি ছিলেন—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত এবং এই পত্রিকার পাতায় আবার 'দাশ' হয়েছেন। মানব সংসারের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব বৈচিত্র থেকে শুরু করে বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরঙ্গ লীলায়, অভিনব সব চিত্রকল্পের প্রয়োগে, স্বতন্ত্র এক কাব্যভাষা নির্মাণের প্রবণতায়, কবিতাকে নিমগ্ন করেছেন যিনি- তিনি নিঃসন্দেহে জীবনানন্দ দাশ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- 'ঝরাপালক' (১৯২৭)। তবে কল্লোল পত্রিকার ১৩৩২ বঙ্গাব্দের, ফাল্গুন সংখ্যায় জীবনানন্দের 'নীলিমা' কবিতাটি তার অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল, এ কথাও আমরা জানি। কিন্তু প্রথম কাব্যগ্রন্থ ১৯২৭ সালেই প্রকাশ পেল। এরপর যথাক্রমে 'ধূসর পান্ডুলিপি'(১৯৩৬), 'বনলতা সেন'(১৯৪২), 'মহাপৃথিবী'(১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির'(১৯৪৮), 'রুপসী বাংলা'(১৯৫৭), 'বেলা অবেলা কালবেলা'(১৯৬১), 'মন বিহঙ্গম'(১৯৭১), কিংবা 'আলো পৃথিবী'(১৯৮১) ইত্যাদি প্রকাশ পেতে থাকে। তাঁর কবিতার ভাষা, শব্দ চয়ন কিংবা কাব্যকথনে আঁকা ছবিই তাঁর কবিতাকে চিনে নেওয়ার সেরা অভিজ্ঞান। যদিও শুভ্র মানবতার জয়পতাকা উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বৈতরণী এ যুগে কল্পনাতীত, তবুও ভাবের আদর্শে বোধের বাহন হয়ে ওঠা কবিতার মগ্নতায়, আর আত্ম-অনুসন্ধানলব্ধ প্রবণতায় বিশ্বস্ত বোধিবৃক্ষের অবস্থান প্রত্যক্ষ করেছেন জীবনানন্দ দাশ প্রতিদিনের অন্তর্গত রক্তক্ষরণের ভেতর। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের 'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতায় যে স্বাক্ষর তিনি রেখে গেলেন বাংলা কবিতায় তা ভাস্বর হয়ে থাকল,---

'হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন—
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের প'রে শুয়ে রবে?—
অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন।
সেদিন তোমার!
তোমার আকাশ- আলো- জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল?'"[১]—('নির্জন স্বাক্ষর')

সত্য ও সাধনার পথ ধরেই জীবনানন্দ মানব-সভ্যতার পটভূমিকায় মনুষ্যত্বের চারাগাছ রোপণ করে যেতে চেয়েছেন। আকাঙ্ক্ষা রেখেছেন সেই বীজ থেকে মহীরুহ হয়ে ওঠা

সবুজ শস্যক্ষেতে বারুদের গন্ধ বিলীন হয়ে যাবে একদিন, মুছে যাবে রক্তের জঘন্য উল্লাস। গভীরতর সেই সত্যের কাছে পৌঁছতে গেলে চেতনায় কৃত্রিম জটিলতার পর্দা সরিয়ে, সহজ সৌন্দর্যে উন্মুখ হতে হবে আমাদের। তবে তা যুগের যন্ত্রণা ও বিপন্নতায় অনেক বেশি আচ্ছন্ন। তাই এ হেন অসুস্থতায় মানব-সভ্যতার সঙ্গে মেঠো চাঁদের দূরত্বও সংগত। আসলেই নিঃশব্দে আসা সু-সময় হারিয়ে যায় নিরন্তর দুঃসময়ের ভারে। তাই ‘মাঠের গল্প’ কবিতায় কবি লিখলেন,—

“ফসল গিয়েছে ঢের ফলি,
শস্য গিয়েছে ঝরে কত,----
বুড়ো হয়ে গেছ তুমি এই বুড়ি পৃথিবীর মতো!
ক্ষেতে-ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে কতবার,— কতবার ফসল কাটার
সময় আসিয়া গেছে,—তুমি কেন তবে
রয়েছ দাঁড়ায়ে
একা-একা!— ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি- খড়- নাড়া—মাঠের ফাটল,”[২]—(‘মাঠের গল্প’)

আসলে বাংলা কবিতার প্রচলিত ধারাকে বদলে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন যে কবি, তিনিই জীবনানন্দ। সমাজের প্রান্তিক অবস্থানে পড়ে থাকা অতি ক্ষুদ্র বস্তুটিও হয়ে উঠেছিল তাঁর কবিতার বিষয়। কবিতার ভাষায় যে শব্দ তিনি চয়ন করেছিলেন একের পর এক, তা অনায়াসেই রবীন্দ্র-সৃষ্ট বাংলা কবিতার প্রচলিত কাব্যভাষার অভিমুখটিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল, ভিন্ন পথে- স্বতন্ত্র পদযাত্রায়। মানুষ নিজের কাছে কতখানি অসহায় হতে পারে, সাংসারিক পটভূমিকায় নিত্য আমরা কতখানি নিদারুণ বঞ্চনার শিকার হই, বিষাদ-বিষন্নতার ভেতর কতখানি নির্জন-নিরলস পর্দা টাঙানো আছে এবং সার্বিকভাবে সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতি নিরবধি জিজ্ঞাসা আমাদের কিভাবে ক্লান্ত- ক্লান্ত করে অহরহ ইত্যাদি এইসব বিষয় বারবার ভর করেছে, জীবনানন্দের কবিতার নিগড়ে। আবার মানুষের নৈতিক আদর্শের কদর্য পতন দেখে কবির সৃজনশীল সত্তা আর্তনাদ করে ওঠে। আবার গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের অন্যতম কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (২য় খণ্ড)-এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলছেন,—

“কবিতায় প্রতিফলিত হবে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সর্বসাধারণের সুবোধ্য হয়ে তা জীবনাশ্রয়ী বক্তব্যের বাহন হবে—এরকম একটা মত প্রচলিত আছে। এই মত মেনে নিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু পাঠক হিসেবে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি, বক্তব্য ভারাক্রান্ত কবিতার দুর্বলতা এই, তা বারবার পড়তে ইচ্ছে করে না। অল্পক্ষণেই তার আকর্ষণ চলে যায়। বক্তৃতায় বা ইস্তাহারে যে বক্তব্য আমাদের উত্তপ্ত করে, কবিতার মধ্যে

অচিরেই তা আমাদের ক্লান্ত করে দেয়। কোন একটা রচনা শিল্প হিসেবে তখনই সার্থক হয়ে ওঠে, যখন তার মধ্যে বারবার আকর্ষণ করার মতন কোন সাবলীল রহস্য জন্মায়। আমাদের সাধারণ মুখের কথায় নির্বাচন ও যোজনার কৃতিত্বে কবিরা রহস্যধ্বনি করে তোলেন 'মায়াবীর মত জাদুবলে' এবং জীবনানন্দ দাশ একজন অতুলনীয় মায়াবী।"[৩] —(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার পৃথিবী আবার লাউডগা, কচি শশা, কাঁচা আমড়া, তাজা লঙ্কা ইত্যাদিতে ভরে আছে। সেই পৃথিবীর উন্মুক্ত আঙিনা জুড়েই সতেজ উত্তপ্ত জীবনে প্রাণবন্ত শিশুরা ছোটাছুটি করে বেড়ায়। "পৃথিবীর লম্বা বারান্দায় শিশুর খেলা দৌড়ে চলেছে কালান্তরে।" কাল থেকে কালান্তরে এভাবেই নিষ্পাপ শিশুরা কবির পৃথিবীতেও দৌড়ে বেড়ায়। তাতে কবির পরম তৃপ্তি উপভোগ্য। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'খসড়া' প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। এরপর একাধিক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের তিনি প্রণেতা। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরবর্তীতে যে সমস্ত কাব্যগ্রন্থ তিনি বাংলা কবিতার আকাশে গেঁথে গেছেন, সেগুলি যথাক্রমে— 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেয়াল' (১৯৪২), 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩), 'দূরযানী' (১৯৪৪), 'পারাপার' (১৯৫৩), 'শ্রাবণ' (১৯৫৩), 'পালা-বদল' (১৯৫৫), 'ঘরে ফেরার দিন' (১৯৬১), 'হারানো অর্কিড', (১৯৬৬), 'পুষ্পিত ইমেজ' (১৯৬৭), 'অমরাবতী' (১৯৭২), 'অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭৩), 'অনিঃশেষ' (১৯৭৬), 'নতুন গল্প কবিতা' (১৯৮০) ইত্যাদি।

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যিক ভুবনের পটভূমিকায় "মমতাময় জীবন, জীবনের অনির্বচনীয়তা এবং মানবিক দুর্জয়ে বেদনার ত্রিস্তরে কবির মনোভূমি গড়ে উঠেছে। এবং এখান থেকেই আমরা পেয়েছি অগণ্য চিত্রকল্পের পাপড়ি—পূর্ণ কুসুমের মতো কবিতাগুলিতে যেগুলি দৃঢ়লগ্ন।"[৪] আবার 'অভিজ্ঞানবসন্ত' কাব্যগ্রন্থের 'কোথায় চলেছে পৃথিবী' কবিতায় একটু ভিন্ন সুর ধরেন অমিয় চক্রবর্তী। কবিতার শুরুতেই যার ঘর নেই অর্থাৎ যে কিনা গৃহহারা তাকে সনাক্ত করে, তার সাথে কথাবার্তা শুরু করেন তিনি। পরিশেষে তিনি নিজেই ব্যক্তিগত জবানিতে ব্যক্ত করেন তিনিও গৃহহারা কোনো এক অচেনা পথিকের মতো ঘরের দিকে তাকিয়ে আছেন অহর্নিশি। অহর্নিশি তাঁর ঘরে ফেরার অপেক্ষা হয়ে আছে স্থির। গৃহহারা জীবনে বর্ষাকালের অসহ্য যন্ত্রণাবোধ থেকে, তিনি বর্ষার অবিরাম ধারাকে কালচক্ষুর সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। আর তার মতো সমস্ত গৃহহারা পথিককে কোথায় নিয়ে যায় এ পৃথিবী উদ্দেশ্যহীন! কবি সে ব্যাপারেও প্রবল সংশয় প্রকাশ করেন। 'কোথায় চলেছে পৃথিবী' কবিতায় তাঁর বক্তব্য—

'তোমারও নেই ঘর
আছে ঘরের দিকে যাওয়া।

. . .

হাঁটি ধারে ধারে
ফিরি মাটিতে মিলিয়ে
. . .
কোথায় চলেছে পৃথিবী।
আমারও নেই ঘর
আছে ঘরের দিকে যাওয়া।।"[৫]—('কোথায় চলেছে পৃথিবী')

তবে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় বিশেষ লক্ষ্যণীয় এই যে, "কোনো কবিতাতেই বিবাদী রঙের সংঘাত সমন্বয়ের জন্য কবি আকুল নন। তার সব রঙই প্রসন্নতার স্মারক, প্রশান্তির দিকে তাদের ইঙ্গিত।"[৬] তাই 'অভিজ্ঞানবসন্ত' কাব্যের 'সংগতি' কবিতায় কবি আশা প্রকাশ করেন, যে দরজা ভেঙে গেছে সেই জীর্ণ দরজার সাথে পোড়োবাড়িটা একদিন মিলে যাবেই। এই কবিতাতে আসলে কবি তাঁর স্বপ্নের জগতের সঙ্গে ইহজাগতিক পৃথিবীর মেলবন্ধন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তিনি আশা প্রকাশ করেন, পাগলেরও সুমতি ফিরবে একদিন। আকাশ, আগুন, তৃষ্ণায় মাঠ ফেটে গেলে, মারী কুকুরের জিভ দিয়ে চেটে চেটে পরিস্কার করে দেওয়া যাবে শস্যক্ষেত। বন্যার জল হোক কিংবা প্রলয়, সমস্ত কিছুতে ধরাতল কাঁদলেও, এই ছবি একত্রে মিলিত হবে সেই ধরাতলের মাটিতেই। মিলে যাবে মানুষের সংগ্রাম ও সাধনা। মানুষের ক্ষুৎকাতর প্রবৃত্তি ও ক্ষুধার পরিণাম মিলে যাবে একত্রে। জীবনের প্রতি অসীম মোহগ্রস্ততা ও স্বপ্নের বিদ্রোহে ভাষা হারানো মানুষের উদ্দীপ্ত বুক সেদিন একত্রে হবে লীন। সঙ্গী হারানো পাখিরা প্রবল একাকীত্বের সময়েও উড়বে হাওয়ায়। প্রতিটি প্রাণহীন জীবন ধুঁকতে ধুঁকতে বাঁচার আনন্দে একদিন মিলে যাবে সৃষ্টি আর সুরের মূর্ছনায়। তারপর দেবতার ঝাঁটায় যাবতীয় মলিনতার স্পর্শ কাটিয়ে পুণ্যের পথে হাঁটবে মানুষ। তবে এখনই তা হবে না। কারণ সমাজিক অন্ধত্বের অনন্ত বন্ধনে তারা এখন আবদ্ধ হয়ে রয়েছে কঠিন। কাজেই সেই আবদ্ধতা কাটানোর জন্য দীর্ঘ অপেক্ষাও করতে হবে মানুষকে। তাই আদতে এই কবিতায় কবি মন্বন্তরের ভয়ঙ্কর কড়াল অবক্ষয়ের ছবিটি প্রত্যক্ষ করেছেন শহুরে মানুষের জীবনচর্যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহ উত্তাল প্রেক্ষিতে প্রবল বন্যার ধ্বংস লীলা চলে একদিকে, আর অন্যদিকে প্রকৃতির খেয়ালিপনায় দেখা যায় অনাবৃষ্টির সর্বনাশা রূপ। নিসর্গ প্রকৃতির সেই রুক্ষ ভাবচিত্রের বর্ণনাই ফুটে উঠেছে 'সংগতি' কবিতায়,—

"পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
আকাশে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা,—
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয় কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।"[৭]—('সংগতি')

যদিও 'কল্লোলে' সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কোনো কবিতাই প্রকাশিত হয়নি, তথাপি সেই কালপর্বের নক্ষত্রদের তালিকায় তিনি কেন বাইরে থেকেছেন—সেই বিস্ময় গবেষণার বিষয় হয়ে উঠুক। এই প্রত্যাশায় আমার আলোচনার বৃত্তে রেখেছি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী' প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। এরপর তাঁর প্রকাশিত একাধিক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে - 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫), 'ক্রন্দসী' (১৯৩৯), 'উত্তর ফাল্গুনী' (১৯৪০), 'সংবর্ত' (১৯৫৩), 'প্রতিধ্বনি' (ফরাসি ও জার্মান কবিতার অনুবাদ - ইংরেজি : ১৯৫৪), 'দশমী' (১৯৫৬), ইত্যাদি।

তাঁর প্রকাশিত এই সকল একাধিক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে তিনি তাঁর ভাবনার দীপ্তিকে উন্মোচন করতে পেরেছেন গভীরতম উপলব্ধির গহনে। আসলে বাংলা কবিতায় তিনি আবির্ভূত হওয়ার কিছুকাল আগে আগেই সমগ্র পৃথিবী কাঁপিয়ে ঘটে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)। সে ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায় আমাদের অজানা নেই। বিশ্বযুদ্ধের লেলিহান শিখায় মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়; নাগরিক ক্লান্তি ও চালাকি; সমাজ ও সভ্যতার ভাঙন; সর্বোপরি মানব-জীবনের অসহনীয় পরিনতিতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তখন প্রায় চরম ভীত সন্ত্রস্ত। প্রবল বিশ্বাসহীনতা ও নিবিড় সংশয়ের ধূসর পটভূমিকায় তখন বীভৎস ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পৃথিবীর আকাশ। যুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর তাণ্ডবে অসুন্দরের রণলীলা প্রতক্ষ করেছেন পাশ্চাত্যের কবি বোদলেয়র থেকে প্রাচ্যের রবীন্দ্রনাথ। তাঁরা প্রত্যেকেই দেখেছেন মানুষের অন্তর্গত মজ্জার ভিতরে কীভাবে কিলবিল করে বেড়ায় অবিশ্বাস্য দহনের প্রতিবিম্ব। সেই কঠিন রোগগ্রস্ত সময়ের মলিনতায় কালো প্রচ্ছদের পৃথিবীকে গ্রহণ করেই, সৃষ্টির নবতম বীনায় সুর জাগালেন নিঃসঙ্গ যন্ত্রণাদগ্ধ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। যদিও বাস্তব-চিত্রের কঠিন অভিঘাত, সাহিত্য সংস্কৃতিকে তখন গ্রস্ত করতে থাকল সমগ্র পৃথিবী জুড়েই। তবুও 'তন্বী' থেকে শুরু করে 'সংবর্ত'-তে এসে চিত্রকল্প অর্থাৎ রেখাঙ্কিত ভাবচ্ছবি বা পুরোপুরি ছবি নয় ঠিক, কিন্তু ছবির কাছাকাছি যে বোধ পৌঁছায়, সেই বোধের রেখাটি তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারলেন, প্রগাঢ় অভিনবত্বের নিরিখে।

"এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে।
প্রাদেশিক শ্যামলিমা যেই পাংশু সাধারণ্যে ঢাকে,
অমনই সে আসে,
রেখাঙ্কিত ভাবচ্ছবি, অবিচ্ছিন্ন স্মৃতির উদ্ভাসে
লাক্ষণিক, —নেত্রসার, কপোলপ্রধান
প্রাকপ্রচ্ছদ নটী যেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোচে ব্যবধান
দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে : ভুলে যাই
উত্তরচল্লিশ আমি; ..."[৮]—('সংবর্ত')

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কবিতার শব্দ চয়নের ক্ষেত্রেও বিশেষ স্বতন্ত্রতার পরিচয় বহন

করেছেন। প্রচলিত শব্দকে তিনি প্রচলিত শব্দের মতো সমান অর্থে ব্যবহার করলেও, শব্দটির প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি একই অর্থের ভিন্ন এক-একটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যেমন 'উড়ন্ত' শব্দটিকে বোঝাতে তিনি 'উড্ডীন' শব্দ ব্যবহার করেন। গৃহহীন বোঝাতে তিনি ব্যবহার করেন 'অনিকেত'। যে সন্ন্যাসীর পরিধানের বস্ত্র জীর্ণ সেই সন্ন্যাসীর জীর্ণ বস্ত্র বোঝাতে তিনি প্রয়োগ করেন 'চীবর' শব্দটি। 'পেঁচা' শব্দটিকে তিনি পেঁচা না বলে 'উলুক' শব্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। 'মিথ্যা' বোঝাতে গিয়ে তিনি 'অপলাপী' শব্দের আগমন ঘটান। 'ঘূর্ণন' না বলে বলেন 'চংক্রমণ'। 'যজ্ঞ' শব্দটিকে তিনি বোঝান 'ক্রতু' শব্দের মাধ্যমে। সুতরাং শব্দ চয়ন এবং তা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কবির স্বতন্ত্র দক্ষতার পরিচয় পাঠকের কাছে ধরা পড়ে একেবারেই স্বতন্ত্র মাত্রায়। তবে তা নিশ্চয়ই দীক্ষিত কবিতা পাঠকের কাছেই ধরা পড়ে। সুক্ষ অনুভূতি ছাড়া তা অনুধাবন অসম্ভব। স্থূল অনুভূতির সীমায় তা পৌঁছয় না। তাই কাব্য পাঠকের সুক্ষতর বোধ না থাকলে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা দুর্বোধ্যতার দোষে দুষ্ট হয়।

কবি বিষ্ণু দে'র একটি মাত্র কবিতা 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি এই পত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধও লিখেছেন। কিন্তু কবিতা-রাজ্যে তাঁর স্বতন্ত্র দীপ্তি গুরুত্বপূর্ণ। বিষ্ণু দে বাংলা কবিতার পূর্ণাঙ্গ অবয়বে রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি অস্বীকার করতে না পারলেও, কাব্য চিন্তনের অসামান্য দক্ষতায় অবিস্মরনীয় কৃতিত্বের দাবিদার হয়ে উঠেছেন এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর বক্তব্যের স্বরটিও বাঙালি কবিতা পাঠকের কাছে ভিন্ন রূপে ধরা দেয়। বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। এরপর কবির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের তালিকায় রয়েছে,—'চোরাবালি' (১৯৩৭), 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৪৪), 'সন্দ্বীপের চর' (১৯৪৭), 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০)', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫৩), 'আলেখ্য' (১৯৫৮), 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৬০), 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' (১৯৬৩), 'সেই অন্ধকার চাই' (১৯৬৮), 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে' (১৯৭০), 'ঈশাবাস্য দিবানিশা' (১৯৭৪), 'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর' (১৯৭৫), 'উত্তরে থাকো মৌন' (১৯৭৭), 'আমার হৃদয়ে বাঁচো' (১৯৮০) ইত্যাদি।

তবে সবকিছুর মধ্যেও বিষ্ণু দে-র কবিতাকে কোনো কোনো পাঠক 'দুর্বোধ্যতার দোষে দুষ্ট করেন অবলীলায়। আসলে আমরা যে বোধটাকে সহজে জাগাতে পারি না, বলা ভাল জানতে পারি না তার জটিলতার ব্যাপ্তি, তখনই হোঁচট খাওয়ার একটা প্রশ্ন ওঠে। এই হোঁচটটাই চেনা ছন্দকে ভেঙে দেয়। পাঠকদের মনে রাখতে হবে আধুনিক কবিতার রাস্তাটা ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়েই এগিয়েছে। সময় যেখানে দুর্বোধ্য, মননে যখন গিঁট লেগে যাওয়ার ক্ষণ চলছে,কবির ভাষা, কবিতার ভাষা তখন তো দুর্বোধ্য হবেই। এই দুর্বোধ্যতার বিষয়ে ইংরেজ কবি ও সমালোচক stephen spender-এর বক্তব্য ছিল—

"The result of that excessive outwardness of'a spiritually barren

external worlds is the excessive inwardness" of poets who prefer losing themselves within themselves to losing themselves outside themselves in external reality."[৯]

তাই বিষ্ণু দে তাঁর কাব্যিক বোধের খেয়ায় দাঁড়িয়ে পাঠককে দেখিয়ে গেলেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে যে ভাবনার জাগরণ, সেটাই হবে কবিতা আর হৃদয়কে নৌকায় তুলে দিয়ে বৈতরণী পার করতে পারলেই হবে মুক্তি,—

"স্বপ্ন আমার কবিতা,
অমাবস্যার দেয়ালি,
ধুম্রলোচন নিদ্রাহীন
মাঘ-রজনীর সবিতা।
হৃদয় আমার খেয়ার যাত্রী বৈতরণীর পার।"[১০]—('ক্রেসিডা')

আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠকের কাছে এভাবেই বিষ্ণু দে হয়ে উঠেছেন অনির্বাণ চৈতন্যের অঙ্গীকার, জীবনের বহু আঁকা-বাঁকা পথ পেরিয়ে আসা আলো-অন্ধকারের উন্মুক্ত স্বাক্ষর। 'পদধ্বনি' কবিতায় বাংলা কবিতার আদিগন্ত শস্যক্ষেতে যিনি বপন করে যেতে পেরেছেন, 'প্রেমের' শাশ্বত বীজমন্ত্রটি,----

"হে ভদ্রা, এ-হৃদয় আমার
তোমাতে ভরেছে তাই কানায়-কানায়,
প্রেমের একান্ত দানে টলোমলো একাধিকবার
বৈতরণী অলকানন্দায় যমুনা-গঙ্গায়
ঘুরে ফিরে আদিঅন্ত তোমাতে জানায়
সম্মিলিত জীবনের আদিগন্ত মুক্ত মোহনায়।"[১১]—('পদধ্বনি')

'জল দাও' ও 'প্রাকৃত কবিতা' হল দুটি ভিন্ন ভাবনার কবিতা, দুটি ভিন্ন স্বাদের কবিতা। 'জল দাও' কবিতায় সভ্যতার এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাওয়ার রূপ ফুটে উঠলেও 'প্রাকৃত কবিতা'-য় রূপায়িত হয় নারী, পুরুষ, বাৎসল্য-প্রীতি ইত্যাদির কথা। তবে দুটি কবিতাতেই আমরা প্রকৃতির নিবিড় যোগসূত্র দেখতে পাই। প্রকৃতির যোগসূত্র বলতে উভয় কবিতার প্রকাশভঙ্গিতে প্রকৃতি যে প্রবলভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে, সেই জায়গাটিকে ধরা যেতে পারে। আর এই সন্নিবেশের মাঝেই প্রকৃতির কোলে প্রেম হয়ে উঠেছে মানব জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস সচল রাখার মূল চালিকাশক্তি। প্রসঙ্গত 'জল দাও' কবিতাটি পাঠের পর বাঙালি কবিতা পাঠকের মনে কবি তরুণ সান্যালের 'জল শুধু জল' কবিতাটির কথাও ভেসে আসতে পারে। এ বিষয়ে কবি গণেশ বসু বলছেন, "উত্তরসূরি কবির রচনায় পাই প্রকৃতি, মানবসমাজ মানবসত্তাকে যে আবহমানকাল ঈশ্বরসাধনা ও শিল্পসাধনায় ধারণ করে আছে সেই রূপটি যেন বিশেষভাবে তুলনীয় এই কবিতাটির সঙ্গে। বিষ্ণু দে যেখানে জলকে

ভেবেছেন প্রেমের প্রতীক, সেখানে তরুণ সান্যালে ব্যক্তি- সমাজ- প্রেম- রূপকল্পনা- সম্পদ সবকিছুই মানুষকে ধারণ করে বর্ণিত হয়েছে।” যেমন,

“প্রলয় পয়োধি যখন ভাসাচ্ছিল বেদ তুমি জলপোশাকে ছিলে
তুমি অগ্নি জল সইতে সীতা সইতে সরযূ পরে ছিলে...।”[১২]

—('জল শুধু জল' : তরুণ সান্যাল)

তবে জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখের তুলনায় বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে শুরু করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখেরাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন কল্লোলের ভাবধারায়। এমনকি নজরুলের লেখাতেও কল্লোলের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত। প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত গোটা মানুষের মানে খুঁজতে খুঁজতে নিজেকে প্রান্তিক সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিপন্ন করতে দ্বিধান্বিত হননি, তেমনি বুদ্ধদেব বসুও বাসনার বুকে জ্বলে ওঠা কামনার আগুন, কবিতার ঐশ্বর্যে জ্বলজ্বলে অক্ষরে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখলেন—

“মানুষের মানে চাই—
—গোটা মানুষের মানে!
রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত—
গোটা মানুষের মানে চাই।”

অন্যদিকে আরাধ্যার আরাধনায় দেহহীন এক আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রত্যাশায় নিজেকে যখন নিমগ্ন করেন রবীন্দ্রনাথ। তখন কল্লোলের কবিরা ভিন্ন সুরের প্রতিধ্বনি জাগায় বাংলা কবিতায়। কারন বাসনার বহ্নিমান শিখা নয়নের জলে নিভিয়ে রাখার পক্ষপাতী তাঁরা নন। তাই নজরুল স্ব-ন্ট্রে অকপট স্বীকারোক্তি দিয়ে গেলেন,—

“তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়!”

—('অ-নামিকা' : কাজী নজরুল ইসলাম)

একইভাবে প্রায় সমকালীন বুদ্ধদেব বসুর এন্ট্রিও শোনা গেল যে সুর, তা নজরুলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা চলে। বাসনার বুকে যৌবনের ক্ষুধিত রূপ ফুটিয়ে তোলার যে প্রবনতা, তা বুদ্ধদেব বসু-র কবিতাতেও রেখায়িত হল কুণ্ঠাহীন ভাবে। কবিতার ভাষ্যে তিনিও নির্দিধায় বলে যেতে পারলেন,—

“বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।”

—('বন্দীর বন্দনা' : বুদ্ধদেব বসু)

তবে সবকিছুর পরেও এ কথা অবশ্যমান্য যে, কল্লোলের কবিরা হয়তো রাবীন্দ্রিক

আচ্ছাদনে আচ্ছন্ন হতে চাননি ঠিকই, কিন্তু তাঁরা যে রবীন্দ্রনাথকে অবহেলার পাত্রে বসিয়ে অহর্নিশি অস্বীকার করেছেন, এমনটা কখনোই নয়। তাঁর সৃষ্টির বৈভব অস্বীকার করা সম্ভব নয় বলেই তাঁরা স্বীকার করলেন কিনা—এ বিষয়ে বিস্তৃত কথাবার্তা চলতে পারে। কিন্তু সর্বোপরি কল্লোল গোষ্ঠীর স্রষ্টাদের কলম যে রবীন্দ্রনাথকে সশ্রদ্ধায় স্মরণ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ‘কল্লোলে’ প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, আবেদন প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্ররচনার সুলভ সংস্করের জন্য। বিষ্ণু দে তো তাঁর একটা কাব্যগ্রন্থের নামই রাখলেন ‘তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ’— এই শিরোনামে। আবার রবীন্দ্রসঙ্গীতের অসামান্য শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের নাম আমরা প্রায় সকলেই জানি, বিষ্ণু দে তাঁর কাব্যকথনে রবীন্দ্র গানের প্রসঙ্গ এনে দেবব্রত বিশ্বাসের কথা তুলে আনলেন। অপরদিকে নজরুল তো স্পষ্ট ভাষায় বলে গেলেন “পরোয়া করি না, বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে/ মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।” (আমার কৈফিয়ৎ : কাজী নজরুল ইসলাম)। কিংবা বুদ্ধদেব বসুর কবিতাতেও উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ। পৃথিবীর উপকূলে যখন লুব্ধতার লালা ঝড়ে; বর্বর রাক্ষস যখন হাঁকে এ পৃথিবীতে সে-ই শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে বড়ো; উন্মত্ত জন্তুর মুখে যখন কেঁপে ওঠে জীবনের সোনার হরিণ; সেই চরম দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে পারেন তিনি। অকুণ্ঠ চিত্তে বলতে পারেন,—“তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে/ হে বন্ধু, হে প্রিয়তম। সভ্যতার শ্মশান- শয্যায়/ সংক্রমিত মহামারি মানুষের মর্মে ও মজ্জায়;” (রবীন্দ্রনাথের প্রতি: বুদ্ধদেব বসু)। তবে এ সবের মধ্যে দাঁড়িয়েই কল্লোল যে বিশ শতকের সাহিত্য আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি স্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ আজ এক শতাব্দী পরে অন্তত আর নেই। সমসাময়িক সময়ে বহু সমালোচনা থাকলেও, সার্বিকভাবে কল্লোল গোষ্ঠী যে রাবীন্দ্রিক মোহের ঘোরে নিমজ্জিত হয়ে পড়েনি এবং অপরদিকে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের পাঠককে গতানুগতিক ঘরানা থেকে বেড় হওয়ার জন্য নতুন আলোর দিশা সনাক্ত করে দিয়েছেন, তা বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে নির্ঘাৎ স্বীকৃত। কল্লোলের সার্থকতা এখানেই। গ্রহণযোগ্যতাও এখানেই।

তথ্যসূত্র :

১। সৈয়দ, আব্দুল মান্নান; (সংকলিত ও সম্পাদিত) কবিতা সমগ্র- জীবনানন্দ দাশ; অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ: মার্চ ২০০৫, পৃষ্ঠা-১১২

২। তদেব; পৃষ্ঠা-৫৭

৩। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল; “মুখবন্ধ অংশ” জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড); বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ নভেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা-৪

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ; বাংলা কবিতার কালান্তর; দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০২১, পৃষ্ঠা-১৭৩

৫। চক্রবর্তী, অমিয়; শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ : মে ২০১৯, পৃষ্ঠা-২৬

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ; বাংলা কবিতার কালান্তর; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০২১, পৃষ্ঠা-১৭৫

৭। চক্রবর্তী, অমিয়; শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ : মে ২০১৯, পৃষ্ঠা-২৭

৮। চক্রবর্তী, জগন্নাথ; (সম্পাদিত) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ: নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা-১১৬

৯। দত্ত, সন্দীপ; "বিষ্ণু দে-র কাব্যভাবনা"; জ্বলদর্চি, ২৪ নভেম্বর ২০২২, https-//www.jaladarchi.com

১০। দে, বিষ্ণু; বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা-৩৪

১১। দে, বিষ্ণু; বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা-৪৬

১২। বসু, গণেশ; "জল দাও আমার শিকড়ে"; বেলাভূমি পত্রিকা, ফলতা, বৈশাখ ১৪১৬, পৃষ্ঠা-৪১

কল্লোলের দীনেশরঞ্জন : দীনেশরঞ্জনের কল্লোল
শ র্মি লা ঘো ষ

'কল্লোল ছিল দুজন স্বপ্নাভিলাষী সাহিত্য নবিশের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা মাত্র।'[১]। এই দুজনের একজন গোকুলচন্দ্র নাগ আর অপরজন অবশ্যই দিনেশরঞ্জন দাশ। দীনেশরঞ্জন কে? 'কল্লোলের বিশ্বকর্মা'[২] বলেছেন জীবেন্দ্র সিংহরায়। অত্যন্ত যথাযথ এই সম্ভাষণ। কিন্তু কল্লোলে পৌঁছানোর আগে আমরা দীনেশরঞ্জনের সঙ্গে পরিচিত হ'ব। ১৮৮৮ সালের ২৯ শে জুলাই চট্টগ্রামে দীনেশরঞ্জনের জন্ম। তাঁদের আদি নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর পরগনার কুমোরপুর গ্রামে। পিতা রায় কৈলাসচন্দ্র দাশ বাহাদুর এবং মাতা ইচ্ছাময়ী দেবী। তাঁরা ছিলেন চার ভাই এবং তিন বোন। মনোরঞ্জন-বিভুরঞ্জন, দীনেশরঞ্জন এবং প্রিয়রঞ্জন চার ভাই এবং চারুকলা, তরুবালা, নীরুবালা (বা নিরুপমা) তিন বোন। কৈলাশচন্দ্র নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়। ফলে মায়ের শিক্ষাতেই দীনেশরঞ্জন এবং তাঁর ভাই-বোনেরা বড় হয়েছিলেন। তাদের শিক্ষা দীক্ষা এবং রুচি মায়ের কাছেই তৈরি হয়েছিল। ইচ্ছাময়ী কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটির নাম 'আশাকুসুম।' "যে সমস্ত মায়ের সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক সুতিকাগৃহ বা বাল্যকাল পর্যন্ত, ইচ্ছাময়ী তাদের একজন ছিলেন না। তিনি ছিলেন দীনেশরঞ্জনদের সংগঠনশীল চরিত্র ও বর্ধিত মনের আজীবন ধাত্রী।"[৩]

দীনেশরঞ্জন চট্টগ্রামের স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন এবং তারপর ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু সেখানে বেশিদিন পড়াশোনা হয়নি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলেন এমনটা জানা যায়। এরপর কিছুদিনের জন্য তিনি আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর এই পরিবার চট্টগ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে আসে এবং সেখানেই বসবাস করতে শুরু করে।

দীনেশরঞ্জন কর্মজীবনে নানা ধরণের কাজ করেছেন। প্রথমে তিনি চৌরঙ্গি অঞ্চলে খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা এস রায় অ্যান্ড কোম্পানিতে কাজ করতেন। দীনেশরঞ্জন দেখতে সুপুরুষ ছিলেন। অনেকেই তাঁকে পার্শি বলে ভুল করত। কিন্তু আলাপ করার পরে বোঝা যেত, "ইনি যে শুধু বাঙালি তা নয়, একেবারে বিশ্বাসী বন্ধুস্থানীয়। অল্প একটু হেসে দু চারিটি মিষ্টি কথায় দূরকে নিকট ও পরকে আপন করার আশ্চর্য জাদুমন্ত্র তিনি জানতেন।"[৪] এখানে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি লিন্ডসে স্ট্রিটের একটি ওষুধের দোকানে যোগ দেন। জানা যায়, সেখানে তিনি তাঁর ভালো ব্যবহারের জন্য ক্রেতাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু খুব বেশিদিন সেখানেও তিনি কাজ করেননি। এই সময় গোকুলচন্দ্র নাগ নিউ মার্কেটে তাঁর মামা এস. বোস ফ্লোরিস্টের ফুলের স্টলটি দেখাশোনা করতেন। কাছাকাছি কাজ করার সুবাদে দীনেশরঞ্জন প্রায়ই যেতেন গোকুলচন্দ্রের নিউমার্কেটের ফুলের দোকানে।

সেখানেই দীনেশরঞ্জন একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে তৈরি হয় 'ফোর আর্টস ক্লাব'।

এই ক্লাব প্রধানত দীনেশরঞ্জন এবং গোকুলচন্দ্রের ভাবনারই ফসল। ঠিক হয়, এর অভিনবত্ব হবে দুই দিক থেকে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এর সভ্য হতে পারবে। সকলেরই সমানাধিকার থাকবে। আর সাহিত্য সংগীত চিত্রশিল্প ও কারুশিল্প এই চারটি দিকে হবে এর বিস্তার।

৪ঠা জুন, ১৯২১ তারিখে ৮৮বি হাজরা রোডে 'ফোর আর্টস ক্লাব' বা চতুষ্কলা সমিতির উদ্বোধন হয়। সভ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্ম জাতি লিঙ্গ বয়স কোন দিক থেকেই কোন বাধা ছিল না। মাসিক চাঁদা ঠিক হয় এক টাকা। ফোর আর্টস ক্লাব এই নামকরণ করেন গোকুলচন্দ্র নাগ। সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ। যে চারজন বিশিষ্ট সদস্য সেদিন স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁরা হলেন সুনীতি দেবী, সতীপ্রসাদ সেন, গোকুলচন্দ্র নাগ এবং অবশ্যই দীনেশরঞ্জন দাশ। এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার জন্য যে নিদর্শন পত্রটি রচিত হয়েছিল, জানা যায়, দীনেশরঞ্জন নিজের হাতে তার অলঙ্করণ করেছিলেন এবং এই চারজন বিশিষ্ট সদস্য তাতে নিজের নিজের কথা লিখে স্বাক্ষর করেছিলেন। আমরা এখানে দীনেশরঞ্জনের কথাগুলি উদ্ধৃত করছি

"ছিল যে পরানের অন্ধকারে
এল সে ভুবনের আলোর পারে
স্বপন বাধা টুটি বাহিরে এল ছুটী
অবাক আঁখি দুটী হেরিল তারে।
নীরব বেদনায় পুজিনু যারে হায়
নিখিল তারি গায় বন্দনা রে।।"[৫]

---- দী।
June 4–1921.
Four Arts Club

অল্পদিনের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেলেও ফোর আর্টস ক্লাব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বছর দুই পরে নানা কারণে ক্লাব উঠে যায়। প্রথম থেকেই এই ক্লাবে চতুষ্কলার অন্যতম বিভাগ 'সাহিত্য' সম্পর্কে উৎসাহ ছিল খুব বেশি। বস্তুত ক্লাব প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সাহিত্য বিভাগ থেকে একটি পত্রিকা বার করার পরিকল্পনা ছিল। গোকুলচন্দ্র, দীনেশরঞ্জন প্রমুখরা এই নিয়ে কথাও বলতেন। ক্লাব ভেঙে যাওয়ার পরেও তারা নিরাশ হননি। এবং প্রায় রাতারাতি কাগজ বের করা হবে ঠিক হলো। এভাবেই 'কল্লোল' পত্রিকার জন্ম। এই পত্রিকার জন্ম ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ফোর আর্টস ক্লাব বা চতুষ্কলা সমিতির অনুষঙ্গ। তাঁদের হাতে লেখার আয়োজন ছিল খুবই সামান্য, আর্থিক সংস্থান বলতে প্রায়

কিছুই ছিল না। কিন্তু তবুও ইতিহাস রচিত হলো। এ প্রসঙ্গে দীনেশরঞ্জন লিখেছেন — "নাম ঠিক করিয়া ফেলিলাম কল্লোল। গোকুলের ব্যাগে ছিল এক টাকা আট আনা, আমার কাছে ছিল টাকা দুই - এই সম্বল লইয়া দোকান হইতে কাগজ কিনিয়া একটা ছোট প্রেসে কল্লোল এর প্রথম হ্যান্ডবিল ছাপা হইল। বিধাতার সাহায্যে ১৩৩০ এর পহেলা বৈশাখ কল্লোল ছাপিয়া বাহির হইল।"[৬]

সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ এবং সহসম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই বাংলা সাহিত্যের এই দিক নির্দেশকারী পত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন দীনেশরঞ্জন এবং গোকুলচন্দ্র। প্রসঙ্গত কল্লোলের প্রথম কার্যালয় স্থাপিত হয়েছিল দীনেশরঞ্জনেরই দাদার বাড়িতে, ১০/২ পটুয়াটোলা লেনের দুখানা ঘরে। দীনেশরঞ্জনেরই এক বন্ধুর প্রেস থেকে কম খরচে প্রথম দুমাস পত্রিকাটি ছাপা হয়েছিল।

এমনই অনাড়ম্বর ভাবে জন্ম হলো কল্লোলের। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রথম লেখাটিই ছিল দীনেশরঞ্জন দাশের একটি কবিতা 'কল্লোল'।

"আশা আছে তবু যদি কোনদিন শত শত যুগ পরে
বধির শিলার ফেটে যায় বুক
গুঁড়াইয়া যায় তার নিজ সুখ,
জল-কল্লোল তুলি ভীমরোল বক্ষ তাহার ভরে।"[৭]

আগেই বলেছি দীনেশরঞ্জন কে "কল্লোলের বিশ্বকর্মা" বলেছিলেন জীবেন্দ্র সিংহরায়। অত্যন্ত যথাযথ এই সম্ভাষণ। কল্লোল- এর জন্ম থেকে এর সাত বছরের স্বল্পায়ু জীবনকালে (বৈশাখ ১৩৩০ —পৌষ ১৩৩৬) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিলেন দীনেশরঞ্জন।

— "দীনেশরঞ্জন দাশ ছিলেন একজন করিৎকর্মা ও উদ্যোগী পুরুষ। তাঁর সোৎসাহ পরিচালনায় ফোর আর্টস ক্লাব যেমন অত্যল্প কালের মধ্যে সাড়া জাগাতে পেরেছিলো, তেমনি তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় কল্লোল পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন যুগ রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলো।"[৮]। বলা বাহুল্য এই যুগ 'কল্লোল যুগ' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত) নামে সুপরিচিত। বাংলা সাহিত্যে এই যুগ আধুনিকতার যুগ। আবার জীবেন্দ্র বাবুকে উদ্ধৃত করছি —"কল্লোল ছিল একটা স্বয়ংপ্রভ ইনস্টিটিউশন এবং সে দিক থেকে তার ভূমিকা ঐতিহাসিক। এই কল্লোল এর মত একটি সৃজনধর্মী প্রতিষ্ঠানকে বুঝতে হলে তার কলাকর্মশালার বিশ্বকর্মা দীনেশরঞ্জন কে জানতে হবে।"[৯]

কীভাবে কাজ করতো 'কল্লোল' পত্রিকা তার কিছু উদাহরণ আমরা তুলে ধরতে পারি এই আলোচনায়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা থেকে জানা যায় কল্লোলে পাঠানো সুবোধ দাশগুপ্তর লেখা অমোননিত হলেও তার কাছে একটি চিঠি এসেছিল —"যদি দয়া করে আমাদের অফিসে আসেন একদিন আলাপ করতে।" ১০ক। অর্থাৎ লেখা অপছন্দ হলেও লেখক

পরিতাজ্য নয়। এই চিঠি গোকুলচন্দ্রের লেখা হলেও তা আসলে সামগ্রিকভাবে কল্লোলেরই কথা।

"ঐ পোস্টকার্ডটিই গোকুল। ঐ পোস্টকার্ডটিই সমস্ত কল্লোলের সুর। কল্লোলের স্পর্শ। তার নীড় নির্মাণের মূলমন্ত্র।" [১০খ]।

আর কল্লোলের আর একজন বিশিষ্ট লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন প্রথম দিন কল্লোল পত্রিকার অফিসে তাঁর যাওয়ার অভিজ্ঞতা। প্রথম পরিচয়ের পর দীনেশরঞ্জন বলেছিলেন, "কল্লোল আপনার পত্রিকা, যে আসবে এ ঘরে তারই পত্রিকা। লিখুন। লেখা দিন।"[১১ক]। প্রবাসীর জন্য যে গল্প নিয়ে গিয়েছিলেন, দ্বিরুক্তি না করে সেই গল্পটিই শৈলজানন্দ তুলে দিয়েছিলেন দীনেশরঞ্জনের হাতে। আর তারপর? "দীনেশ একটি লাইনও না পড়ে লেখাটা রেখে দিলে তার দেরাজের মধ্যে। বললেন লেখা পেলাম বটে, কিন্তু তার চেয়েও বড় জিনিস পেলাম। পেলাম লেখককে। "কল্লোলের" বন্ধুকে।"[১১খ।] এইভাবেই কল্লোলের সুরকে বেঁধে দিয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র এবং গোকুলচন্দ্র। এটাই কল্লোলের মূলসুর।

শৈলজানন্দ "কল্লোল"-এ তাঁর যোগদানের বিষয়ে আরো বলেছিলেন 'কল্লোলে আসব না? 'কল্লোলে' না এসে পারি? আজকের দিনে যত নতুন লেখক আছে স্তব্ধ হয়ে সবায়ের ভাষাই ঐ কল্লোল। সৃষ্টির কল্লোল, স্বপ্নের কল্লোল, প্রানের কল্লোল। বিধাতার আশীর্বাদে তাই সবাই একত্র হয়েছি। মিলেছি এক মানস তীর্থে। শুধু আমরা কজন নয়, আরো অনেক তীর্থঙ্কর।"[১২।]

এই শুভসংযোগ কল্লোলের মূলমন্ত্র। আর তার মূল স্থপতি দুজন — গোকুলচন্দ্র এবং দীনেশরঞ্জন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এভাবেই এসেছিলেন কল্লোলে। দীনেশরঞ্জনের দীর্ঘ পত্র পেয়ে। এই পত্রকে প্রেমপত্র বলেছেন অচিন্ত্যকুমার। তাতে লেখা ছিল — "তুমি এসো। আমার হাতের সঙ্গে হাত মেলাও।"[১৩ক] দীনেশরঞ্জনের লেখা এই সব চিঠি এক একটি সম্পদ। কল্লোল পত্রিকার সম্পাদকরা কিভাবে তাঁদের লেখক গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছেন তার এক একটি দলিল।

আর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়? তিনি একদিন ফোর আর্টস ক্লাবে এসে পড়েছিলেন কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। পরে যখন কল্লোল হল, তখন আবার তাঁর ডাক পড়ল।—"পুরনো ঘর ভেঙে যখন ফের নতুন ঘর বাঁধা হল, ছোট করে, বন্ধুতায় ঘন ও দৃঢ় করে, তখনও পবিত্রর ডাক পড়ল। ঘর ছোট, কিন্তু চূড়াটা খুব উঁচু। সে চূড়া উঁচু আদর্শবাদের।"[১৩খ।]

এইভাবে একের পর এক সমকালের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকরা এসে যোগ দিয়েছেন কল্লোল পত্রিকায়। এবং এ বিষয়ে দীনেশরঞ্জন এবং গোকুলচন্দ্রের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

বুদ্ধদেব বসুও তাঁর লেখায় দীনেশরঞ্জনের সুপুরুষ চেহারা এবং সুন্দর ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। "আর সর্বোপরি ছিল তাঁর বন্ধুত্বের প্রতিভা। তাঁর কল্লোল পরিচালনায়

যাকে বলা যায় প্রধান মূলধন। সহজে বন্ধু হতে পারতেন, তাঁর সংসর্গে অন্যদের পক্ষেও পরস্পরের বন্ধু হওয়া সহজ হতো। তাঁর কথা মনে হলে এখনো আমার সেই দিনটির কথা মনে পড়ে, যেদিন প্রথম কম্পিতবক্ষে কল্লোল আপিশে ঢুকেছিলাম।' ১০/২ পটুয়াটোলা লেনের সেই আড্ডার নেশা কখনো ভুলতে পারবো না আমি। এমন উদার ও বিচিত্র আড্ডার স্বাদ আমার জীবনে সেই প্রথম।"[১৪]

কবি নজরুল ইসলামও কবিতা পাঠিয়েছিলেন কল্লোলের জন্য। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে দিয়েছিলেন সেই কবিতা। জেলে বসে লেখা, 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'। সেই কবিতা ছাপা হয়েছিল কল্লোলের দ্বিতীয় সংখ্যায়।

নজরুল তাঁর 'বিষের বাঁশি' গ্রন্থের ভূমিকায় দীনেশরঞ্জনকে উল্লেখ করেছিলেন 'আমার ঝড়ের রাতের বন্ধু'[১৫] বলে।

"দীনেশরঞ্জন বয়সে আমাদের সকলের চেয়ে বড়, কিন্তু আশ্চর্য, বন্ধুতায় প্রত্যেকের সমবয়সী। একেবারে নিভৃততম, দুঃসহতম মুহূর্তের লোক। কি আকর্ষণ ছিল তাঁর, তাঁর কাছে প্রত্যেকের নিঃসংকোচ নিঃসংশয় হবার ব্যাকুলতা জাগত। অথচ এত ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও একদিনের জন্যও তাঁর জ্যেষ্ঠত্বের সম্ভ্রম হারাননি। তার দৃঢ়তাকে উচ্চতাকে অবনমিত করেননি। নিজে আর্টিস্ট ছিলেন, তাই একটি পরিচ্ছন্ন শালীনতা তাঁর চরিত্রে ও ব্যবহারে মিশে ছিল। তারই জন্য এত আস্থা হত তাঁর উপর। মনে হত, নিজে নিঃসম্বল হলেও নিঃসম্বলদের ঠিক তিনি নিয়ে যাবেন পরিপূর্ণতার দেশে। নিজে নিঃসহায় হলেও নিঃসহায়দের উত্তীর্ণ করে নেবেন তিনি বিপদ বাধার শেষে শ্যামলিম সমতলতায়।"[১৬।]

কল্লোল প্রকাশের পর থেকে তা নিয়ে কতটা ব্যস্ত ছিলেন দীনেশরঞ্জন অথবা কিভাবে লালন করেছেন এই পত্রিকাকে তা খানিকটা বুঝতে পারা যায় এই সমস্ত মন্তব্য থেকে। জীবেন্দ্র সিংহরায় জানিয়েছেন যে, "গোকুলচন্দ্র যতদিন জীবিত ও সুস্থ ছিলেন ততদিন তিনি পত্রিকাটির সৃষ্টির দিক দেখতেন আর কর্মের দিক দেখতেন দীনেশরঞ্জন। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, টাকা আদায়, ছাপাখানার কাজ দেখাশোনা করা, বিক্রি ও প্রচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নানা বিচিত্র কাজ তিনিই করতেন।"[১৭]

কিন্তু শুধু কর্মের দিক নয়, এরই সঙ্গে ছিল লেখক দীনেশরঞ্জনের সাহিত্যকর্ম। কল্লোলের প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় তিনি কোনো না কোনোভাবে লেখক হিসেবে যুক্ত থেকেছেন। এর আগে ফোর আর্টস ক্লাব থেকে যে গল্প সংকলনটি (ঝড়ের দোলা) প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে দীনেশরঞ্জনের একটি গল্প ছিল।

এরপর কল্লোলে একেবারে প্রথম থেকেই দীনেশরঞ্জনের লেখার পরিচয় পাই আমরা। বস্তুত, কল্লোলের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রথম লেখাটিই ছিল দীনেশরঞ্জনের একটি কবিতা 'কল্লোল।' ওই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর একটি ছোটগল্প। কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত দীনেশরঞ্জনের ছোটগল্পের একটি তালিকা ---

কল্লোল প্রথম বর্ষে (১৩৩০) প্রকাশিত ছোটগল্প
ফুলের আকাশ (১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩০)
বেনামী জিনিস (২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০)
গায়িকা (৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩০)
আঁধারের আশা (৭ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৩০)
সরাইখানা (৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০)
বকুল (১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩০)
চম্পা (১২শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৩০)

কল্লোল দ্বিতীয় বর্ষে (১৩৩১) প্রকাশিত ছোট গল্প
বালুবেলা (৩য় সংখ্যা,আষাঢ়, ১৩৩১)
পাষাণপুরী (৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩১)

কল্লোল পঞ্চম বর্ষে (১৩৩৪) প্রকাশিত ছোটগল্প
সত্যব্রত (২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় ছিল দীনেশরঞ্জনের একটি ব্যঙ্গ রচনা 'কাজের মানুষ।' এছাড়া প্রথম বর্ষের তৃতীয় এবং চতুর্থ সংখ্যায় দীনেশরঞ্জনের লেখা দুটি কথিকা যথাক্রমে 'ফুলের গান' এবং 'ফুলের পূজা'। প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল গল্পসমগ্রতে'[১৮] এ দুটিকে ছোটগল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু জীবেন্দ্র সিংহরায় তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে কল্লোলের যে সূচিপত্র দিয়েছেন, সেখানে এই দুটি লেখাকে স্পষ্টতই কথিকা বলে উল্লেখ করা আছে।

কল্লোল পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ, ১৩৩৪) থেকে শুরু হয়েছিল দীনেশরঞ্জনের উপন্যাস 'দীপক'। দু'বছর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর এই উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটে। দীনেশরঞ্জনের অপর একটি উপন্যাস 'রাতের বাসা'। উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ। কল্লোল পত্রিকায় (সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে সপ্তম বর্ষ, নবম সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৬ পর্যন্ত) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলেও কল্লোল বন্ধ হয়ে যাবার ফলে উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'কল্লোল' কবিতাটি ছাড়াও দীনেশরঞ্জনের আরও কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকায়। 'শ্রাবণ শেষে' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), ওঠ বীর (মাঘ, ১৩৩০), 'কে লইবে' (শ্রাবণ, ১৩৩১), 'যৌবন বিদায়' (ফাল্গুন, ১৩৩১) প্রমুখ।

এছাড়াও কল্লোলের পাতায় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন দীনেশরঞ্জন। সম্ভবত তৃতীয় বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে তাঁর প্রবন্ধ রচনার সূচনা। রাজর্ষি চিত্তরঞ্জন (শ্রাবন ১৩৩২), গোকুলচন্দ্র নাগের মৃত্যুসংবাদ (কার্তিক ১৩৩২), গোকুলচন্দ্র নাগ (প্রবন্ধ

: স্মৃতিতর্পণ. অগ্রহায়ণ ১৩৩২), সুকুমার ভাদুড়ী (প্রবন্ধ স্মৃতি তর্পণ, চৈত্র ১৩৩২), সাহিত্যে অশ্রদ্ধার অপরাধ (ভাদ্র, ১৩৩৫) প্রমুখ। সপ্তম বর্ষে অর্থাৎ কল্লোলের শেষ বছরে চলচ্চিত্র বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন দীনেশরঞ্জন। ১৩৩৬-এর আষাঢ়, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ এবং পৌষ সংখ্যায় 'চলচ্চিত্র' শীর্ষক এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। এই সময় দীনেশরঞ্জন চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং সে বিষয়ে তার নানা জ্ঞানের পরিচয় প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যায়।

এছাড়াও কল্লোল পত্রিকায় সংগ্রহ (সাহিত্যকথা), আলোচনা, ডাকঘর ইত্যাদি বিভাগে দীনেশরঞ্জন লিখতেন। এর মধ্যে 'ডাকঘর' বিভাগটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমকালীন জীবনের নানা অস্থিরতার প্রভাবে যে সাহিত্যে নতুন একটা পর্যায় সূচিত হতে যাচ্ছে,কল্লোল এর ডাকঘর বিভাগে তেমন কথাই বলা হয়েছিল। ডাকঘর বিভাগটি শুরু হয় কল্লোলের পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ ১৩৩৪ এর আষাঢ় মাস থেকে। ডাকঘর (সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ) এই শিরোনামে সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ এখানে লিখেছেন —"যে অবস্থায় দেশের সাহিত্য গড়িয়া উঠে, তাহারই সূচনা মাত্র আজ বাঙলাদেশে। দেশের ও সমাজের অবস্থা তরুণের দলকে জর্জরিত করিতেছে, (যাঁহাদের মুখ চাহিয়া তাহারা এ যন্ত্রণা ভুলিতে পারে), তাঁহাদের মুখেও কোনও উচ্চ আদর্শের জ্যোতি দেখিতে পায় না, আজ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াই তাহারা এই নিষ্ঠুর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ইহাতে যদি গুরুজনদের মনকষ্ট হয়, বা কাহারও কাহারও অপযশও হয় তাহাও তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত। তবু তাহারা তাহাদের সামর্থ্যমত এই অপকৃষ্ট রচনার ভিতর দিয়াই বাংলার মুখ ফিরাইবে, যশোভায় প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।"[১১] সমকালীন যুগের যন্ত্রণা, অপূর্ণতা, অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছে এই লেখায়।

তাছাড়া প্রচ্ছদ, কার্টুন আঁকা ইত্যাদিতেও দীনেশরঞ্জনের উৎসাহের কোন অন্ত ছিল না।

এমনটাই জানা যায় বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে।

কল্লোল ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় দীনেশরঞ্জনের কিছু লেখা বেরিয়েছিল। এছাড়াও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর আরও কিছু লেখা। উতঙ্ক (রূপক নাট্য),মাটির নেশা (গল্প সংগ্রহ), ভুই চাঁপা (গল্প সংগ্রহ) প্রমুখ।

কল্লোল পত্রিকার সম্পাদনা, লেখালেখি, কল্লোলের অন্যান্য কাজ তো ছিলই, এগুলি ছাড়াও দীনেশরঞ্জন ১৩৩২ সন থেকে 'বিজলী' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। কল্লোল ১৩৩২ এর ফাল্গুন সংখ্যায় 'ডাকঘর' বিভাগে দীনেশরঞ্জন সে কথা জানিয়েছেন।

কল্লোল পত্রিকার মালিকানা থেকে খুব সামান্যই আয় হত। এই অবস্থায় দীনেশরঞ্জন আরেক দুঃসাহসিক কাজ করলেন। ১৩৩১ সালের বৈশাখে তিনি স্থাপন করলেন কল্লোল পাবলিশিং হাউস। এই প্রকাশনা সংস্থার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ সুবোধ রায়ের 'নাটমন্দির'। তিনটি একাঙ্ক নাটিকার সংকলন। এছাড়াও আরো বেশ কিছু গ্রন্থ এই প্রকাশনা থেকে

প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু দীনেশরঞ্জনর ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও এটি ভালো চলেনি এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

দীনেশরঞ্জন অনেক সময়ই কার্টুন বা প্রচ্ছদ এঁকে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। নজরুল ইসলামের 'বিষের বাঁশি' এবং জগদীশ গুপ্তের 'বিনোদিনী'-র প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ দীনেশরঞ্জনের করা এবং এক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর আঁকা ছবিতে বা কার্টুনে দ্দ.ট্র. স্বাক্ষর থাকতো। কল্লোলের পাতায় চিত্রশিল্পী **D. R.** এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে বারবার। এই জাতীয় বিজ্ঞাপন কল্লোলের দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ, ১৩৩১) থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানিয়েছেন জীবেন্দ্র সিংহরায়।

এরই মাঝে ১৩৩২ সালের আশ্বিনে কল্লোলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে। স্বভাবতই সে মৃত্যু দীনেশরঞ্জনের কাছে এক বিরাট আঘাত। এই পর্বে গোকুলচন্দ্রকে নিয়ে তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "গল্পসর্বস্ব সিকি মূল্যের মাসিকপত্র হিশেবে জীবন আরম্ভ করে কল্লোল যে ক্রমে ক্রমে নতুন লেখকদের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলো তার পিছনে ছিল গোকুলচন্দ্র নাগের প্রেরণা যিনি তাঁর হ্রস্ব জীবনের শেষ বছরগুলিতে কল্লোলের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।"[২০ক]

কিন্তু গোকুলচন্দ্রের অকাল এবং শোচনীয় মৃত্যুর ফলে বুদ্ধদেব বসু এবং অনেকেই মনে করেছিলেন এবার বুঝি কল্লোলের সংকট উপস্থিত হল। "কিন্তু দীনেশরঞ্জন কল্লোলকে শুধু যে বাঁচিয়ে রাখলেন তা নয়, নানাভাবে পূর্ণ করে তুলতে লাগলেন। তাঁর উৎসাহে নানা দিক থেকে নবীন আগন্তুক এসে জুটলো কল্লোলের আসরে। প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও আরো কয়েকজন নবীন ও সেকালে অজ্ঞাত লেখকের সানন্দ সহকর্মিতা তিনি যে পেয়েছিলেন সে তাঁরই যোগ্যতার ফলে।"[২০খ।]

অন্যদিকে কল্লোল অফিসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভার কথা উল্লেখ করেছেন অচিন্ত্যকুমার।[২১ক] সেই ছোট ঘন মায়াময় ঘরটিতে অনেকেই একত্রিত হয়েছিলেন সেদিন। নরেন্দ্র দেব, মুরালীধর, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ রায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ, ভূপতি, হরিহর, হেমেন্দ্রলাল প্রমুখ। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন — 'দীনেশদাকে ঘিরে সেদিন বসে ছিলাম আমরা কজন।"[২১খ]

সেদিনকার সভায় ঠিক হয়েছিল 'কল্লোলকে ঘিরে একটা বলবান সাহিত্য গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে। যার মধ্যে দিয়ে একটা মহৎ প্রেরণা ও বৃহৎ প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্য শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। একটা কিছু বড় রকমের সৃষ্টি, বড় রকমের প্রজ্ঞা। সমস্ত বাধা বিপদ ও ব্যর্থ বিতর্ক উপেক্ষা করে একাগ্রসাধন।...... মনে আছে সেদিনের সেই সভার চৌহদ্দিটা মিত্রতার মাঠ থেকে ক্রমে ক্রমে অন্তরঙ্গতার অঙ্গনে ছোট করে আনা হয়েছিল। স্থির করেছিলাম, সাহিত্যিক সিদ্ধিও যোগজ সিদ্ধি— কেউ তাই বিয়ে করব না। অনন্যচেতা হয়ে

বদ্ধপদ্মাসনে শুধু সাহিত্যেরই ধ্যান করব। শুধু তাই নয়, থাকব একসঙ্গে, এক ব্যারাকে, এক হাঁড়িতে! সকলের আয় একই লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে জড়ো হবে। দর বুঝে নয়, দরকার বুঝে হবে তার সমান বাঁটোয়ারা। সুন্দর স্বপ্নের উপনিবেশ স্থাপন করব।”[২১গ।]

এমনভাবে ভাবতো কল্লোল। কল্লোলের লেখক গোষ্ঠী। আর তার ঠিক মাঝখানটিতে ছিলেন দীনেশরঞ্জন। সারাজীবন অবিবাহিতই ছিলেন দীনেশরঞ্জন। জানা যায় সেখানে কিছু ব্যক্তিগত বেদনার ইতিহাস ছিল। সে প্রসঙ্গের আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না। তবে এই সময় একটি চিঠি লিখেছিলেন দীনেশরঞ্জন। তার কিছুটা অংশ উল্লেখ করছি।

“..... অবসাদ অভিমান আমাদের আসে, কিন্তু সকলকে তাড়িয়ে নয়, সকলকে ঘাড়ে করে উঠে দাঁড়াই আমরা। যত দুর্বার পথ সামনে পড়ে তত দুর্জয় হই। তাই নয় কি? আমরা যে এসেছিলাম, বেঁচেছিলাম, বেঁচে থাকব এ কথা পৃথিবীকে স্বীকার করতে হচ্ছে, হবে-ও।”[২১ঘ।]

এই কথাগুলো মিথ্যে হয়নি। মাত্র সাত বছরের কম সময় ছিল কল্লোলের আয়ুষ্কাল, কিন্তু তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন –‘I must–at this stage– mention Kallol– chronologically the most important literary periodical after Sabujpatra. ‘Kallol though its peak point extended over no more than three years– justified in making a greater noise than any periodical after Sabujpatra.’[২২]

রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব থাকলেও শেষপর্বে কল্লোল পত্রিকার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল এমনটা জানা যায়। “ তখন দীনেশরঞ্জনের প্রায় না খেতে পাবার অবস্থা। ঋণজালে তিনি জর্জরিত।”[২৩।] এই সময় অর্থাৎ কল্লোলের শেষ দিকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন দীনেশরঞ্জন। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মসের সঙ্গে সিনারিও লেখক ও পরিচালক হিসেবে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি।

মনে রাখতে হবে এই পর্বেই দীনেশরঞ্জন চলচ্চিত্র বিষয়ক নানা প্রবন্ধ লিখছেন কল্লোলের পাতায়। নানা বিষয় নিয়ে সেসব প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে এবং লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই সেখানে প্রধান হয়ে উঠছে। দীনেশরঞ্জন নিজেই লিখেছিলেন “কোন ইংরাজি বই থেকে পড়ে না লিখে আমার অভিজ্ঞতায় এ দেশের সুবিধা অসুবিধা থেকে যতটুকু আহরণ করতে পেরেছি তাই আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবার আমার ইচ্ছা।”[২৪।] কল্লোল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও সিনেমা জগতের সঙ্গে তাঁর এই যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল।

কল্লোল মোট সাত বছর চলেছিল। এর প্রথম সংখ্যা বার হয় ১৩৩০ সালের বৈশাখে, আর শেষ সংখ্যা ১৩৩৬ সালের পৌষে। একদল তরুণ তাঁদের অক্লান্ত উদ্যম ও পরিশ্রমে এই পত্রিকার প্রকাশ করে চলেছিলেন, আর তাঁদের মধ্যমণি ছিলেন দু'জন —গোকুলচন্দ্র

এবং দীনেশরঞ্জন। আর গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পর নিশ্চিতভাবেই কল্লোলের কেন্দ্রে ছিলেন দীনেশরঞ্জন। গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুশয্যায় কল্লোলকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দীনেশরঞ্জন। কিন্তু অর্থনৈতিক দুরবস্থা, নানারকম ঋণে জড়িয়ে পড়া এবং শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়ার কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত এই কথা রাখতে পারেননি। আশা করেছিলেন ভবিষ্যতে আবার কল্লোল প্রকাশ করতে পারবেন, কিন্তু তাঁর সে আশা পূরণ হয়নি।

"শেষ নিবেদনে দীনেশরঞ্জন সকলের কাছে নিজের অযোগ্যতা ও অপরাধের মার্জনা চেয়েছেন, বন্ধুবর্গ ও হিতৈষীদের প্রতি জানিয়েছেন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কল্লোলের মৃত্যুমুখে সম্পাদকের শেষ উক্তিটি বিশেষভাবে স্মরণীয়—"যিনি সকল সংগ্রামে সকল বিপদে সকল গৌরবে একান্ত নিকটে থাকিয়া সুখ-দুঃখের বোঝা বহিয়াছেন, সেই অন্তরের দেবতাকে প্রণাম করি।" [২৫।]

"কল্লোল" পত্রিকার এই আকস্মিক বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেকের কাছেই হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কল্লোল এর উজ্জ্বলতম প্রতিভূ বুদ্ধদেব বসুর কথাগুলি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন— 'কালি- কলম আর প্রগতি দুটিই স্বল্পজীবী হয়েছিলো, কিন্তু কল্লোলের স্রোত যে উচ্ছ্বসিত হয়েই সহসা শুকিয়ে যাবে তা আমরা কেউ কল্পনা করিনি। কল্লোল আর চলবে না, এ খবর যেদিন শুনেছিলাম, সেদিন মনে যে আঘাত পেয়েছিলাম, তার রেশ এখনও পর্যন্ত মন থেকে একেবারে মিলোয়নি। সেদিন মনে মনে বলেছিলাম দীনেশরঞ্জন মস্ত ভুল করলেন, আজও সে কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। যদি কল্লোল আজ পর্যন্ত চলে আসতো এবং সাম্প্রতিক নবীন লেখকদেরও গ্রহন করতো তাহলে সেটি হতো বাংলাদেশের একটি প্রধান এবং সাহিত্যের দিক থেকে প্রধানতম মাসিকপত্র, আর দীনেশরঞ্জনের নাম সম্পাদক হিসেবে হয়তো রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরেই উল্লিখিত হতে পারতো। একথা মনে না করে পারিনা যে এ গৌরব দীনেশরঞ্জন ইচ্ছে করেই হারালেন — বাংলা সিনেমা বাংলা সাহিত্যের প্রথম ক্ষতি করলো কল্লোলের অপমৃত্যুর জন্য অন্তত আংশিক রূপে দায়ী হয়ে। সত্যি কথা বলতে আজ পর্যন্তও আমি কল্লোলের অভাব অনুভব করি, কারণ ঠিক ঐ ধরনের আর একটিও সাহিত্যিক মাসিকপত্র এখনও আমাদের দেশে হলো না। আমাদের মত লেখকরা যারা দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখে না, যারা শুধুই কবিতা গল্প উপন্যাস ইত্যাদি লেখে, অথচ যথেষ্ট রকম গতানুগতিকভাবে লেখে না, আমরা আমাদের আপন মনে করতে পারি এমন একটি পত্রিকাও আজ বাংলাদেশে নেই"[২৬।]

বুদ্ধদেব বসুর মতো কল্লোল গোষ্ঠীর উজ্জ্বল এক জ্যোতিষ্কের এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, কল্লোল এর মত পত্রিকার বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেকেই মেনে নিতে পারেননি এবং তার জন্য কিছুটা হলেও তারা বাংলা সিনেমাকে এবং বাংলা সিনেমার সঙ্গে দীনেশরঞ্জনের জড়িয়ে পড়াকে কে দায়ী করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু একথাও লিখেছেন যে, ... "কল্লোলে'র আয়ু ঠিক তখনই ফুরিয়ে এলো, যখন সদ্য-আগত দিশি সিনেমার আকর্ষণ তাঁর (দীনেশরঞ্জন দাশ)সময় ও মনোযোগ অনেকাংশে অধিকার করে নিলে।"২৭।

একথা আমরা সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারছি না, কিন্তু কারণ যাই হোক, কল্লোল পত্রিকার এই বন্ধ হয়ে যাওয়া বাংলা সাহিত্যের পক্ষে যে এক অপূরণীয় ক্ষতি তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই সময় এই ধরনের সাহিত্যিক পত্রিকা বাংলায় ছিল না। বাংলা সাহিত্যের জন্য এবং প্রতিষ্ঠিত ও নবীন সাহিত্যিকদের জন্য এই পত্রিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কল্লোল এর শেষ বছরে নানা কাজে অত্যধিক পরিশ্রম করার জন্য দীনেশরঞ্জনের শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বেশ কিছুদিনের জন্য তিনি কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। শরীর কিছুটা ঠিক হবার পর তিনি ফিরে এসে নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন। তারপর থেকে তিনি প্রধানত: সিনেমার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর শরীর আর ভালো হয়নি। ১৯৪১ সালে আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাসখানেক অসুস্থ থাকার পর ১২ই মে, ১৯৪১ তাঁর মৃত্যু ঘটে।

দীনেশরঞ্জনের অকাল মৃত্যুর সংবাদ সমকালীন প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব এবং বেদনার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রত্যেকেই দীনেশরঞ্জনের অসামান্য প্রতিভা এবং তার অকালে চলে যাওয়ার কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে বেদনার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এই বিষয়ে জীবেন্দ্র সিংহরায়ের গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আগ্রহী পাঠককে পড়ে নিতে অনুরোধ জানাই।

(প্রসঙ্গত একটি কথা বলতে চাই। দীনেশরঞ্জনের যখন মৃত্যু হল (মে,১৯৪১) তখনো রবীন্দ্রনাথ জীবিত রয়েছেন। বস্তুত সেই বছরেরই আগস্ট মাসে তার মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু দীনেশরঞ্জনের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের কোন প্রতিক্রিয়া আমি খুঁজে পাইনি। যদি এ ব্যাপারে কেউ আলোকপাত করতে পারেন, তাহলে এই আলোচনা আরো সমৃদ্ধ হতে পারে।)

কল্লোল পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দীনেশরঞ্জন। বাংলা সাহিত্যের এই বিশিষ্ট পত্রিকার সম্পাদনার কাজ তিনি নিরলস করে গেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে ছোটগল্পকার, কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার। এরই সঙ্গে তিনি ছিলেন প্রচ্ছদশিল্পী এবং কার্টুনিস্ট। কল্লোলের প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় তিনি লিখেছেন। কল্লোলের অন্যান্য বিভিন্ন কাজ, ছবি এবং কার্টুন আঁকা, বিভিন্ন ডিজাইন আঁকার কাজ তিনি করে গেছেন। এছাড়াও কল্লোল পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীনই ১৩৩২ থেকে তিনি 'বিজলী' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। কল্লোল ১৩৩২ এর ফাল্গুন সংখ্যায় 'ডাকঘর' বিভাগে দীনেশরঞ্জন নিজেই সে কথা জানিয়েছেন। এর পরবর্তী পর্বে ছিল চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। এবং সেই যোগাযোগও ছিল অত্যন্ত নিবিড়। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবেই এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন দীনেশরঞ্জন।

তারই সঙ্গে তিনি ছিলেন বন্ধু-বৎসল এবং স্বজন-প্রিয় একজন মানুষ। শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, তাঁর অন্তরের সৌন্দর্যও ছিল গভীর। সাহিত্যের বহু দিকে ছিল তাঁর সাধনা, "কিন্তু সাহিত্যের চেয়েও দীনেশের হৃদয় ছিল অনেক বড়, অনেক বড় ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। দীনেশের ঘর ছিল ছোট, কিন্তু হৃদয়ে স্থানাভাব ছিল না।.স্বর্গের স্বপ্ন যে না দেখেছে সে আর্টিস্ট নয় — এই স্বপ্ন সেদিন দেখেছিলেন দীনেশ দেখিয়েছিলেন আমাদেরকে। কল্লোলকে তিনি ব্যবসার চোখে দেখেননি, দেখেননি লোভীর চোখে, তিনি দেখেছেন স্রষ্টার চোখে, পূজারীর চোখে, নিজের চিত্তের আনন্দের প্রতীকের মত। তাই সেদিনের সোনায় কোন খাদ মেশেনি। সেদিনের সাধনা ছিলনা এতোটুকু মেকি। দীনেশ কখনো বিচলিত হননি তাঁর পথ থেকে, তাঁর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান থেকে।..তিনি যে কত বড় প্রাণবান ছিলেন, কত বড় আত্মপ্রত্যয়ী যোদ্ধা তা সেদিনকার কল্লোলের প্রতি পৃষ্ঠায় লেখা আছে।"[২৮।]

আত্মপ্রত্যয়ী এই যোদ্ধা, অনুভবী এই সুহৃদ, বহুমুখী এই শিল্পী, যিনি শূন্য থেকে শুরু করে, এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হার নিশ্চিত জেনেও শেষপর্যন্ত লড়াই করে গেছেন, তাঁর কথা প্রতি পৃষ্ঠায় লেখা আছে বলেই বুঝি শতবর্ষ স্পর্শ করেও কল্লোল আজও এত জীবন্ত, আজও এত প্রাসঙ্গিক। এবং নিশ্চিতভাবেই এই শিল্পী-যোদ্ধা-বন্ধু র নাম শ্রী দীনেশরঞ্জন দাশ।

আকর গ্রন্থ:----

১। কল্লোলের কাল — জীবেন্দ্র সিংহরায়।
২। কল্লোল যুগ — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
৩। কল্লোল গল্পসমগ্র — সংকলন ও সম্পাদনা : অরুণ মুখোপাধ্যায়।
৪। প্রবন্ধ সমগ্র বুদ্ধদেব বসু।
৫। An Acre of Green Grass – Buddhadeb Basu

তথ্যসূত্র :

১। জীবেন্দ্র সিংহরায়, 'কল্লোলের কাল', কথাশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮০। পৃষ্ঠা ২১
২। জীবেন্দ্র সিংহরায় পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৫৪
৩। ঐ। পৃষ্ঠা ৫৪
৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, "কল্লোল যুগ', পৃষ্ঠা ৩৩
৫। জীবেন্দ্র সিংহরায়। পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা ৩
৬। ঐ। পৃষ্ঠা ১৯
৭। দীনেশরঞ্জন দাশ, 'কল্লোল', 'কল্লোল', প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩০।
৮। জীবেন্দ্র সিংহরায়, পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা ৫৪
৯। ঐ। পৃষ্ঠা ৫৪

১০ক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। 'কল্লোল যুগ', পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা ২।

১০খ। ঐ। পৃষ্ঠা ৩।

১১ক ও ১১খ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ২২

১২। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা ২১

১৩ক ও ১৩খ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পৃষ্ঠা ৩১

১৪। বুদ্ধদেব বসু 'কল্লোল ও দিনেশরঞ্জন দাশ।', বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সমগ্র ৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫ পৃষ্ঠা ২৩।

১৫। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোল যুগ, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৬

১৬। ঐ। পৃষ্ঠা ৩৬

১৭। জীবেন্দ্র সিংহরায়, পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা ৫৬

১৮। কল্লোল গল্পসমগ্র,(প্রথম বর্ষ ১৩৩০ — দ্বিতীয় বর্ষ ১৩৩১), সংকলন ও সম্পাদনা অরুণ মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৭, তৃতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ২০২০।

১৯। দীনেশরঞ্জন দাশ,'ডাকঘর', কল্লোল, আষাঢ়,১৩৩৪।

উদ্ধৃত, রবিন পাল, কল্লোলিত ছোটগল্প, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, আগস্ট ১৯৮৮। পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮।

২০ক ও ২০খ।। বুদ্ধদেব বসু, 'কল্লোল ও দিনেশরঞ্জন দাশ', বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সমগ্র ৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫ পৃষ্ঠা ২১।

২১ক, ২১খ ও২১গ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ। পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা ১৪৪।

২১ঘ। ঐ। পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৫

২২। Buddhadeba Basu– 'An Acre of Green Grass–ó Papyrus'– November 1982 page 79

২৩। জীবেন্দ্র সিংহরায়। পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা ৫৯

২৪। জীবেন্দ্র সিংহরায়, পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা ৬০

২৫। ঐ। পৃষ্ঠা ৫০।

২৬। বুদ্ধদেব বসু, 'কল্লোল ও দিনেশরঞ্জন দাশ', বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সমগ্র ৪,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫ পৃষ্ঠা ২২।

২৭। ঐ। পৃষ্ঠা ২১।

২৮। জীবেন্দ্র সিংহরায়। 'কল্লোলের কাল'। পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা ৬৬ — ৬৭

আমার চোখে কল্লোল

হা সি ব সু

সময়টা ১৯৩০ এর দশক, বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র তখন রবীন্দ্রনাথ। সেই সময় কিছু তরুণ লেখক নতুন একটি ধারা নিয়ে লেখা শুরু করলেন, যে সাহিত্য ছিল মাটির কাছাকাছি। এঁরা বাংলা সাহিত্যে এক নব চেতনা নিয়ে এলেন, যাকে 'কল্লোল যুগ' বলে চিহ্নিত করা হলো।

কিছু লেখক আবার এই ধরণের সাহিত্যকে আধুনিকতার নামে অশ্লীলতা এবং যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। তাঁরা 'শনিবারের চিঠি' (১৯২৪) নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। নীরদ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস প্রমুখের এই পত্রিকায় সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আসলে কী অভিযোগ?

এই আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে, এই সম্বন্ধে একটি জবানবন্দি বেরোয় নতুন লেখকদের পক্ষ থেকে, সেটা রচনা করেন কৃত্তিবাস ভদ্র, ওরফে প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁদের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ তাঁরা নাকি সাহিত্যে আভিজাত্য মানেন না। মুটে মজুর কুলি খালাসী দরিদ্র বস্তি ইত্যাদি অস্বস্তিকর সত্যকে নিয়ে লেখেন।

১৩৩৩ এর ফাল্গুন মাসে 'শনিবারের চিঠির' সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখলেন, "কবিতা ও গদ্যের যে প্রচলিত রীতি সবাই এতদিন দেখে আসছিলেন তা অনেকেই আর অনুসরণ করেন না। যৌনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব নিয়ে লেখা হচ্ছে। কবিতা স্তবক, অক্ষর মাত্রা অথবা মিলের কোনো বাঁধন মানেন না, যাঁরা লেখেন তাঁরা continental literature এর দোহাই পাড়েন।" উদাহরণ স্বরূপ, বুদ্ধদেব বসুর কল্লোলে প্রকাশিত 'বন্দীর বন্দনা' এবং আরো কিছু লেখার উল্লেখ করেন। লেখেন, উনি এগুলোকে সাহিত্যের আগাছা মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের মতামত কী, এই সাহিত্যের ব্যাপারে, তা জানতে চাইলেন এবং ওঁর মত জনসাধারণের জানা উচিত একথা লিখলেন।

রবীন্দ্রনাথ সব বুঝে সরাসরি আর্জি খারিজ করে দিলেন।

সজনীকান্তকে লিখলেন, 'কঠিন আঘাতে একটা আঙ্গুল পঙ্গু হওয়াতে লেখা সহজে সরছে না'।

'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৩৩০ এর বৈশাখে, সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ, সহ সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ। প্রতি সংখ্যার দাম চার আনা, প্রায় বারো ফর্মার পত্রিকা।

আরো যে সমস্ত পত্রিকা কল্লোল যুগকে আলোকিত করেছিল সেগুলো হচ্ছে 'উত্তরা' (১৯২৫) কালি কলম (১৯২৬) প্রগতি (১৯২৬)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পর, যখন একটা অস্থিরতায় সারা পৃথিবী আলোড়িত, ঠিক এইরকম একটি মুহূর্তেই কল্লোল যুগের শুরু। সেখানে সাহিত্যিকদের মনন সৃজন এমন এক বলয় তৈরি করেছিল যেখানে মার্কসীয় দর্শন (সাম্যবাদ), ফ্রয়েড এর তত্ত্ব, স্থান পেয়েছিল, প্রান্তিক মানুষের কথা, সাধারণ জীবন যাপনের কথা, মানুষের দেহজ প্রেম সমস্তই স্থান

পেয়েছিল। সাহিত্য বুর্জোয়া সমাজের প্রতিভূ নয়, সাধারণ মানুষ এবং মাটির স্পর্শ গন্ধ নিয়ে তৈরি এক নতুন অঙ্গন--এই সত্য তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দীনেশরঞ্জন দাস, মানবেন্দ্র বসু, গোকুলচন্দ্র নাগ ও সুনীতা সেন "ফোর আর্টস ক্লাব" তৈরি করেন এবং "ঝড়ের দোলা" ছোটগল্প সংস্করণের হাত ধরেই কল্লোল সাহিত্য গোষ্ঠী এবং' কল্লোল' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা গড়ে তোলেন। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, দারিদ্র্য, হতাশা, মূল্যবোধের অবক্ষয় লক্ষ করে, অনাহারক্লিষ্ট বিপর্যস্ত পৃথিবীকে সাহিত্যে রূপায়িত করে 'কল্লোল যুগ'। কল্লোলের সমার্থক হলো উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা গলা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন। আর একটি পত্রিকা ছিল 'সংহতি', জিতেন্দ্র নাথ গুপ্ত ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা, এটি শ্রমজীবী মানুষের প্রথম মাসিক পত্রিকা। লাঙ্গল, গণবানী ও গণশক্তি এসেছিল তারও অনেক পরে। যত নতুন লেখক ছিলেন তাদের সবারই ভাষা ওই কল্লোলে—'সৃষ্টির কল্লোল, স্বপ্নের কল্লোল, প্রাণের কল্লোল।' একজন অন্য জনের পরিপূরক, এ এক সহমর্মিতা।

সাতাশ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের এক চিলতে ঘরে কল্লোলের পাবলিশিং হাউস খোলা হয়। সন্ধ্যেবেলা সেখানে কবি-সাহিত্যিকদের তুমুল আড্ডা বসতো, ছোট্ট ঘরে সবার বসার জায়গা হতো না, ঘর ছাপিয়ে ফুটপাথে নেমে যেত। সেই ঘরকেই নজরুল বলেছিলেন 'একগাদা প্রাণ ভরা একমুঠো ঘর'।

নজরুল লিখেছেন—

'আর কতকাল রইবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল !'

এই লেখার জন্য নজরুলের এক বছর জেল হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' নাটিকাটির উৎসর্গ -পৃষ্ঠায় 'শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম কল্যানীয়েষু 'লিখে স্বাক্ষর করে দিলেন।' 'কবি' ও 'শ্রীমান' এই কথা দুটির মধ্যে তাঁর স্নেহ ও আন্তরিকতা অক্ষয় করে রাখলেন।

নজরুল জেল থেকেই 'কল্লোল' পত্রিকার জন্য লাল কালিতে লিখে পাঠালেন 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'

'মুখ ফুটে আজ, বুক ফাটে মোর
তিক্ত দুখের সুখ আসে,
রিক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'।

এই কবিতার জন্য কবিকে পাঁচ টাকা দেয়া হয়েছিল 'কল্লোলের' পক্ষ থেকে।

কল্লোল পাবলিশিং হাউস থেকে প্রথম বই বেরোয়, সুবোধ রায়ের 'নাট মন্দির,' তিনটি একাঙ্ক নাটকের সংকলন, ফোর আর্টস ক্লাবের 'ঝড়ের দোলা' এবং 'নজরুলের ' 'বিষের বাঁশী'।

১৩৩২ এর আটই আশ্বিন, মারা যান, গোকুলচন্দ্র নাগ।

গোকুলের তিরোধানে নজরুলের কবিতা প্রকাশিত হয় 'কল্লোলে'

'সব নিয়ে গেছ বন্ধু! সে কল কল্লোল
সে হাসি-হিল্লোল নাই চিত উতরোল!'

১৩৩২ এর বৈশাখে 'কল্লোলে' রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তি' কবিতাটি ছাপা হয়। 'কল্লোলের' সামান্য পুঁজি থেকে তার জন্য দক্ষিনা দেয়া হয় বিশ্বভারতীকে।

"সেদিন আমার মুক্তি, যেদিন হে চির-বাঞ্ছিত
তোমার লীলায় মোর লীলা
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে-তাল মিলা।"

আরো যাঁরা কল্লোলে এলেন তাঁদের মধ্যে পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র দাস, প্রণব রায়, ফনিন্দ্র পাল এবং সুনীল ধর। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী ও পরিমল গোস্বামীও কল্লোলে লিখেছেন। বিভূতিভূষণ প্রায় নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন। শিবরাম চক্রবর্তী, যদিও হাসির গল্প লিখতেন, কল্লোলে সবসময় বিপ্লব প্রধান কবিতা লিখেছেন। তাঁর দুটি কবিতার বইয়ের নাম 'মানুষ' ও 'চুম্বন' (১৯২৯)

'সুখ নাই পূর্ণতায়, তিক্ত প্রেয়সীর ওষ্ঠাধর,
সভ্যতায় সুখ নাই, শত কোটি নর যার পর—
এ জীবন এত সুখহীন—বেদনাও হেতায় বিলাস'

কিংবা

'স্বর্গ হতে আসিল যে রসাতলে নেমে
সকলের পাপে আর সকলের প্রেমে...
গাহি জয় সে বিজয়িনীর!
যে বিপুল যে বিচিত্র যে বিনিদ্র কাম
গাহি জয়—তারই জয়।'

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'যৌবন চাঞ্চল্য' প্রকাশিত হয়েছিল

কল্লোলে—
'সহজ স্বচ্ছন্দ মনোরথ
ভুটিয়া যুবতী চলে পথ
টসটসে রস ভরপুর
আপেলের মতো মুখ
আপেলের মতো বুক
যৌবনের রসে ভরপুর'

তারাশঙ্করেরও প্রথম আবির্ভাব কল্লোলে। প্রায়ই উনি যেতেন গ্রামের পোস্ট অফিসে, সেখানেই একদিন পেলেন এক মাসিক পত্রিকা, এক কোণে নাম লেখা 'কল্লোল' ঠিকানাটা, টুকে নিলেন তিনি। তাঁর লেখা 'রসকলি' পাঠিয়ে দিলেন। চার দিনেই সাদা পোস্টকার্ডে

লেখা চিঠি এলো। তখনকার দিনে সাদা পোস্টকার্ডের আভিজাত্য ছিল। চিঠিতে লেখা ছিল গল্পটি মনোনীত হয়েছে এবং পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'এতদিন আপনি চুপ করিয়া ছিলেন কেন?' এই লাইনটিই তারাশঙ্করের জীবনে সঞ্জীবনীর কাজ করেছিল।

সরোজ কুমার রায়চৌধুরীও কল্লোলের লেখক ছিলেন আর ছিলেন মনোজ বসু। কল্লোলে ছাপা হয়েছিল তাঁর জসিমী ঢঙে লেখা কবিতা। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের গল্প বেশ কিছু ছাপা হয়েছিল কল্লোলে।

মনীশ ঘটক এক দুর্ধর্ষ উদ্দাম মানুষ, ছ- ফুটের বেশি লম্বা,এক অদ্ভুত দীপ্তি ছিল তাঁর চেহারায়। কল্লোলে আত্মপ্রকাশ করেন 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে। সেদিন তাঁর ছদ্মনামের অর্থ কেউ যদি জোয়ান ঘোড়া করতো তাহলে খুব ভুল হতো না। যে জীবন ভগ্ন, রুগ্ন, পযুদস্ত, তাদেরকে সে সরাসরি ডাক দিল প্রথম পংক্তিতে। কল্লোলে যুবনাশ্বের তিনটি গল্প 'মন্থশেষ' 'ভুখা ভগবান', আর 'দুর্যোগ,' প্রকাশিত হয় ১৩৩২ বঙ্গাব্দে।

শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র প্রকাশ্যভাবেই আধুনিকতার সপক্ষে ছিলেন। "শনিবারের চিঠি" মনে করেছিল রবীন্দ্রনাথও যেন প্রচ্ছন্ন রূপে কল্লোলের প্রতি আশীর্বাদময়। নইলে এমন কবিতা তিনি কেন লিখেছেন?

'সংগীত- উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ পথরোধী পাষাণ- সঞ্চয়
গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে অপনাতে জাগাবে উৎসাহ।'

শুধু আশীর্বাদ নয়, বিপক্ষ দলের শত্রুকে 'মসীকৃষ্ণ' ও 'জড়' বলেছিলেন তিনি।
এক সময় রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' 'ঘরে বাইরে' নিয়েও
প্রশ্ন উঠেছিল, পারিবারিক সম্পর্কের নিরিখে।

বিশ্ববিখ্যাত কবিদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিল কল্লোল গোষ্ঠীর কবিরা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন এবং সহযোগিতা করেছিলেন। Romain Rolland– Maudline Rolland– Jacinto Benavente– Jhon Bojer– H.G wells প্রমুখ কবিরা। সেদিন সবার হৃদয় স্পর্শ করেছিল Yone Noguchi-র এই কবিতা।

I followed the twilight—
I followed the twilight to find where it went
It was lost in the day's full light
I followed the twilight to find where it went
It was lost in the dark of night.
Last night I wept in a passion of joy
Tonight the passion of sorrow came
O light and darkness– sorrow and joy
Tell me – are ye the same.

যে কবিদের নিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম তাঁদের দুএকটি পংক্তির উল্লেখ করছি—

বুদ্ধদেব বসুর 'স্পর্শের প্রজ্জ্বলন'—

'কিন্তু বলবার কিছু নেই যে
এখন আর কিছু বলবার কথা নেই
এখন শুধু স্পর্শের স্বাক্ষর
স্পর্শের প্রজ্জ্বলন'

কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনায়' লিখেছেন

'বাসনার বক্ষমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃঙ্গারের হিয়া
রমণী- রমন - রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি।"

সিটি কলেজে লেকচারারের কাজ করতেন জীবনানন্দ। তাঁর কবিতায় অশ্লীলতার অপবাদে চাকরি চলে যায়।

পরাবাস্তব (surrealism) কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন—'বনলতা সেন'

'সব পাখি ঘরে আসে, সব নদী
ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন
থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার
বনলতা সেন'

প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'আজ আমি চলে যাই, চলে যাই তবে
পৃথিবীর ভাই বোন মোর, গ্রহ তারকার দেশে'

কবি জসীমউদ্দীনের কবিতা 'কবর' কল্লোলের পাতা থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য সূচিতে স্থান পেলো, কিন্তু অনভিজাত 'কল্লোলের' নামটার কোনো উল্লেখ ছিলো না।

'এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।'

অদ্ভুত ভাবের সংমিশ্রণ ছিল কল্লোল, কখনো উন্মত্ত, কখনো উন্মনা। কখনো সংগ্রাম বা জীবনতৃষ্ণা, প্রায় রাশিয়ান লেখক Ivan Turgenev এর চরিত্র। বিপ্লবীদের জন্য সে সময় মৃত্যুটা বড়োই রোমান্টিক ছিল, এককথায় যার নাম যুগযন্ত্রণা (malady of the age)

'কল্লোল' বন্ধ হয়ে যাবার পর বহু বছর চলে গেছে, আরো কত বছর চলে যাবে কিন্তু ওরকমটি আর 'ন ভূতো ন ভাবী'।

দৃশ্য বা বিষয়ের পরিবর্তন হবে দিনে দিনে, কিন্তু যৌবন-দীপ্তিতে বাংলা সাহিত্য একদিন আলোকিত হয়েছিল তার লয় ক্ষয় নেই, তা সত্যের মতো উজ্জ্বল থাকবে চিরকাল।

কল্লোলের নারী-গল্পকার
ন ব নী তা ব সু

(১)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবী আর আগের মতো থাকল না। অসংখ্য মানুষের মৃত্যু, হানাহানি, মানুষের মধ্যে লোভের নগ্ন প্রকাশ, মনুষ্যত্বের অবনমন, পুঁজিবাদী শক্তিদের আগ্রাসন এই সমস্ত কিছু মানব সভ্যতাকে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে গেল। এই অবস্থা মানব সভ্যতার পক্ষে ছিল অভূতপূর্ব! আগে কখনও মানব সভ্যতা এই সংকটের মুখোমুখি হয়নি। মানুষের আস্থা, বিশ্বাস সমস্তকিছুই একটা প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়ালো। সাহিত্যের মধ্যেও তার প্রতিফলন দেখা গেল। ইউরোপীয় সাহিত্যের দ্বার আমাদের সামনে খুলে গেল। ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যের বাইরেও ইউরোপীয় সাহিত্যের মহৎ ভাণ্ডারের দিকে বাঙালির দৃষ্টি প্রসারিত হলো। বাংলা বাজারে সুলভ হয়ে উঠল ফরাসি, স্ক্যানডেনেভিয়ান, নরওয়েজিয়ান, আইসল্যান্ডিক, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, জার্মান, পোলিশ, হাঙ্গেরিয়ান, রাশিয়ান প্রভৃতি সাহিত্যের অনুবাদ। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের মধ্যে বিশেষত গল্প ও উপন্যাসের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে দেখা গেল। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ চর্চা আমাদের চৈতন্যের রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। বিদেশি সাহিত্য কীভাবে আমাদের প্রভাবিত করেছিল তার একটা চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে ১৩৩৩ এর বৈশাখে কল্লোল এ প্রকাশিত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এর লেখা 'রুষ সাহিত্য ও তরুণ বাঙালী' শিরোনামাঙ্কিত লেখাটিতে। সেখানে তিনি বলছেন, "বিংশ শতাব্দীর তরুণ বাঙালীর মন আজ রূপকথার রাজপুত্রের মত সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হবার জন্যে দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে। ... তরুণ বাঙালীর মনে আজ ভবিষ্যৎ বাংলার একটা আবছায়া এসে পড়েছে, আর সেই আবছায়ায় দাঁড়িয়ে তার মন যেন সুদূর রুষিয়ায় তার সম্ভাব্য রূপ দেখছে। রুষ-সাহিত্যে বাঙালী দেখেছে বেদনার সিন্ধু মন্থন করে জয়মাল্য গলে মানবের অন্তরের বিজয়লক্ষ্মী উঠেছে; বাঙালীর মন রুষ সাহিত্যের ইতিহাসে একটা এত বড় নিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছে যে, সে আপনার অজ্ঞাতসারেই তাকে স্বীকার করে নিয়েছে।"

ফ্লবেয়ার, জোলা, ইবসেন, ন্যুট হামসুন, গর্কি, গোগোল, টুর্গেনেভ, চেকভ, ডস্টয়ভস্কি, টলস্টয়, মেটারলিঙ্ক, জোহান বোয়ার প্রমুখদের লেখাতে এই তরুণ লেখকেরা দেখলেন মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, বাস্তবতাবোধ, জনগণতান্ত্রিক চেতনা, মিথুনাসক্তি, যৌবনের উদযাপন, যৌবনের বন্দনাগান, প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলিকে যুদ্ধ-পরবর্তী কালের মূল্যবোধে বিচার।

সেই সময় ভারতবর্ষের পরিস্থিতিও অস্থির। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড (১৯১৯) রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড উপাধি ত্যাগ, খিলাফত আন্দোলন এবং ১৯২১ সালে অসহযোগ

আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব হলো মারাত্মক। স্ত্রী-পুরুষ, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত, বেকার চাকুরিজীবী, শ্রমিক-কৃষক ইত্যাদি শ্রেণির বড়ো অংশ এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এই রকম এক অস্থির সময়ে দীনেশরঞ্জন দাশ এবং গোকুল চন্দ্র নাগের সম্পাদনায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'কল্লোল' প্রকাশিত হলো। পত্রিকাটির আর্থিক সম্বল বলতে সেরকম কিছু ছিল না। দীনেশরঞ্জন এই সম্পর্কে বলেছেন, "নাম ঠিক করিয়া ফেলিলাম —কল্লোল। গোকুলের ব্যাগে ছিল এক টাকা আট আনা, আমার কাছে ছিল টাকা দুই— এই সম্বল লইয়া দোকান হইতে কাগজ কিনিয়া একটি ছোট প্রেসে কল্লোলের প্রথম হ্যান্ডবিল ছাপা হইল। ৩০ শে চৈত্র সংক্রান্তি - চৈত্র মাসের সং দেখিতে পথে বিপুল জনতা হয়। সেই সুযোগে গোকুল ও আমরা কয়েকজন মিলিয়া হ্যান্ডবিল বিলি করিতে বাহির হইয়াছিলাম। ইহার পূর্বেই কল্লোলের কিছু কিছু কপি প্রেসে ছাপিতে দেওয়া হয়। বিধাতার সাহায্যে ১৩৩০- এর পহেলা বৈশাখ কল্লোল ছাপিয়া বাহির হইল।" দীনেশরঞ্জন কল্লোলকে স্বাগত জানিয়ে কবিতায় লিখলেন, "আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা নিশিদিন / অজানা জানার নয়নের বারি / নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি / পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি' ফিরে আসি নিশিদিন।" (বৈশাখ ১৩৩০)

কল্লোলের চিন্তাধারার মধ্যে ছিল পুরানোকে অস্বীকার করে নতুনের আহ্বান। সেদিনের সেই উদ্দামতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন, "কল্লোল বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।" এই আলোড়নে যোগ দিয়েছিল তৎকালীন যুব লেখকগোষ্ঠী। যৌবনের স্পর্ধায় যারা নতুন পথ খুঁজতে চাইছে, নতুন পথে হাঁটতে চাইছে। ভাব-ভঙ্গী ভাষায়-আঙ্গিকে আসছে নতুন স্বকীয়তা। এই সম্মিলিত উচ্ছ্বাসের কথা বলতে গিয়ে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, "আজকের দিনে যত নতুন লেখক আছে স্তব্ধ হয়ে, সবায়ের ভাষাই ঐ 'কল্লোল'। বিধাতার আশীর্বাদে তাই সবাই একত্র হয়েছি। মিলেছি এক মানসতীর্থে। শুধু আমরা ক'জন নয়, আরো অনেক তীর্থঙ্কর।"

কল্লোল-এ তীর্থঙ্করের সংখ্যা কম নয়। কল্লোল বলতেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে দীনেশরঞ্জন দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জসীমউদ্দীন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখের যুবনাশ্ব (মণীশ ঘটক) প্রমুখদের নাম। কিন্তু এর সঙ্গেই ছিল নারী লেখকদের দীর্ঘ তালিকা। তাঁরা কল্লোল এর পাতাকে কবিতা, গল্পে ভরিয়ে তুলেছেন। এদের মধ্যে নারী গল্পকার আমাদের প্রবন্ধের মূল আলোচ্য।

(২)

সময়, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক—কবিতার মতো তখন গল্প-উপন্যাসে খ্যাতিমান লেখকদের ঐতিহ্যময় বৈদগ্ধ্যের দ্যুতি বিচ্ছুরিত—এই দশকের সীমায় মধ্যে এঁদেরই, সমান্তরালে পায়ে পায়ে হাঁটাহাঁটির পর নতুন নতুন সৃষ্টিতে, প্রণোদনায়, নানা বীক্ষার, ব্যাখায়, জীবন-সংলগ্নতার সহজ ভাষায় যাঁরা কলম ধরেছেন; তাঁদের গল্পপাঠে বারবার যেন মনে হতে থাকে স্বপ্নে-বিদ্রোহে- স্বপ্নভঙ্গে-ভাঙনে-বিপর্যয়ে-সুখের উল্লাসের নানা রঙে আঁকা প্রতিদিনকার জীবনের চলচ্ছবি গল্পের ক্যানভাসে ভয়ানকভাবে উজ্জ্বল। সুনীতি দেবী, নৃসিংহদাসী দেবী, মাধবী দও, কেতকী দেবী, প্রভাবতী দেবী স্বরস্বতী, সুরমা দেবী, রাধারানী দত্ত, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, উমা দেবী, প্রমুখ নারী গল্পকার, নানা অনুভূতির গ্রন্থনায় কল্লোলের সময় সারণিতে স্মরণীয় পদচিহ্ন রেখে গেছেন। জীবন- ভাবনার বিশিষ্টতা, রুদ্ধবাক নারীর প্রশ্নময় আর্তি প্রকাশ, অনিশ্চয়তার দোলাচলতা, কিংবা বিশ্বাসের ব্যবধান নিরূপণে এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার আয়ুধকে ধারাবাহিকভাবে শাণিত করে গেছে। আর তাই ঘরকন্নার বাইরে কল্লোল যুগেই নারীগল্পকাররা ছোটগল্পের ঐতিহ্যময় নিজস্ব বীক্ষায় ও ভাষার জগতে নতুনের বেলাভূমি, নিখুঁত প্রত্যাশা কিংবা মোক্ষম জিজ্ঞাসা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন :

সুনীতি দেবীর গল্পে বৈদগ্ধ্যের জৌলুস নেই, বরং পাঠক পড়তে পড়তেই আবিষ্কার করেন সহজ-সীবলীল ভঙ্গিতে অস্তিত্বজিজ্ঞাসার মূল সূত্রটিকে। তাঁর গল্পের বিষয় পাঠকের চেনা। বিষয় নির্বাচনও সংসারের চৌহদ্দির মধ্যেই বন্দি। কিছু গল্পবলার প্রাঞ্জলতায় ফুটে ওঠে—ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার দ্বিবাচনিক সাপর্কের টানাপোড়েন। ১৩৩০ বঙ্গাদের কল্লোল পত্রিকার বৈশাখ সংখায় প্রকাশিত ‘বীণা’ গল্প যেন অস্তিত্ব সংকটের নিদারুণ উদাহরণ। বীণাযন্ত্রের জবানিতে যেন তার জীবন-অনিশ্চয়তা, তার রিক্ততা, পূর্ণতা, তার তুমূল ভাঙন, তার প্রকট অস্থিরতা, নতুনপথ ও পাথেয়, গন্তব্য খুঁজে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা সুরের মূর্ছনায় ঝরে পড়ে। একাকীত্বের যন্ত্রণায় শূণ্যতার অনুভব কিংবা ভালোভাবে থাকার ঠিকানাতেও রিক্ততার ক্রন্দন ‘আমার বুক কান্নায় ভরে উঠল! নীরব কান্নায় অভিযোগ করলাম—শুধু ব্যথাই দিয়ে গেলে। একবার বাজালে না?..... সে দিনের পর আর আমার প্রভুর বাড়িতে সঙ্গীতের বৈঠক বসেনি। আমি অন্ধকারে আপন মনে গুণীর পরশ পাবার ধ্যান করছি। বাইরের কোন কোলাহল আমার ছিন্নতন্ত্রীতে আর সুরের স্পন্দন জাগায় না.....নতুন তারে নতুন করে কেউ আমায় আর বাঁধবে কি? কে জানে’—এই দুই মাত্রাকে গল্পকার মিথ্যা চেতনার দাপটে ধ্বস্ত সময়ে তুলে ধরেছেন, লিখেছেন স্বপ্ন ভাঙার কথাও।

জ্যৈষ্ঠের প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত ‘মন্দির’ গল্পে রয়েছে প্রান্তিকায়িত নারী জীবনের অন্ধকার ছবি। মন্দিরের গা ছমছম পরিবেশে পূজারী দেবদাসীর গল্প শোনে। সমাজ, মানুষ ছিনতাই করে নেয় নারীর শরীর। মানুষ হয়ে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা তো দূরের

কথা, দেহ তখন ভোগের প্রসাদ হয়ে জান্তব উল্লাসে বিনষ্ট। দেবদাসী বলে, ‘তারপর অনেক কথা। আমার মন রইল দেবতার চরণে, দেহটা গেল মানুষের অধিকারে....তার উত্তর কোথাও পেলাম না! দেবতার কাছেও না—বুকফাটা কান্নায়, জীবনের নিষ্ঠুরতিক্ত বাস্তবতায় দেবদাসী বাসী ফুলেই পুজো শুরু করে দেয়। নষ্টভ্রষ্ট অধঃপতিত সমাজে বাসী ফুলের উপচার তার প্রতিবাদের অস্ত্র। অবরুদ্ধ সমাজে দেবদাসীর শান্ত হিম উচ্চারণ—“একদিন নৃত্য সভায় হঠাৎ মূর্ছার পর পৃথিবীর আলোতে জাগলাম না.... তবু আমার পূজা বন্ধ হয়নি। এই হাজার বছর আগেকার শুকনো ফুলের রেণুতেই আজও আমার পূজা সমানে চলছে, যেন বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে, মেকি পৃথিবীর মানবিক হাহাকার ছুরির ফলার মতো ঝলসে ওঠে।” ‘পথ চাওয়া’ (শ্রাবণ, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) গল্পে মিত্তিরবাড়ির ছোটবউয়ের ঘাড় ধরে সংসার নামক যন্ত্র-জীবনের লাভ-ক্ষতি আদায় করে নেয়। প্রতিদিনকার চাহিদাপূরণের খেলায় হাঁপিয়ে ওঠে ছোটবউ। প্রতিটি মুহূর্ত সহ্য করে তাকে জীবন্মৃত অবস্থায় টিকে থাকতে হয়। তবু বারান্দা থেকে দেখা বাইরের পৃথিবী তার বিক্ষত মানবিকসত্তায় শান্তির প্রলেপন লাগায়, সে চোখে এক অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে জেগে থাকে। অতৃপ্তির যন্ত্রণাবোধে তার মনে প্রশ্ন জাগে, “তার পথচাওয়া ফুরিয়েছে কি?” রবীন্দ্রনাথের ‘ছুটি’ গল্পের ফটিকের সেই উচ্চারণ, “মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি”— মিত্তিরবাড়ির ছোটবউয়ের পথচাওয়ার মধ্যেই যেন মিশে যায়। সংক্ষিপ্ত অবয়বে ছোট বউয়ের নিরবচ্ছিন্ন রক্তক্ষরণ যেন লেখিকার কলমে তীব্র হয়ে ওঠে। ‘উপেক্ষিতা’য় (আশ্বিন, ১ম বর্ষ) প্রকৃতি ও নারীর সহাবস্থান ভ্রমণপিপাসু মানুষ সুখের চরিতার্থতায়। প্রকৃতিকে নিংড়ে ভোগ করার সাধনায় ব্যস্ত। সর্বব্যাপ্ত ধ্বংসের মধ্যেও চলে প্রকৃতি নিধনের মহাযজ্ঞ। অথচ প্রকৃতি ঋতু বৈচিত্র্যে রূপের ডালি নিয়ে সকলকে মুগ্ধ করে। লেখিকা এই গল্পে নারীজীবনের তুলনা টেনে অবক্ষয়ী মূল্যবোধকে চিনিয়ে দিয়েছেন, ‘মনে পড়ে গেল চিরন্তন নারী প্রকৃতির ব্যথা আর কান্না। কাজের ঠেলায় চিরদিন পুরুষ তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সংসারে কাজের মধ্যে সে নারীকে চেয়েছে শুধু অবসর বিনোদনের জন্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, আর দরকার পড়লেই তার চোখের জল, তার অন্তরের ব্যাকুল চাওয়া উপেক্ষা করে কাজের ভিড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে”—নিজেদের অজ্ঞাতসারে নারীদের মনুষ্যত্বের অনেক অভিজ্ঞান আমরা নষ্ট করে ফেলছি, উত্তরণের পথ সেখানে একপ্রকার রুদ্ধ। তাই ‘কোথা যাও’ এর বারবার প্রয়োগ নাড়ীর বাঁধনকে ধরে রাখার নিখুঁত প্রয়াস।

‘মনের দেখা’, (চৈত্র, ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা) নারীর সত্যদৃষ্টির একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। অন্তর্যামীর কাছে একজন সংসারের ঘেরাটোপে বন্দী নারী কীভাবে মুক্তির পথ খুঁজে পায়, গল্পের বিষয়টিই তাই। অন্তর্যামী শেখায় সাহসে ভর করে সত্তাসন্ধানের পথ নির্মাণের। পুরুষতান্ত্রিকতায় নিঃসঙ্গ, একাকী, অসীম। একলা পথ চলার লড়াই তার দীর্ঘ। তাই তার

পথ কখনো জীবনতরী ভাসাতে ভাসাতে ভরাডুবিও করে বসে সে। তবু শূন্য প্রত্যাশা-প্রাপ্তির কলসি নিয়ে সে অনন্ত অপেক্ষা করে, "তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়"— আত্মঅন্বেষণের এই লড়াই চিরন্তন।

"তোমার হৃদয় বিশ্বদেউল সকল দেবতার" এই সুর যেন ধ্বনিত হতে দেখি 'পূজা' (আষাঢ়, ১৩৩১) গল্পে। আকাশচুম্বী, চূড়া, অগণন অর্ঘ্যে দেবতা পূজিত নন। দেবতা পূজিত হন অন্তরের নৈবেদ্যে, প্রকৃতির উপচারে। 'পূজা' গল্পের পূজারীর এই উপলব্ধি গল্পে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে।

'স্মৃতির খাতা' (আশ্বিন, ১৩৩১) দু'খানি পাতা জুড়ে এক অখণ্ড প্রেমের গল্পের জন্ম দিয়েছে। শচীন ও মল্লিকার বৃদ্ধ দাদু ও দিদিমার প্রেমের অতীত ইতিহাস স্বচ্ছন্দভাবে বর্ণিত হয়েছে। কাহিনিতে জটিলতা নেই, সূক্ষ্ম উপলব্ধির গভীরতা নেই। গল্পের গল্পত্বও ছোট। বয়ঃসন্ধির গোধূলিবেলায় দু'জন নর-নারীর প্রেম, সংরাগ, উদ্বেলতা, ব্যর্থতা যেন প্রৌঢ়ত্বের শেষ ঠিকানায় পৌঁছে যায়। 'স্মৃতির খাতা'র একপাতায় প্রিয়াকে না পাওয়ার অস্ফুট কান্না, 'অন্যপাতা'য় প্রিয় বিরহের সমারোহ গল্পটির বিষয় নির্মাণ করে দিলেও প্রাপ্তমনস্ক পাঠকের কাছে তা আস্বাদ্য করে তুলতে পারেনি। তবে জীবনের কথামালায় এদের উপস্থিতি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'মাটির টান'(অগ্রহায়ন, ১৩৩৪) গল্পটি কবিতার মতো। প্রত্যেক শব্দে রয়েছে টুকরো হয়ে যাওয়া অস্তিত্বের দীর্ঘশ্বাস। মাটি ও বৃক্ষের রূপকে স্থায়িত্বের বিশ্বাসকে উপড়ে ফেলার ছবি এঁকেছেন লেখিকা। আত্মঘাতী অন্ধত্বকে বরণ করে নিয়ে মানববিশ্ব ধ্বংসলীলায় উন্মত্ত। শিকড়ে মাটির ঘ্রাণকে অস্বীকার করে, জীবনকে নস্যাৎ করে অবক্ষয়ী সময় বহির্পৃথিবীর মুখোশকে নিয়েছে পরে। কিন্তু সময়ের অভিঘাতে একদিন আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে শরীরে পচন ধরে, জ্বলে-পুড়ে খাক হয়, দেহ মাটিতে মেশে, মুছে যায় অস্তিত্ব। এক অসধারণে বাচন, সংক্ষিপ্ত পরিসরে লেখিকা সুনীতি দেবী নতুন করে গল্পপথের নির্মাণ করেন। কাহিনিকে টেনে হিঁচড়ে বড়ো করার কোনো অভিপ্রায় তাঁর ছিল না, অপ্রত্যাশিতের চমকে, পাঠককে মুগ্ধ করা—তা সত্ত্বেও জীবন অভিজ্ঞতার ছোট ছোট মুহূর্তকে কোলাজের মতো তুলে ধরার সার্থক চেষ্টাকে কুর্নিশ না জানিয়ে উপায় নেই।

সুনীতি দেবীর 'বনফুল' গল্পের মতো (বৈশাখ, ১৩৩২) 'রাত্রি' গল্পের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে আছে প্রকৃতির রহস্যময়তা। রাতের নিঃশব্দ অন্ধকার খোঁজে আলোর। 'স্বপ্নালস' 'সন্ধ্যা'য় কিংবা 'উষার লজ্জারক্ত দেহ'-এ কিংবা শিশিরের শব্দে রাত পেতে চায় দিনের উষ্ণ সান্নিধ্য। কোথাও তার হৃদয়ার্তি, কোথাও তার নিবিড় একাত্মতা যেন মানবজীবনপ্রবাহের রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে মিশে যায়। সংক্ষিপ্ত অবয়বে লেখিকা অপূর্ব রসে অভিষিক্ত করে দেন দিন ও রাতের জাগতিক পরিসর। বহিঃপ্রকৃতি হয়ে ওঠে এক পৃথক চরিত্র।

প্রয়োজনহীন ভগ্নাংশিক অবস্থিতি মানুষকে অবহেলার গহ্বরে নিক্ষেপ করে। 'বনফুল' (বৈশাখ, ১৩৩১) গল্পে বনফুলের প্রতীকে লেখিকা দেখান নারীর অস্তিত্ব ততটুকু যতটুক

পর্যন্ত সে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছে। ফলে এসময় তাকে দৃষ্টির জগৎ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়, একপেশে করে তোলে। উপেক্ষাই তার একমাত্র সম্বল হয়। নারীর অবস্থিতির স্তরান্তরকে নানা কোণে নানা রেখায় নতুন রূপ দিয়েছেন। 'পণ-ভঙ্গ' (কার্তিক, ১৩৩৩) এর প্রতি স্তরে রয়েছে লঘু চালে জীবনের ছাঁচকে ধরার ছল। মিনু ওরফে মৃণালিনীর বিবাহ না করার পণ থেকে যুদ্ধ ফেরত সেনাকে বিয়ে করার পণ কীভাবে ভঙ্গ হল তারই বৃত্তান্ত 'পণভঙ্গ'। গভীরতার অকারণ বা নান্দনিকতার উজ্জ্বল প্রকাশ গল্পে নেই। লঘু বয়নে, বিষয়ের হালকা চালে গল্পটি তরতরিয়ে এগিয়ে গেছে গন্তব্যের দিকে।

(৩)

নৃসিংহদাসী দেবী কল্লোলযুগের অন্যতম উলেখযোগ্য কথাকার। কল্লোল পত্রিকার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় তাঁর লেখা প্রকাশিত। জীবনের স্তরান্তরে মানুষগুলি কেবল বেঁচে থাকার জন্য নয়, নিজের অভিজ্ঞতার বীজাণু ছড়িয়ে দেন গল্পশিল্পের শরীরে। 'মা' (ভাদ্র, ১৩৩০) গল্পের অত্যন্ত দরিদ্রের মেয়ে সুভাষিণীর বিয়ে হয় জমিদার পরিবারের একমাত্র পুত্র অজয়ের সঙ্গে। রূপে, গুণে সে সকলের মন জয় করে নেয়। একমাত্র পুত্রের জন্ম দেয় সে। কিন্তু ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে বসন্ত রোগে সুভাষিণীর দুটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। শরীরিক-অক্ষমতা তার রূপ গুণ, প্রাণবন্ত ধর্মকে নষ্ট করে পরিবারে উপেক্ষার পাত্রী করে তোলে। কিন্তু নিজের সন্তান মিহির পিতৃতন্ত্রের চরম নিষ্ঠুরতার তোয়াক্কা না করে ছুটে যায় মায়ের কাছে। নারীজন্ম যে কেবল অপমানের, লাঞ্ছনার নয় তা নস্যাৎ করে দেয় মিহির। জীবনের মর্মে মর্মে অভাববোধের তাড়না মুছে দিয়ে মিহির মা'কে দেয় বিশ্বজননীর বিজয়কেতন। নারীর অবদমিত অবস্থান থেকে উওরণের এই সত্যকে তুলে ধরেন লেখিকা। জীবনের 'যাত্রাপথে' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০) স্বপন-বিশ্বাস-পরম্পরা-মাধুর্য দিয়ে রচিত হয় সম্পর্কের নিটোল বুনট। দেশও সমাজ যখন ক্রমাগত টুকরো হতে থকে তখনও মানুষ সুখের ছেঁড়া কাপড় গায়েও ভালো থাকার স্বপ্ন দেখে। অরুণ ও বৌদিদির সম্পর্কে রয়েছে এক অমেয় প্রেমের স্নিগ্ধতা, স্নেহের ফল্গুধারা। গল্পের শেষে প্লেগ রোগাক্রান্ত বৌদিদির মৃত্যুতে এক অবিচ্ছিন্ন ট্র্যাজিক বিষণ্ণতা গ্রাস করে অরুণকে। অরুণ বোঝে নিষ্কাম স্বার্থহীন প্রেম বিশ্বাসহীনতার যুগে দুর্মূল্য। লেখিকা এক আশ্চর্য নির্লিপ্ততায় শাশ্বত মানবিক সমবেদনা, উদারতা, সহানুভূতিকে জুড়ে দেন গল্পদেহে। 'ভবিতব্য' (ফাল্গুন, ১৩৩০) গল্পে লেখিকা স্মৃতি-সত্তা-ভবিষৎকে এক সূত্রে গেঁথেছেন। মনোরমার মায়ের যক্ষ্মা রোগের কারণে অবনীশের মা মুহূর্তে মনোরমার সঙ্গে অবনীশের বিবাহ প্রস্তাব খারিজ করে দেয়। অবনীশও মনোরমাকে দূরে সরিয়ে রাখে, তার সংস্পর্শ এড়িয়ে যায়। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে আটবছর পর। মনোরমার ডাক্তার স্বামী সুশান্ত অসুস্থ অবনীশকে বাড়ি নিয়ে আসে, মনোরমার শুশ্রূষায় ভালোও হয়ে ওঠে। নিরুত্তাপ স্বার্থপরতায় অবনীশ একদিন যে মনোরমাকে

হারিয়েছিল, সেই মনোরমা হারিয়ে যাওয়া প্রহরের উপর দাঁড়িয়ে অবনীশকে জীবনের নতুন সূর্য দেখার সুযোগ করে দেয়। তাই গল্পের শেষে ভবিতব্যের কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে অবনীশের অপরিসীম দৈন্য স্খলিত হয়ে পড়ে। হৃদয়ের ঐশ্বর্যে জয়ী হয় মনোরমা।

'শ্রান্তির শেষ' (বৈশাখ, ১৩৩১) গল্পে পাঠক জানতে পারে, হিমাংশু ও ভূপেন সমাজসৃষ্ট কাজের বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে আসতে মুক্তির দিগন্ত সন্ধান করে। হিমাংশু পারলেও ভূপেন কর্মচালিত জীবনের অক্টোপাসে আষ্টেপৃষ্টে নিজেকে জড়িয়ে নেয়। কর্মবিধ্বস্ত ভূপেন শ্রান্তি খোঁজে, শ্রান্তি পায়ও। টেলিগ্রামে ভূপেন জানতে পারে তার স্ত্রী অসুস্থ। সমস্ত কর্মের শেষে ভূপেন বাড়ি ফিরলেও স্ত্রীকে চিরতরে হারিয়ে ফেলে। ছেলেও চলে যায় মামার বাড়ি। একরাশ শূন্যতায় কর্মব্যস্ত ভূপেন হতবাক ভরা দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়ে থাকে। গল্পের লেখিকা এক সুন্দর বার্তাদেন—বহমান সময়ের চাপে কর্মব্যস্ত মানুষ সম্পর্কের পেলবতাকে হারিয়ে ফেলে চিরতরে। সময় তখন মানুষকে নির্বাসনে পাঠায়। আর কর্মমুখর মানুষ চোরাবালিতে কেবল ডুবতে থাকে, ডুবতে থাকেই। কখনও ভালোবাসার অন্তরঙ্গতায়, কখনও বিচ্ছেদের নিবিড়তায় আবার কখনও জীবন দর্শনের গভীরতায় মানুষ জীবনব্যাপী আত্ম-অনুসন্ধানে নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দী রাখে। 'খাতা' গল্পের মহেন্দ্রনাথ তেমনি একজন। যৌবনের মহেন্দ্রনাথকে কেউ চিনতে পারে না। কেউ সন্ধান পায় না তার মনের টালমাটালকে। মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বিভাকর আবিষ্কার করে নতুন মহেন্দ্রনাথকে। যার মনে স্বপ্নের উড়ান ছিল, ছিল ভালোবাসার খরস্রোত। সযত্নে রাখা খাতায় ভালোবাসাকে মহেন্দ্রনাথ পাকা ফসলের মতো গোলায় তুলে রাখে। ভালোবাসার মানুষকে হারিয়ে কঠোর বাস্তবতায় এই সম্বলটুকু সে হারাতে চায়নি। তাই কোনো এক বর্ষণমুখর দিনে বিভাকরের অনুভূতিতে ধরা পড়ে প্রেমিক মহেন্দ্রনাথের জীবন সম্পর্কে তার সূক্ষ্ম রোমান্টিকবোধের পরিচয়।

'ব্যর্থ অশ্রু' (আশ্বিন, ১৩৩১) গল্পে লেখিকা দেখিয়েছেন, সংসারে পিতৃতন্ত্রের আবহমান কালের চোখ দিয়ে নারীদের দেখা হয় তাচ্ছিল্যে, অপমানে, অবজ্ঞায়। সংসারে করুণা সর্বস্ব দিয়ে করলেও স্বামী সুরেশের মন পায় না। করুণার ব্যথাহত হৃদয়ে অভিমান গুমরে ওঠে। কখনে তা ফেটে পড়ে সন্তান-সন্ততির ওপর। বুকে পাথর চেপে পরজীবী হয়েই করুণা সন্তান পালন করে। সুরেশ্বরও একদিন তাদের ছেড়ে চলে যায়। জীবনের উপান্তে এসে স্বামী পরিত্যক্তা করুণা বুকভরা অভিমান নিয়ে চিরতরের মতো সব বাধা ছিন্ন করে চলে যায়।

'পাশের বাড়ি' (চৈত্র, ১৩৩১) গল্পের কণিকা যেন করুণার যমজ সত্তা। পুরুষের চোখে কণিকাদের জাত "শুধু ভাত সেদ্ধ করবার, ছেলে ঠেঙাবার, পাড়া বেড়াবার, পরচর্চা। করবার, কোন্দল করে অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করবার, দুঃখে কেঁদে মাটি ভেজাবার আর শোকে উন্মাদ হয়ে বুক চাপড়াবার।" (প্রথম প্রতিশ্রুতি: আশাপূর্ণা দেবী) তাই এ জাতের মৃত্যুর পনেরো দিনের মধ্যেই স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। এদের উপস্থিতি -

অনুপস্থিতিতে সমাজে কিছু যায় আসে না। এই যে সুপরিকল্পিতভাবে নারীত্বের অমূল্যায়ন, মূল্যবোধের অবনমন-এর হিসেব কেউ রাখে না, রাখতে চায় না। এই দুই গল্পে নারীর ভাগ্য বিপর্যয়ের চিরন্তন বিষাদ সিন্ধুকে ধরতে চেয়েছেন লেখিকা। 'রোকশোধ' (পৌষ, ১৩৩১) গল্পে অমিয়া নিতাইদার সেবা কবে। তার জীবনের ঋণ শোধ করে। অমিয়া জানত লগ্নভ্রষ্টা নারীকে সমাজ মেনে নেয় না। তাই বিয়ের রাতে নিতাইদা পণের টাকা না দিলে অমিয়ার জীবন একপ্রকার নষ্ট হয়। তাই নিতাইদা'র অসুস্থতার খবরে সমাজ, সংসার, স্বামী তুচ্ছ করে সে এগিয়ে যায়, নিতাইদাকে সুস্থ করে। লেখিকার বর্ণনা গুণে এই সাধারণ গল্পও অসাধারণ হয়ে ওঠে।

মহেশ গঞ্জের ভূধর বাঁড়ুয্যের 'অবস্থান্ত' এর(১৩৩১, মাঘ) কাহিনিকে লেখিকা শব্দের পারিপাট্যে নির্মাণ করেছেন। ভূধর বাঁড়ুয্যের প্রতিপত্তি, খ্যাতি, সম্পত্তি নিলাম দরে কিনে নেয় শ্রীপতি রায়। সব হারিয়ে ভূধর বাঁড়ুজ্যে তখন পথের ভিখারী, একমাত্র সম্বল পুত্র মানিক। একে নিয়ে রাতের অন্ধকারে দিকভ্রষ্ট নাবিকের মতো পথ চলা শুরু হয়। তারপর সময়ের বিরতি। প্রৌঢ় ভূধর বাঁড়ুয্যে তখন শান্ত, ধীর। নদীর ধারে বসে জীবনের প্রহর গোণে। মানিক বড়ো হয়, বাবার সম্পত্তি ফিরিয়ে এনে বাবাকেই স্ব-স্থান দিতে চায়। জীবনসৈনিক ভূধর বাঁড়ুয্যে মাটির পৃথিবীতে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায়। যে আশ্রয় আশ্রয়চ্যুত করে না কখনো। এই গল্পে ভবানী বাঁড়ুয্যের মধ্যে তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' এর বিশ্বম্ভরের সামান্য রেখাপাত আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না, বিলীয়মান প্রভুদের ঔদ্ধত্য, দাপট, অহংকার কালস্রোত কোথায় যে অস্তমিত হয় তার হদিশ আমরা পাই না। শুধু রিক্ত, নিঃস্ব, দীনতার চেহারা যেন ভেসে ওঠে চরহীন কোনো এক নদীর বুকে।

'ব্যথার তৃপ্তি' (চৈত্র, ১৩৩৩) গল্পের একরৈখিক বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে পরিবারের আখ্যানমালা। সুরুচির লক্ষ্মীশ্রী খোকন হওয়ার পর ম্লান হয়ে যায়। ক্ষিতীশের সঙ্গে তার আর সংসার করা হয় না। মৃত্যুর নিস্তব্ধতায় সুরুচি ক্ষিতীশকে সান্ত্বনাবিহীন পৃথিবীতে দাঁড় করায়। খোকনের জীবনে আসে নতুন মা, নীলা। সন্তানহীন জীবনে নীলা খোকনকে বুক পেতে আগলে রাখে। কিন্তু সেও হারিয়ে যায় মৃত্যুর নীলিমায়। খোকনের মৃত্যুর পর শহরের ডাক্তার ক্ষিতীশ গ্রামে প্রাকটিস করার কথা ভাবে। নীলাকে একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে নিজেকে মেলে ধরে ক্ষিতীশ, গল্পের উপস্থাপন নিস্তরঙ্গ। তা সত্ত্বেও নীলার মধ্য দিয়ে মা হয়ে ওঠা কিংবা সন্তানহারার যন্ত্রণার যে আকৃতি লেখিকা নির্মাণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে দুঃসহনীয়।

সন্তানকে জন্ম না দিয়েও সন্তানের মা হয়ে ওঠা, সেই সন্তান হারিয়ে মায়ের হাহাকার, স্নেহ থেকে ছিন্নমূল মায়ের অনিশ্চয়তায় দিনযাপন এবং শেষে অস্থিরতার সংকট কাটিয়ে স্থিতিতে ফেরার আকাঙ্ক্ষায় যেন 'ব্যথার তৃপ্তি' গল্পের মূল উপজীব্য। লেখিকা এখানে সন্তানহারা দম্পতিকে, নতুন আশ্বাসে মোড়া নতুন ভুবন খুঁজে দিতে চেয়েছেন। সম্পৃক্ত করেছেন ইতিবাচকতার চমৎকার অভিব্যক্তি।

'ভুলের মূল্য' (১৩৩৫, শ্রাবণ) যেন দুই বন্ধুর অভিমানাহত মননের ধারাবাহিক সংলাপ। বিনোদ-রঞ্জনের সম্পর্কের মধ্যে অদ্ভুত এক নিশ্চয়তা আছে, আকুতি আছে, আত্মপ্রত্যয় আছে—বিশ্বাসে নয়, ভালোবাসায় তারা একই সুতোয় বাঁধা। সময়ের প্রয়োজনে তাদের দুজনকে আলাদা হতে হয়। পৃথক থাকার মাশুল দুইজনকেই দিতে হয়। রঞ্জনের মৃত্যু তাদের সমগ্রতাবোধের ভিতকে আরো শক্ত করে ধরে রাখে। লেখিকা যে জীবন ও জগৎকে সহমর্মিতার দৃষ্টিতে দেখেছেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় গ্রহণ করেছেন, তাঁর গল্পগুলি যেন তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমাজ-মানুষের মানসিক নিবীর্যতা স্বার্থপরতা পৃথিবীর সব সম্পর্কের গায়ে কালিমার দাগ লাগিয়ে দিতে চায়। ভাই-বোনের সম্পর্কও এর থেকে বের হতে পারে না। সংকীর্ণ স্বার্থ মানুষকে সংকীর্ণ করে, চিন্তাকে ক্ষুদ্র করে। আরোপিত মিথ্যাচার, বিশ্বাসহীনতা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে থাকে। বিবেচনার শান্তিও নষ্ট হয়। ডাক্তার ও সুচিত্রিতার সম্পর্কের মতো পৃথিবীর যাবতীয় সম্পর্ককে ঘিরে নানা কৌতূহল, জিজ্ঞাসার মীমাংসা খুঁজে দিতেই যেন লেখিকা গল্পটি লিখেছেন। এখানেও তিনি আপসহীন, নির্ভীক।

(৪)

১৩৩০ বঙ্গাব্দের কল্লোল পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পকার কেতকী দেবীর 'রিক্তা' গল্পে এক নারীর রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের মর্মবিদারী হাহাকারের মতো উঠে আসা এক দীর্ঘ উচ্চারণ। পুরাণ থেকেই নারীর চূড়ান্ত অবমাননা, নির্লজ্জ দীনতা, সংকোচ পিতৃতান্ত্রিক আবহে নির্মিত হয়েছে। 'রিক্তা' গল্পের নারীটি ফাঁপা অস্তিত্বের প্রতিভূ। যে নারী আত্মীয়-পরিজন-গৃহ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র পুরুষকে জাপটে ভালোবেসে নিজের জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, পুরুষকে সুখী করতে (সমাজকে সুখী করাও তার দায়) অভিসারিকার বেশে কত না অঙ্গীকার করে সে ধরা দেয় প্রিয়জনের কাছে। কপালে উজ্জ্বল সিদুঁর প্রমাণ করে সুখে থাকার জাঁকজমককে। দীর্ঘদিন ধরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে নারীর ভালো থাকার জ্যামিতিক ছক তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু জীবন তো নিখুঁত জ্যামিতিক বিন্যাস নয়। তাই একদিন ঝরে যাওয়া মুকুলের মতো নারীত্ব ঝরে যায়, সম্পর্কের দীনতা প্রকট হয় আর সেই নারী মনে মনে ভাবে, 'অন্তর্যামী দেবতা, যে অভিশাপ ওরা যেচে নিচ্ছে তা যেন বিফল হয়। ওরা যেন আমার মত দুঃখিনী না হয় প্রভু। হতভাগিনী দুঃখিনীর অশ্রুমালা এভাবেই নিবেদিত হয় যুগে-যুগান্তরে।

গল্পকার লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নারীর মন' (শ্রাবণসংখ্যা ১৩৩০) গল্পেও প্রকাশিত হয়েছে নারীকে পণ্য করে সামাজিক অসংগতির চিত্র। পুরুষ চিরকাল নারীকে ব্যবহার করেছে ভোগের পুতুল রূপে। সমাজের অন্দরমহলে নারীর যে নিশ্চেতন পুতুল কাঠামো তৈরি হয়ে এসেছে তাকে ভর করে পুরুষ স্বপ্ন দেখে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার। একজন প্রেমাকাঙ্ক্ষী নারী যে ভালোবাসার নিগড়ে জীবনের শেষ সুধা দিতেও প্রস্তুত পুরুষতন্ত্রের চতুর অঙ্কপাতের

কাছে সে পরাস্ত হয়। অপমানে, অভিমানে নীল হয়ে যাওয়া সম্পর্কের পরিসীমায় দাঁড়িয়ে সে উপলব্ধি করে, 'হায় নারীর মন! এখনো তুমি তাকে ভালবাস।" লেখিকার আরেকটি গল্প 'চাওয়া' (কল্লোল, ১৩৩১, বৈশাখ) আবহমান কাল ধরে নিত্য চাওয়ার গল্প। শক্তির একটি মনোরম সংসার ছিল। স্বামী বিনয়কে নিয়ে সুখ ছিল তার, হয়তো স্বপ্নও। এই সব কিছুর মধ্যে বিনয়ের বন্ধু অতুলের উপস্থিতি যেন স্বপ্ন- সাধ- সংকল্পগুলোকে নিশ্চল করে দেয়। অতুলকে ঘিরে শক্তির মানসিক বিন্যাসের অক্ষরেখা টালমাটাল হয়ে যায়। অতুলের অসুস্থতা কিংবা বিনয়ের দীর্ঘ অনুপস্থিতি তাকে দেউলিয়া করে দিয়েছে। অতুলের সঙ্গে কথালাপের মুহূর্ত, মুগ্ধতার, মোহসঞ্চারের দিনগুলো শক্তির কাছে দামী হয়ে ওঠে, জীবনভর দাম চোকাতে গিয়ে শক্তি কখন যে প্রতারিত হয় তা ভাবতে পারে না। ত্রিকোণ সম্পর্কের পরিণতি পাথর হয়ে যাওয়া মনের জমিতে ফাটল তৈরি করে, "অতুল হয়ত আজ জয়ী। তাহার ভুলের সংকোচন করিতে পারিয়াছে। কিন্তু সে যে পারে না; শুধু পারে না নয়, চায় না যুগে যুগে ক্ষতবিক্ষত হৃদয় তাহার অবসন্ন, ক্লান্ত চোখদুটি বুঝি চিরদিনের জন্য ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তবু সে চাহিয়া আছে—এ চাওয়ার বুঝি শেষ নাই—সীমা নাই"।

নীলিমা বসুর 'ডায়েরীর একপাতা' (ভাদ্র, ১৩৩০) গল্পের মেয়েটি জানল না বিয়ের পর স্বামীর ঘর ছেড়ে দিনের পর দিন কেন বাপের ঘরে থাকতে হয়। বিয়ের সময় দেনা-পাওনা নিয়ে বাদানুবাদ যে সদ্য বিবাহিতা মেয়েটির সংসার করার রঙিন স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে সেই লাঞ্ছনার ছবি এখানে প্রকাশিত। 'দেনাপাওনা'র নিরুপমা যেন প্রতিবিম্বিত হয়। শুধু তাই নয়, বহুবিবাহপ্রথার একটা নগ্নদিকও লেখিকা সযত্নে এঁকেছেন। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে মনের ভিতরে সব কিছু ভঙ্গুর হতে হতে নিষ্ফল বেদনা তার মাথাকুটে মরে। অপমানের পঙ্ককুণ্ডে হারিয়ে যায় স্বামীর প্রতি প্রেম, মাথাকুড়ে মরে প্রশ্রয়, আশ্বাস ও শ্রদ্ধা। 'অভিমান' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩১) গল্পে রয়েছে দুই নর-নারীর অভিমানাহত হৃদয়ের প্রকাশ। অটল ভালোবাসায় সুধার স্বপ্নময় বেঁচে থাকার দিন-রাতের সঙ্গী ছিল স্বামী বিমল। বিদেশি বণিকতন্ত্রের এগজিবিশনে যাওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে জন্মেছিল অভিমানের পাহাড়। তারপর একদিন বর্ষণমুখর আবহে বিমলের ভালোবাসার পেয়ালাটি যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে, তখন সুধার সমস্ত সুখের উপকরণে নতুন করে গড়ে ওঠে ভালোবাসার তাজমহল। তাদের এই মিলনকে রূপ দিতে লেখিকা লেখেন, "আকাশের অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে, ঘরের কোণে দুইটি প্রচণ্ড অভিমানীর, এ কয়দিনের অন্তরের জমাট ভাব যেন মুহূর্তেই কাটিয়া গেল"।— বিশ্বাসহীনতার দিনে এই প্রাপ্তিও তখন দুষ্প্রাপনীয় হয়ে ওঠে।

'বরুণা' (১৩৩১, জ্যৈষ্ঠ) গল্পের বরুণা তিতিক্ষা, মানবিকতা, করুণার প্রতিমূর্তি। অনাহারে ক্লিষ্ট মতি ভিখারীর জন্য বরুণার দয়ার্দ্র হৃদয়ের ছবি নিষ্ঠুর সময়ের কাছে বিপরীত। মতি ভিখারীকে ভিক্ষা না দিতে পেরে উপোসী বরুণার মানবিক মূল্যবোধের

স্বীকৃতি প্রদানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেন গল্পের প্রাণশক্তি। 'বুড়ো ঝি' (১৩৩১, আশ্বিন) গল্পের মণিও বরুণার মতো দয়াশীলা। মণির সঙ্গে বুড়োঝির কথালাপে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের, ঔদ্ধত্য, দাপট, হিংস্রতার রূপ স্পষ্ট হয়। সমাজের উঁচুতলা থেকে নীচতলা-সর্বত্র নারীরা অপমানের শিকার। মন দিয়ে সংসার করা, সন্তান প্রসব করা, স্বামীর সেবা করা—এই ধারার মধ্যে একটিতে খুঁত পেলেই পুরুষসমাজ রে রে করে ওঠে। তখন সেই গৃহিণীর কপালে জোটে অবমাননা, গৃহত্যাগের নিদান। সহানুভূতিশীল পুরুষজাতি আবারও লক্ষ্মীমন্ত বউ ঘরে নিয়ে আসে।

'ঝরা ফুল' গল্পে বন্ধুত্বের নিটোল সম্পর্কের কথা বর্ণিত হয়েছে। মেকি পৃথিবীতে এ সম্পর্ক আজ দুর্লভ। প্রভা তার খাঁটি মনের দাবি নিয়ে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদে পা দিয়েও মানুষের প্রতি বিশ্বাসকে অটুট রাখে।

নীলিমা বসু পাঠককে শুধু নিটোল গল্পের স্বাদ দিতে চাননি। বরং তাঁর আখ্যান বিশেষ সময়ের, বিশেষ করে নারীর প্রকৃত অস্তিত্বের চিহ্ন রূপে প্রতিভাত হয়েছিল।

(৫)

সুরমা দেবীর গল্পে গভীর মননের ছাপ সুস্পষ্ট, সুস্পষ্ট অসহযোগ আন্দোলনের দিকটি। জীবনের মেঘ-রৌদ্রের খেলায় যেটুকু আলোর রেশ আছে, ছায়ার অংশ তারও অনেক বেশি। 'আলো-ছায়া' (১৩৩৩, আশ্বিন) গল্পে এই সত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। স্বদেশী করা যুবক শঙ্করকে ভালোবেসে সুফলা আজীবন কাটিয়ে দিতে পারে। সেখানে তুচ্ছ হয় পরিবারিক ভালো লাগা-মন্দ লাগা। সুফলার উপযুক্ত নানা পাত্র বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু সুফলার ভালোবাসার কাছে নতিস্বীকার করে তাদের ফিরে যেতে হয়। ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরে সুফলা বারবার সমে ফিরতে চায়। ব্যর্থ হয় সে। জগতের নিয়মকে ফাঁকি দিয়ে শঙ্কর চিরবিদায় নেয়। অধরা থেকে যায় মিলনের প্রতীক্ষা। গল্পকার কখনও আলোর, ছায়ায় তাদের বন্ধুর-মসৃণ জীবনপথের প্রগাঢ় উপস্থিতিকে গভীরতর দ্যোতনায় এগিয়ে নিয়ে যান। 'মরুকুঞ্জ' (১৩৩৪, শ্রাবণ) গল্পেও বয়স্ক পণ্ডিত মহাশয়ের কাহিনিসূত্রে রয়েছে প্রেম-অপ্রেমের গাথা। এখানে লেখিকা বিধবা কিশোরীর স্বপ্নভঙ্গের জাল বুনেছেন। রঙিন স্বপ্ন দেখার শুরুতে ম্লান হয়ে যাওয়া বিবর্ণ ছবিটি তখনই তীব্র হয়ে ওঠে যখন সদ্য বিবাহিত-যুবক যুবতীর পাশে এক থানপরা নিরাভরণা কিশোরীর ম্লানচোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। সদ্য বিবাহের পর পণ্ডিত মহাশয়ের শ্বশুর বাড়ি গমন, বিধবা গোলাপের সঙ্গে তার সখ্য যেমন তাঁর স্ত্রী কমলা মেনে নিতে পারলো না, তেমনি মানতে পারল না সমাজ। রাতারাতি গোলাপের জীবনে লক্ষ্মণরেখা কেটে দিল সমাজ। মিথ্যা কলঙ্কের শাস্তি মাথায় করে তার স্থান নির্দিষ্ট হল কাশীতে। অলক্ষ্যে পণ্ডিতমহাশয়ও সেই শাস্তি বহন করে চলেছেন। "জীবন প্রভাতে একদিন যে দুটি মন এক অপূর্ব সম্বন্ধে বাঁধা পড়েছিল, বিপরীত

গতিতে সে দুটি মনের কাছে সে বন্ধন-স্মৃতি আজও অম্লান।”

একজন বালবিধবার করুণ পরিণতি, জীবন-অধ্যয়নের গভীরতা ও ব্যাপকতার অজস্র প্রমাণ পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে গল্পে। প্রিয়জন, প্রেম, গৃহের আকর্ষণ সকলেরই আছে। তাই সমস্ত দিনের পরে ‘সব পাখি ঘরে ফেরে’— হয়তো বা ‘নীড়ের মায়া’ গল্পে অজয়ও ফিরতে চেয়েছিল সুখী গৃহকোণে। দাদার সংসারের অভাব, ভবঘুরে জীবন তাকে বাস্তবতার আড়াল নিতে বাধ্য করেছিল। ধরা পড়ার ভয়ে সে বেছে নিয়েছিল সিঙ্গাপুরের গল্প—চারটে ফার্ম, অগাধ টাকার। তাই যেদিন তাকে বৌদি মাধবীর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, সেদিনও সে আরও একবার মিথ্যার জগতকে আশ্রয় করে পালাতে বাধ্য হয়। অভাব, অপ্রতুলতা অপ্রাপ্তির নামান্তর হয়ে ওঠে। অনিচ্ছুক হয়েও দমবন্ধ জীবন থেকে সে পালিয়ে বাঁচতে চায়।

আর সংসারী মানুষ সুখের প্রার্থনায় অনিচ্ছুক হয়েও মেকি-সুখদেই বরণ করে নেয়, শুরু হয় সুখ নিয়ে হিসেব কষার মিথ্যা খেলা।

অহল্যা গুপ্তের ‘গৌরী’ (আশ্বিন, ১৩৩০) গল্পটি নিটোল প্রেমের কাহিনি, গৌরী ও দেবীপ্রসাদের প্রেম-বিরহ-মিলনের নিতান্ত সহজপাঠ। লেখিকার সার্থকতা এখানেই যে, তিনি সহজ ভাষায়, সাবলীলতায় সম্পর্কের সংবেদনশীলতাকে জুড়ে দিয়েছেন। আপাত সাধারণ বিষয়ের মধ্যেও গল্পটি উত্তীর্ণ হয়েছে ভালোবাসার ঐশ্বর্যের বর্ণিল উচ্চতায়।

রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণদের তৈরি করা নিয়মের যূপকাষ্ঠে বলি হত হিন্দু বিধবারা। নিয়মের নামে তাদের জীবন অতিবাহিত হত কৃচ্ছ্রসাধনের অসারতার মধ্যে। সধবাদের কর্ম কোলাহল মুখর জগৎ থেকে এরা নির্বাসিত শুভ অনুষ্ঠানের মাঙ্গলিক আচার কিংবা নিজের। জীবন নিয়ে স্বপ্ন দেখা থেকে এরা বঞ্চিত। সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে এদের বঞ্চনা, বেদনা, হাহাকার, সুখ-দুঃখ, অপিরিসীম অসহায়তার হিসেব কেউ রাখে না। অহল্যা গুপ্তের ‘বিধবা’ (আষাঢ়, ১৩৩১/শ্রাবণ, ১৩৩১) গল্প সেই কালবেলার কাহিনি। সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বিধবা মাধবীকে অজিতের বিবাহ-ইচ্ছা, ইচ্ছার পরিণতি সাধন, জীবন দিয়ে অজিতের মায়ের বিধবা মাধবীর পক্ষে আপসহীন লড়াই,—এমনি নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে অহল্যা গুপ্ত সেই কালটিকে নিখুঁতভাব উপস্থাপন করেন। দুই পর্বে প্রকাশিত গল্পটি যেন চিরাগত অচলায়তনকে ভেঙে দিতেই ইতিহাসকে, নিরবছিন্ন সংগ্রামকে ধারণ করে আছে। নারীমুক্তির এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ‘কল্যাণী’ (পৌষ, ১৩৩০) গল্পের মধ্য দিয়ে লেখিকা মানবিক অস্তিত্বের ভিতটাকে টলিয়ে দিয়েছেন। কলাণী ও জেলেনী বৃদ্ধার কথোপকথনে উঠে আসে সময় ও সমাজের বিপুল ভাঙন, বিকার মানতে পুরুষের কাপুরুষতার কাছে, লোভের কাছে গ্রস্তনারী নগ্ন হয় বারবার বহুধানিষ্পেষিত নারী মূল্যবোধের ধ্বস্ত কাঠামোকে ভাঙতে চায়। তাই কল্যাণী সমাজকে শোনাতে চায়, ‘যে তার স্ত্রীর ধর্ম রক্ষা করতে পারে না, যে মোহে পড়ে মনুষ্যত্বকে হারায়, আমার ধর্মরক্ষার জন্য আমি তাকেও হারাতে প্রস্তুত আছি।’’—

সমাজ নানা অছিলায় নারীকে স্বেচ্ছাবন্দী করতে চায়। অবক্ষয়ী সমাজের কদর্যতায়, সন্ন্যাসীদের লোভলালসার অবাধ, অগাধ আয়োজনে। আমরা শিউরে উঠি। প্রতিদিনের চেনা-জানা বাস্তবে দলিতমথিত নারী-অন্তর্বিস্ফোরণে বিদীর্ণ করতে চায় পুরুষের ভোগবাদের পৃথিবীকে। যেভাবে শ্লেষ- কারুণ্য, বিষাদ- তিক্ততা, যন্ত্রণা-গ্লানি, আত্মসংকোচ-বিদ্রোহকে একই অবস্থান থেকে দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁর কৃৎকুশলতার শক্তি সমাজের রিক্ততার ছবিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়। মানুষকে চিনতে সাহায্য করে।

সান্তনা বসাকের 'তৃষিত' (কল্লোল, ১৩৩০, পৌষ) ভাঙা জীবনের অভিজ্ঞান। চিন্ময়ের বিদেশ যাত্রার অভিপ্রায়ে নিজের সত্তাকেও বিকিয়ে দেয়। তার কাছে আবেগ, অনুভূতি, প্রীতি, অভিমান, সম্মান, প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, মূল্যহীন নাগরিক লোভ তার শিরদাঁড়া ভেঙে দেয়। কিন্তু ভিতরের আস্ত মানুষটা অস্তি-অনস্তির দোলায় দুলতে থাকে। রাতের নগ্ন নির্জনতার একসময় মৃত্যুর মোক্ষণেই জীবনের শান্তি খুঁজে পায়। একজন মানুষের কাছে তখন মৃত্যু হয়ে ওঠে আত্মসম্মান রক্ষার শেষ অস্ত্র। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সমস্তবিশ্বে যে ক্ষয়িষ্ণু চেতনা বিরাজ করছিল তারই জরুরি বার্তা যেন দিতে চেয়েছেন লেখিকা। 'ভাইফোঁটা'(১৩৩১, কার্তিক) গল্পের সরিত যেন গুমোট আকাশে বিদ্যুৎলেখা, বিদ্রোহের মূর্তপ্রতীক। নারী সম্পর্কে পিতৃতন্ত্রের দেওয়া সংজ্ঞার বাইরে তার অবস্থান—নম্রতা, শীলতার ঊর্ধ্বে তার স্থান। সরিতকে বিয়ের জন্য দেখতে আসে সতীন্দ্র। সরিতের কথাবার্তা, চালচলন সতীন্দ্রের পছন্দ হলেও সরিত এক্ষেত্রে একরোখা—বিয়েতে রাজি হল না, কিন্তু সতীন্দ্রকে সে বরণ করে নিল তার দাদা রূপে। সতীন্দ্রের চোখে "গোধূলির স্নিগ্ধ আলোকে তাকে কল্যাণময়ী ভগিনী মূর্তিতে বড় মনোরম বড় পবিত্র দেখাইল।" সময়ের ক্যানভাসে লেখিকা সমাজের নানা সমস্যা—নারী অবমাননা, পণপ্রথা, নারী শিক্ষারে বিরোধী-মতের, অত্যাচার, মৃত্যু চিত্রিত করলেন গল্পের শেষে—দ্রোহাত্মক গল্পকারের মুন্সিয়ানায় জড়িয়ে গেছে এক অদ্ভুত লাবণ্য। বাচনভঙ্গীর এই অনায়াস সারল্য গল্পকে অন্যমাত্রা দান করে। গল্প পড়তে পড়তে পাঠকের ভাবনার গতিপথ যেন মুহূর্তেই পথ পাল্টে ফেলে।

প্রেম-ভালোবাসা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। নারী বিদ্বেষী পুরুষের পক্ষে তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সম্ভবও হয়নি অনিন্দিতা দেবীর 'স্বপ্ন-ব্যথা' (কার্তিক, ১৩৩৪) গল্পের নায়ক কথকের। উত্তম পুরুষের ঢঙে তিনি বলে গেছেন পাওয়া-না পাওয়ার কাহিনি। বন্ধু সুরেশের বাড়িতে তার বোন নমিতার সঙ্গে আলাপ, প্রথম দেখাতেই ভালোলাগা, ভালোলাগার গভীরতা প্রাপ্তি, স্বপ্নের মায়াজালে বিস্তারের পথ চেয়ে স্বদেশি নারীবিদ্বেষী কথকের যাপিত মুহূর্তেরা বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও নমিতার পক্ষ থেকে মুগ্ধতার মুখর আলাপনের ইঙ্গিত ছিল না। এই ইঙ্গিত ক্রমশ বাস্তবায়িত হয় যখন কথক পড়ে নেন তার খুড়তুতো বোন প্রতিমাকে লেখা নমিতার চিঠি। পুরুষের চোখে নারীরা নয়, নারীদের চোখে পুরুষের পৌরুষত্বের ঠুনকো বড়াই স্খলিত হয়ে যায়, পুরুষ পরিহাসের পাত্র হয়ে

ওঠে। গল্পে কথকের অনুভূতি ও নমিতার শ্লেষাত্মক বাচনের সংমিশ্রণে নারীর স্বতন্ত্র অবস্থান চিহ্নিত হয়ে যায়। গল্পে বইতে থাকে মূলস্রোতের চলতি পথের বিপরীত হাওয়া। 'স্বীকার' (মাঘ, ১৩৩৪) গল্পে রয়েছে এক স্ত্রীর স্বীকারোক্তি। মৃত্যুর আগে লেখা চিঠিতে সুনীতির আত্ম-উন্মোচন পাঠকসমাজ লক্ষ্য করেন। ছোটবেলার সঙ্গী অরুণকে হৃদয় দিয়ে পরবর্তীতে বিবাহিত হয়েও তার ভালোবাসাকে নিঃশব্দে ধারণ করার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই। কারণ সুনীতি চাইলেও নিত্যকার অভ্যাস ও স্মৃতি থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারেনি। সে সযত্নে স্ত্রীর কর্তব্য, মায়ের দায়িত্ব পালন করেছে। সমান্তরালে অরুণকে ভালোবাসার স্বপ্ন-সাধকে ভগবানতুল্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একদিকে সংসারে তৃপ্তির বন্ধন, অন্য দিয়ে ভালোবাসার অচ্ছেদ্য অঙ্গীকারে আবদ্ধ নমিতা। কিন্তু একদিন, মৃত্যুর সীমায় দাঁড়িয়ে স্বামীর মুখোমুখি হতে চায়, তার চিঠি, অরুণের চিঠি, তাদের একান্ত কথাগুলো বলতে চায়। বেঁচে থেকে যা পারেনি, চিঠির মধ্যে দিয়ে তার এতদিনের দুঃসহভার কিছুটা লাঘব হয়। এখানেও গল্পকার বিশ্বস্ততার সঙ্গে জীবনবোধের ভিন্নতর মাত্রাকে সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করেন।

উমা দেবীর 'চিঠি' (আশ্বিন, ১৩৩৪) গল্পেও প্রেম-অপ্রেমের বিন্যাস-প্রতিবিন্যাসকে সমতলের উপর টানা একরেখায় স্থাপন করার মুনসিয়ানা লক্ষ্য করা গেছে। অমিয়া চৌধুরীর 'বর্ণ-সমস্যা'য় ফুটে উঠেছে—মানবিক সম্পর্কগুলো কখনও সাদা-কালোয় বিভাজিত হতে পারে না। স্ত্রীর কালো রঙ বলে স্বামীর হীনমন্যতা এবং পরে বর্ণ বৈষম্যের অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ থেকে বেরিয়ে এসে বৈবাহিক বন্ধনকে স্বীকার করে ভালোবাসার রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠা— যেন সমাজের ভিতরের এক নিভৃত অন্ধকারকেই চকিতে প্রকাশ করে।

(৬)

সুরুচিবালা রায়ের গল্প কেবলমাত্র সময়ের প্রতিচ্ছবি না হয়ে সময়ের চাপে পিষ্ট নারীর প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। 'আত্মদান' (কার্তিক, ১৩৩০) গল্পের যমুনা সমাজের বিবরে দাঁড়িয়ে তার পাঁকটুকু চিনে ফেলেছে। তাই শৈলেনদের মতো পুরুষদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে এদের সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যমুনার সময় লাগে। যমুনা ভাবে, পুরুষদের চোখে নারীর দেহই সব, 'খালি রূপ' ই তাদের উপজীব্য। যমুনা দেখল দুজনের সংকট তাদের একসূত্রে গেঁথেছে। তাদের কাছে সমাজের পচন তখন তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই এ গল্পটিও এক হিসাবে জীবন-উপলব্ধির গল্প হয়ে ওঠে। আবার ইন্দুলেখা দেবীর 'ছবি' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০) জীবনকে বোঝাতে চেয়েছিল 'অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়', প্রাণের গভীর ভালোবাসাই তার প্রার্থিত সুখ। অর্থের প্রাচুর্য তার সুখকে শুকিয়ে দিতে থাকে। গল্পের শেষে পাঠক নিয়তি নির্দিষ্ট বেদনাদায়ক স্থির পরিণতির মুখোমুখি হয়। প্রাণের ছবি মুছে দেয় বাস্তবের নিস্পন্দ ছবি। এ গল্পটিও সংহত ভাবে, ভাষায় সমৃদ্ধ। সীতা দেবীর 'মনস্কামনেশ্বর' (মাঘ, ১৩৩০) এর অপর্ণার তীর্থযাত্রায় বহুদিনের লালিত স্বপ্ন

ভেঙে যাওয়ার ধাক্কাটা খুবই কষ্টদায়ক। বিয়ের রাতে প্রথমে তার পুরুষকে দেখার পর কত দিন গেছে, যুগের পর যুগ কেটেছে অপর্ণা আর তাকে দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ পায়নি। তীর্থ যাত্রায় এসে, মনস্কামনেশ্বরে পুজো দিতে এসে হারানো বাস্তবতা কঠিন হয়ে ওঠে। গল্পটি তো শুধু বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা দীর্ণ কাহিনি নয়, গল্পটিতে ঘটে যায় অনেক ঘটনা। পাণ্ডাদের লোভ, মানুষের অন্ধসংস্কারকে দুর্বলতা ভেবে অর্থ উপার্জনের মতো ঘৃণ্য পেশার নগ্ন চেহারা বিরাটাকারে ধরা দেয় গল্পদেহে। এই অসহায়তাকেও লেখিকা স্পষ্ট করে দেন নিজস্ব সাবলীলতায়।

সুষমা মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতীক্ষা'য় (শ্রাবণ, ১৩৩১) গল্পের শিবু চেয়েছিল, ছেলে রঘুনাথ বিদ্বান হোক। তাই অনেক কষ্টে সে রঘুনাথকে কলকাতায় পাঠায়। শিবু চিঠির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। রঘুনাথের মৃত্যুসংবাদ আসে। তবু তার অপেক্ষার শেষ হয় না। সন্তানহারা পিতার হাহাকার তার বুক থেকে সবটুকু বাতাস কেড়ে নেয়। জীবনমায়ার হাসি-খেলার তার ছিঁড়ে যায়। এ গল্পে লেখিকা সার্থকভাবে পিতৃহৃদয়ের আর্তনাদকে রূপ দিতে পেরেছেন।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'সমাজ-দ্রোহী' গল্পটি প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৩৩ সংখ্যায়। একটি প্রেমের করুণ পরিণতির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এই গল্পে। পিতৃহীন রেণু বড় অস্থির দুরন্ত প্রকৃতির মেয়ে। গাছে ঢিল ছোঁড়ে, পুকুরে সাঁতার কেটে জল তোলপাড় করে। ফলে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা এই দুরন্ত মেয়েটিকে একেবারেই পছন্দ করতো না। কলকাতায় লেখাপড়া করে মহিম। গ্রামে এসে রেণুর সঙ্গে তার আলাপ হয়। রেণুকে সে ভালোবেসে ফেলে। রেণুর মা তার বিয়ের অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। গ্রামের লোকেরা সবাই তার বিয়ে ভাঙিয়ে দেয়। রেণুর মা মহিমের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিলে মহিম তা গ্রহণ করতে পারে না। কলকাতায় গিয়ে মহিম জানতে পারে রেণুর বিবাহ হয়ে গেছে। এরপর থেকে মহিমের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়। সে বিয়ে না করে রেণুর কথা ভেবেই বাকি জীবন কাটাতে থাকে। বহুকাল কেটে যাবার পর বৃদ্ধ অবস্থায় মহিমের সঙ্গে রেণুর আবার দেখা হয়। দুজনেই দুজনকে ভুলতে পারেনি। বিবাহের পাঁচ বছর পরে রেণুর একটি মেয়ে হবার পরেই স্বামী মারা যায়। রেণু ও মহিম দুজনের জীবনেই নিদারুণ প্রায়শ্চিত্ত চলতে থাকে, প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত। বৃদ্ধ বয়সে এই দেখাই ছিল শেষ দেখা। দেখা হবার দশ এগার দিন পর রেণু মারা যায়। সমাজকে স্বীকার করতে গিয়ে, সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি হয় প্রেম। এরকম কত প্রেমের বলি যে হয়ে যাচ্ছে সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন লেখিকা।

মাঘ ১৩৩২ এ প্রকাশিত 'আশ্রয়' গল্পে গ্রামীণ সমাজের জাতপাতদীর্ণ এক চেহারা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু জাতপাতের ঊর্ধ্বেও থাকে মানবিক সম্পর্ক। এখানে সেই চিত্রই অঙ্কিত করেন লেখিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। রামহরি মণ্ডলের মেয়ে চন্দ্র বিধবা হয়ে পিতার কাছে ফিরে আসে। রামহরির স্ত্রী ইতিমধ্যে মারা গেছে। কন্যাকে নিয়ে চাষবাস করে

রামহরির দিন কাটে। এদের সঙ্গে যুক্ত হয় হরে চাঁড়ালের পুত্র পেমা। ছোটবেলা থেকেই মাতৃহীন এই বালকটি বিমাতার কাছে লাথি ঝাঁটা খেয়ে মানুষ হতে থাকে। বিমাতার তাড়নায় সে প্রায়শই আশ্রয় নেয় চন্দ্রাদের বাড়িতে। কিন্তু গ্রামে ফিসফাস বাড়তে থাকে। পেমা চণ্ডাল। তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, আশ্রয় দেওয়া বা খেতে দেওয়া গ্রামীণ সমাজে প্রায় অপরাধের সামিল। রামহরি এসবের কিছুকেই পাত্তা দিত না। তাই তাকে সমাজে একঘরে করে দেওয়া হয়। এই অপরাধে পেমার বিমাতা তাকে বাড়ি থেকে বহিষ্কার করে। রামহরি তাকে আশ্রয় দেয়। ফলে তার অপরাধ আরও বেড়ে যায়। এইভাবে দিন যেতে থাকে। রামহরি একদিন অসুস্থ হয়। টাকার অভাবে চন্দ্রা তার কাকা কিশোরের কাছে যায় এবং জমি বন্ধক দিয়ে কুড়ি টাকা সংগ্রহ করে। এত করেও রামহরিকে বাঁচানো যায় না। রামহরির মৃত্যুর পর কিশোর দাবি করে চন্দ্রা কুড়ি টাকার বিনিময়ে আট বিঘে জমি তাকে বিক্রি করেছে। এর স্বপক্ষে সে সকলকে কাগজ দেখায়। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে পেমা। সে চিৎকার চেঁচামেচি করে। এই দুই দিন পর হঠাৎ চন্দ্রাদের ধানের গোলায় এবং ঘরে আগুন লাগে। সমস্ত গ্রাম দেখে কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করে না। সমস্ত রাত ধরে জ্বলতে জ্বলতে সমস্ত কিছু পুড়ে যায়। আশ্রয়হীন চন্দ্রা হাহাকার করতে থাকে। তখন পেমা তাকে বলে, "কাঁদছিস কেন চন্দ্রা, আমি তোর বড়দাদা, আমি এখনও বেঁচে রয়েছি যে তুই বলছিস তোর সব গেছে, সব তো যায়নি বোন। চলদিদি, আমরা দুই ভাই বোনে কলে যাব, তুই ঘরে থাকবি, আমি কলে কাজ করে টাকা আনব। তোর বাবা শুধু তোরই বাবা ছিল না রে, সে আমারও বাবা ছিল। আমায় চিনেছিল বলে তোকে আমার হাতে দিয়ে গেছে। চন্দ্রা দিদি, আজ ভাল করে আমার পানে চেয়ে দেখ আমি তোর দাদা। মনে কর আজ আমি চাঁড়াল নই।" জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে মানবিক সম্পর্কের জয়গান ঘোষিত হয়েছে এই গল্পে। ভাই বোনের চিরন্তন সম্পর্কের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জাতপাতের বেড়া।

'শেষের দিক' গল্পটি প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৩২ সংখ্যায়। বিথানের সঙ্গে বিবাহ হয় রবীন্দ্রর। ফুলশয্যার দিন বিথানের সঙ্গে রবীন্দ্র ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলে বিথান বিরক্তি বোধ করে। এতে অভিমানে আহত হয় রবীন্দ্র। বিবাহ পরবর্তী জীবনে এই অভিমানে রবীন্দ্র বিথান থেকে ক্রমশ দূরে চলে যায়। শ্বশুরের টাকায় রবীন্দ্র বিলেত যায়। বিথানের জেদ করে তার বাবাকে প্রতি মাসে টাকা পাঠানো বন্ধ করতে বাধ্য করে। এতে রবীন্দ্র আরও আহত হয়। বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আসে রবীন্দ্র কিন্তু বিথানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কোনো উন্নতি হয় না। এদিকে বিথানের জেদ এবং অভিমান ক্রমশ কমতে থাকে। সে ফুলশয্যায় ফিরিয়ে দেওয়া আদর পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। অবশেষে যখন সমস্ত অভিমান ত্যাগ করে বিথান স্বামীর কাছে ফিরে যায় তখন রবীন্দ্র বসন্ত রোগে

আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। বিথানের জন্য থাকে শুধু হাহাকার, মিলনের অতৃপ্তি। অভাগিনীর মত কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, "ওগো দয়িত আমার, প্রিয় আমার, একবার এসো গো এসো। আমি সাধ মিটিয়ে একবার কথা বলব, আমার আশা পূর্ণ কর। ঈপ্সিত গো, আজ আমি ফিরেছি তুমি কোথায় গেলে?" অভিমান এবং জেদ কীভাবে বিবাহিত জীবনকে ক্রমশ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় এই গল্পে পাওয়া যায় তার নির্মম চিত্র।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'অপরাধিনী' গল্পের কাহিনি গতানুগতিক। এই বিষয় নিয়ে একাধিক গল্পের সন্ধান আমরা পাই। মণীষা অল্পবয়সেই বিধবা হয়। বিধবা হওয়ার জন্য তার উপর বিভিন্ন সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। এই সময় বড়লোকের সন্তান আদরের দুলাল নীরেন এর চোখ পড়ে মণীষার উপর। মণীষাকে বাড়ি থেকে বের করে ভোগ করে বেপাত্তা হয়ে যায়। নিরুপায় মণীষা অধঃপতিত জীবন যাপনে বাধ্য হয়। বেশ্যাবৃত্তি করতে থাকে। একদিন গঙ্গাস্নানে যাবার সময় এক বালক সন্ন্যাসীর কথায় সে তার জীবনধারা বদলে ফেলে। দীক্ষা নিয়ে সৎ জীবন যাপন করতে থাকে। কিন্তু গুরুর কামার্ত দৃষ্টি তার উপর পড়ে। গুরু তার কামক্ষুধা নিবৃত্ত করতে চায় এবং মণীষার উপর বলপ্রয়োগ করে। মণীষা দায়ের কোপে গুরুকে হত্যা করে। জজসাহেবের বিচারে মণীষার ফাঁসির সাজা হয়। ফাঁসির আগের দিন জজসাহেব ও মণীষার একান্ত সাক্ষাৎকারে জানা যায় বিচারক হচ্ছে নীরেন যে মণীষাকে বাড়ি থেকে এনে অসৎ পথে আসতে বাধ্য করেছিল। সেই নীরেন আজ সাধু, সৎ, ভদ্র, উপরে বসে পতিতার বিচার করে। কিন্তু তার পাপের কোনো বিচার হয় না। সমাজের ক্লেদাক্ত দিকের কথা তুলে ধরা হয়েছে এখানে।

কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আরও অনেক নারীগল্পকার আছেন যাঁরা মেধাবী অক্ষর দিয়ে বাংলা গল্পসম্ভারকে প্রতিভার অর্ঘ্য নিদেন করেছিলেন। গল্পের শব্দে এঁরা স্পষ্টবাক, সপ্রতিভ ও ঝক্‌ঝকে ভাবনার স্রষ্টা। তাদের গল্পের বৈচিত্র্যের আরেক দিক জীবন-অভিজ্ঞতা-জাত প্রজ্ঞা—স্বভাবতই যা তাঁদের গল্পের সম্পদ হয়ে উঠেছে। গল্পের সংখ্যা কম হলেও তাদের গল্পে ভাষার প্রতি, বিষয়ের প্রতি সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি সততা, নিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে থাকে নারী হৃদয়ের জমাট অভিমানের চিত্রটি অস্পষ্ট থাকে না। মিনতি দেবী, শান্তা দেবী, রাধারানী দত্ত, অদিতি দেবী প্রমুখ মূল্যবোধের ব্যাপক ভাঙনের মুখোমুখি হয়েও জীবনের বৃহত্তর পটভূমি থেকে নতুন সন্দর্ভের সমিধ সংগ্রহ করছেন। তাঁদের গল্পও চেতনা-নিষ্ণাত কেনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(৭)

মিনতি দেবীর অগ্রহায়ণ ১৩৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শেষবেলা' গল্পটিতে জীবন থেকে চলে যাবার করুণ সুর ধ্বনিত হয়েছে। ডায়েরির আকারে লিখিত সংক্ষিপ্ত এই গল্পে বড় হয়ে উঠেছে মৃত্যুর দিক, জীবন থেকে চলে যাবার দিক। চৈত্র ১৩৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত

'সংসার' গল্পটিতেও মৃত্যুর কথা। কথকের চোখের সামনে একটি পরিপূর্ণ হাসিখুশি সংসারে হঠাৎ মৃত্যুর থাবা। স্বামী ও দুই শিশুকে ফেলে বধূটি মৃত্যুলোকে যাত্রা করেছে। বিধাতার এই খেলা, উপহাসকে লেখিকা সহ্য করতে পারেননি।

শান্তা দেবীর অগ্রহায়ণ ১৩৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'তিলোত্তমা' গল্পটি। সুমতি নামের একটি মেয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। সুমতি দেখতে কদাকার। সৃষ্টিকর্তা যেন এই মেয়েকে সৃষ্টি করবার সময় তার সরস ও রঙিন মাল মশলাগুলি কৃপণের মতো দূরে সরিয়ে রেখেছিল। স্কুলের বোর্ডিং এ সুমতি এলে কোন এক সুরসিকা তার নামকরণ করে তিলোত্তমা। তারপর থেকে সকলে তার আসল নামটিই ভুলে গেছে। স্কুলে সুন্দরী হিসেবে খ্যাতি ছিল মল্লিকার। তার জন্মদিনে সলিলাদি উপহার পাঠিয়েছে সুমতির মাধ্যমে। কিন্তু পাঠানো বাক্সের মধ্যে কোনো উপহার পাওয়া যায় না। তখন সকলেই সুমতি বা তিলোত্তমাকে দোষী সব্যস্ত করে। শিক্ষিকা মিস কাঞ্জিলালের দরবারে অভিযোগ করে মল্লিকা। তিলোত্তমা বলে যে ঐ বাক্সে একটি নীল রঙের ব্রোচ ছিল যেটা সে ভেঙে নর্দমায় ফেলে দিয়েছে। উপহার দিয়েছিল সলিলাদির দেওর সর্বেশ। সুমতি তার কাজের জন্য কোনো ক্ষমা চায় না। এর পরিণতিতে তাকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু মল্লিকার উপর তার রাগ বর্তমান থাকে। কারণ কাগজের বুকে আঁকা একটি কিশোরের ছবি সুমতি তার বইয়ের পাতার ভিতর রেখেছিল। সেই ছবি আজ সে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। তার কোনো মোহময়ী ক্ষমতা নেই। কিন্তু তাকে ছলনা করে সেই কিশোর সর্বেশ মল্লিকাকে উপহার পাঠাবে তার হাত দিয়ে এটা সুমতি ওরফে তিলোত্তমা কোনোমতেই মেনে নিতে পারেনি। প্রেমকে না পাওয়ার বেদনায় তার আচরণ হয়ে উঠেছে হিংসাত্মক। অথচ গল্পের শেষে দেখা যায় সলিলাদি চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে ঐ বাক্সে ব্রোচ ভরতে তিনি ভুলে গেছেন। এর জন্য মল্লিকা যেন কিছু মনে না করে। সংবেদনার অভিঘাতে উঠে আসা এ গল্পটি অনবদ্য।

রাধারাণী দত্তর পৌষ ১৩৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'পুরুষ' লেখাটি গল্প না বলে গদ্য বলাই সংগত। এখানে লেখিকা পুরুষের প্রতি বক্তব্যে বলেছেন, যে পুরুষ জন্মেই হয়েই পেয়েছে মাকে, মায়ের স্তনধারায় পুষ্ট হয়েছে, মায়ের দ্বারা লালিত পালিত হয়েছে, সেই পুরুষ শক্তিমদমত্ত হয়ে নারীকে হাত পা রজ্জুবদ্ধ করে, গলদেশে গুরুভার শৃঙ্খল পরিয়ে, তার কণ্ঠরুদ্ধ করে, অন্ধকার গৃহকোণে জড়পিণ্ডবৎ ফেলে রেখেছে। নিজের শক্তির পায়ের চাপে নারীকে নিষ্পেষিত করে রেখেছে। কিন্তু যখন পুরুষ দুর্বল হয়েছে, বৃদ্ধ হয়েছে, ভোগের নেশা প্রশমিত হয়েছে, তখন নারীর উপর পাষাণভার অপসারিত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আজ আর তার সে শক্তি নেই। এখানে মূলত পুরুষ সম্পর্কে একজন নারীর আত্মগত ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একে গল্প কোনোমতেই বলা যায় না,

আত্মগত প্রবন্ধ বললে যথাযথ মূল্যায়ন হয়।

'মা' গল্পটি প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩৩৪ সংখ্যায়। বিকাশের বাবা ভীষণ কড়া স্বভাবের। মা ঠিক তার উলটো। বিকাশ বাবার কাছে মুখ খুলতে না পেরে মায়ের কাছে বিভিন্ন ভাবে রাগ প্রকাশ করতো। পরবর্তীকালে বিবাহিত বিকাশ তার স্ত্রী ললিতার মধ্যে মায়ের স্বভাব ক্রমশ ফুটে উঠতে দেখে অবাক হয়ে যায়। তার সর্বংসহা মা ক্রমশ ললিতার মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে। মায়ের চিরন্তন রূপ যে অবিনশ্বর এবং আবহমান-এই গল্পে সেটাই ধরা পড়েছে।

১৩৩৫ এর শ্রাবণ সংখ্যায় 'পাতানো মা' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পের প্রথমেই আমাদের সঙ্গে পরিচয় হয় কোঁকড়া চুল, বুক পিঠ পাতলা, সরু সরু হাত পা, রোগা টিঙ টিঙে নিতাই নামের এক ছেলের সঙ্গে। যার মা তাকে আঁতুড়েই রেখে মারা যায়। মাতৃহীন এই ছেলে মামার ঘরে মানুষ যাকে দেখার কেউ নেই। অবহেলা তার যার নিত্য সঙ্গী। সেজন্য মাত্র তেরো-চোদ্দ বছর বয়সেই তার মুখে চোখে জীবনযুদ্ধের ক্লান্তি ললাটের রেখায় আবছাভাবে ফুটে উঠেছে। মুখে ক্লান্ত অবসাদ যেন নিবিড় করে মাখানো। সর্বাঙ্গ দিয়ে চামড়ার আড়ালে লুকানো হাড়গুলির দৈর্ঘ্য প্রস্থ সুস্পষ্ট। চোখ দুটি যেন কাঁচা ঘুম ভরা নিদ্রালস জড়ানো। তাতে অতৃপ্তি বিরক্তি অবসাদ ও ঔদাসীন্য একসঙ্গে বিরাজমান। পাশের বাড়ির ভাড়াটে পরিবারদের নিত্য বাজার করে দেয় নিতু। তাদের বাড়িতে দুটি বৌ। বড় বৌ সধবা, ছোট বৌ বিধবা। একদিন বৃষ্টিমুখর সকালে নিতু সেই বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আটকে যায়। সেই সময় জানতে পারে বিধবা বৌটির নাম আর তার মায়ের নাম একই- অনসূয়া। এইভাবেই তাদের মধ্যে একটা মাতা পুত্রের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ব্যাপারে অনসূয়ার শাশুড়ির বিশেষ ভূমিকা ছিল। দিন গড়াতে থাকে। নিতু ওরফে নিতাই শক্ত সমর্থ যুবক হয়ে ওঠে। কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে পড়তে থাকে। তাদের মাতা পুত্রের সম্পর্ক আত্মীয় ও পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে বিসদৃশ ঠেকে। ব্রাহ্মণ নিতুর সঙ্গে কায়স্থ অনসূয়ার আত্মীয় সম্পর্ক হতে পারে না। জাতের নিগড় সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আবার অনসূয়ার অতৃপ্ত মাতৃহৃদয় নিতুকে পেয়ে শান্ত হতে চায়। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত নিতুও বুভুক্ষু হৃদয়ে অনসূয়ার মাতৃস্নেহ উপভোগ করতে চায়। সামাজিক কানাকানি, অশ্লীল ইঙ্গিত ক্রমশ এই সম্পর্কে একটা বাধা তৈরি করে। এই সমস্ত কিছুই অনসূয়াকে বিরক্ত করে তোলে। নিতুকে সে কটু কথাও শুনিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়। নিতু এটা উপলব্ধি করে বলে, "মা, ছেলেকে গর্ভে ধরার, প্রসব করার, দিনেরাত্রে অশ্রান্ত দেহমনে তাকে তিল তিল করে বড় করে তোলার কষ্ট ও দুঃখও কিছু কম না। ... 'মা' হলে তাকে দুঃখও সইতে হয় এটা একান্ত স্বাভাবিক, তুমি মা, সে কষ্ট সে দুঃখ তুমি পাওনি। ... তাই গর্ভে না ধরার দরুন অপমান দুঃখ ও আঘাতের ধাক্কা সহ্য করে তুমি অন্যদিক দিয়ে মা হওয়ার কষ্টটা পুষিয়ে নিচ্চ। কিন্তু সে সব কষ্টই তো তোমার ছেলের জন্য। তুমি গভীর

সত্যভাবে আন্তরিক কামনায় মা হতে চেয়েছ বলেই দুঃখ আঘাত পাচ্ছ।” এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নিতু আর তার পাতানো মায়ের সম্পর্কটি উদভাসিত হয়ে ওঠে। সময় এগিয়ে যায়। ডাক্তারি পাস করে নিতু পশ্চিমে দূর দেশে প্র্যাকটিস করে। তার পাতানো মা অনসূয়া বিভিন্ন অসুখে ভুগতে থাকে। ভগবানের কাছে একাগ্রচিত্তে সে এই অসহ্য রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রার্থনা করতে থাকে। কিন্তু তার মনে মৃত্যু ইচ্ছার অন্তরালে সংসারের একটা অতৃপ্ত সাধ পূর্ণ হবার বাসনা নিঃশব্দে চুপি চুপি পায়চারি করে। মৃত্যুর পর ছেলের হাতে মুখাগ্নি। নিতুকে সে বারবার এই আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছিল। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছেলের হাতে মুখাগ্নির অধিকার তুলে দিয়ে মা ও পুত্রের সম্পর্কটিকে জোরালো করতে চায়। ‘জীবনের কোলাহলময় হাটে যাকে সে ঐকান্তিক আন্তরিকতায় আপনার করতে চেয়েও সে অধিকার নিজে পায়নি এবং তাকেও দিতে পারেনি,-এখন যদি মরণের নিঃশব্দ আঁধার পথের মাঝে সে তার কাছ হতে সেই অধিকারের একটা কিছু বড় পাওনা পেয়ে যায়- এই লোভটাই যেন তার কাছে মৃত্যু-স্বপ্নাচ্ছন্ন কল্পনা-নয়নে বার বার প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে।”

অদিতি দেবীর শ্রাবণ ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘কল্পনা’ নামক ছোট্ট গল্পটিতে প্রেমের করুণ সমাপ্তির কথা বলা হয়েছে। অসুখে শয্যাশায়ী কল্পনা। নিখিলেশ এসে প্রবেশ করে এবং কল্পনাকে দেখে চমকে ওঠে। একটি বীণাকে কেন্দ্র করে কল্পনা তার মনের ব্যথা বেদনা প্রকাশ করে। সে নিখিলেশকে বলে, “আপনার জন্যে আমি একটি জিনিস রেখেছিলুম। ... আমার একটি পুরান বীণা। আপনি একজন বীণা-বাজিয়ে, তাই আশা ছিল আপনার নিপুণ হাতে বেজে উঠে এর সুরে এক দিন বিশ্বকে মোহিত করে দেবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় নিখিলবাবু, আজ সে বীণার সব-কটা ‘তার’ই ছিঁড়ে গেছে। আর বুঝি তাতে কোন সুরই বাজবে না! তাই বলি, আজ ওই ভাঙা বীণা নিয়ে কাজ নেই, তার চেয়ে যে দিন নূতন ‘তার’ চড়ে তাতে আবার নূতন সুর বেজে উঠবে- সেই দিন নেবেন।” এই কথাগুলির মধ্যে যেমন তাদের সম্পর্কটি ফুটে উঠেছে সেই সঙ্গে কল্পনার মনের বেদনাও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেই কথাগুলো নিখিলেশ এর মধ্যে বেসুরো কান্নার মতো বেজে উঠেছে। সে বলে ওঠে, ‘তার না থাকে তো চড়িয়ে নেবো খন। আমারও তাহলে এই ভবঘুরে জীবনটার একটা কিনারা হয়, ঘরের কোণে নিশ্চিন্ত মনে বসে একটু গাইবার।’ তার কিছু মুহূর্ত পরেই কল্পনার জীবনের সমাপ্তি ঘটে। একটা বিয়োগান্তক পরিণতির মধ্যে গল্পটা শেষ হয় যার রেশ থেকে যায় পাঠকের মনে।

মায়া বসুর বৈশাখ ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘ঝড়ের রাত্রি’ গল্পটি দাম্পত্য জীবনের গল্প। গল্পটি বিভা নাম্নী স্ত্রীলোকের জবানিতে বিবৃত হয়েছে। বিবাহের পর বিভা দেখেন তাঁর স্বামী সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেন। বিবাহ তিনি করলেন কিন্তু স্ত্রীসঙ্গ করবেন না।

এভাবেই জীবন কাটাবেন। এর ফলে বিভার জীবন হয়ে ওঠে দুঃসহ। এক অসহনীয় পরিস্থিতিতে বিভাকে শ্বশুরবাড়িতে জীবন কাটাতে হয়। এই ঘটনা আত্মীয়দের মধ্যেও জানাজানি হয়। এইভাবেই জীবন চলতে থাকে। বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। বাড়ির এক বিবাহ সভায় স্বামী সঙ্গ বঞ্চিত বলে বিভাকে অপমানিত হতে হয়। এই ঘটনা ঘটে বিভার স্বামীর সম্মুখে। স্বামীর সম্বিত ফেরে। তিনি বুঝতে পারেন স্ত্রীকে বঞ্চিত করে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করা বৃথা। স্ত্রীকে তিনি গ্রহণ করেন। সেদিনই কাল বৈশাখীর তাণ্ডব শুরু হয়েছে। বাতাসের বেগ ক্রমশ বাড়তে থাকে। বাড়ির অবস্থা জানতে বিভার স্বামী বাইরে বের হলে বাড়ির ছাদ ভেঙে মৃত্যু হয়। বিভার জীবনে থেকে যায় হাহাকার।

এখানে জোর করে বিচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলে মনে হয়। অনাবশ্যক ভাবে হঠাৎ করে কালবৈশাখী আনার কোনো দরকার ছিল না। কালবৈশাখী আনার সঙ্গে সঙ্গে ছাদও ভেঙে পড়ে! যা অতি ভয়ানক! গল্পশেষে মনে হয়, মিলনান্তক পরিণতিকে প্রায় জোর করে বিয়োগান্তক পরিণতিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

কল্যাণী পালের ১৩৩৬ এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ভূতের বোঝা গল্পটি প্রকাশিত হয়। নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা নিয়েই গল্পটি বেড়ে উঠেছে। গল্পের কথক সুরেন বাবুর সঙ্গে রামধনবাবুর পথের আলাপ। রামধনবাবু তার পাশের বাড়ির বিধবা মেয়ে সরমা ও তার মা কে নিয়ে আসে বারাণসীতে। তাদের সঙ্গে জড়িয়ে যান সুরেন বাবু।

রামধন বাবুর কাকা এই দুটি মেয়ে মানুষের কাছ থেকে রামধনকে বিচ্যুত করতে চান। এর জন্য রাতের বেলা দুটি মহিলাকে বের করে দিতে কিছুমাত্র তার কুণ্ঠা বোধ হয় না। সুরেন এদের আশ্রয় দেয়। সরমার প্রতি তার আকর্ষণ বাড়তে থাকে। কিন্তু রামধন পিছু ছাড়ে না। সে সরমাকে পেতে চায়। কিন্তু রামধনের প্রতাপান্বিত কাকা অন্য মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে এবং বিবাহ হয়েও যায়। সরমা সুরেন এর কাছে বোন হিসেবে আশ্রয় পেতে চায়। এখানেই গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে।

গল্পটির প্লট আপাতভাবে সরল হলেও তার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে এবং তাতে লেখিকা ব্যর্থ হয়েছেন। যে সুরেন সরমাকে প্রেমাস্পদ হিসেবে ভেবে এসেছে সবসময়, তাকে বোন হিসেবে মেনে নেওয়াটা মানসিকভাবে জটিল এবং দুর্বহ। গোটা গল্পের মধ্যেই সরমা সুরেনের প্রতি দুর্বল, আকৃষ্ট এরকমটা দেখানো হয়েছে এবং আবহ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু গল্পের শেষে তার মন হঠাৎ রামধনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল কেন, কেনই বা সে সুরেন এর বোন হয়ে উঠতে চাইলো এটা পাঠকের কাছে প্রহেলিকা হেয় উঠেছে। একটা টানাপোড়েনের সাহায্যে গল্পটিকে দুর্বলভাবে মেলানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

চৈত্র ১৩৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বিমলা দেবীর 'বিজলী' গল্পটি। গল্পের মূল চরিত্র বিজলী। মাত্র তিন মাস বয়েসে তার মা মারা যায়। তার রং ছিল কালো, যাকে অমাবস্যা বললেও কেউ আপত্তি করবে না। মুখে আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই শ্রী ছিল। পিতা বিমাতাকে ঘরে আনলে বিজলীর জীবন ক্রমশ দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। কিন্তু মুখ বুজে সে সমস্তই সহ্য করে। প্রতি মুহূর্তে তার দোষ ধরা পড়ে। এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিজলীর বিবাহ দিয়ে তার বিমাতা শান্তি পায় এবং পিতার দায় উদ্ধার হয়। কিন্তু একবছর পরেই বিজলী বিধবা হয় এবং পুনরায় বাবার ঘরে ফিরে আসে। তার উপর অত্যাচার এবং বিভিন্ন কটু কথার মাত্রা বাড়তে থাকে। একদিন বিমাতা সুশীলার ধনী ভগ্নীর পুত্র অমরেশ তাদের বাড়িতে আসে খোঁজ খবর নিতে। অমরেশ ক্রমশ এখানে আসতে থাকে এবং বিজলীর প্রতি তার একটা আকর্ষণ তৈরি হয়। বিজলী এই প্রথম অমরেশের কাছে সহৃদয় ব্যবহার লাভ করে। কিন্তু বিমাতা সুশীলার কটু বাক্য, অশ্লীল ইঙ্গিত বাড়তে থাকে। একদিন এক ঘটনার প্রেক্ষিতে এই ইঙ্গিত এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে বিজলী আর তা সহ্য করতে পারে না। গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করে লজ্জা থেকে পরিত্রাণ লাভ করে।

বালবিধবাদের দুর্বিষহ জীবনের ছবি এই গল্পেও পাওয়া যায়। তাদের জীবনে প্রেম নেই, সহৃদয়তা নেই, সহৃদয় ব্যবহার নেই। শুধু কটু কথা, গলগ্রহ হয়ে থাকা। এক অসহনীয় পরিস্থিতি। প্রেম তাদের জীবনে আসলে সেটা কলঙ্ক হয়ে ওঠে। এবং এই কলঙ্ক মোচন করতে গিয়ে আত্মহত্যা করতে হয়। সমাজের কালো দিককেই তুলে ধরে এই গল্প।

উমা মিত্রের লেখা ১৩৩৩ এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সেতুবন্ধ' এর কাহিনি গড়ে উঠেছে অমর এবং সুনীলার প্রেমকে কেন্দ্র করে। অমর পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে। তার মনের অবস্থা দুঃসহ। এই অবস্থায় সুনীলার চিঠি আসে, সেখানে সে লেখে, 'মানুষের সহ্য করবার ক্ষমতা আছে বলেই, তারা এত দুঃখ কষ্ট পায়। তারা যদি এই দুঃখ কষ্ট ভ্রূক্ষেপ না করে কাজ করে যেতে পারে তবেই তারা পরে উন্নতি করতে পারে। তাই আমি বলি, তুমিও সেই পথের পথিক কবে।' সুনীলার জীবন বড় দুঃখের। বিবাহের পর তার স্বামী কুপথে গিয়ে সুনীলাকে ত্যাগ করে। সে আশ্রয় নেয় সুনীলের বৌদিমণির কাছে। ফলে সামাজিক ভাবে সুনীলা আর বিবাহ করতে পারে না। সুনীলা অমরকে ভালোবাসলেও তার প্রেমের প্রকাশ নীরব। সেবার মধ্য দিয়ে সেই প্রেম ফুটে উঠেছে। অমরের প্রবল শরীর খারাপে সুনীলা তাকে সেবা করেছে, সুস্থ করে তুলেছে। কিন্তু অমর সুনীলার কাছ থেকে বারবার পালাতে চেয়েছে। অমরের কঠিন ব্যাধি তার জীবনের আশাকে নির্বাপিত করেছে। এই অবস্থায় সুনীলার পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে বড় করুণ। অমর সুনীলাকে এড়িয়ে গেছে সবসময়। বৌদি তাদের মধ্যে সেতু হিসেবে থাকলেও প্রেমের জোড় লাগাতে পারেননি। প্রেম এবং তার করুণ পরিসমাপ্তিতে গল্পটা শেষ হয়েছে এবং পাঠকের মধ্যে একটা করুণ সুর রেখে গেছে।

নিরুপমা দেবীর ‘মা-হারা’ (পৌষ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) গল্পটি করুণ এবং দুঃখের। এক মহিলা লেখিকা তার মাতৃহৃদয় দিয়ে এক মা হারা বালকের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। আসাম ঘেষাঁ পূর্ববঙ্গের একটি স্টেশনে এই ঘটনার সূত্রপাত। কালো নামের ছেলেটির মা মৃত। বাবা স্টেশন মাস্টার। কর্মসূত্রে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয় বিভিন্ন জায়গায়। একটি ছোট বোন আছে, থাকে দিদিমার কাছে। সারাদিন একলা একলা ঘুড়ে বেড়ায় স্টেশন চত্বর জুড়ে। ট্রেনের যাত্রীরা আসে, নামে আর শিশুটি খুঁজতে থাকে তার মা কে। গল্পের কথকের (স্ত্রী) সঙ্গে কালোর ভাব হয়ে যায়। সে কথক (স্ত্রী) নিয়ে যেতে চায় তাদের কোয়ার্টারে। কিন্তু ট্রেন আসার তাড়ায় সময় হয় না। কিন্তু কালোর সঙ্গে কথাবার্তায়, গল্পে যেভাবে তার করুণ জীবনের কথা ফুটে উঠেছে তা বেদনাদায়ক।

সরোজকুমারী দেবীর ‘ঝড়ের রাতে’ (চৈত্র, ১৩৩০) গল্পে তিন বন্ধুর মধ্যে তর্ক হয় মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে। মৃতপ্রায় রোগীর বিছানার পাশে বসে নলীনের ভয়ার্ত অবস্থা, রোগীর মৃতা স্ত্রীর রূপ দর্শন এবং গল্পের শেষে যুক্তি সহকারে নির্মলের ভৌতিক অস্তিত্বের অভিজ্ঞতাকে নস্যাৎ করা—বিষয়গুলি লেখিকা স্তরে স্তরে নির্মাণ করে দিলেও অতিপ্রাকৃতের রহস্যময়তার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয় না। অতিপ্রাকৃতের সূক্ষ্মতায়, অনুপুঙ্খতায়, স্বাভাবিকতায় গল্পটি সংহত হয়ে ওঠে না। কাহিনি বলাই এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে। এই অংশটি যাবে।

সরোজকুমারী দেবী ‘মাধবীর পত্র’ গল্পটি (কার্তিক, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)। পত্রাকারে লিখিত হয়েছে। অনিল এবং মাধবীর সুখের সংসার ছিল। কিন্তু কিছু পুরুষ পাষণ্ড মাধবীকে অত্যাচার করে, লাঞ্ছিত করে। তারপর আইন আদালত লাঞ্ছনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মাধবীকে যেতে হয়। সেই অত্যাচারীদের কঠিন শাস্তিও ঘটে। শ্বশুরবাড়ি থেকে মাধবীকে চলে আসতে হয়। কিন্তু তার শ্বশুর পণ্ডিতদের বিধানের উপর নির্ভর করে প্রায়শ্চিত্ত করে মাধবীকে বাড়ি নিয়ে আসে। বলাবাহুল্য, এতে মাধবীর শাশুড়ি একদমই খুশি হতে পারে না। তিনি তার পুত্রবধূকে কলঙ্কিত, অশুচি ইত্যাদি ভাবতেই থাকেন। শাশুড়ির হাতে ভীষণভাবে লাঞ্ছিত হতে হয় মাধবীকে। এই অবস্থায় মাধবীর অবলম্বন ছিল তার স্বামী অনিল। কিন্তু অনিলও তার লাঞ্ছিত স্ত্রীকে দেখে দেহে মনে সংকুচিত হয়ে পড়ে। তার মনে হাতে থাকে স্ত্রী অপবিত্র হয়ে গেছে, অশুচি হয়ে গেছে। অথচ অনিল স্ত্রীকে গ্রহণ করতে চায়। সে তার বন্ধু সুশীলকে চিঠিতে লেখে, “কবে কোনকালে শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির পবিত্রতা সম্বন্ধে নিয়ম করা হয়েছিল। সে একবার পতিতা হলে আর তার উদ্ধার নেই”,—পুরুষদের সম্বন্ধেও সেই কথা, তবে হয়তো ব্যবস্থার ভার পুরুষের হাতে থাকায় তাদের উপর কোন জোর পড়ে নি। কালস্রোতে তাই পুরুষদের এ সব দোষ সহনীয় ও ক্ষমার যোগ্য বলে চলে আসছে— এতে কারোর কিছু বক্তব্য নেই। কিন্তু মেয়েদের বেলায় এ বিধান অনড় পাষাণের মত সমাজে চেপে বসে আছে। কত লক্ষ নিষ্পাপ পবিত্র জীবন এই বিধানের মুখে বলি

পড়ছে, কে তার খোঁজ রাখে? সেই সংস্কারের বশে আজও আমরা বিশ্বাস করছি, পুরুষের শত বিচ্যুতি সত্ত্বেও সে দেহাতিরিক্ত আত্মার মতই নির্বিকার নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ, তাতে কোন মলিনতার আরোপ হতে পারে না। কিন্তু স্ত্রী জাতি? - তার অনিচ্ছাকৃত সামান্য ত্রুটিও অমার্জনীয়। অনেক মাথা খোঁড়াখুঁড়ির পর সমাজ যদি বা তার সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম করে মেয়েদের অনুকূলে মত দিলে তো ব্যক্তিগত দ্বিধাদ্বন্দ্বের আর বিরাম নেই। আশ্চর্য ব্যাপার যা হোক !" আস্তে আস্তে সে স্ত্রীকে গ্রহণ করবার জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করতে থাকে। গল্পের শেষে সেই ইঙ্গিত থাকে সুশীলের পত্রে। সে অনিলকে বলে, 'যুগ যুগ ধরে যে সব ভুল ধারণা ও অন্ধ সংস্কার সমাজের বুকে চেপে বসে তার কণ্ঠ রোধ করছিল, কালধর্মে সে সব ক্রমে আপনিই সরে যাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মনের দিক থেকে আমরা ক্রমশই এগিয়ে চলেছি। তোমার ভিতর দিয়ে তাই আজ নবযুগকেও শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দন কচ্ছি।'

গোটা গল্পটির মধ্যে নরপশুদের হাতে লাঞ্ছিত এক মহিলার মনোবেদনা, সংসারে তার অবহেলা, লাঞ্ছনার পরে স্বামীর মনোভাব ইত্যাদি অতি চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু হয়ে উঠছে। লাঞ্ছিত মাধবীর দরকার ছিল সহমর্মিতা, আদর যত্ন। সেখানে তার শাশুড়ি তাকে বাড়ির বাইরে বের করে দিতে পারলে খুশি হয়। প্রতি মুহূর্তে তাকে অত্যাচার করেছে। প্রতি মুহূর্তে তার অপমানজনক মুহূর্তগুলিকে মনে করিয়ে দিয়েছে। সামাজিক অবনমনের মুখে ফেলেছে। এভাবে মাধবীকে মানসিকভাবে ধ্বস্ত করেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে স্বামী অনিলের মনোভাবও উঠে এসেছে। সেও তার স্ত্রীকে পূর্বের মতো ভালোবাসতে পারছে না। আদালতেও সে তার স্ত্রীর সঙ্গ দেয়নি। অন্তত গল্পে আমরা তার ইঙ্গিত পাই না। আদালতে লড়াইটা মাধবীকে একাই লড়তে হয়েছে। তার বাবা-মা কে সঙ্গে নিয়ে। সামাজিক প্রায়শ্চিত্তও করতে হয়েছে। অনিলের উপলব্ধি হয়েছে যে সে তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় অপমানিত মাধবীকেও মেনে নিতে পারেনি। চমৎকার এই গল্পটিতে যে সমস্যার কথা সরোজকুমারী দেবী তুলে ধরেছেন আমরা এখনও যে তার থেকে খুব একটা অগ্রসর হতে পেরেছি তেমন নয়। গল্পের শেষে নবযুগের নব মানসিকতার ইঙ্গিত আছে। একথা অনস্বীকার্য গল্পে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে এখন আমরা তার থেকে অনেকটাই এগিয়ে এসেছি। কিন্তু আরও এগোতে হবে এই গল্প সেই কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

(৮)

ছোটগল্প যেখানে জীবনের কোনো মুহূর্তের অভিজ্ঞান, সময় ও সাময়িক অভিজ্ঞতা যেখানে চিরন্তনত্বের আখ্যা পেয়েছে, ছোটগল্পের সেই শিল্পরূপ কল্লোলের নারীগল্পকারদের গল্পকায়ায় নতুন রূপে চিহ্নিত হয়েছে। পুরুষ লেখক রচিত কথাসাহিত্যের যে দুর্গ ছিল দুর্ভেদ্য, সেখানে নারীগল্পকাররা তাঁদের নিজেদের মতো করে সত্য, সত্তা, নিজস্বতা দিয়ে

স্বতন্ত্র প্রাচীর, অলিন্দও বাতায়ন নির্মাণ করতে পেরেছিলেন। নানা জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজের আন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকট করে তাঁরা বাংলা ছোটগল্পের প্রতিস্রোতকে চিনিয়ে দিয়েছেন। যদিও সূচনা-বিকাশ-পরিসমাপ্তির একরৈখিকে বিন্যাসে বা ছোটগল্পের কথাগ্রন্থনীয় সূক্ষ্ম, পার্থক্য আছে কিংবা আঙ্গিকও অন্তর্বয়ানের মেলবন্ধনে ভাবাদর্শ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেনি, তবু তাঁদের গল্পভুবন অন্তঃস্বর ও মুখ্যস্বরের কারুকার্যে মূর্ততা বাংলা ছোটগল্পের নিরিখে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পশেষে চমককে জুড়ে না দিয়ে, প্রত্যেকটি গল্পের শেষে তাঁরা ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনের শাশ্বত সত্যকে, সময়কে, সমকালীন সমাজের বয়ানকে। সমাজের বহুবিধ যুদ্ধে ক্লান্ত নারীর অবয়ব, তার মনস্তত্ত্ব তার সময় তাঁদের গল্পের ভিতর থেকে নতুন করে চেতনা গড়ে তোলে পাঠকের মনে। পাঠকৃতির মধ্যে পাঠক অনুভব করেন জীবনের স্পন্দন। তাই কল্লোলের নারীগল্পকারদের এক সহজ সাবলীল নির্ভার উপস্থাপনায় তাঁদের গল্পমালা হয়ে ওঠে জীবনকে দেখবার এক বিশেষ দর্পণ, সময়ের শাব্দিক উচ্চারণ।

ঋণস্বীকার :

১. কল্লোল গল্পসমগ্র (প্রথম বর্ষ ১৩৩০- দ্বিতীয় বর্ষ : ১৩৩১), সংকলন ও সম্পাদনা : অরুণ মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০২০, কার্তিক ১৪২৭, কলকাতা মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স পাঃ লিঃ।

২. কল্লোল, গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড (তৃতীয় বর্ষ : ১৩৩২- চতুর্থ বর্ষ : ১৩৩৩) প্রাগুক্ত। প্রথম প্রকাশ, ৯ মার্চ ২০০৯, ফাল্গুন ১৪১৫, কলকাতা, মিএ ও ঘোষ পাবলিশাস পাঃ লিঃ।

৩. কল্লোল গল্পসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড (পঞ্চম বর্ষ, ১৩৩৪), প্রাগুক্ত। প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১০, অগ্রহায়ণ ১৪১৭, কলকাতা মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

৪. কল্লোল গল্পসমগ্র, চতুর্থ খণ্ড (ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৩৫—সপ্তম বর্ষ ১৩৩৬), প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, পৌ ১৪১৮,কলকাতা মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ঃ কলকাতা।

৫. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, একাদশ প্রকাশ, আশ্বিন ১৪২১, কলকাতা : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৬. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কল্লোলের কাল, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০, কলকাতা : দে'জ।

কল্লোলের কালে জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে মৃত্যুভাবনা : এক বিপরীতস্রোত

শু ভা শি স দা স

সারসংক্ষেপ

বিষয় : কল্লোলের কালে জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে মৃত্যুভাবনা এক বিপরীত স্রোত।

জন্মলগ্ন থেকে এই শব্দ বারবার কানে অনুরণিত হয়েছে 'জন্মিলে মরিতে হবে'। তাহলে প্রশ্ন! আমারও কি সেই সময় আসবে? যা আমাকে নিয়ে যাবে অসীম অনন্তলোকে, অজানা জগতে। জানি ক্রমবর্ধমান জীবন, কাল সিন্ধু পানে চললে ফেরান সম্ভব নয়। মৃত্যু এক কঠিন অনুভূতি, এক চিরকালীন রহস্য, যার সত্য উদঘাটন কোনোকালেই সম্ভবপর নয়। তবু মানুষ প্রতিনিয়তই বিস্ময়কর উৎসাহে এগিয়ে যায় সমাধানের লক্ষ্যে। এই মৃত্যু কোনো কোনো ঔপন্যাসিকদের লেখার বিষয় হয়ে ওঠে। লেখকের ব্যাক্তিগত জীবন ধরা পড়ে পরিবারে, সমাজে, পরিচিতর মধ্যে, প্রিয়জনদের মধ্যে। তারাই ঘুরে ফিরে আসে সাহিত্যের চরিত্র হয়ে। ঔপন্যাসিক চরিত্রের উত্থান-পতনের জন্য, কখনো কখনো উপযুক্ত শাস্তি দেন। সমাজবদ্ধ জীব ভুল থেকেই শিক্ষা নেয় প্রতিনিয়ত। কিন্তু তার আগমনে দ্বিতীয়বার সুযোগ মেলে না ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার। হয়তো ঔপন্যাসিক চান না। সামাজিক গণ্ডিকে অতিক্রম করলেই অমোঘ নিয়মে তার আগমন। বিশ শতকে ঔপন্যাসিকের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন হয়েছে। তাঁরা চরিত্রকে শোধনের সুযোগ দিয়েছেন। কোথাও কোথাও অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু আনতে হয়েছে তাঁদের। কল্লোলের যুগে যুদ্ধোত্তর সাহিত্যে ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিকতার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে যে দেখা দিয়েছিল, জগদীশ গুপ্ত সকলের মতো সেই প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবুও তাঁর রচনায় স্বাতন্ত্র্য-ধর্মী মনোভাব আমাদের চোখে পড়ে। ক্রূর দৃষ্টি দিয়ে চরিত্রের নগ্ন নির্মোহ রূপ দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছেন নির্বিকার চিত্তে। আমার অভিসন্দর্ভের বিষয়— "কল্লোলের কালে জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে মৃত্যুভাবনা এক বিপরীত স্রোত।" জগদীশ গুপ্তের রচনায় মৃত্যুর আগমন কি সত্যি নিয়তি নির্ভর, নাকি কথাকারের কৌশল, নাকি মৃত্যু ভাবনাই তাঁর কলমের স্বক্ষেত্র। একটা মৃত্যু কিভাবে সাহিত্যিকের চিন্তা-চেতনায় বদল আনছে, আনছে তাঁর গল্প ও উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর সমাজ জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, কীভাবে একটি সমাজ বা যুগ বদলে যাচ্ছে সাহিত্যিকের কলমে, তা ফুটিয়ে তোলাই এই অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য।

সূচক শব্দ :

১. মৃত্যু

২. জগদীশ গুপ্ত

৩. গল্প ও উপন্যাস

কল্লোলের কালে জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে মৃত্যুভাবনা এক বিপরীত স্রোত—আমাদের

জীবন একটা জ্যামিতিক বৃত্তের মত। সেই বৃত্ত চক্রাকারে শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে জীবাত্মা তার পরিক্রমণ শেষ করে আবার শূন্যে মেশে। এই মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা বহুকাল ধরে চলে আসছে। মেলেনি উত্তর। মৃত্যু কী, কী বা তার রূপ আর স্বরূপ—এই উত্তর জানার চেষ্টা করছি। বেদ-পুরাণ-উপনিষদের একটির পর একটি গ্রন্থ পড়তে পড়তে খুঁজে পাই মৃত্যু সম্পর্কিত অজস্র আলোচনা।

আর্য সভ্যতার পূর্বে অনার্য জাতির প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের কথা বিভিন্ন গ্রন্থে পাই। যেমন—**E.B.Tayler** এর **Primitive Culture J. G. Frazer** এর **'The belief immortality and the worship of the Dead'** প্রভৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, মৃত্যু সম্পর্কে প্রাক্বৈদিক যুগের ভারতীয় ধারণার সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের ধারণা হুবহু একই রকম ছিল।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে মৃত্যুকে দেবতা রূপে দেখানো হয়েছে। এখানে মৃত্যু লোকের রাজা যমের কথা বলা আছে। এছাড়া পঞ্চদশ ও ষোড়শ এই দুটি সূক্তে মৃত্যুর পর সৎকারের উপায় ব্যক্ত। তবে আত্মা অজেয়, অমর-অবিনশ্বর। শুধুমাত্র কর্মফলের উপর নির্ভর করে পরলোক, ভূলোক, এমন কি পুনর্জন্ম লাভ হয়ে থাকে তার।

ঋগ্বেদের সময় থেকেই মৃতদেহ দাহ করার কথা জেনেছি। শরীর দহনের পর আত্মার উদ্বায়ী হওয়ার কথা মেলে। গ্রন্থের ১৮শ কাণ্ডের ৩য় অনুবাদের ৭ম সূক্তে বলা আছে—

"হে জাতবেদা অগ্নি, এ মৃত্যুকে দগ্ধ করতে আরম্ভ কর, তোমার জ্বালাযুক্ত রসহরণশীল দহন সামর্থ্যহোক। এ মৃতের শরীর সম্যক ভস্মীভূত কর, তারপর এ পুরুষকে সুকৃত লোকে অর্থাৎ পুণ্যবানদের নিবাসস্থল স্বর্গলোকে স্থাপন কর।"[১]

এই মৃত্যুর পর মৃতদেহকে সৎকার করার কথা বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা বিভিন্ন ভাবে করে আসছে পঞ্চভূতে লীন করে দেওয়ার জন্য। তাঁদের ধারণা কর্ম অনুযায়ী আত্মা জীবনচক্রের স্তরকে পরিক্রমণ করে চলে শুধু। আর এই স্তর পরিক্রমণের পরিণামই আমার মনে হয় মৃত্যু।

আবার 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-ধ্বংস তাঁরই লীলা মাত্র। আর মৃত্যু যেন তাঁরই লীলার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পুনরায় নতুন রূপে আসার বড় মাধ্যম। মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহ ছেড়ে নতুন দেহ ধারণ করে—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নাবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যান্যানি সংযতি নবানি দেহী।"[২]

খ্রিস্টধর্ম মতেও মৃত্যু প্রায় অনুরূপ। Samuele Bacchiocchi তাঁর গ্রন্থে মৃত্যু

সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন- মৃত্যু যেন দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদ। দেহের মৃত্যুর সময় আত্মা বেঁচে থাকে। এই বিশ্বাসকে বিভিন্ন উপায় প্রকাশ করা যায়। যা থেকে মৃতদের জন্য প্রার্থনা, পবিত্রতা এমনকি পরকালে চিরশান্তি ইত্যাদি মতবাদের জন্ম নেয়। তাঁর গ্রন্থে আছে—

"In the history of Christianity– death has been defined generally as the survival of the immortal soul from the mortal body. This belief in the survival of the soul at the death of the body has been expressed in various ways and given rise to such corollary doctrines as prayer for the dead– indulgences– purgatory– intercession of the saints– the eternal formant of hell– etc."[৩]

অর্থাৎ মৃত্যু হল আমাদের নশ্বর দেহের সঙ্গে অবিনশ্বর আত্মার কেবল বিচ্ছেদ। কল্লোলের কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্তের রচনায় এই মৃত্যুর পথান্বেষণ করতে গিয়ে তাঁর লেখার ভিতর থেকে যে মৃত্যু ভাবনার পরিচয় পেয়েছি, আমার মনে হয় পরবর্তীকালে বাংলা কথাসাহিত্যে যাঁরা উপন্যাস বা গল্প নিয়ে লিখেছেন তাঁরা এর দ্বারা অনেকখানি আলোকিত বা প্রভাবিত হয়েছেন।

জগদীশ গুপ্ত বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে প্রায় অর্ধশত গল্প লিখলেও গল্পকার রূপে জনপ্রিয়তা সেই অর্থে তিনি পাননি। জগত ও জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে তীব্র ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যা কিছু প্রতিষ্ঠিত তাকে বিনা যাচাইয়ে গ্রহণে আপত্তি, প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি আস্থার অভাব, জীবন সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁকে শিল্পী করেছে। তাঁর গল্পে মানুষের যে অসহায়তা ও পরাজয়ের বেদনা, কঠিন ও নির্মম জীবন দৃষ্টি, অমোঘ নিয়তির জয় ঘোষিত হয়েছে—তা সাধারণ পাঠককে তাঁর প্রতি বিমুখ করেছে। তাঁর সাহিত্যে মৃত্যুচেতনা সম্পর্কে আলোচনার আগে কতকগুলি বিষয় আমাদের মাথায় রাখা দরকার। জগদীশ গুপ্তের লেখায় বারংবার দুঃখবাদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে চাপা স্বরে। তাঁর বেশ কিছু গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে চিন্তা চেতনায় অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ অনেক সমালোচক মনে করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য রচনার পটভূমি জগদীশ গুপ্তই নির্মাণ করে গিয়েছিলেন এবং সেই অর্থে জগদীশকে মানিকের পূর্বসূরী অনেকে বলে থাকেন। তবে জগদীশ গুপ্তের আবির্ভাব সহজ সুলভ ভঙ্গিতে। কিছুটা তারাশংকরের প্রভাব তাঁর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে লক্ষিত হলেও তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র ভূমিস্ফোটক। তবে লেখকের প্রথম দিকের রচনায় এই নৈরাশ্যবাদ বা দুঃখবাদের কোনও অস্তিত্ব দেখা যায় নি। বিশ শতকের আবির্ভাব ঘটল ফ্রয়ডিয় যুগ। স্রষ্টার মনে তখন বুর্জোর প্রতি প্রবল বিদ্বেষ। সমাজ চেতনার এক আমুল পরিবর্তন দেখা গেল। তার প্রভাবে লেখকের সৃষ্টি গেল বদলে। সে সময় "কল্লোল" ও "কালিকলমে" কিছু প্রতিবাদী রচনার উন্মেষ ঘটল। সেই সকল সাহিত্যিকদের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠলো রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের ভাবজগতের বিরোধিতা। কিন্তু

সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত বিপরীত পথ ধরলেন। তাঁর সৃষ্টিতে প্রাধান্য পেল সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা। সমালোচক এস. ঘোষ তাঁর একটি প্রবন্ধে সে সময়কার সামাজিক সমস্যার কথা প্রসঙ্গে তিনটি ঘটনাকে সামনে রাখতে চেয়েছেন।

"প্রথমতঃ ১৯২২-২৭ অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে সমগ্র জাতির জীবনে উদ্দীপনার অভাব দেখা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ ১৯২৯-এর অর্থনৈতিক মন্দার আঘাতে সর্বব্যাপী সংকট বাংলার মফঃস্বলেও পৌঁছায়।

তৃতীয়তঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্ট বিশ্বাসের সংকট এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রে তার প্রভাবে পাশ্চাত্য তথা ইংরেজ প্রভাবিত বিশ্বে রোমান্টিকতা বিরোধী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।"[৪]

বস্তুত এই সবকিছুর প্রভাবে বাংলা সাহিত্যেও ধীরে ধীরে রোমান্টিক হারিয়ে যেতে শুরু করলো। ইতিপূর্বের সাহিত্যিকদের কলমে সে সাহিত্য সত্য-শিব ও সুন্দরের ফসল ফলিয়েছে তা ধীরে ধীরে বদল ঘটল কল্লোল পরবর্তী যুগের বহু সাহিত্যিকদের কলমে ও রচনায়। শরৎচন্দ্র থেকে জগদীশ সকলের কলম প্রেমকে দূরে সরিয়ে নৈরাশ্যকে গ্রহণ করলো। তবে তাঁর গল্পে প্রকৃতি একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সমালোচক সুজিৎ ঘোষ তার প্রবন্ধের একস্থানে বলেছেন—

জগদীশ গুপ্ত তাঁর রচনায় প্রকৃতপক্ষে, এই রোমান্টিকতার বিরোধিতা করলেন। একটি সমাজ, বিশেষ করে মফঃস্বলের শহর, কোলকাতার মতো মেট্রোপলিস থেকে দূরে, যেখানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-সম্পর্কগুলি শিথিল হয়ে পড়ে, অথচ নাগরিক মূল্যবোধ সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পায় না এমন এক সমাজ পটভূমিতে অবস্থিত থেকে জগদীশ গুপ্তের চরিত্রগুলি সৃষ্ট হয়। যেখানে ভেঙে-পড়া মানবিক সম্পর্কসমূহ ভাঙা মূর্তির মতো ইতস্ততঃ ছড়ানো সেখানে সে-চিত্র-চরিত্র অঙ্কিত হলে, প্রথম দর্শনে তাদের নৈরাশ্যবাদী মনে হতেই পারে।

তাঁর গল্পের বেশীরভাগ পাত্র-পাত্রীরা সর্বদাই সমাজের কাছে প্রতারণার স্বীকার। সমাজের কলঙ্কের কাছে বাঁচার কোনও পথ না পেয়েই মৃত্যুকে বরণ করছে, কতকটা নিয়তির কাছে পরাজয় স্বীকার করেই। তাঁর 'এইবার লোকে ঠিক বলে' গল্পে কিভাবে একটি দরিদ্র সংসারের আপাত তৃপ্তির পেছনে সৌভাগ্যের সুখ দেবার যে সুপ্ত বাসনা লুকিয়ে থাকে তা এক প্রবঞ্চক গুরুর ধোঁকায় হঠাৎ প্রকাশ পেয়েছে এবং সংসার ত্যাগ করে প্রবঞ্চিত হয়ে গ্রামে ফিরে গল্পের নায়ক শিবপ্রিয় শুনেছে স্ত্রী সমাজের দুর্নাম সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যাকেই পরিত্রাণের একমাত্র উপায় রূপে বেছে নিয়েছে রটলমাধব পাল বৌমাকে গয়না দিয়েছে, কাপড় দিয়েছে কেউ দেখেছে হাসতে, কেউ দেখেছে পা দিতে, কেউ দেখেছে আঁচল নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে-মিথ্যে কলঙ্ক নিয়ে সে গেছে।"[৬]

সমাজের মিথ্যে কলঙ্ক মাথায় নিয়ে শিবপ্রিয়র স্ত্রী মৃত্যু পথের যাত্রী হয়েছে বলেই "এই সমাজকে শিবপ্রিয় প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছে রাতের অন্ধকারে। মা দত্তাকে সঙ্গে

নিয়েই রাতের অন্ধকারে টাউনে সে যেতে চায় কারন- এ মাটি আর সইছে না, মা।”[৭] শিবপ্রিয় প্রতারণায় যত না নিঃস্ব হয়েছে, স্ত্রীর মৃত্যুতে সে হয়েছে ভিখারী।

তাঁর কলম রবীন্দ্র বক্তব্যের শুধু বিরোধিতাই নয়, শরৎচন্দ্রের রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যান নামে প্রচলিত কাহিনীর নৈতিকতা-হীন ভণ্ডামিকে তিনি সজোরে পদাঘাত করলেন। সে-স্থানে তিনি লিখলেন—“মানুষের প্রেমের ট্র্যাজেডি মৃত্যুতে নয়, বিরহে নয়, অবসাদে আর ক্ষুদ্রতার পরিচয়ে, আর উদাসীনতায়।”[৮] ঠিক সেকারণেই তিনি রোমান্টিকতা থেকে সরে গিয়ে মৃত্যু সম্পর্কিত শরৎচন্দ্রের ভাবকে পরিত্যাগ করলেন। তাঁর ‘দিবসের শেষে’ গল্পে দেখি মৃত্যুর করুণ চিত্র—যখন ওপারের কাছাকাছি পাচুঁকে পুনর্বার দেখা গেল তখন সে কুম্ভীরের মুখে, নিশ্চল জনতা হায় হায় করিয়া উঠিল, পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিল সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল পাঁচুর মা সে দৃশ্য দেখিলো না। সে তখন মূর্ছিতা।”[৯]

একই রকম বাকসংযম লক্ষ্য করা যায় তাঁর “পয়োমুখম” গল্পে। কবিরাজ শ্বশুর ছেলের বারবার বিয়ে দিয়ে পণ লাভের আশায় একটির পর একটি পুত্রবধূকে হত্যা করে যায়। প্রথমে মণিমালা, তার মৃত্যুর পর অনুপমা এবং সবশেষে তৃতীয়বার বীণাপাণির সঙ্গে ভূতনাথের বিবাহ দেন শ্রী কৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা। সব ক্ষেত্রেই কৌশলে পণের অর্থ সংগ্রহ করেন। কিন্তু প্রথম দুটি পত্নীর মৃত্যুতে অপরিণত ভূতনাথ, পরিণত হয়ে তৃতীয়টির মৃত্যু আটকাতে সক্ষম হয়েছে। পুত্রবধূর একটার পর একটার মৃত্যুতে পণের টাকা গ্রহণরূপ এই নোংরা কৃতকর্ম শেষ পর্যন্ত ভূতনাথের কাছে পিতা কৃষ্ণকান্ত ধরা পড়ে যায় এবং ভূতনাথ বলে—

“এই বৌটার পরমায়ু আছে, তাই কলেরায় মরল না, বাবা। পারেন ত’ নিজেই খেয়ে ফেলুন।”[১০]

স্নেহের ছলে পিতা কৃষ্ণকান্ত এই গল্পে গোপন আততায়ীর ভূমিকা নিয়েছে। অস্তিত্বের সংগ্রামে একদিন ভূতনাথের মতো পিতৃভক্তও আয়ুর্বেদজ্ঞ পিতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। আসলে ‘পয়োমুখম’ গোটা গল্পটাই সুকৌশলই লোভী চিকিৎসকের নরহত্যার এক Crime story, যে ক্রাইম সাধারণত লোকবিচারে আইনের দ্বারা দণ্ডিত হয়, জগদীশ গুপ্ত সেই ক্রাইমের চেয়ে মনের গভীরতলশায়ী ক্রাইম-এর বীজটার দিকে অধিক আকর্ষণ বোধ করেছেন। প্রতিটি মানুষের মনের গভীরে যে দুর্ভেদ্য এক আদিম অরণ্য থাকে তাকে ফুটিয়ে তোলাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। কবিরাজ হয়ে কৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা মানুষের জীবন দানের ব্রত গ্রহণ করেছিল। ব্রত ভ্রষ্ট হয় রোগীর অমোঘ মৃত্যু এনে দিয়ে। আসলে জগদীশ গুপ্ত কোন রূপক বা ব্যঙ্গের মাধ্যমে নয়, সরাসরি এই ধরণের আপাত মাধুর্যের আড়ালে বিষময় স্বরূপকে এঁকেছেন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। তাঁর “হাড়” গল্পে গলায় মাছের হাড় বেঁধে সনাতনের

মৃত্যু পথে গমনের দৃশ্য। মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে খাওয়ার সময় সনাতনের গলায় চিতল মাছের কাঁটা গলায় বেঁধায় সমস্ত হাসি একমুহূর্তে বদলে গেছে বিষাদে।

"বেহারী আসিয়া হাজির হইলো তখন সনাতনের দেহের আক্ষেপ শান্ত হইয়া গেছে। দেখিতে দেখিতে লোক জমিয়া গেল। ডাক্তার আসিলেন, বলিলেন অ্যাসফিক্সিয়া। মাছের শিরদাঁড়ার হাড়, বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া মধ্যপথে আটকাইয়া আছে।"[১১]

এখানে লক্ষণীয় জগদীশ গুপ্ত মৃত্যু সম্পর্কে সংযত হলেও, নিঃস্পৃহও নন, তাঁর মৃত্যুর ঘটনার মধ্যে কোনও মর-বিডিটি বা রুগ্নতাও পাওয়া যায় না। তার চেয়ে মানুষ কিভাবে মৃত্যুর সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত সংগ্রাম করে টিকে থাকার চেষ্টা করে সেই কথাই তাঁর কলমে প্রকাশ পেয়েছে বারংবার। তাঁর 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' গল্পে দেখি এমনই এক চিত্র। শশাঙ্কের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ভোলা বাপের বাড়ী থাকাকালীন মৃত্যু পথের যাত্রী হয়েছে। গল্পকার তার মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"ভোলা দাসীর পরমায়ু যথার্থই শেষ হইয়াছিল, কি আরো কিছুদিন তিনি বাঁচিলে বাঁচিতে পারিতেন তাহা নির্ণয় করা শক্ত; কিন্তু ভোলা দাসীর মা সে তর্ক তুলিতেই দিলেন না; তিনি বড়াই করিতে লাগিলেন ইহাই বলিয়া যে মা আমার সতীলক্ষ্মী ছিলো, ডাক্তারে তার গা ছুঁলে না।"[১২]

সমকালীন সময়ে পরপুরুষ স্পর্শ করলে দোষ হয়, এই হীন অটুট সতীত্বের ধারণা যেন জীবনের পথে কোথাও যে একটা বাধা সৃষ্টি করেছিল, এবং তার পরিণতিই যে সমাজে একাধিক মৃত্যুকেই ডেকে এনেছিল, তা গল্পকার বুঝেছিলেন। তাঁর "তরঙ্গ থেকে তরঙ্গে" নামক গল্পে আরেক মৃত্যু ঘটনার প্রসঙ্গ। গল্পে গুণবতীর মৃত্যু অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। স্বামীর আগে মরতে পারার সৌভাগ্য কয় জনের হয়। সমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল। মৃত্যুর সকল দুঃখ তারা ভুলে যেতেন এই ভেবে তিনি এয়োস্ত্রী হয়ে মরতে পারছেন। এমন কয়জনের ভাগ্যে থাকে। গুণবতীর কথাতেই সেই আনন্দের কথা প্রকাশ পেয়েছে—

প্রৌঢ় বয়সে একটি সাত বৎসরের পুত্র এবং স্বামীকে রাখিয়া গুণবতী মারা গেলো। গুণবতী মরিবার সময় বলিয়া গেলো, "ছেলের মুখ দেখে ম'লাম; এই আমার ঢের। আশা তো ছিলোই না। কিন্তু বলিলো না যে হাতে শঙ্খ আর মাথায় সিঁদুর লইয়া গেলাম ইহাই আমার সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য।"[১৩]

সমকালীন সাহিত্যিকদের লেখায় বারংবার যে হিন্দু ধারণা প্রাধান্য পেয়েছে—মৃত্যুকালে স্বামীর পদধূলি গ্রহণে সতী নারীর স্বর্গে গমন। জগদীশ গুপ্ত খুব সন্তর্পণে বাস্তবতার প্রসঙ্গ এনে সেই ধারণা থেকে কিছুটা সরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল জহুরির দৃষ্টি। তাই সামাজিক প্রেম ও মৃত্যুকে নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর 'আদি কথার একটি' গল্পে দেখি গল্পকার গো-মড়কের সঙ্গে মানুষের মৃত্যুকে একাসনে রেখে দেখতে চেয়েছেন মানুষের মনের প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি আস্থার অভাব কতটা। আসলে জীবন সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল বলেই তিনি এইরূপ নিষ্ঠুর হতে পেরেছেন। তবে এই মৃত্যু সম্পর্কে

নিঃস্পৃহ মনোভাব, নির্লিপ্ত সংযম বোধ তাঁকে শিল্পী করেছে। গল্পে দেখি "কাঞ্চনের গর্ভে গোপালের দুটি কন্যা জন্মিবার পর গোপাল একদিন তুলসী তলায় শয়ন করিলো। সেটা স্মরণীয় বৎসর; সেবার দেশে গো-মড়কের খুব হুজুগ। গোপাল একটি কন্যার বিবাহ দিয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয়টিকে পার করিবার পূর্বেই সে নিজেই পার হইয়া গেলো।"[১৪]

তাঁর গল্পে মৃত্যুর পাশে জীবন প্রবাহ দুই সমতলে বিরাজমান। তিনি একাধিক গল্পে সন্তানকে মাতৃহারা করে নিয়তির কাছে ছেড়ে দিয়ে দেখেছেন তারা কিভাবে সমাজের সমস্যার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করে টিকে থাকে। 'সুতিনী' থেকে 'তরঙ্গ হইতে তরঙ্গ' পর্যন্ত মৃত্যুর গ্রাসে প্রবীণরাই প্রবলভাবে আক্রান্ত, নবজাতকের রেহাই। 'সুতিনী' গল্পে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু চিত্র আমাদের ভাবিয়ে তোলে। কিভাবে একটার পর একটা মৃত্যুকে বাস্তবের সামনে এনে নিঃস্পৃহ থেকেছেন তিনি। গল্পে দু'বার মৃতবৎসা রাজবালার অন্তিম পরিণতির চিত্র দৃশ্যমান।

"রাজবালার চোখ উল্টাইয়া গেল....গলায় উদগারের মতো একটা শব্দ হইল.... রক্তহীন দেহ কাঁপিতে লাগিল....এবং ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া নয়, নিঃশ্বাস সহজভাবে চলিতে চলিতেই একনিমেষে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। সেই ছেলে, মুক্তিপদ, ধীরে ধীরে বড় হইতেছে।"[১৫]

এখানেই গল্পকার কাহিনির সমাপ্তি করেছেন। অন্ধকার শেষে আলোর দিশায় নব কিশলয়ের ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠার কাহিনিতেই গল্পের সমাপ্ত ঘটেছে, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নয়। তবু সমকালীন একটি সামাজিক সভ্যতার উন্মেষ পর্বে সমাজের অন্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যেও অনেকটা মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে। সাহিত্যিকরা রোমান্টিক সাহিত্য -চেতনা থেকে কিছুটা সরে এসে বাস্তবধর্মী সাহিত্য রচনার প্রতিষ্ঠার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছে। তারই চেষ্টার ফলস্বরূপ কল্লোল থেকে কালি-কলম পর্যন্ত যুগের পটভূমি সৃষ্টি হয়েছে। জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যের মধ্যে যে শৈল্পিকতা ও সত্যতা আছে, মানুষের মনের গোপন অন্ধকারের হদিশ তিনি যে দিতে এসেছিলেন সাহিত্যাঙ্গনে, তাও অনেকে অনুভব করেছেন। জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার একস্থানে লিখেছেন—

"এই দৃষ্টি ঠিক রসদৃষ্টি নয়, কারণ ইহা normal বা সুস্থ নয়, তথাপি ইহাও আর্টের পর্যায়ভুক্ত।"[১৬]

আসলে যারা ছকে বাঁধা গতে বাঁধা দৃষ্টিতে এযাবৎ দেখে আসছিলেন, মন-প্রাণ ভরে প্রেম-প্রকৃতি-ঈশ্বরকে পাথেয় করে একটার পর একটা রোমান্টিকতার জ্বাল বুনে চলেছিলেন তাঁদের কাছে জগদীশ গুপ্ত অসুস্থ বলেই মনে হবে। তাঁদের ভালো মানুষ সেজে থাকার দিন যে শেষ হয়ে এসেছে তা তারা বোঝেন নি বা বুঝতে চান নি। সে কারণেই মোহিতলালের এই স্ববিরোধী উক্তি। এই সোনার চামচ মুখে নিয়ে বড় হওয়া সাহিত্যিকদের কাছে nor-

mal বলতে রোমান্টিক মূল্যবোধই একমাত্র পাথেয় এবং সেটাকেই তাঁরা সুস্থ সাহিত্য বলে মনে করে এসেছেন। সমালোচক সুজিৎ ঘোষ একস্থানে লিখেছেন—জগদীশ গুপ্ত ব্রেখটের "থ্রিপেনী নভেলের মতোই যা কিছু সাবেক, ভালো,- তা না দেখিয়ে, খারাপ, নতুনকে দেখালেন এবং তার মধ্যে দিয়েই মানুষের ভিন্নতর মূল্যবোধ ও অস্তিত্বের বিশ্বাসে উপনীত হলেন। এবং সে কারণেই জগদীশ গুপ্তের নবমূল্যায়ন আবশ্যক হয়ে পড়েছে, পুনঃ পুনঃ তিনি আলোচিত হচ্ছেন। শুধু অস্বাভাবিক ও অসুস্থ হলে তাঁর কালের বহু সাহিত্যিকের মতো জগদীশ পাঠকের স্মৃতিতে হারিয়ে যেতেন।"[১৭]

জগদীশ গুপ্ত বরাবর বাস্তব নিষ্ঠ চোখ দিয়ে দেখেছেন তার সৃষ্টিকে। তাই রচনায় অতি লৌকিকতার কোনও স্থান পায়নি। তিনি 'মাদুলি-কবচ তাবিজ" ('দিবসের শেষে' গল্পে) ও অমোঘ শক্তিসম্পন্ন 'মাদুলি'কে ('সুতিনী' গল্পে) অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দিয়ে বিরোধিতাই করেছেন। এমনকি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্বের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের তুলনায় অবিশ্বাসী মনোভাব, বিশেষত সেই শ্রেণির আদেশকেও জগদীশ গুপ্ত বেশি পশ্রয় দেননি বা বলা ভালো দিতে চান নি। তাই তাঁর 'হাড়' গল্পে চাটুজ্যে মশাই যখন সনাতনকে তার আশীর্বাদ সহযোগে নিদেন দিয়েছেন, ঠিক তখনই সনাতন—চাটুজ্যে মশাইয়ের কথাকে অশ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েছে। এখানেই গল্পকারের ব্রাহ্মণের আশীর্বাদের প্রতি অবিশ্বাসী মনোভাবের পরিচয় মেলে, "ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে সুস্থ দেহে শ্রীবৃদ্ধি হইবে এই কথাটি ভালো করিয়া কানে তুলিল না প্রথম এই সনাতন; এবং ব্রাহ্মণের আদেশ অবহেলিত হইল গ্রামে এই প্রথম।"[১৮]

জগদীশ গুপ্ত মনে করেন, আত্মসম্মানকে আঁকড়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বড়ো কিছুই নেই। আর চূড়ান্ত পর্যায় সেই পথ থেকে ভ্রষ্ট হলেই জীবন মৃত্যু অপেক্ষাও শোকাবহ হয়ে ওঠে। তাঁর কাছে কলঙ্কিত সম্পর্কের থেকে শ্রেয় আত্মসম্মানবোধ। তাঁর গল্পের অধিক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত মা সন্তানের চিন্তায় ব্যকুল। মাতৃত্বের এই রূপকে এতো মূল্যে ও গুরুত্বে তিনি তুলে ধরেছেন বলেই জগদীশ গুপ্তের মৃত্যু-চেতনার মধ্যে জীবনের প্রতি নিষ্ঠা ও স্পৃহাই প্রকাশিত হয়। জগদীশ গুপ্তের গল্পে মৃত্যু যেন এক নতুন মঞ্চ হয়ে নায়ক-নায়িকার গতিপ্রকৃতি তথা ঘটনার অভিমুখ পরিবর্তিত করেছে নতুন আঙ্গিকে। এখানেই জগদীশ গুপ্তের স্বাতন্ত্র্য।

জীবন মৃত্যুর নিরবচ্ছিন্ন ধারা এই বিশ্বের এক অনন্ত প্রবাহ। তাই মৃত্যুকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্তও মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারেননি অথবা অস্বীকার করার প্রচেষ্টাও দেখা যায় না তাঁর সৃষ্টিতে। পরবর্তী কালে বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু প্রমুখ সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্টিতে এই মৃত্যু বোধকে আরও ব্যঞ্জনাময় করেছেন আপন কলমের পরিসরে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। প্রশান্ত প্রামাণিক। মৃত্যু : দর্শন ও বিজ্ঞান। জ্ঞান-বিচিত্রা প্রকাশনী। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা বইমেলা। ২৬ শে জানুয়ারি। ২০০০। পৃ-২২।

২। শ্রীমদ্ভাগবতগীতা। উদ্বোধন কার্য্যালয়। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ। ১৩৬৪। পৃ-৪৭।

৩। **Samuele Bacchiocchi –Immorality or Resurrection – A Biblical Study on Human Nature And Destiny–Chapter – IV – THE BIBLICAL VIEW OF DEATH–Biblical Perspectivesù 4990 Appian Way Berrien Springs Michigan – 49103ù2001– P–123*f***

৪। **Sumit Sarkar –Morrden India - Macmillan– 1984– P.206–26– 257–61.**

৫। সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত)। জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য (প্রবন্ধ — সুজিৎ ঘোষ-মৃত্যুচেতনা এবং জগদীশ গুপ্ত)। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। বইমেলা, ২০১২। পৃ-১৪৩-১৪৪

৬। জগদীশ গুপ্ত। জগদীশ গুপ্ত : রচনাবলী(প্রথম খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। ১৩৬৫। পৃ-৪৫৯-৪৬০।

৭। তদেব। পৃ-৪৬০।

৮। জগদীশ গুপ্ত। জগদীশ গুপ্ত : রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। ১৩৬৫। পৃ-৩২২।

৯। জগদীশ গুপ্ত। জগদীশ গুপ্ত : রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। ১৩৬৫। পৃ-৪৪১।

১০। তদেব। পৃ-৪৯৮।

১১। জগদীশ গুপ্তের গল্প। সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত। ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স। কলকাতা। ১৩৫০। পৃ-১২৯।

১২। তদেব। পৃ-২৫।

১৩। তদেব। পৃ-১১০।

১৪। তদেব। পৃ-৫২।

১৫। জগদীশ গুপ্ত। জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী। সুতিনী। বসুমতী। কলকাতা। ১৯৫৩। পৃ-৪১৩।

১৬। মোহিতলাল মজুমদার। সাহিত্যবিতান। বঙ্গভারতী। কলকাতা। ১৯৪৯। পৃ-৪০১।

১৭। সমরেশ মজুমদার(সম্পাদিত)। জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য (প্রবন্ধ — সুজিৎ ঘোষ-মৃত্যুচেতনা এবং জগদীশ গুপ্ত)। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। বইমেলা, ২০১২। পৃ-১৪৭।

১৮। জগদীশ গুপ্তের গল্প। সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত। ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স। কলকাতা। ১৩৫০। পৃ-১২৪।

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

১. ঋগ্বেদ সংহিতা। ১ম ও ২য় খণ্ড। হরফ প্রকাশনী। কলকাতা। ২০০৩।

২. স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদিত)। উপনিষদ গ্রন্থাবলী। ১৯তম পুনর্মুদ্রিত। উদ্বোধন কার্য্যালয়। ২০১১।

৩. ধীরেন্দ্র দেবনাথ। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ। ২২ শ্রাবণ। ১৪০৭।

৪. শ্রীমৎ অনির্বাণ। মৃত্যু ও জন্মান্তর-প্রসঙ্গ। ওভারম্যান ফাউন্ডেশন। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ। ২০১৮।

৫. জগদীশ গুপ্ত। জগদীশ গুপ্ত : রচনাবলী(প্রথম খণ্ড ও দ্বিতী খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। ১৩৬৫।

৬. ক্ষেত্র গুপ্ত। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (পঞ্চম-খণ্ড)। গ্রন্থনিলয়। কলকাতা। চতুর্থ সংস্করণ। ২০১৩।

এক ব্যতিক্রমী চরিত্র সন্ধানী গল্পকার জগদীশ গুপ্ত

সু বো ধ ম ণ্ড ল

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে জগদীশ গুপ্তের জন্ম, নদীয়া জেলার কুষ্টিয়াতে। নদীয়ার সম্ভ্রান্ত সেনগুপ্ত পরিবারের সন্তান। পিতামহ আনন্দমোহন সেনগুপ্ত সুপ্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী। বাবা, কাকা সকলেই ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। কলকাতার রিপন কলেজ, অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়াশোনা শেষ করে স্টেনোগ্রাফি ও টাইপিংয়ের কাজ শেখেন। বিখ্যাত আইনজীবী পরিবারের সন্তান হয়েও উপার্জনের আশায় টাইপিংয়ের কাজ বেছে নেন। আত্মমর্যাদাবোধের কারণে বার বার চাকরি ছেড়েছেন, সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে চেয়েছেন। প্রথমে 'গুপ্তের গল্প' নামক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে উপার্জন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফাউন্টেন পেনের কালির ব্যবসা শুরু করলেন। ব্যবসায়িক দক্ষতা না থাকার কারণে এবারেও ব্যর্থ, শুরু করলেন পুনরায় টাইপিস্টের কাজ। তবে এবার আর অধীনস্ত চাকুরী নয়, স্বাধীনভাবে টাইপিস্টের কাজ করতে লাগলেন। পারিশ্রমিক নিয়ে কোর্টে বিচারপ্রার্থীদের কাগজপত্র টাইপ করতে লাগলেন। এই সময় থেকে ধীরে ধীরে 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'উত্তরা'র মতো প্রথম শ্রেণির বাংলা পত্রিকাতে লেখালেখি শুরু জগদীশ গুপ্তের। পরে লেখাকেই পেশা করলেন। ১৯৫৪ সাল থেকে ভারত সরকার কর্তৃক সাহিত্যিক পেনশন পেতে শুরু করলেন। তবে লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও পয়সার কাছে তিনি শিল্পীসত্ত্বাকে বিকিয়ে দেননি কখনও। 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' পত্রিকা ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পর এই দুই পত্রিকা ভালো সম্মানমূল্যের বিনিময়ে জগদীশ গুপ্তের সমস্ত গল্পকে তাদের পত্রিকাতে পাঠানোর প্রস্তাব দিলে তিনি স্বসম্মানে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সাহিত্যজীবনে জগদীশ গুপ্ত এক দিনের জন্য নিজের ভাবনা এবং আদর্শ থেকে একচুলও সরেননি। নিজের সাহিত্যভাবনা থেকে সরে পাঠক-মনোরঞ্জনের জন্য একটিও ফরমায়েশি লেখা তিনি লেখেননি। প্রকাশকের ইচ্ছামতো নিজের লেখালিখিকে নিয়ন্ত্রণ করেননি কখনও।

বাংলা সাহিত্যের বিরল ও ব্যতিক্রমী গল্পকার জগদীশ গুপ্ত। সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকে স্বীকৃতি পাননি, অবহেলিত থেকেছেন দীর্ঘদিন। রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে স্বতন্ত্র পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে সাহিত্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে, জগদীশ গুপ্ত প্রথম দিকে সে আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করলেও, অল্পদিনের মধ্যে নিজের লেখালিখির মাধ্যমে সেই আন্দোলনের অংশ হয়েছিলেন। 'কল্লোল' পত্রিকার মূল যে লক্ষ্য স্থির হয়েছিল জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যচর্চার মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে। সরোজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেছেন

"জগদীশ গুপ্ত কল্লোলের কালবর্তী এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও সত্য যে কল্লোলের যা মূল বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত ছিল তা একমাত্র জগদীশ গুপ্তের রচনাতেই অভিব্যক্ত।... কল্লোল বলতে যা বোঝায় তার লক্ষ্যভ্রষ্টতার প্রধান হেতু এই অপরিণত উদ্দেশ্য। জগদীশ গুপ্তের দিকে না তাকালে মনে হয় কল্লোলের সমগ্র প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত রোম্যান্টিক পন্থাবিলাসে পরিসমাপ্ত।"[১]

সমকালে জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যপ্রতিভার মূল্যায়ন হয়নি, আজীবন উপেক্ষিত থেকে গেছেন। মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন অনালোচিত থেকেছেন তিনি। অশোক গুহ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আবুল আহসান চৌধুরী, হীরেণ চট্টোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যসমালোচক তাঁকে নিয়ে আলোচনার পর থেকে বাংলা সাহিত্যে তাঁকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম তাঁর গল্পের প্রশংসা করেন এবং তাঁর সাহিত্য যে 'বিরল ও ব্যতিক্রমী' সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

জগদীশ গুপ্তের সমকালে জনপ্রিয়তা না পাওয়ার অন্যতম কারণ তখন বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক। তিনজনই নিজেদের মতো করে আলাদা ঘরানা তৈরি করে নিয়েছেন। তিনজনই বাংলাসাহিত্যের পাঠকদের আলাদা আলাদা সাহিত্যরস প্রদান করেছেন। লেখালিখির মধ্য দিয়ে নিজেদের মতো করেই পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করে নিয়েছেন। তিন বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু নন বাংলা সাহিত্যে এতদিন পর্যন্ত প্রায় সকল সাহিত্যিক চরিত্রকে নিজেদের মতো করে বানিয়ে নিতেন। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে দেখা চরিত্রদের নিজেদের নিজেদের মতো করে পরিবর্তন করে নিতেন। নিজেদের সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে 'সাহিত্যের চরিত্র' রূপে উপস্থাপন করতেন। জগদীশ গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম তাঁর সাহিত্যের চরিত্রদের 'সাহিত্যের চরিত্র' রূপে না গড়ে সেইসব চরিত্রদের অন্তর্লিন স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপন করলেন, যা বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে একেবারে অপরিচিত। তিনি তাঁর চরিত্রদের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করে একটা আদল দিতে চাননি, চরিত্রদের মনস্তত্ত্বের অন্তর্লিন স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে পাঠকের সামনে আনতে চেয়েছিলেন। এ কারণে পাঠকের কাছে অস্বস্তির কারণও হলো তাঁর 'বিরল ও ব্যতিক্রমী' গল্প উপন্যাসের কাহিনি ও তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা। সমকালের পাঠক তাই জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যকে খুব সহজে গ্রহণ করার ব্যাপারে অনীহা দেখালো। হীরেন চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে বলেছেন "দস্তয়ভ্স্কির **Underground man** বা বিমল কর যাকে বলেছেন জলের তলার মানুষ, তাকে লক্ষণীয় ভাবে আবিষ্কার করেছেন জগদীশ গুপ্ত, এটাই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষ তাঁর সামাজিক জীবনে, অন্যান্যদের সঙ্গে ব্যবহারে যতই মহৎ সাজার চেষ্টা করুক, ভেতরে ভেতরে সে যে পাশব সত্তা লালন করে, সেই স্তর থেকে সে যে খুব উন্নত হতে পারে নি, এই সত্যই জগদীশ গুপ্ত উন্মোচিত করতে চেয়েছেন। মানুষকে তার

এই প্রসাধন ও সভ্যতার নির্মোক সরিয়ে এতো অনাবৃত ভাবে দেখালে মানুষের ভালো লাগার কথা নয়, কারণ মানুষকে সাহিত্যে এভাবে দেখতে আমরা অভ্যস্ত নই। এই কারণেই জগদীশ গুপ্ত মোটেই জনপ্রিয় সাহিত্যিক ছিলেন না। বাংলা সাহিত্যের মুখ্য সমালোচকগণ তাঁর কথাসাহিত্য সম্বন্ধে হয়তো সেই কারণেই তেমন ঔৎসুক্য দেখান নি। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সাহিত্যপাঠের যে ঐতিহ্য ও সনাতন রীতি আমরা এতদিন পর্যন্ত দেখে এসেছি তাতে জগদীশ গুপ্ত এক তীব্র ব্যতিক্রম। মানুষের যেমন হওয়া উচিত অথবা যেমন হলে তাকে আমাদের ভালো লাগে তা নয়, মানুষ প্রকৃতই যা, তার বিশ্বস্ত ছবি একেবারে নির্মোহ দৃষ্টিতে আঁকতে চেয়েছেন জগদীশ গুপ্ত, এখানেই তাঁর মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য।"[২]

বাংলা সাহিত্যের বিরল ও ব্যতিক্রমী কথাসাহিত্যিক হয়েও জগদীশ গুপ্ত সমকালে বিশেষ জনপ্রিয় হননি। কৈশোরে কবিতা লিখলেও তিনি বাংলা সাহিত্যে পরিচিতি লাভ করেছেন কথাসাহিত্যিক হিসেবে। কৈশোরে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে গল্প লেখালেখি করলেও প্রথম গল্প ছাপা হল **'ভারতী' পত্রিকায়, ১৯১১ সালে**। গল্পের নাম 'মির্জার স্বপ্নদর্শন'। 'কল্লোলে'র গল্পকারদের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রখরভাবে তাঁর গল্পে দেখা গেলেও প্রথম দু'বছর 'কল্লোল' পত্রিকায় একটিও গল্প তিনি লেখেননি, তৃতীয় বছর থেকে অর্থাৎ ১৯২৫ সালে তিনি প্রথম 'কল্লোল' পত্রিকায় গল্প লিখলেন, গল্পের নাম দৈবধন'। ১৯২৬ সালে 'উত্তরা' পত্রিকায় লিখলেন 'জ্যাঠানন্দ' ও 'ঠিকানায় বুধবার' গল্প। এই বছর 'কালি-কলম' পত্রিকাতে ও গল্প লিখলেন। এখন থেকে বাংলা ভাষার প্রথম শ্রেণির গুরুপূর্ণ প্রায় সকল পত্রিকায় লেখালিখি করতে লাগলেন তিনি। 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'দিবসের শেষে' ও 'তৃষিত আত্মা' গল্প প্রকাশিত হলো। 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো 'তুফান ও তৈল' গল্প। এভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প, উপন্যাস, কবিতা লেখালিখির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গড়ে উঠল জগদীশ গুপ্তের বিরল ও ব্যতিক্রমী এক সাহিত্য জগৎ।

জগদীশ গুপ্তের প্রথম গল্প 'পেয়িং গেস্ট' 'বিজলী' পত্রিকায় **১৩৩১ বঙ্গাব্দের ২৯ ফাল্গুন প্রকাশিত হয়।** প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'বিনোদিনী' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোর প্রশংসা করেছিলেন। জগদীশ গুপ্তের উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলো হলো 'উদয় লেখা', উপায়ন', 'তৃষিত সৃক্কণী', 'পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক', 'মেঘাবৃত অশনি', 'রূপের বাহিরে', 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী', 'শ্রীমতী', 'অঞ্জন শলাকা', 'ভৃঙ্গার' প্রভৃতি। প্রথম উপন্যাস 'অসাধু সিদ্ধার্থ' প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই উপন্যাসটি পড়ে বিরক্ত হয়েছিলেন। 'অসাধু সিদ্ধার্থ' ছাড়া তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'কলঙ্ক', 'কলঙ্কিত তীর্থ', 'গতিহারা জাহ্নবী', 'তাতল সৈকতে', 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা', 'দুলালের দোলা', 'নন্দ আর কৃষ্ণা', 'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ', 'নিষেধের পটভূমিকায়', 'মহিষী', 'যথাক্রমে', 'রতি ও বিরতি', 'রোমন্থন', 'লঘুগুরু', 'সত্রভোগ', 'সুতিনী' প্রভৃতি।

প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'অক্ষরা' প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। এছাড়া প্রকাশিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ 'তুলসী', 'কশ্যপ ও সুরভী' প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জগদীশ গুপ্তের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বিনোদিনী'র প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'ছোটগল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখীহইলাম।'[৩] রবীন্দ্রনাথের মতোই জগদীশ গুপ্ত খুশি করতে পেরেছিলেন বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র 'রূপ ও রস' সন্ধানী একশ্রেণীর পাঠককুলকে। রবীন্দ্রনাথ জগদীশ গুপ্তের গল্পের প্রশংসা করলেও তিনি রবীন্দ্র অনুসারী না হয়ে রবীন্দ্রনাথের বিপ্রতীপে তাঁর সাহিত্যচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করেররীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বিকল্প এক সাহিত্যধারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'উত্তরা-প্রগতি-কল্লোল-কালি কলম' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে 'কল্লোল গোষ্ঠী' গড়ে উঠেছিল জগদীশ গুপ্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য; অবশ্য ব্যতিক্রমও। একেবারে স্বতন্ত্রভাবে তিনি তাঁর সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। কল্লোল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হয়েও তাঁর লেখাগুলো ছিল কল্লোলের উদ্দেশ্যবাহক। বাস্তব জীবন ও মানুষের প্রকৃত চরিত্রই তাঁর গল্পের বিষয়। সাহিত্যজীবনে যে শতাধিক গল্প তিনি লিখেছেন তার একটি গল্পকেও তিনি ফরমায়েশি গল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাননি। তাঁর গল্পের কাহিনি পাঠককে অস্বস্তিতে ফেলে, চরিত্রগুলোও কখনও কখনও পাঠকের ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে। আসলে সমাজবাস্তবতাকে তিনি পাঠকের সামনে হাজির করেন। যেমন চরিত্রদের তিনি দেখেন, ঠিক তেমনিই তিনি তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেন, চরিত্রদের নিজের মতো করে দেখানোয় বিশ্বাসী, পাঠকের ভালোলাগার মতো করে দেখাতে তিনি আগ্রহী নন, যা বাংলা সাহিত্যে তাঁকে একেবারে ব্যতিক্রমী করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত—

"সাহিত্যসৃষ্টিতে আমরা যা দেখে থাকি তা এই রকম যে, বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিক মানুষের গুঢ় মনস্তত্ত্বই অনাবৃত করার চেষ্টা করেন, আর ন্যাচারালিস্টরা চেষ্টা করেন মানুষের আদিম সত্ত্বাটি অর্থাৎ পাশব প্রবৃত্তি তুলে ধরার। মানুষ ওপরে যতোই পরিশীলিত হবার চেষ্টা করুক, আদিম সত্তায় তার জাগরূক আছে দুটি প্রবৃত্তি একটি তার কামপ্রবৃত্তি, অন্যটি অর্থলিপ্সা। এছাড়া ন্যাচারালিস্টদের ধারণা, মানুষ অদৃষ্টের হাতে অসহায় পুতুল মাত্র, স্বাধীন ইচ্ছা বলে তার কিছু নেই কোনো স্বাধীন ইচ্ছাই অন্ধ নিয়তি সফল হতে দেয় না। এই কারণে বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিকরা যখন মধ্যবিত্ত সমাজকেই প্রধান অবলম্বন হিসাবে বেছে নেন, ন্যাচারালিস্টরা বেছে নেন সাধারণত নিচু শ্রেণীর মানুষকে, কারণ তাদের মধ্যে কৃত্তিমতা অনেক কম, সভ্যতার প্রলেপ তাদের মধ্যে অল্প পড়েছে বলেই সাহিত্যিক চরিত্র হিসাবে তাদের পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা অনেক বেশি।"[৪]

জগদীশ গুপ্ত মানব মনের অতল অন্ধকারে তাঁর অনুসন্ধান চালিয়েছেন। নিজস্ব দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করেছেন মানব চরিত্রকে এবং মানব মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন নিজের মতো

করে। কখনও ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণী তত্ত্বের নিরিখে মানব মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান করেছেন মানুষের মনের মধ্যে নিহিত সুপ্ত বাসনা, তার জৈবিক প্রবৃত্তি। মানুষের অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা মানুষের চরিত্রকে কতটা প্রভাবিত করে, কিভাবে তার চরিত্রকে পরিচালিত করে, প্রতারিত করে তার দৃষ্টান্ত আমরা জগদীশ গুপ্তের গল্পে পাই। মানুষের মধ্যের অর্থলীপ্সা মানুষকে কতটা হীন, নীচ করে তোলে, এমনকি অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজে তাড়িত করে তা অত্যন্ত নিষ্ঠুর অক্ষরে লিখেছেন তাঁর গল্পে। 'বিরল ও ব্যতিক্রমী চরিত্র সন্ধানী গল্পকার জগদীশ গুপ্ত' নিবন্ধে আমরা তাঁর 'পয়োমুখম' ও 'চন্দ্র-সূর্য যতদিন' গল্পের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বক্তব্য প্রসারিত করতে চাইবো।

জগদীশ গুপ্তের প্রথম গল্প সংকলন 'বিনোদিনী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প 'পয়োমুখম'। রবীন্দ্রনাথ 'বিনোদিনী' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোর মধ্যে 'বিশেষ রূপ ও রস'-এর সন্ধান পেয়েছিলেন। 'পয়োমুখম' গল্পের বিষয় বাংলার সমাজের তো বটেই সাহিত্যেরও অতি পরিচিত একটি বিষয় পণপ্রথা। তবে পণপ্রথাকে অবলম্বন করে এ গল্প লেখা হলেও জগদীশ গুপ্তের কলমে উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী একটা গল্প হয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে 'পয়োমুখম'।

গল্পের কাহিনিতে দেখা যায় কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা কবিভূষণ একজন অর্থলোভী মানুষ। অর্থলোলুপতা তাকে পিশাচ করে তুলেছে দিন দিন। কৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা ছেলে ভূতনাথকে কবিরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা করে। লেখাপড়া শেষ করার আগে ভূতনাথকে সাতশত টাকা পণের বিনিময়ে ন'বছর বয়সী মণিমালিকার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দেয়। কিন্তু ভূতনাথের দাম্পত্যজীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় না সামান্য জ্বরে মণিমালিকার মৃত্যুতে। কবিরাজ কৃষ্ণকান্তের দেওয়া ওষুধ খেয়েও বাঁচে না ভূতনাথের বালিকা স্ত্রী। মণিমালিকার মৃত্যুর অল্পদিন বাদে কৃষ্ণকান্ত পুনরায় ভূতনাথের বিবাহের আয়োজন করে। আপত্তি থাকা সত্ত্বেও দেবাদিদেব মহাদেবের দু'বার বিবাহের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তাকে বিবাহে সম্মত করে পিতা কৃষ্ণকান্ত। পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা পণের বিনিময়ে অনুপমার সাথে ছেলে ভূতনাথকে বিবাহ দেওয়া হয়। অনুপমা সংসারে আসার পর কৃষ্ণকান্তের পাটের ব্যবসায় ভালো লাভ হতে শুরু করে। কিন্তু সংসারের ওঠাপড়ার নিয়মে কৃষ্ণকান্তের সংসারের অবস্থার পরিবর্তন হয়, সংসারের আয় উন্নতি কমতে শুরু করে। অনুপমাও অসুস্থ হয়। প্রথমে জ্বর, জ্বর সেরে যাবার পর বমি। শেষে 'ধাত ভেঙে' 'অনুপমা মণিমালিকার অনুগমন করিল।' অনুপমার মৃত্যুর পর, 'মরিবে তো সবাই, দুদিন আগে, দুদিন পরে। ... মূর্খ আর বলে কাকে! স্ত্রী মারা গেলে তার ধ্যানেই যাবজ্জীবন কাটাইয়া দিতে হইবে ইহা কোন শাস্ত্রের কথা!'[৫] এমন নানাবিধ কথা বলে ভূতনাথের আবার বিবাহের আয়জন করলো। 'পণ ও পাত্রী ঠিকই ছিল দু-দশদিন অগ্রপশ্চাৎ কৃষ্ণকান্ত দুটিকেই ঘরে তুলিলেন।' এবার আটশত টাকা পণের বিনিময়ে কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথকে তৃতীয়বার বিবাহ দিলেন। শুধু

আটশত টাকা পণেতেই সন্তুষ্ট হলো না কৃষ্ণকান্ত, ভূতনাথের তৃতীয়া পত্নী বীণাপাণির গায়ের রঙ কালো হবার কারণে মাসে মাসে মাসোহারা দিতে হয় তার পিতাকে। ভূতনাথ ও সংসারের অন্য সকলের অজান্তে সে মাসোহারা আসে কৃষ্ণকান্তের কাছে মানি অর্ডারের মাধ্যমে। এ সকল কারণে কৃষ্ণকান্তের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করে বীণাপাণি। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত বাড়ি না থাকা অবস্থায় বীণাপাণির বাবার পাঠানো মাসোহারার টাকার মানি অর্ডার আসলে ভূতনাথের কাছে ধরা পড়ে যায় কৃষ্ণকান্ত। ছেলের কাছে ধরা পড়ে যাবার পর উপরি উপার্জন বন্ধ হয়ে যাবে, তাই বীণাপাণির প্রতি কৃষ্ণকান্তের ব্যবহারের পরিবর্তন হয়। বীণাপাণি অসুস্থ হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী কৃষ্ণকান্ত অসুস্থ বীণাপাণির জন্য লুকিয়ে 'খল' নিয়ে আসে। কিন্তু ভূতনাথ সে 'খল' খেতে দেয় না। ওষুধের বাটি নিয়ে বাবার কাছে গিয়ে বলে—

'এ বৌটার পরমায়ু আছে, তাই কলেরায় মরল না বাবা। পারেন তো নিজেই খেয়ে ফেলুন। বলিয়া ঔষধসমেত হাতের খল আড়ষ্ট কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে নামাইয়া দিল।'[৬]

গল্পের শেষে ভূতনাথের কাছে ধরা পড়ে যায় কৃষ্ণকান্তের অভিসন্ধি।

জগদীশ গুপ্ত গল্পের কাহিনিতে পণপ্রথাকে নিয়ে আসলেন। পিতা কৃষ্ণকান্ত নিজের সন্তানকে বিবাহের আয়োজন করলো বার বার। পণ প্রথার মতো চিরাচরিত সামাজিক কু-প্রথা নিয়ে গল্পের কাহিনি গড়ে তুললেও, সে কাহিনীর মধ্যে আনলেন এক ব্যতিক্রমী ভাবনা; যা বাংলা সাহিত্যে নতুন। কৃষ্ণকান্ত নিজের সন্তানকে বার বার বিবাহ দিয়েছে শুধুমাত্র পণের অর্থ লাভ করার লোভে। মণিমালিকা, অনুপমা এবং বীণাপাণির সঙ্গে পর পর সে তার ছেলে ভূতনাথকে বিবাহ দিয়েছে শুধু পণের অর্থ লাভ করার জন্য। অর্থের মোহে নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ বিষয়ে একটু ভাবলো না সে।

অর্থলোলুপতা মানুষকে কতটা অমানবিক করে তোলে ও ক্রমশঃ অপরাধমূলক কাজে প্ররোচিত করে তার এক নির্মম দৃষ্টান্ত 'পয়োমুখম'। কৃষ্ণকান্ত শুধু পণের টাকার লোভে নিজের সন্তান ভূতনাথকে সুখের সংসার করতে দেয়নি। পণের টাকার লোভে নিজের সন্তানকে তিন তিন বার বিবাহ দিয়েছে। পিতার কাজ নিজের সন্তান যাতে সুখে থাকে, আনন্দে থাকে সে ব্যবস্থা করা, অথচ নিজের সন্তানের জীবনকে বিষময় করে তুলেছে কৃষ্ণকান্ত অর্থের লোভে। পিতার দায়িত্ব অস্বীকার করে নিজের সন্তানের একটা নিশ্চিত ও সুখি সংসারজীবনের বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা না করে সে তিন তিন বার সন্তান ভূতনাথকে বিবাহ দিয়েছে। এক অনিশ্চিত ও অস্বস্তিকর জীবনের দিকে বার বার ঠেলে দিয়েছে নিজের সন্তানকে। অর্থের লোভের কারণে নিজের সন্তানের প্রতি ব্যবহারে যে অমানবিক ও পৈশাচিক আচরণের দৃষ্টান্ত সে স্থাপন করেছে, তা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিরল ও ব্যতিক্রম।

অর্থের লোভ কখনও কখনও মানুষকে অপরাধমূলক কাজে পরিচালিত করে, যার এক

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'পয়োমুখম' গল্পের কৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা। কৃষ্ণকান্ত নিজের সন্তানকে নিশ্চিত সংসারজীবন করতে না দিয়ে ও নিজের সন্তানের জীবনকে বার বার ক্ষতবিক্ষত করে বাংলা সাহিত্যে এক ঘৃণ্য পিতার যেমন অমানবিক উদাহরণ হয়ে উঠেছে, তেমনি আবার পণ আদায়ের মাধ্যমে অর্থলাভের মোহে একের পর এক পুত্রবধূদের হত্যা করে একজন ঘৃণ্য অপরাধী হয়ে উঠেছে সে। প্রথমে ন'বছরের ফুটফুটে বালিকা মণিমালিকাকে নিজে পছন্দ করে এনেছে পুত্রবধূ করে, তাকেই হত্যা করেছে। ছেলে ভূতনাথকে বিয়ে দিয়ে মোটা টাকা পণ নিয়ে সে ক্ষান্ত হয়নি, নতুন করে পণ আদায়ের জন্য সে ফুলের মতো ফুটফুটে কন্যাসম বালিকা মনিমালিকাকে তার কবিরাজিবিদ্যা প্রয়োগ করে হত্যা করেছে। পণ আদায়ের জন্যই সে এ কাজ যে করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন দেখি মণিমালিকার মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যে ভূতনাথের অমত সত্ত্বেও তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়। এবং দ্বিতীয়বার ভূতনাথের বিবাহ দিয়ে সাড়ে পাঁচশত টাকা পণ আদায় করে। সুন্দরী বাকপটু প্রাণচঞ্চল অনুপমা সংসারে আসার পর কৃষ্ণকান্তের সংসারে আয় বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু যখন আবার সংসারের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে তখন সে প্রাণচঞ্চল পুত্রবধূ মণিমালিকাকে কলেরা রোগের জীবাণু খাইয়ে হত্যা করে। মণিমালিকাকে হত্যা করে ছেলের তৃতীয় বিবাহের প্রস্তুতি শুরু করে। ভূতনাথ রাজি না হলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে দার্শনিক নানান কথাবার্তা শুনিয়ে পিতার নিকট সর্বদা ভীত ও অনুগত ভূতনাথের তৃতীয় বিবাহের বন্দোবস্ত করে। গায়ের রঙ কালো হওয়ার কারণে বীণাপাণির সঙ্গে আটশত টাকার পণ এবং মাসিক পঞ্চাশ টাকার মাসোহারার বিনিময়ে এই বিবাহ হয়। মাসোহারার ব্যাপারটা সকলের কাছে ছিল অগোচর। মাসোহারার বিষয়টি ভূতনাথ জেনে ফেলায় উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কবিরাজি বিদ্যা প্রয়োগ করে বীণাপাণিকে খুন করার পরিকল্পনা করতে থাকে পুনরায়। এবার অসুস্থ বীণাপাণিকে 'খল' খাইয়ে হত্যার পরিকল্পনা করলে কবিরাজি বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠা ভূতনাথ তা ধরে ফেলে। এবং বীণাপাণির জীবন রক্ষা হয়। অর্থাৎ গল্পের কাহিনি জুড়ে পণের টাকার লোভে কৃষ্ণকান্ত নিজের সন্তানকে বিবাহ দিয়ে এবং পুত্রবধূদেরকে কবিরাজিবিদ্যা প্রয়োগ করে একের পর এক যেভাবে হত্যা করেছে তাতে তাকে শুধু অমানবিক ও অর্থলোভী নয়, এক পিশাচ ও অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়।

জগদীশ গুপ্ত 'পয়োমুখম' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণকান্ত শর্মা চরিত্রের অর্থলোভী পৈশাচিক রূপকে নির্মম অক্ষরে পাঠকের সামনে আনলেন। কৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা নিজের সন্তানের সুখি সংসারকে বিপন্ন করে, সন্তানের ভবিষ্যতের বিনিময়ে যেভাবে অর্থ উপার্জন করেছে এবং অর্থ উপার্জন করার জন্য কন্যাসম পুত্রবধূদের একের পর এক হত্যা করেছে তাতে বাংলা সাহিত্যের এক কলঙ্কিত ও ঘৃণিত চরিত্র হিসেবে ব্যতিক্রমী হয়ে থাকবে। অর্থের লোভে কৃষ্ণকান্তের ব্যবহার ও তার অপরাধমূলক কাজ পাঠককুলকে আতঙ্কিত ও শিহরিত করে।

মানুষের অর্থলোলুপতার আর একটি অমানবিক আখ্যান জগদীশ গুপ্তের 'চন্দ্র সূর্য্য

যতদিন'। বিশ শতাব্দীর সভ্য সমাজের মধ্যে থাকা মানুষেরা অর্থের মোহে মানুষকে কতটা অমানবিকতার পথে নিয়ে যায়, মানবিক মূল্যবোধহীনতার পথে চালিত করে, মানুষকে প্রতিমুহূর্তে কতটা অপমান ও অমর‌্যাদা করে তা অত্যন্ত নির্মোহ ও নিরাসক্তভাবে উপস্থাপন করেছেন এ গল্পের কাহিনিতে।

গল্পের কাহিনিতে দেখা যায় দীনতারণ প্রথম স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা ও আটমাসের পুত্রসন্তান থাকতে স্বর্ণপ্রভার ছোটবোন, তার একমাত্র শ্যালিকাকে বিবাহ করে। গল্পকার এই বিবাহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন,

"এক স্ত্রী বর্তমানে দীনতারণের দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার কারণ শ্বশুরমহাশয়ের সম্পত্তি। প্রফুল্লকুমারী অন্য ঘরে গেলে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ বাহির হইয়া যাইত সম্পত্তিও সামান্য নয়।"[৭]

সম্পত্তির লোভে দীনতারণ শ্যালিকাকে বিবাহ করে, সম্পত্তির লোভে দীনতারণের পিতা জগত্তারণ পুত্রবধূ থাকতেও একমাত্র পুত্রকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেয়, আরও আশচর্যের বিষয় নিজের সম্পত্তি যাতে ভাগাভাগি না হয় সেজন্য স্বরূপচন্দ্র নিজের ছোটমেয়েকে বড়মেয়ের স্বামীর সঙ্গে অর্থাৎ জামাইয়ের সঙ্গে বিবাহ দেয় অতি উৎসাহে।

গল্পকার জগদীশ গুপ্ত গ্রাম্য সমাজব্যবস্থার মধ্যে থাকা মানুষদের সামন্ততান্ত্রিক স্বভাবচরিত্রকে তুলে ধরলেন। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধিদের অর্থের মোহ আর অন্যদিকে সেই সমাজের পুরুষ প্রতিনিধিদের নারীকে ভোগ করার মানসিকতাকে তুলে ধরলেন। গল্পের কাহিনিতে দেখালেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষদের অর্থের মোহ আর নারীকে ভোগ করার মানসিকতার কারণে নারীজীবনের অপমান, অবমাননা। সামন্ততান্ত্রিক এই ভোগবাদী পুরুষ প্রতিনিধিরা ভোগ করার মোহে কিভাবে নারীদের জীবনকে প্রতিনিয়ত বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করে তার এক অমানবিক চিত্র গল্পে তুলে ধরেছেন।

সামান্ততান্ত্রিক মানসিকতার জগত্তারণ বেয়াইমশাইয়ের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য নিজের সন্তানের সুখি সংসারের ভবিষ্যৎ ভাবেনি, চিন্তা করেনি নিজের পুত্রবধূর সংসারজীবনের শান্তির কথা। সম্পত্তির মোহে সে পুত্র দীনতারণের স্বর্ণপ্রভার মতো সুন্দরী স্ত্রী ও আটমাসের পুত্র সন্তান থাকা সত্ত্বেও পুত্রবধূর ছোটবোনকে ছেলের দ্বিতীয়পক্ষ করে এনেছে। আর জগত্তারণের এই সম্পত্তির লোভের কারণে স্বর্ণপ্রভার সুখি দাম্পত্য জীবনে এসেছে বিপত্তি। কিন্তু এর চেয়েও আরও অমানবিকতা সূচিত হয়, আমাদের আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি, নিজের সম্পত্তি যাতে ভাগাভাগি না হয় ও পণ দিয়ে অর্থের অপচয় না করতে হয় সেজন্য স্বরূপচন্দ্র নিজের ছোটমেয়ে প্রফুল্লকুমারীকে বড়মেয়ের স্বামীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার আয়োজন করতে দেখে। সম্পত্তির ভাগাভাগি বাঁচাতে ছোটমেয়ে প্রফুল্লকুমারীকে বড়োমেয়ে স্বর্ণপ্রভার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে নিজের ছোটমেয়ের ভবিষ্যৎ শুধু নষ্ট করলো না, একই সঙ্গে বড়মেয়ে স্বর্ণপ্রভার সুখি দাম্পত্য জীবনকে বিষিয়ে দিলো।

নিজের সহোদরা যখন সতীন হলো, তখন স্বর্ণপ্রভার সংসারজীবনে আসলো বিপত্তি। পিতা ও শ্বশুরের সম্পত্তির লোভের কারণে স্বর্ণপ্রভার একমাত্র সহোদরা আজ তার সতীন। দীনতারণের সঙ্গে সংসার করতে গিয়ে স্বর্ণপ্রভা উপলব্ধি করেছে স্বামী দীনতারণের ভোগবাদী ও নারীলোলুপ চরিত্রকে। নিজের ভবিষ্যতের সর্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাই সে ভেবেছে সহোদরার অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথা

"প্রফুল্লর প্রসাধনের দিকে নিঃস্পৃহ চক্ষে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ক্ষণপ্রভার মনে হইলো, ইহার অদৃষ্টও তো তাহারই মতো; উর্ণনাভের তন্তুকেই এ-ও প্রেমের বন্ধন বলিয়া ভুল করিতেছে; ভোগের কেবলি বর্ধিষ্ণু ক্ষুধার মুখে আহার তুলিয়া দিয়া এও মনে করিতেছে জীবনের চরিতার্থতার কিছু বাকি রহিলো না। কিন্তু যেদিন আত্মার ক্ষুধার দাবি মিটাইবার দিন আসিবে সে-দাবি যখন আর কোনো কথা কানে তুলিতে চাহিবে না তখনই মায়াবীর এই স্বপ্নপুরীর চিহ্নও রহিবে না... দেখিতে হইবে, সব শূন্য। পৃথিবী সবের মতো অসাড়; বৃথা সে অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়াছে...।"[৮]

জগদীশ গুপ্ত 'চন্দ্র-সূর্য্য যতোদিন' গল্পে গ্রাম্য সমাজের সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা লালন করা মানুষদের অর্থের লোভ, নারীকে মানুষ হিসাবে মনে না করার প্রবণতা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারীলোলুপতার বিষয়গুলোকে সামনে এনেছেন। গল্পের চরিত্র-পাত্র এবং কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার মানুষগুলোর অর্থের অসীম মোহ। একদিকে একজন পিতা তার দুই কন্যার সুখি সংসারজীবনকে বিপন্ন করেছে নিজের সম্পত্তি যাতে ভাগাভাগি না হয় এবং পণ দিয়ে সম্পত্তির অপচয় থেকে রেহাই পেতে। অন্যদিকে আর এক পিতা নিজের একমাত্র সন্তানের সুখি সংসারজীবন বিপর্যস্ত করেছে বেয়াইমশাই স্বরূপচন্দ্রের সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশটুকু আত্মসাৎ করার লোভে। অবশ্য দীণতারণ তার সংসারের বিপর্যয় উপলব্ধি করতে পারি নি। কারণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধি সে নিজেও। সে চেয়েছে শ্বশুরের সম্পত্তির সম্পূর্ণটুকু আত্মসাৎ করতে এবং শ্যালিকা প্রফুল্লকুমারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহন করে ভোগ করতে। মাঝখান থেকে নারীলোলুপ অর্থলোভী মানুষগুলোর লোভের কারণে বিপন্ন হয়েছে দুটি নারীজীবন। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে, নিজের বোনের ভবিষ্যৎ ভেবে দিশাহীন হয়ে পড়েছে স্বর্ণপ্রভা। অর্থলোভী মানুষগুলো কর্তৃক সহোদরাকে সতীন করে পাঠানোর ফলে যখন তার সংসারজীবনে বিপত্তি ঘনিয়ে আসলো, স্বামীর নারীলোলুপতার চরিত্র যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন সে মানসিকভাবে ভীষণ আঘাত পেলো। স্বামীর কাছে একমুহূর্ত আর সে থাকতে চাইল না

"এই শয্যায় প্রবেশ করিতে তার গা ঘিন ঘিন করিতেছে;... অদূরবর্তী ঐ লোকটা কেবল একটা মাংসপিণ্ডযেমন কদর্য্য তেমনি লোলুপ; তার মাংসাশী দেহটা যেন সর্বাঙ্গ দিয়া হা করিয়া আছে... মন দিয়া ঐ দেহস্পর্শ করা সে যেন স্মরণাতীত কোন যুগে পরিত্যাগ করিয়াছে।"[৯]

এবং গল্পের শেষে দেখা যায় স্বর্ণপ্রভা রাতে বাড়ি ছেড়ে সন্তানকে নিয়ে চলে যায়। লোকে যখন তাকে ধরে নিয়ে আসে তখন সে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ। 'সম্পূর্ণ উন্মাদ; কিন্তু ছেলেটি বুকে আছেই।'

জগদীশ গুপ্ত তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজের অন্ধকারময় দিক গুলোতে আলোকপাত করতে চেয়েছেন। ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণী তত্ত্বে যেমন মানুষের সুপ্ত বাসনা, যৌনাকাঙ্খাকে বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি সভ্য সমাজের মানুষের অন্তরের গভীরে লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন প্রবৃত্তি, তাদের আপাত ভালো স্বভাবের আড়ালের অপরাধপ্রবণ অমানবিক চরিত্রের দিক তুলে ধরতে চেয়েছেন। গ্রাম্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা পোষণ করা পুরুষদের নারীর উপর অত্যাচার-লাঞ্ছনা, নারীকে অপমান করা, মর্যাদাহীনের চোখে দেখার প্রবণতা গুলোকে অত্যন্ত নির্মম অক্ষরে লিখেছেন। আপাত নিরীহ মানুষেরা অর্থের লোভে কতটা নির্মম ও হৃদয়হীন হয়ে ওঠে, অর্থের মোহে অন্ধ হয়ে একের পর এক অমানবিক ও অপরাধমূলক কাজ করে চলে তা বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী বিশ্লেষণে হাজির করেছেন। 'পয়োমুখম' ও 'চন্দ্র-সূর্য্য যতোদিন' গল্পে অর্থলোভী মানুষদের যে অমানবিক, নির্মম, নৃশংস ও পৈশাচিক প্রতিমূর্তি উপস্থাপন করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। সমগ্র সাহিত্যজীবনে ফরমায়েশি লেখা লেখেননি। পাঠকমনোরঞ্জনের জন্য প্রকাশকের ইচ্ছামতো নিজের লেখনীকে পরিচালিত না করে সমাজের একেবারে ব্যতিক্রমী চরিত্রদের সন্ধান করে গেছেন। এজন্য তাঁর গল্পের কাহিনি পাঠকের কাছে একেবারে অপরিচিত, চরিত্রগুলোও একেবারে ব্যতিক্রমী, জগদীশ গুপ্তের আগে বাংলা সাহিত্যের পাঠক এসব চরিত্রদের দেখেনি। আর এ কারণেই জগদীশ গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে পরিচিতি লাভ করেছেন বিরল ও ব্যতিক্রমী চরিত্র সন্ধানী গল্পকার পরিচয়ে।

উল্লেখপঞ্জি

১। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', 'নতুন সাহিত্য ভবন', প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৮, পৃ. ২৬৮
২। হীরেন চট্টোপাধ্যায়, 'জগদীশ গুপ্ত', 'সাহিত্য অকাদেমি', দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ১৭-১৮
৩। তদেব, পৃ. ৩৫
৪। তদেব, পৃ. ৩৮
৫। জগদীশ গুপ্ত, 'পয়োমুখম', 'জগদীশ গুপ্তর গল্প', ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স' 'প্রথম মুদ্রণ, ১৩৫০, পৃ. ১৭
৬। তদেব, পৃ. ২৪
৭। 'চন্দ্র-সূর্য্য যতোদিন', তদেব, পৃ. ৩৫
৮। তদেব, পৃ. ৪৮
৯। তদেব, পৃ. ৪৯

গোকুল নাগের গল্প : 'ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ'

প্রী ত ম চ ক্র ব র্তী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' বইতে 'কল্লোলে'র যে প্রতিনিধির উল্লেখ সবার আগে করেছেন তিনি গোকুলচন্দ্র নাগ, 'কল্লোলে'র সহ-সম্পাদক। 'বেহালা বাজিয়ের মত চেহারা'র সেই লোকটির প্রতি অচিন্ত্যকুমারের মন তখনও বিশেষ 'প্রসন্ন' ছিল না; ভবানীপুরের রাস্তায় বা ট্রামে যাকে দেখে 'কেমন যে দূর ও দাম্ভিক মনে হত। মনে হত লম্বা চালের লোক, ধরাখানাকে যেন সরা জ্ঞান করছে।'[১] অথচ বন্ধু সুবোধ দাশগুপ্ত ওরফে নানকুর সঙ্গে যখন নিউমার্কেটে গেছেন গোকুল নাগের সঙ্গে দেখা করতে, তখন মামার ফুলের দোকানে তাঁকে দেখে বদলেছে ধারণা—

'সেদিন একান্তে তার কাছে এসে স্পষ্ট অনুভব করলাম, চারপাশের এই রাশীভূত ফুলের মাঝখানে তার হৃদয়ও একটি ফুল, আর সেই ফুলটিও সে অকাতরে বিনামূল্যে যে কারুর হাতে দিয়ে দিতে প্রস্তুত।'[২]

মনে রাখতে হবে তিনি মামাদের আশ্রয়ে থেকে দোকান খুলতে বাধ্য হলেও 'ব্যবসা করতে' বসেননি। তাঁর 'চরিত্রের বিশালতা', 'বড় শিল্পীমন' আর চোখে 'সন্ধানের আলো' প্রত্যক্ষ করে অচিন্ত্যকুমার আবারও জানাচ্ছেন,

'শিশির-ভেজা গাঢ়-সবুজ ঘাসের ওপর গোকুল হাঁটছে খালি পায়ে। বোধহয় আমাদেরই প্রতীক্ষা করছিল। তার সেদিনের সেই বিশেষ চেহারাটি বিশেষ একটা অর্থ নিয়ে আজও আমার মনের মধ্যে বিঁধে আছে। যেন কিসের স্বপ্ন দেখছে সে, তার জন্যে সংগ্রাম করছে, প্রাণপণ প্রতীক্ষা করছে পিপাসিতের মত। অথচ সংগ্রামের মধ্যে থেকেও সে নির্লিপ্ত, নিরাকাঙ্ক্ষিত। জনতার মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ অনন্যসহায়।'[৩]

হয়ত সৃষ্টিশীল মানুষেরা এমনই হয়, বহুজনের মাঝেও যাঁরা 'অপূর্ব একা'। নাহলে নিজের ব্যাগে পড়ে থাকা দেড় টাকা আর দীনেশরঞ্জনের দুই, সেই সাড়ে তিনটাকা নিয়ে 'কল্লোলে'র পরিকল্পনা করতেন না। চৈত্র সংক্রান্তিতে জেলেপাড়ার সঙ দেখার ভিড়েই নতুন পত্রিকা প্রকাশের জন্য হ্যান্ডবিল বিতরণ শুরু করেছিলেন, এভাবেই সেদিন খুব সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যে এক মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন তাঁরা।

সেই 'কল্লোলে'র 'প্রথম ঋত্বিক' গোকুলচন্দ্র নাগ সম্পর্কে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী জানাচ্ছেন— 'গোকুল ছিলেন অনন্য স্পর্শাতুর মনের অধিকারী, স্বভাব-শিল্পী যথার্থত মরমিয়া; মর্মের মর্মযাতনায় ভুগেছেন; নিঃশব্দ বিদ্রোহেও জড়িত হয়ে পড়েছিলেন কখনো কখনো। আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন, ছবি এঁকেও দক্ষতা দেখিয়েছেন মামাদের ব্রাহ্ম সুরুচি-সুনীতিবোধের নিরিখে যা ছিল জাত খোয়ানোর সমতুল। বেহালা বাজাতেন; লিখে তো পরবর্তীকালে 'পথিক'-বৃত্ত নিজের দেশকালকে অমরতাই দিয়ে গেছেন। অভিনয়

জগতের সঙ্গেও যুক্ত হতে হয় 'পেটের তাগিদেই'। জীবিকাহীন জীবনের দায়ে মামার ফুলের দোকান চালাবার দায়িত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল। ফুল বিক্রী নয়, ফুলের প্রেম ছিল তার অন্তরের সাধন। আন্তর প্রবণতায় গোকুল ছিলেন মূর্তিমন্ত 'চতুষ্কলা', চারুশিল্প, গান, সাহিত্য ও কারুশিল্প।'[৪]

গোকুল নাগ 'সোল অফ এ শ্লেভ' বা 'বাঁদীর প্রাণ' নামে একটি নির্বাক চলচ্চিত্রে শুধু অভিনয়ই করেননি, ছবির 'ড্রাফটম্যান আর্টিস্ট' এর ভূমিকাতেও তাঁকে পাওয়া যায়। 'বাঁদীর প্রাণ'এ ধর্মপাল হয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী আর তাঁর সহচর রাহুসেন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন গোকুল নাগ। 'কল্লোল' প্রকাশের পর যে স্বল্পকাল গোকুল নাগ জীবিত ছিলেন ততদিন পত্রিকার সম্পাদনার কাজ তিনি একাই সামলেছেন (সার্বিক পরিচালনার ভার ছিল দীনেশরঞ্জন দাশের ওপর)। এমনকি 'কল্লোল'-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই হাতে 'নাড়া' বেঁধে দিলেন গোকুল নাগ ধারাবাহিক উপন্যাস 'পথিক' লিখতে শুরু করে। নতুন জীবনবোধ জীবনবেদনার নতুন দিশারী আলো। ভাষায়, কবিতায়, বুঝিবা সুরের, দোলা; কথা, যতটুকু বলা, ...- বলার রহস্যোচ্ছ্বাস তার চেয়ে বেশি। অচিন্ত্যকুমারের ভাষায় 'কথার' চেয়ে বেশি 'ফুটকি'। আসলে ভেতর হতে কেমন অমূল্য ব্যথা-পীড়িত, বাইরে তার প্রকাশ প্রকাশের অতীত। কালের হাতে নিরুদ্ধবাকজীবন-চরিত্রের স্পন্দিত ব্যঞ্জনা-ঝঙ্কার। সব দিয়ে জীবনকে চেনার পাওয়ার সর্বস্বপণ আকুলতা, মনকে-চৈতন্যকে শরীরের মধ্যে জড়িয়ে জীবনীশক্তির উদ্ভাসন চেষ্টা। অথচ পারিপার্শ্বে কোথাও আশ্রয়ের ভরসা তো নেই! তাই বুকভরা বাষ্পোচ্ছ্বাসের ঠেলায় পথে পথে ঘোরা 'পথিক বৃত্তি'।'[৫]

সজনীকান্ত দাশের কাছে তিনি 'কল্লোলের কর্ণধার'। 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের আগেই অবশ্য গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, মণীন্দ্রলাল বসু এবং সুনীতি দেবী গড়ে তুলেছিলেন 'ফোর আর্টস ক্লাব'। চারজনের একটি করে গল্প নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল 'ঝড়ের দোলা' গল্প সংকলন। বইটির নামকরণ প্রসঙ্গে দীনেশরঞ্জন দাশ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেছিলেন 'সদানন্দময়তা সত্ত্বেও আমাদের মনে এক অতৃপ্তির তুফান বইছে, কি যে ঠিক চাই, জানি না। এখনো ধরতে পারি নি। কিন্তু কিছু যে পেতেই হবে, সেই চেষ্টাতেই অশান্ত আবেগে আমাদের মন ছুটাছুটি করছে। দোলা লেগেছে ঝড়ের।'[৬]

বইটিতে ছিল সুনীতি দেবীর 'পাগল', গোকুলচন্দ্র নাগের 'মাধুরী', মণীন্দ্রলাল বসুর 'শ্রীপতি' এবং দীনেশরঞ্জন দাশের 'জয়মালা'। গোকুল নাগের রচনার একটি স্পষ্ট তালিকা এভাবে দিয়েছেন রবিন পাল;

ক) 'ঝড়ের দোলা'- এই বইয়ের চারটি গল্পের মধ্যে 'মাধুরী' গল্পটি গোকুল নাগের।

খ) 'রূপরেখা'- কথিকা জাতীয় রচনা। ন'টি লেখা আছে- মালিনী, শিশির, বাতায়ন, জলছবি, মা, আলো ও ছায়া, দুই-সন্ধ্যা, পূজারিনী, অনন্ত আশা।

গ) 'সোনার ফুল'- বড় গল্প। ধারাবাহিক এই রচনাটির প্রকাশকালে কিছুটা বর্জিত নীতির, সুরুচির অভাব এই বোধে।

ঘ) 'পরীস্থান' — মেটারলিঙ্কের 'ব্লু বার্ড' নাটকের গল্পাংশ নিয়ে ছোটদের জন্য উপন্যাস।

ঙ) 'পথিক' — উপন্যাস।

চ) 'মায়ামুকুল' — উনিশটি গল্পের সংকলন।

'কল্লোল' পত্রিকার সূচি অনুসরণ করে এঁর যে সব ছোট গল্পের নাম পাই তা হল- শেষ অনুরোধ, দেবতার গ্রাস, বসন্ত বেদনা, ব্যথার প্রদীপ, দরিয়া।'[৭]

রূপরেখার 'কথিকা'গুলি মূলত প্রকাশ পেয়েছিল 'প্রবাসী', 'নবজাতক', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায়।

'ঝড়ের দোলা'র অন্য তিন লেখকের চেয়ে আয়তনে দীর্ঘ গোকুল নাগের গল্পটি 'মাধুরী', একটি চরিত্রের নামেই গল্পের নামকরণ। কিন্তু 'রজনী' উপন্যাসের মতো একাধিক চরিত্রের আত্মকথনে গড়ে উঠেছে গল্পটি। প্রায় পঁয়তাল্লিশ পাতার গল্পটিকে 'ছোটগল্প' বলতে সংশয় জাগলেও মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ এর আগেই লিখেছেন 'নষ্টনীড়', পরে 'কল্লোলের কুলবর্ধন' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখবেন 'সরীসৃপ'। আর গোকুল নাগের মতো লেখক যে সাহিত্য নির্মাণের চেনা পথে হাঁটবেন না তা বলাই বাহুল্য। গল্পটি শুরু হয়েছে বৈঠকি চালে; এক মজলিসে বিনয় ডাক্তার ভালবাসা সংক্রান্ত দর্শন প্রকাশ করতে গিয়ে অবতারণা করেছেন গল্পের মূল বিষয়বস্তুর। নির্মাণ-ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' গল্পের সঙ্গে সাযুজ্য পাওয়া যায়। শুরুতেই ভালবাসা সম্পর্কে বিনয় ডাক্তারের দর্শন এরকম- 'ভালোবাসার বিশেষ কতকগুলি বাঁধা রাস্তা নেই। ওর বিশেষ কতকগুলি রূপও নেই, ওকে ধর্বার কোন উপায় নেই। ও কতকটা হাওয়ার মত, আপনার খুশীতেই চলে ফেরে। ওর রং পিয়াল ফুলের রেণুর মত কি, রক্ত জবার মত তা জানি না, তবে তার চেয়ে যার সঙ্গে ওর বেশী সাদৃশ্য আছে তা হচ্ছে, চোখের জল। টাটকা বেলায় একটু আভাস পাওয়া যায় বটে কিন্তু পুরাণ হলে নয়। যেটা থাকে তা হচ্ছে- ব্যথা।' এই ব্যথা-ময় প্রেমের গল্পই 'মাধুরী'। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে খাতায় লেখা নিশীথের আত্মকথনেই এক 'রোমান্টিক' প্রেমের আখর রচনা করলেন গোকুল নাগ। শল্য-চিকিৎসক নিশীথকে সুস্থ করার জন্য অপারেশন করলেও মৃত্যু যেন অমোঘ নিয়তি হয়ে এগিয়ে আসছিল রোগীর দিকে। আর 'রোগশয্যায়' শুয়ে তার বাঁচার আর্তি প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিল 'বাঁচবার জন্য যতখানি ইচ্ছে আমার বুকে আছে, ঠিক ততখানি নব্বই জন সুস্থ মানুষের নেই।' আর বুকে ছিল মাধুরীর জন্য প্রেম, যে প্রেমে হয়ত কিছুটা আমিত্বের অহংকারও মিশে ছিল — 'স্বেচ্ছায় এসে সেই ঠাঁই সে পূর্ণ করুক, - এই ছিল আমার কামনা, কিন্তু আমি তাকে ডাকব না, এই ছিল আমার গর্ব। এই গর্ব আমার কামনাকে পাহারা দিত।' একসময় নিশীথ মাধুরীর পরিবারের অনেক অভাব ঘুচিয়েছিল, হয়ে উঠেছিল মাধুরীর মায়ের ছেলের মতো। মাধুরীর

জন্মদিনে বাইশশো টাকার ব্রোচ উপহার দিয়েছে। তবুও নিশীথ সম্পর্কে মাধুরীর মনে হয়েছিল — 'আমার ভালো লাগা বা না লাগা- কিম্বা ওটা পরা বা না পরার সঙ্গে যেন তার কোনই যোগ নেই। দেওয়াই ছিল যেন তার কাজ, দিয়েই যে নিশ্চিন্ত।' কখনো নিশীথের চোখের দিকে তাকিয়ে মাধুরী ভেবেছে- 'ঐ মানুষটার মন ব'লে কিছুই নেই? সময় সময় ইচ্ছে হত তার ঐ আবরণটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে, তার ভিতরের মানুষটিকে টেনে বার করে আনতে।'

মাধুরীর প্রতি নিশীথের 'পজেসিভনেস' প্রকট হয়ে উঠেছে নিজের পিসতুতো ভাই প্রভাতের উপস্থিতিতে। এই দুই যুবক-যুবতী যাতে পরস্পরের মুখোমুখী না হয় সে জন্য হাসপাতালের বিছানায় শুয়েও প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এ কারণে নিশীথ নিজেকে শুধু 'কাপুরুষ' ভাবেইনি, খাতায় তা লিখেও রেখেছে। ভিজিটিং আওয়ারে যাতে দুজন আলাদা সময়ে আসে তেমন কৌশল করার পরেও যখন একই সময়ে এসে পড়েছে প্রভাত ও মাধুরী, তখন প্রভাতকে ব্রাউনিং-এর বই কিনতে পাঠিয়েছে নিশীথ। দুই নরনারীর প্রতিটি আচরণকে নিখুঁতভাবে জরিপ করেছে সে। মাত্র দু' বছর বয়সে প্রভাত এসেছিল নিশীথের বাড়ি, তারপর আঠেরো বছর প্রভাতের মায়ের স্নেহচ্ছায়ে দুই ভাই বড় হয়েছে একইসঙ্গে, তবু মাধুরীর কথা বলেনি প্রভাতকে। দুই বছর মাধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ, তার কাছেও এই ভাইটির অস্তিত্ব আড়ালেই রেখেছে নিশীথ। তার এই আচরণে হয়ত মিশে গেছে আধুনিক মানুষের নিরাপত্তাহীনতা- 'আমি ওকে আজীবন হিংসা করে এসেছি, ও সব বিষয়েই আমায় এগিয়ে যেত বলে। তাই মাধুরীকে যখন পেলাম, সে কথা ওকে জানাইনি। কি জানি এখানেও যদি ও আমার আগে গিয়ে দাঁড়ায়।' নিশীথের আশঙ্কা মিথ্যে হয়নি তার চোখের সামনেই প্রভাত-মাধুরীর পারস্পরিক সঙ্কোচ ক্রমশ সরে গেছে তাদের দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যেও 'কত গোপন দুঃখ আনন্দের প্রস্রবন' বয়ে গেছে।

তিন নরনারীর মাঝে আরেকজন- সে রমা। নিশীথের নার্স, যার 'হাতের স্পর্শ বড় মিষ্টি', 'দৃষ্টি বড় করুণ', কখনো নিশীথের কপালে হাত রেখে তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে। নিশীথের হাতে সেই খাতাটাও দিতে চায় না; কারণ সে জানে সেখানে লেখা থাকে অভিমানী প্রেমিকের বেদনা, অসহায়তা 'তুমি কল্পনায় এমন সব আজগুবি ছবি আঁক যাতে শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হয়।' সেই ছবি মুছতেই রমা ক্যালেণ্ডারে লিখে রাখে 'Do not burden your mind with the memory of the past.' 'বাঁধন ছেঁড়া'র আগেই নিশীথের চোখ পড়েছে এই নিবেদিতা নারীটির প্রতি 'আমার এই খেয়া ঘাটের বাঁধন ছেড়বার সময় চোখে পড়্‌ল তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐ একটি মানুষ, চেয়ে রয়েছে শুধু আমারই মুখের দিকে।' নিশীথের জ্বরে উত্তপ্ত কপাল তাই বরফ নয়, রমার বরফ-সিক্ত শীতল হাতের স্পর্শ চেয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রী পুরুষটি পেয়েছে এই নারীর নিবিড় ছোঁয়া শুধু নিঃশ্বাসের স্পর্শ বা তারও বেশি, কারণ শান্তি-সুখের পরেও আগুনের স্রোত বয়ে গেছে।

নিশীথের শরীরে টান পড়েছে 'শিরা মাংসের বাঁধনে বাঁধনে'। আর রমা তার এই ক্ষণ-প্রাপ্তির সান্ত্বনার রসদটুকু জোগাড় করেছে বিনয় ডাক্তারের বক্তব্য থেকে, একেবারে না পাওয়া থেকে পেয়ে হারানোকেই তিনি এগিয়ে রেখেছেন 'যে পেয়েছে সে তো বেঁচে গেছে, তার তো আর সংশয় রইল না মনে। হারিয়েও আর না পেয়েও সে ভাববে- পেয়েছি, তার সমস্ত কান্নার জন্য তাকে স্বীকার করতে হবে, এক নিমেষের জন্যেও সে পরিপূর্ণতার স্বাদ পেয়েছে, ঐ তার সান্ত্বনা।'

মাধুরী সংসার পেতেছে প্রভাতকে নিয়ে— যে নিশীথের সম্পূর্ণ বিপরীত, শুধু নামে নয়, চরিত্রগুণেও। মনে মনে তো প্রভাতকে নিশীথ শত্রুই ভাবত; 'ওকে ঘৃণা করি ও অত সুন্দর বলে।' কারণ প্রভাত 'সবারই আদরের মানুষ। ভগবান ওকে কোনগুণেই বঞ্চিত করেননি।' মাধুরীও প্রভাতের সঙ্গে সংসার করতে গিয়ে দেখেছে- 'তার মধ্যে যা আছে তা সবটাই ভালো। সবটাই যে হাসি গানে ভরা। অন্ধকার তো তার বুকে ঠাঁই পাবার নয়। তার চোখের দৃষ্টিতে সব অন্ধকার যে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।' কিন্তু মাধুরীর মনে তো নিশীথের 'কালো ছায়া' রয়ে গেছে, তাই প্রভাতের 'বুকের ওপর মাথা রাখতে গিয়ে শিউরে ওঠে' সে। নিশীথের ভালোবাসা তার কাছে নিতান্ত 'ধনীর খেয়াল' ছিল না তবুও মৃত-নিশীথের স্মৃতি বুকে আগলে বসে না থাকার জন্য নিজের মায়ের কাছেও মাধুরী 'পাষাণী', নিশীথের ছবি পর্যন্ত তার ঘর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রভাতকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তে বান্ধবী তড়িতাও মাধুরীর নৈতিকতা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছে- 'এটা সত্যই যে তুমি আজ যে কাজ করতে যাচ্ছ, তার দিকে তাকিয়ে কোন পুরুষ মানুষ কোন মেয়েকেই আর বিশ্বাস করবে না।' কিন্তু মাধুরী তো আবরণ সরিয়ে নিশীথের 'যথার্থ রূপটিকে' প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায়নি। অথচ একদিনের আলাপে প্রভাত 'গ্রাস' করে নিয়েছিল মাধুরীকে। নিশীথ তার কাছে 'পাষাণ দেবতা' হয়েই রয়ে গেছে। তবু প্রভাতের প্রেমে সাড়া দেবার আগে দ্বন্দ্বে জর্জর হয়েছে মাধুরী, 'ভয়ানক অন্ধকারে' নিজেকে 'ভয়ানক একা' মনে হয়েছিল তার; শেষ পর্যন্ত প্রভাতকে বিয়ে করে 'ভালোই' আছে। এই জটিল জীবন-জিজ্ঞাসাতেই আধুনিক মন ও মানুষের অন্তহীন যাতায়াত।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশ পেল গোকুলচন্দ্র নাগের 'ব্যথার প্রদীপ'। এই গল্পের কেন্দ্রে প্রেম বা অপরাধবোধ, যাই থাক না কেন, প্রধান দুই চরিত্র মনোহর এবং রঙ্গন, দুজনেই নিম্নবিত্তের প্রতিনিধি। মায়ের দয়া, অর্থাৎ ওলাউঠা বা বসন্তে আত্মীয়-পরিজন হারিয়ে মনোহর দাশের 'সংসার বন্ধন' বলতে 'মদের বোতল আর কাজের নেশা'। তবে বাইরে মাতলামি করা বা মাতাল সঙ্গী জুটিয়ে হইহল্লা করার মধ্যে সে নেই। তার মেলামেশার ক্ষেত্রটিও অতি সংক্ষিপ্ত। প্রতি সন্ধ্যায় তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালানোয় ছেদ পড়ে না। আর রাতের আহারের সময়- 'অদৃশ্য কোনো মানুষের কাছে আপনার জীবনের ব্যথা-বেদনার সমস্ত ইতিহাসটুকু গভীর আবেগের সঙ্গে একটু একটু করে বলে

যেতে থাকে! চোখ দিয়ে তখন তার অবিশ্রান্ত ধারায় জল ঝরে পড়ে!' মনোহরের এই নিঃসঙ্গ জীবনে হঠাৎ আবির্ভাব ঘটেছে রঙ্গনের 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' দুজনের দেখা, মনে মনে পূর্বরাগের সূচনা। রঙ্গনের মনোযোগ পাবার জন্য হোঁচট খাবার অভিনয় করতে গিয়ে সত্যিই আঘাত লেগে যায় মনোহরের পায়ে; সেই সূত্রে ধরে নীরব প্রেম ভাষা পেল। মনোহরের পদসেবার মধ্য দিয়েই সম্পর্কের সূচনা, তবে রঙ্গনের মুখে তখনও ছদ্মরাগ- 'মিনেগুলান সব উটচোকো, রাস্তা দিয়ে যাবে কিন্তুক চোক দুটো যে কুতা থাকে তা যমরা জানে।'

মুখের ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রঙ্গনের চেহারাও- 'স্বাস্থ্যপূর্ণ, আঁট-সাঁট শরীর, গায়ের রং কালো, রোদের তাপে ও পরিশ্রমে তামাটে দেখাচ্ছে, গালে অতিরিক্ত লাল আভা; চোখ দুটি তার আরও কালো, তাতে যেন বিদ্যুতে ভরা।' সে থাকে 'জগৎবিখ্যাত অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে আবর্জনায় ভরা মাথা-ফাটার গলি'র ভিতর 'নক্ষ্মী বাড়ীউলি'র ঘরে ভাড়াটে হিসেবে। এই অবস্থান অনিবার্যভাবে স্মরণে আনবে 'কল্লোলে'র অন্যতম প্রতিনিধি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্তে' গল্পের পটভূমি এবং প্রধান দুই চরিত্র, অঘোর ও রজনীকে। সেখানে অবশ্য অঘোর চোর এবং রজনী দেহোপজীবিনী। তাদের সংসার পাতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু মনোহর দাশ ও রঙ্গন খেটে খায়; মনোহর জেটিতে ক্রেনমিস্ত্রীর কাজ করে আর রঙ্গন তো ছ'বছর বয়স থেকে কুলিমজুরের কাজ করছে। কারোরই আত্মীয় কুটুমের বালাই নেই। মনোহরের উঠোনের তুলসী মঞ্চে প্রণাম করে তারা একসঙ্গে থাকতে শুরু করেছিল, লেখকের কথায়- 'এই জন্য এটাকে বিবাহ বা উদ্বাহ বন্ধন বলা যায় না মিলন নাম ঠিক। এই মিলনের মধ্যে কোন নতুনত্ব বা এ মিলন কবিত্বময় ছিল কিনা জানি না কিন্তু এতে বড় একটা চমৎকারিত্ব ছিল।' এই 'চমৎকারিত্ব' কল্লোলীয়ানদের অন্বিষ্ট, তাই অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসের নাম 'বিবাহের চেয়ে বড়ো'। যে উপন্যাসের পরিচয় দিতে গিয়ে রাহুল দাশগুপ্ত লিখেছেন,

"যে প্রাণাবেগ, হৃদ্যতা, ব্যাকুলতা নিয়ে এক সময় দুটি জীবন সমৃদ্ধ হতে চেয়েছিল, তাই যেন বিবাহসূত্রে হারিয়ে যায়। দেহের উষ্ণতায় ও প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতায় সেই স্নিগ্ধ প্রেমকে আর পাওয়া যায় না, পরস্পরকে আবিষ্কার করতে চাওয়ার নেশা হারিয়ে যায়। বিবাহ যদি হয়ে থাকে দুটি জীবনের ঘর বাঁধার সামাজিক প্রক্রিয়া মাত্র তাহলে তা জীবনের পক্ষে মেনে নেওয়া বড়োই কষ্টকর। প্রেম ভিন্ন বিবাহোত্তর জীবন বড়ো দুর্বিষহ।"[৯]

অন্যদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাসও নিম্নবিত্তের জীবনাশ্রয়ে লেখা হলেও নেত্য আর কালাচাঁদের বিবাহের অন্তরায় ছিল নেত্যর বৈধব্য। নেত্য বিধবা বলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চায়নি, আর কালাচাঁদও বিয়ে না করে একসঙ্গে 'শ্যাল-কুকুরের মতো' সংসার পাততে চায়নি। আমাদের আলোচ্য গল্পে এসব প্রতিবন্ধকতা ছিল না। মনোহর ও রঙ্গনের জীবনে সামাজিক সংকট আসেনি, মদ ছেড়ে সেই খরচ বাঁচিয়ে রঙ্গনের গায়ে রূপোর ভারি

গয়না তুলে দিয়ে 'মনোহর তৃপ্ত'। তৃপ্ত হবার কথা তো রঙ্গনেরও, লক্ষ্মী বাড়িউলীর বাসা-বাড়িতে মাঝরাতে দোর ঠ্যাঙাতো মাতালেরা, আর বাড়ির মালকিনের যুক্তি 'অমোন গতোর নে দোর বন্দো করে কি থাকতে হয়? খুলে দে না শতেক খোয়ারী!' সেখানেই রঙ্গন দেখেছে পতিতা হরিদাসীর ছেলের সান্নিপাতে করুণ মৃত্যু। ডাক্তারের ফি দিয়ে আর ওষুধ কেনার পয়সা নেই, অসহায় হয়ে অসুস্থ ছেলের বুকে ঘষেছিল প্রেসক্রিপসন। আর মনোহরের কাছে এসে নিঝঞ্ঝাট সংসার পেয়েও- 'রঙ্গনের মনে তৃপ্তি নেই, যৌবনের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রমেই তার অসহ্য হয়ে উঠছে। অতৃপ্ত কামনা সর্বদাই তাকে যেন কেমন আচ্ছন্ন করে রাখে।' গৃহস্থ মনের মনোহরকে নিয়ে রঙ্গন তৃপ্ত নয়। সংসার তার কাছে 'সুখের খাঁচা' মাত্র। বাইরের ঝড়-ঝঞ্ঝাময় জীবনেই সে অভ্যস্ত 'সেই দারুণ দুঃখের মধ্যেও স্বাধীনতার একটা তীব্র নেশা তার মনকে ঘিরে রাখত।' তাই 'সংযত, নিয়মিত, পরিমিত, সীমাবদ্ধ' সংসারে বসে তার মনে পড়েছে চাটনিকলের ভোলা চাঁড়ালের কথা যার নোংরামির যোগ্য জবাব রঙ্গন দিয়েছিল বুকে 'প্রচণ্ড এক লাথি' কষিয়ে। অথবা চটকলে ভৈরব দুলের ছেলে শ্রীদাম, যার শরীরে যৌবনের প্রথম স্পর্শ দিয়েছিল রঙ্গন নিজ উৎসাহেই, 'সেইদিন তার যৌবন-বনে ফুল ফুটল। ফুল তুলতে এল অনেক মেয়ে, এল না শুধু যে ফোটাল সে।' চিন্তামণির ঘাটে রসিক পরাণ গালে-ঠোঁটে শুধু চুমাই দেয়নি, ছ'গাছা রুপোর চুড়িও দিয়েছিল। এসব স্মৃতিতে চলাফেরা করে আর নিজেকে সংসারে আটকে রাখতে পারেনি রঙ্গন, কাজ নিয়েছে চিন্তামণির ঘাটে। মনোহরের প্রাথমিক আপত্তিকে বিশেষ গুরুত্বও দেয়নি।

কয়েকমাস পরে গর্ভবতী হয়েছে রঙ্গন, অনাগত সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে নিজের মনেই 'কার ছেলে? পরান? শ্রীদাম? মাধু? দাসু? তিনকড়ি? না মনোহর? কার?' একালের যৌন-স্বাধীনতার সুর যেমন শোনা যায়, তেমনই রঙ্গন স্মরণ করায় তারাশঙ্করের 'বেদেনী'কে সেই রাধিকা, যে শান্ত-প্রকৃতি আর কোমল মুখের মানুষ শিবপদর ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল 'উগ্র পিঙ্গল বর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি কঠোর বলিষ্ঠ দেহে'র শম্ভু বেদের সঙ্গে। আবার চল্লিশের 'বুড়া' শম্ভুর তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে নিটোল পেশী চওড়া বুকের কিষ্টোর সঙ্গে দেশান্তরে পাড়ি দিল বছর বাইশের বেদেনী। 'ব্যথার প্রদীপ' গল্পে অবশ্য রঙ্গনের মনে তৈরি হয়েছে অপরাধবোধ; মনোহরের ভালোমানুষী সে যেন সহ্য করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে মনে আসবে ওপার-বাংলার এই সময়ের জনপ্রিয় কথাকার সেলিনা হোসেনের দুটি গল্প- 'মতিজানের মেয়েরা' এবং 'পারুলের মা হওয়া'। মতিজান অত্যাচারী শাশুড়ি গুলনুর এবং নেশাগ্রস্থ ও অন্য নারীতে আসক্ত স্বামী আবুলের প্রতি প্রতিবাদ জানিয়েছিল স্বামীর বন্ধু লোকমানের সন্তান গর্ভে নিয়ে, একবার নয়, একাধিকবার। অন্যদিকে অকারণে 'সামাজিকভাবে কবুলপড়া স্বামী' আব্বাস আলি কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে পারুল বহু পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, কিন্তু তার গর্ভজাত সন্তান কার, সে উত্তর পারুল দেয়নি। এই সব গল্প শতক-শেষে বা একুশের সূচনা লগ্নে লেখা, সভ্যতায় তখন বিশ্বায়নের ছোঁয়া। আর

গোকুল নাগ গল্প লিখেছেন ঔপনিবেশিক ভারতে। তাই রঙ্গনের মধ্যে প্রবলভাবে জেগেছে অপরাধবোধ, মনোহরের ভালোমানুষী সে যেন সহ্য করতে পারে না। মনোহরের সামনে নিজের ব্যাভিচারের কথা স্বীকারও করে। মনোহর কিন্তু তিরষ্কার করে না, নিজের আত্মসম্মান এবং রঙ্গনের প্রতি ভালোবাসা বজায় রাখে; রঙ্গনের মাথায় হাত বুলিয়ে শিশুটি সম্পর্কে বলে- 'কিন্তুক আমি বলচি উ আমার। আর তুকে মেরে কেটে কি হবে রঙ্গন? ই কতা সত্যি যদি না-ও হয় তবু তুই যে আমাকে ভাঁড়ালি সে কতা কি কুন্দিন তুই ভুলতে পারবি? ই যে মারের বাড়া মার রঙ্গন।' রঙ্গন এবং তার সন্তানের প্রতি ভালোবাসায় খাদ নেই মনোহরের, তবু রঙ্গনের 'ব্যথার প্রদীপ' নেভে না। মনোহর এ গল্পে আদর্শ চরিত্র বটে কিন্তু বাস্তব চরিত্র অঙ্কনে গল্পকারের সাফল্যের প্রতিমূর্তি রঙ্গন।

বেশ কিছু কৌতুকে ভরা রোমান্টিক প্রেমের গল্প লিখেছিলেন গোকুল নাগ 'কল্লোলে'র পাতাতেই। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে প্রকাশ পেয়েছিল 'কবির বিয়ে' গল্পটি। ঔপনিবেশিক-কাল গল্পের প্রেক্ষাপটে বেশ স্পষ্ট, কারণ গল্পকথক বিদেশে সিভিল সার্ভিসে কর্মরত। তিন বছরের কর্মজীবনে তিনদিন ছুটি না নিয়েও উচ্চপদস্থ সাহেবের মুখে তাঁকে শুনতে হয়েছে- 'বাঙালিদের **responsibility** জ্ঞান কিছুই নেই।' প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে লেখা গল্পে একেবারে সমকালকেই লেখক ধরেছেন, কারণ যুদ্ধে হত সৈনিকদের অনাথ পরিবারের জীবিকার 'হিসেবের ভার' কথকের কাজের মধ্যেই পড়ে। যদিও সাহেব ও বাঙালি কর্মচারীর বাক্যালাপে লেখকের স্বাজাত্যবোধের স্পর্শ থাকলেও তা কৌতুকপূর্ণ ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। কথোপকথনের সমাপ্তিতে- 'গাম্ভীর্যের বাঁধন ছিঁড়ে গিয়ে সাহেবের দেহ-নৌকাখানি হাসির ঢেউয়ের ধাক্কায় টেবিল হতে চেয়ার, চেয়ার হতে টেবিলে কাত হয়ে পড়তে লাগল।' 'হাসির বেগ' থামিয়ে 'রুমাল দিয়ে চোখ' মুছে ছদ্ম বিরক্তি দেখিয়ে কথকের ছুটি মঞ্জুর করেছেন সাহেব। কথক পেয়েছেন বন্ধু সতীশচন্দ্র সিংহের বিবাহের আমন্ত্রণ আশ্চর্যও হয়েছেন, কারণ 'সে তো প্রতিজ্ঞাই করেছিল, কখনও বিয়ে করবে না।' এই বিবাহের প্রস্তাবনাই গল্পের বিষয়বস্তু। স্বনামে লেখা কবিতা যখন সম্পাদক মশাই বার বার ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন সতীশচন্দ্র 'অরুণা দেবী' ছদ্মনামে কিছু 'বাছাই করা প্রেমের কবিতা' পাঠিয়েছিল 'নির্ঝরিণী' পত্রিকায়। সেসব প্রকাশ পেতেই উৎসুক হয়েছিল পাঠককুল, কবির লিঙ্গ-পরিচয় এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। সেই আগ্রহের তাগিদে নিজের জমিয়ে রাখা ছবি থেকে একটি পারসি মেয়ের ছবিকেই অরুণা দেবীর প্রতিকৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এখানেও একটু মজার বিষয় আছে, বিবাহে অনিচ্ছুক যুবকের 'সুন্দর চেহারা'র ছবি অ্যালবামে তুলে রাখা, এবং সেখান থেকে যথা সময়ে সুশ্রী-রমণীর ছবি বেরিয়ে আসা। প্রঙ্গগত স্মরণে আসবে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'র শ্রীশ-বিপিনের নানা আচরণ। গল্পে সতীশচন্দ্রের সূক্ষ্ম ইচ্ছাই প্রতিষ্ঠা পেল এক নাছোড় পাঠিকার বাড়িতে চলে আসায়। বৌদির মধ্যস্ততায় কবি ও পাঠিকার মুখোমুখি আলাপ এবং তার পরিণতি বিবাহের

আয়োজন। সেই প্রথম দেখার কথা বলতে গিয়ে- 'কবির সুন্দর মুখখানি যেন কিসের আবেগে আরক্তিম হয়ে উঠল।' শুধু তাই নয় বন্ধুদের চাপল্যের মাঝে চোখ ভরা জল নিয়ে কবি বলেছে- 'আমার কবিতা-সাগর-মন্থন করে যে লক্ষ্মী আবির্ভূতা হলেন তাঁকে নূতন করে কি কথা দিয়ে স্তুতি করব? আমি কেবল দেখলাম।' প্রেমের এই ভাবালুতা এবং আগাগোড়া গল্পটির আবহ কবি-মনের প্রেম নয়, এক টাইপ চরিত্রের দুর্বল পুরুষকে তুলে ধরে গল্পকার পাঠকের মনে কৌতুক সৃষ্টি করেছে।

ওই বছরেই 'কল্লোলে'র ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছিল 'কবিত্বহীন গল্প'টি। সেখানেও গল্পকথক প্রেমাঞ্জনের প্রেমের গল্প শুনিয়েছেন এক মজলিসে বসে। গল্পের নায়িকা অবশ্য কথক-পত্নী পূর্ণিমার বোন জ্যোৎস্না। প্রেমাঞ্জন যে দিদিমার দেওয়ার দেওয়া নাম 'বিশু'-তেই বেশি পরিচিত, তার চরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক জানাচ্ছেন- শৈশবের দুগ্ধ-প্রেম, কৈশোরের কাঁচা আম, ঝালচাটনী, ঘুড়ি লাটাই এবং কলহ-প্রেম এত তাড়াতাড়ি অঞ্জন থেকে অন্ধতার আকার ধরছিল যে, সকলেই বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।' 'অভিভাবকগণে'র 'হাজার উপদেশ' এড়িয়ে ইচ্ছের ঘোড়া ছুটিয়ে চলার পর 'নূতন প্রেমের স্রোতে' গা ভাসাল প্রেমাঞ্জন, সেই প্রেম 'পুস্তক প্রেম'। এই 'নূতন প্রেমোচ্ছ্বাস' তার নিকটজনের কাছে হল আরও দুঃসহ, কারণ জ্ঞানসমুদ্রে ডুব দিতে গিয়ে সে প্রায় দৃষ্টি খোয়াতে বসেছিল। আর সেই সময় রবি ঠাকুরের বসন্তের গান নিয়ে এল জ্যোৎস্না। দুই নরনারীর মধ্যে নীরবেই পূর্বরাগের সূচনা ঘটেছিল। অবশেষে কথকপত্নীর কৌশল ও কথকের সহায়তায় বিশু ও জ্যোৎস্নার প্রেমের সার্থক সূচনা। এই সাধারণ গল্পও মূলত বৈঠকী মেজাজ ও কথকের বন্ধুদের প্রতিক্রিয়ায় বেশ খানিকটা মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। শুরুতেই কথকের পত্নীর পাড়াবেড়াতে যাওয়া এবং সেই সূত্রে কথকের প্রতিক্রিয়া গল্পটির মূল সুর ধরিয়ে দিয়েছিল। 'কবির বিয়ে' বা 'কবিত্বহীন গল্প' দুটি ক্ষেত্রেই কিছু টাইপ চরিত্রের আনাগোনা, চরিত্র নির্মাণে লেখকের বিশেষ মনোযোগ ছিল না বলেই মনে হয়। প্রাধান্য পেয়েছে মজলিসী-ভঙ্গি।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে প্রকাশিত 'সর্বনাশের 'সুখ'ও প্রেমেরই গল্প, তবে তা কিছুটা করুণ রসে আর্দ্র। গল্পটি পত্রাকারে নায়িকার আত্মকথনে লেখা। কিছুটা অংশে আবার নায়কের ডায়েরির অংশও উদ্ধৃত হয়েছে। কথক নিরুপমা যে একসময় দুই বান্ধবী কমলা ও জ্যোতির সঙ্গে 'চিরকুমারী' থাকার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল। যদিও সেই প্রতিজ্ঞার মধ্যে কতখানি সারবত্তা ছিল তা প্রশ্নের অবকাশ রাখে। কারণ প্রতিজ্ঞার পরেই নিরুপমার 'বুকের ভিতর কান্না গুমরে উঠেছিল' এবং তার মনে হয়েছিল 'যতদিন প্রতিজ্ঞা করিনি ততদিন চিরকুমারী থাকার ভিতর খুব বড় রকমের কবিত্ব দেখতে পেতাম।' সম্ভবত বিশ শতকের সূচনা-লগ্নেই গল্পকার নারীর আত্মাভিমানের তেমন ছবি দেখেছিলেন, তাই গল্পের তিন নারী 'হাতে হাত রেখে' খুব 'সম্মানের সঙ্গেই' প্রতিজ্ঞা করেছিল 'এ জীবনে কখনও কোন

পুরুষের কাছে আত্মবিক্রয় করব না, আমাদের নারীত্বের অমর্যাদা কখনও হতে দেব না', এর মধ্যে আপাতভাবে উগ্র-নারীবাদের আঁচ পাওয়া গেলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-যন্ত্রে আবহমানের নারী-নিষ্পেষণের প্রতিক্রিয়া এমন হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মন থেকে এই 'ভীষণ' প্রতিজ্ঞা যে নিরু-জ্যোতি মেনে নিতে পারেনি, তা তাদের চোখের জল ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ওয়ালটেয়ারে গিয়ে নিরু পেয়েছিল তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ, সেই চিত্র-শিল্পীর কাছে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে 'আমার যে আর কিছুই বাকি রইল না! আমার যা-কিছু সমস্তই আহুতি দিয়েছি, তবুও সে আশা মিটছে না। আমার সমস্ত বুকখানিকে নিংড়ে দিলে কি শান্তি পাব?'

যদিও গল্পকার সেই শিল্পীর ডায়েরির অংশ তুলে ধরে তার পূর্বজীবন, যেখানে তার শিল্পীসত্তার অমর্যাদা প্রভৃতির সূত্র ধরে নিরুপমা নামেরই এক ছাত্রী তথা পূর্ব প্রেমিকার প্রসঙ্গ এনেছেন। সেই প্রেমে মেয়েটির পরিবারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং মেয়েটির অকাল-মৃত্যু বেপথু করে দিয়েছিল চিত্রশিল্পীকে। গল্পকথক-নিরুপমার নাম এক কাকতালীয় পরিস্থিতিতে শুনে চিত্রশিল্পীর মূর্ছিত হওয়া এবং তারই সেবায় সুস্থ হয়ে ওঠা গল্পে অনিবার্য পরিণতি নিয়ে আসে। নিরুপমা নিজের হাতে রং-তুলি নিয়ে সেই শিল্পীর একলব্য-শিষ্যা হয়ে উঠেছে, মিশে গেছে সেই মৃত-নিরুপমার সত্তার সঙ্গে। প্রেমিক-চিত্রশিল্পীকে যেন সঞ্জীবনী দান করেছে কথক নিরুপমা। আসলে—

'কল্লোল-লেখকদের আর একটি বৈশিষ্ট্য ভাবনার শিথিলতা। সে যুগের সামগ্রিক চরিত্রেই ছিল একটি মানসিকতার বীজ। সমসাময়িক কালে আগ্রাসী নৈরাশ্যের বন্ধ দরজায় তার মাথা খোঁড়া, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অবনিবনা। 'একদিকে প্রবল বিরুদ্ধবাদ' অন্যদিকে 'বিহ্বল ভাববিলাস'। এই দুই ভাবের প্রভাবে তাঁরা কখনও উন্মত্ত কখনও আনমনা। কখনও সংগ্রাম, কখনও জীবনতৃষ্ণা।'[৯] —গোকুল নাগের প্রতিটি গল্পেই এই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

'রূপরেখা' সংকলনটি গোকুলচন্দ্রের চেনা বই, যার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক নিজেই জানিয়েছেন- 'আকারে ছোট হলেও এগুলি ছোটগল্প নয়, কারণ প্লট বা ছক বজায় রেখে চলবার প্রয়াস এতে নেই। শুধু রেখার সাহায্যে জীবনের কান্নাহাসি এবং বিশেষ করে অভাব এবং অতৃপ্তির ছবিটুকুই প্রকাশ করতে চেয়েছি'; মনে রাখতে হবে কয়েক দশক পরে প্রচলিত প্লটের ছক ভেঙে প্রথাসিদ্ধ প্লটকে অস্বীকার করে ছোটগল্পে 'নতুন রীতি'র জন্ম দেবেন বিমল কর। যদিও 'রূপরেখা' সম্পর্কে অধ্যাপক সুকুমার সেন জানিয়েছেন 'রবীন্দ্রনাথের লিপিকার অনুসরনে গোকুলচন্দ্র কয়েকটি ছোট ছোট গল্প রচনা করেন।'[১০] এমনকি কল্লোলের পাতায় প্রকাশিত 'স্বপ্নকথা' গল্পটিকেও এই ধারার রচনা বলেই মনে হয়। নিঃসঙ্গ মানুষের আর্তি, ভালোবাসা পাবার আকুলতা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কোন প্লট বা চরিত্রের বিকাশ বা বিন্যাস নেই, যা আছে, মানুষের একান্ত কিছু অনুভূতি,

যেন ছেঁড়া স্বপ্নকে লেখক জোড়া লাগিয়েছেন রচনাটিতে। সেই পরিবেশটি আরও গভীর হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যবহারে :

"রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হল
সেই মোহানার ধারে।"

আর 'রূপ-রেখা'র রচনাগুলির নাম যেমন- 'মালিনী', 'শিশির', 'বাতায়ন', 'জলছবি', 'আলো ও ছায়া', 'অনন্ত আশা' সেখানে চরিত্র হিসেবে পেয়েছি চাঁপা, মালিনী, তটিনী, নলিনী, বাসন্তী, মুকুল, আকাশ, বাতাস, ফুল, অলি, আলো প্রভৃতিকে। 'দুই সন্ধ্যা' বা 'মা' রচনায় জননী সত্তার সুমধুর প্রকাশ। আর 'পূজারিনী' রচনাটির পরিণতি 'যেখানে অমরের দেহ মাটির ওপর পড়ে ছিল, সেখানে জেগে উঠল এক মন্দির, রাজকন্যা বিদ্যুল্লেখা এ মন্দিরের পূজারিনী। দিবারাত্র পূজার গান বাতাসে ভেসে বেড়ায়। সে গান যেন অমরের ব্যথার কান্নারই প্রতিধ্বনি।' রবীন্দ্রনাথের নটীর পূজার শ্রীমতীর মত বিদ্যুল্লেখার বন্দনা ভঙ্গিতে না হলেও সঙ্গীতে বিরাজ করেছে।

গোকুলচন্দ্র সম্পর্কে সুকুমার সেন লিখেছেন—

'ছোটগল্প লেখায় গোকুলচন্দ্রের অনায়াসদক্ষতা ছিল। বর্ণনায় একটু স্বপ্নালসতা আছে, কিন্তু সে সময়ের গুণে বা দোষে। কিন্তু রচনার মধ্যে জড়তা নাই, অন্যমনস্কতা বা বিক্ষেপও নাই। গোকুলচন্দ্র কবির মন ও দৃষ্টি লইয়া গল্প লিখিয়া গিয়াছেন।'[১১]

এর পরেও তাঁর মধ্যে 'ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সমাজ পরিবেশ পর্যবেক্ষণের সামর্থ্য' লক্ষ্য করেছেন অধ্যাপক রবিন পাল। মনে রাখতে হবে গোকুল নাগ শুধু গল্পকার বা লেখক মাত্র ছিলেন না। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে যক্ষায় মারা গেছেন, তার আগে পেরিয়েছেন অসুস্থতার বেশ দীর্ঘ পর্ব। এই স্বল্পায়ু জীবনে আড়াই বছরের 'কল্লোল' সম্পাদনায়—

'গোকুল প্রতিটি লেখা মন দিয়ে পড়তেন, কাটছাঁট যোগ বিয়োগ করে প্রকাশ উপযোগী করে তুলতেন, প্রতিটি লেখার লেখক লেখিকাদের সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ রাখতেন, প্রতি সংখ্যার সজ্জা ও রচনাসূচি ঠিক করার দায়িত্ব পালন করতেন। প্রুফ দেখা, প্রেসে যাওয়া, দপ্তরীর কাজ করাও ছিল। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন- কল্লোল যে নতুন লেখকদের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিল তার পিছনে ছিল গোকুলের অন্যতম প্রেরণা।'[১২]

তাই শুধু গল্পকার হিসেবে গোকুল নাগের মূল্যায়ন করতে গেলে সেই বিশ্লেষণ খণ্ডিতই রয়ে যাবে, বরং একথা স্বীকার করতেই হয়, আধুনিক বাংলা ছোটগল্পই শুধু নয়, রবীন্দ্র-উত্তর কথাসাহিত্যের নির্মাণ-পথে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন 'কল্লোলে'র এই পথিকৃৎ।

তথ্যসূত্র :

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', এম সি সরকার এণ্ড সন্স, কলকাতা, দ্বাদশ প্রকাশ, ১৪২৬, পৃ.- ২
২. তদেব, পৃ.- ৩
৩. তদেব, পৃ.- ৩
৪. ভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা চতুর্থ পর্যায়', দে'জ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৩, পৃ.- ২৬৫
৫. তদেব, পৃ.- ২৬৬
৬. দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়, কথাসাহিত্য প্রকরণ, বি বি কুণ্ডু গ্র্যাণ্ড সন্স, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০১৭, পৃ.- ১৫
৭. রবিন পাল, 'কল্লোল কালিকলমের ছোটগল্প', আশাদীপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪, পৃ.- ২১৫
৮. রাহুল দাশগুপ্ত, বাংলা উপন্যাসকোশ, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, পৃ.- ৮৩
৯. রবিন পাল, 'কল্লোল কালিকলমের ছোটগল্প', প্রাগুক্ত, পৃ.- ৪৬
১০. সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্য ইতিহাস', সাহিত্য অকাদেমি, দিল্লী, দশম মুদ্রণ, ২০১৯, পৃ.- ২৫৬
১১. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস পঞ্চম খণ্ড', আনন্দ, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ.- ৩৪৩
১২. রবিন পাল, 'কল্লোল কালিকলমের ছোটগল্প', প্রাগুক্ত, পৃ.- ২১৫

আকর গ্রন্থ :

১. অরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কল্লোল গল্পসমগ্র ২, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫।
২. ঝড়ের দোলা, ফোর আর্টস ক্লাব, কলকাতা (অন্তর্জাল সংগ্রহ)।

কল্লোল যুগের বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অ ঞ্জ না দে ব রা য়

বাংলা সাহিত্যে কল্লোল যুগের পত্তন হয়েছিল যার কলমে তিনিই হলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের জীবনকথা তাঁর লেখনীতে অসাধারণ হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি তার বহুমুখী প্রতিভা ও সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য ও চলচিত্র জগৎকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক চিত্রনাট্য, প্রবন্ধ, রম্যরচনা প্রভৃতির পাশাপাশি নিজেরই লেখা কাহিনী ও চিত্রনাট্য নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

বিশ শতকের তথা বাংলা কথা সাহিত্যের আঞ্চলিকতা সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬খ্রিঃ)-এর গল্প-উপন্যাস দিয়েই শুরু করতে হয়। কারণ বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম আঞ্চলিকতার আবাহন করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি বর্ধমানের রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের কয়লাখনি অঞ্চলকে পটভূমি করে কিছু ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এজন্য বাংলা উপন্যাসের আঞ্চলিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও একটি বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত তাঁর প্রথমদিককার ছোটগল্পগুলিকে বাদ দিয়ে কোনো আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর কিছু ছোটগল্প পড়ে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, — " শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি , দারিদ্র জীবনের যথার্থতা , অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লিখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যে —সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডারি ভঙ্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয় নি"।

বিশিষ্ট সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরীও শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি সম্পর্কীয় গল্পগুলির মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতার সূচনা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন —"কয়লাকুঠির গল্পগুলি বাঙালি মধ্যবিত্ত পাঠক সমাজের একঘেয়ে প্রথাবদ্ধ জীবনে এক অনাস্বাদিত মুক্তির সুখস্পর্শ বহন করে আনল। এক সজীব সতেজ জীবনরসের অফুরন্ত স্রোত প্রবাহিত করে দিল বাঙলা কথাসাহিত্যে। কয়লাখনির অতল থেকে লেখক তুলে আনলেন দীপ্ত প্রানের হীরকখণ্ড। রানীগঞ্জ ধানবাদ অঞ্চলের কয়লাকুঠির অধিবাসী সাওতাল, বাউরি কুলি-কামিনদের সুস্থ সাস্থ্যোজ্জ্বল আদিম জীবনের নিঃসংকোচ প্রেম, ঈর্ষা , আত্মত্যাগ ও অকুণ্ঠ স্থূল উদ্দামতার বলিষ্ঠ সরল কাহিনী বাঙালি পাঠকের দৃষ্টিকে মুগ্ধ অভিভূত করে দিল।

মাত্র বাইশ বছর বয়সে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কয়লাকুঠি' গল্পটি রচনা করেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের (১৯২২খ্রিস্টাব্দ) কার্তিক সংখ্যায় 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় এই গল্পটি

প্রকাশিত হয়। বাউরি সম্প্রদায়ের মেয়ে বিলাসীর সুতীব্র প্রেমতৃষ্ণা এবং তার করুণ পরিণতি নিয়ে গল্পটি রচিত। গল্পটির কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের স্বামী নানকুকে তার স্ত্রী বিলাসী প্রচণ্ড ভালোবাসত। কিন্তু তা সত্ত্বেও নানকু মাইনু নামে আর এক মেয়েকে মন দেয়। তারা দু'জনে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে বিলাসী রমনা নামে একজনের সাথে থাকতে শুরু করে। সে তাকে শরীর দিলেও নানকুর প্রতি অবিচল ভালবাসা থাকায় মন দিতে পারে না। একদিন বিলাসী খবর পায় যে মাইনু মারা গেছে এবং নানকু ফিরে এসেছে। এতে বিলাসী আনন্দে আত্মহারা হলেও পরে জানতে পারে কয়লাখনিগর্ভে চাপা পড়ে তার স্বামী নানকুও মারা গেছে। এই খবর শুনে সে প্রচুর মদ্যপান করে রাতের অন্ধকারে খনির তলায় নেমে গিয়ে নানকুর মৃতদেহ খুঁজে বের করে এবং তাকে জড়িয়ে ধরে উন্মাদিনীর মত বিলাপ করে। এমন সময় কয়লার একটা 'মস্ত চাংরা' তার মাথার উপর সশব্দে নেমে পড়লে নানকুর সঙ্গে সঙ্গে বিলাসীও খনিগর্ভে সমাধিস্থ হয়ে যায়। এভাবে বিলাসী ও নানকুর জীবনের বেদনা-ঘন পরিণতিতে 'কয়লাকুঠি' গল্পটি শেষ হয়েছে। এই গল্পে বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ — আসানসোল এলাকার কয়লাখনি অঞ্চলের পটভূমির বর্ণনা স্বল্প হলেও অত্যন্ত জীবন্ত হয়েছে। হয়তো এখানে আঞ্চলিকতার বিস্তৃত রূপ প্রকাশ পায় নি, ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে তা সম্ভবও নয়। তবুও এই 'কয়লাকুঠি' গল্পটিতে গল্পকার আঞ্চলিকতাকে নিয়ে এসে বাংলা কথাসাহিত্যে একটা নতুন দিক উন্মোচন করেছেন, যা পরবর্তী সময়ে আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার পথ অনেকটাই প্রশস্ত করেছে।

'কয়লাকুঠি গল্প প্রকাশের বছরেই অর্থাৎ ১৩২৯ বঙ্গাব্দে শৈলজানন্দের কয়লাখনি অঞ্চল নির্ভর আর একটি ছোটগল্প 'রেজিং রিপোর্ট' প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী'র ফাল্গুন সংখ্যায়। এই গল্পে তিনি কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমিক-শোষণের করুণ, মমান্তিক ও কদর্য চিত্র একেছেন। এর কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, কয়লাখনির ম্যানেজার শ্রমিকদের অবধারিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও দু'বার ভাবেন না। তার এই উদগ্র আকাঙ্ক্ষার বলি হয় কয়লাখনির শ্রমিক টুইলা। সে খনির অতলে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। কিন্তু তার মৃত্যু জেমস সাহেবের লোভকে একটুও টলাতে পারে নি। তিনি এই ঘটনাটিকে হালকাভাবে নেন এবং উদ্ধতভাবে বলেন —'কুছ পরোয়া নেই'। কারণ হিসেবে জানান যে তার হাতে এরকম অনেক হয়েছে।

তবুও যেনতেন প্রকারে কয়লার রেজিং বাড়াতে হবে। একসময় খনির রেজিংবাবু তাঁর কাছে টুইলার ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রসঙ্গ তুললে তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে বলেন-"Damn your Tuila." এইভাবে এই 'রেজিং রিপোর্ট' গল্পটিতে এক খনি শ্রমিকের মৃত্যু এবং তজ্জনিত মালিকপক্ষের মনোভাব প্রকাশ করে শৈলজানন্দ সেই অঞ্চলের শ্রমিক শোষণের ছবি এঁকেছেন। এই গল্পেও রানীগঞ্জ- আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানকার

মানুষজনের জীবন পরিক্রমার ছবি আছে। পাশাপাশি অঞ্চলটির মানুষজন সম্পর্কে তথাকথিত সভ্য সমাজের মনোভাবের কথাও উঠে এসেছে। এগুলি সবই আঞ্চলিকতার লক্ষণ। তাই অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতো ভাষাবিদ ও সাহিত্য সমালোচক আঞ্চলিকতার নিরিখে শৈলজানন্দের 'রেজিং রিপোর্ট' গল্পটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

শৈলজানন্দের 'মা' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৩৩০ বঙ্গাব্দ)। এটিও গল্পকারের কয়লাকুঠি সিরিজের গল্প। এখানে আঞ্চলিকতার পটভূমিকায় সাঁওতাল যুবক-যুবতীর সমাজ- বিগর্হিত অসংযত যৌবনলীলা, সাঁওতালদের সমাজ-জীবনের ইতস্তত রূপচিত্র অঙ্কিত।

শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি সিরিজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প হল 'নারীর মন'। এই গল্পটিও 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা(জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০)য় প্রকাশিত হয়। কয়লাখনি অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একই পুরুষকে নিয়ে দুই নারীর ঈর্ষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মান-অভিমান এবং সবশেষে গভীর ভগিনী-স্নেহ এই গল্পের মূল উপজীব্য।

'জোহানের বিয়া' গল্পটিও কয়লাখনি অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুখীর মাধ্যমে গল্পকার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নারীর আপাত নির্দয় বুকে প্রচ্ছন্ন বেদনা লুকিয়ে থাকার ছবি এঁকেছেন।

এইরকম অজস্র ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে শৈলজানন্দ বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার আবাহন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর এই জাতীয় গল্পের প্রশংসা করে বাংলা কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন —'শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর কয়লাকুঠির গল্প দিয়ে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন যাকে আধুনিকতা বলতে বাধা নেই'।

শুধু ছোটগল্পেই নয় উপন্যাসেও শৈলজানন্দ বর্ধমানের রানীগঞ্জ — আসানসোলের সেই কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানকার অন্ত্যজ মানুষের জীবনের ছবি তুলে আনার দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর হাতে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসেরও যাত্রা শুরু হয়। তবে উপন্যাসগুলিতে শুধু কয়লাখনি অঞ্চল নয় , রাঢ়ের সমতলভূমির কথাও স্থান পেয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'বানভাসি', 'ষোল আনা', 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস', নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী', 'পাতালপুরী', 'কয়লাকুঠির দেশ'-এর মত কয়েকটি উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের বেশ কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।

শৈলজানন্দ মুখপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবনের প্রথমদিকে রচিত 'ষোল আনা' উপন্যাসটি ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি সে সময়ে প্রচলিত বীরভূম —বর্ধমানের 'ষোল আনা' ব্যবস্থার ক্লিন্ন রূপটিকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। উপন্যাসটির কাহিনি অংশ খুব বেশি নয়। এর সূচনায় দেখা যায় যে, রুক্মিণী নামক এক সুন্দরী মেয়ে তথাকথিত নীতির ধার না ধেরে রাখাল নামক এক যুবককে বিয়ে না করেই ঘরে এনে বসবাস করলে গ্রামের

মাতব্বরদের সভা 'ষোল আনা'-র কর্তারা ক্ষেপে যায়। হরি পন্ডিত নামে এক কর্তা রুক্মণীর বাড়িতে তিরস্কার করতে যায়। তবে স্বাধীনচেতা রুক্মিণী তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় মীমাংসার জন্য সে রুক্মিনীকে 'পালোয়ার' জোগাড় করে দিতে বলে। রুক্মিণী তার কথা মত রাখালের পোষা একটি বড় পাঁঠা গ্রামের 'ষোল আনা'কে উপহার দেয়। তবে উপন্যাসের কাহিনি এখানেই শেষ হয় না। এরপর উপন্যাসের কাহিনি রুক্মিণীকে বাদ দিয়ে ভিন্নমুখী হয়। এই ভিন্নমুখী কাহিনিতেও 'ষোল আনা' ব্যবস্থা প্রাধান্য পায়। এই অংশে নিতাই ডাক্তার, মাতু পিসি ও তার মেয়ে রানীর কথা স্থান পেয়েছে। গ্রামের 'ষোল আনা'-র চাপে পড়ে বিবাহিত এবং সন্তানের জনক নিতাই ডাক্তার মাতু পিসির মেয়ে রানীকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। অবশ্য নিতাই ডাক্তারের এই বিষয়ের পেছনে জমি ও অর্থের লোভও কাজ করছিল। তার প্রথম স্ত্রী লক্ষ্মী এই ঘটনায় ভেঙে পড়লেও শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা মেনে নেয়। কিন্তু বিয়ে সম্পন্ন হলে মাতু পিসি প্রতিশ্রুতি মত জমি ও অর্থ নিতাই ডাক্তার এবং হরি পন্ডিতকে দিতে অস্বীকার করলে তারা রানীর বিরুদ্ধে 'কুশ পাঁথোল' সংঘটিত করতে প্রয়াসী হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত 'কুশ পাঁথোল' হয় না —রানীর মা মাতু জামাইকে ১০০ টাকা যৌতুক দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে গ্রামে কালভৈরবের গাজন শুরু হলে মেলা থেকে ফেরার পথে রানীর সঙ্গে নিতাই ডাক্তারের দেখা হয়। ডাক্তার রানীকে দেখে মজে গিয়ে তার সঙ্গে ঘরে আসে, যা দেখে মাতু খুশি হয়। এরপর উভয়ের মিলনের ইঙ্গিতে উপন্যাসটির কাহিনির সমাপ্তি ঘটে।

এই উপন্যাসটির কাহিনি অংশ স্বল্প হলেও বর্ধমান ও বীরভূমের সীমান্ত এলাকায় ছোট্ট একটি গ্রামের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেক লক্ষণ আছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক গোপিকানাথ রায়চৌধুরীও অবগত করেছেন — "লেখক 'ষোল আনা' গ্রন্থে এই অঞ্চলের 'লোকাল কালার' নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন — এখানেই তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব। সমগ্র গ্রামটির পথঘাট বাড়িঘর এবং সর্বোপরি কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোভী স্বার্থপর সংকীর্ণচেতা মানুষগুলি একেবারে জীবন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে"।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'কয়লাকুঠির দেশ' (১৩৬৫)। এটি তাঁর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস। এই উপন্যাসটিতে শৈলজানন্দ বর্ধমান - বীরভূমের কয়লাখনি অঞ্চলের আঞ্চলিক পটভূমিকায় নব্য ধনী দেবু চাটুজ্যের পুত্র রঞ্জনের সঙ্গে বনেদি মুখুজ্যে বংশের সীতারাম মুখুজ্যের কন্যা মালার রোমান্টিক প্রণয় কাহিনি বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসটির কাহিনি অংশ থেকে জানা যায় যে, দেবু চাটুজ্যে ছিল কোলিয়ারির একজন কর্মচারী। কিন্তু কোলিয়ারির নিঃসন্তান এবং বৃদ্ধ ম্যানেজারের বদান্যতায় তার ভাগ্য রাতারাতি বদলে যায়। তিনি দেশে ফিরে যাবার সময় নিজের কুঠিগুলির স্বত্ব কর্মচারী দেবুর নামে লিখে দেন। ফলে দেবু হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠে। এই দেবুর পুত্র রঞ্জনের সঙ্গে সেই অঞ্চলের মুখুজ্যে বংশের মেয়ে মালার প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মালার পিতা

সীতারাম যখন রঞ্জনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে মনস্থ করেছিলেন, তখন একদিন দশ হাজার টাকা প্রাপ্তির আশায় দেবু সীতারামের কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে মিষ্টিমুখ করে দু'হাজার টাকা নিয়ে যায়। তবে অর্থের লোভে সে এই বিয়ে ভেঙে কোনো এক রাজার কন্যার সঙ্গে রঞ্জনের বিয়ে স্থির করে এবং লোক মারফৎ সীতারামের টাকা ফেরত দেয়। ফলে রঞ্জন ও মালার প্রণয়ে সঙ্কট নেমে আসে। এ সময় চুমকি নামের এক ইরানি কন্যা মালাকে রঞ্জনের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেও নিজে রঞ্জনকে ভালোবেসে ফেলে।

সে সরাসরি রঞ্জনকে প্রেমের প্রস্তাব দেয় এবং তাকে পাবার আশায় দল ছাড়ে। রঞ্জন চুমকির প্রেম প্রস্তাব নাকচ করে দিলেও ইরানি যাযাবর দলটির একটি ব্যক্তি তাকে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে অপ্রত্যাশিত আক্রমণ করে বসে। শেষ পর্যন্ত ঐ দলের অন্য একটি লোকের প্রচেষ্টায় রঞ্জন রক্ষা পায়। তবে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর কিছুদিন পর মুখুজ্যদের পুকুরে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেলে দেবু চাটুজ্যে সীতারামের নামে খুনের অভিযোগ আনে, যার পরিণামে সীতারামের জেল হয়। এভাবে পরিস্থিতি জটিলতার দিকে এগোলে হঠাৎ রঞ্জনের আবির্ভাব ঘটে। রঞ্জন জানায় সে পালিয়ে গিয়ে এতদিন তার পিসির বাড়িতে ছিল। রাজকন্যার বিয়ে হয়ে যাওয়াতেই সে ফিরে এসেছে। ফলে সীতারামের জেল থেকে মুক্তি ঘটে এবং দেবু তার কৃতকর্মের জন্য তার কাছে ক্ষমা চায়। এমতাবস্থায় রঞ্জন ও মালার বিয়েতে কোনো অসুবিধা না থাকলেও মালা বেঁকে বসে। তার বক্তব্য যে, যার জন্য তার বাবা জেল খেটেছে তাকে কোনোমতে বিয়ে করবে না। অবশেষে সকলের চেষ্টায় জট খোলে এবং মালা ও রঞ্জনের বিয়ের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

কয়লার দামের ওঠা নামার মধ্য দিয়ে সেখানকার অর্থনীতিরও যে ওঠানামা হয় এই উপন্যাসে তারও উল্লেখ আছে — "কিন্তু এখানকার সবকিছু যেন ওই কয়লার বাজারের সঙ্গে সমসুত্রে গাঁথা। কয়লার দাম যখন চড়ে, সকলের মুখে হাসি ফোটে। আবার দাম যখন পড়ে চারিদিকে মনে হয় যেন অন্ধকার"। সেই সঙ্গে এই উপন্যাসে অত্যন্ত জীবন্তভাবে আছে কয়লাখনি অঞ্চলের প্রকৃতির বাস্তবচিত্র —গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতের বর্ণনা। শুধু তাই নয়, ঔপন্যাসিক সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত 'জল শান্তির উৎসব', 'সংকট-মোচন পূজা'র মত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের কথাও এখানে বলেছেন। উপন্যাসটিতে শৈলজানন্দ মহাশয় ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় ভাষারীতিরও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

এই উপন্যাস দু'টি ছাড়াও শৈলজানন্দের 'বানভাসি', 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস', 'নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী', 'পাতালপুরী'র মত অসংখ্য উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে রাঢ়বঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চলকে গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতা আনয়নের ক্ষেত্রে শৈলজানন্দকে ভগীরথের মর্যাদা দেওয়া হয়। অনেকেই এবিষয়ে তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তবে সবাই যে একবাক্যে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন এমন নয়। যেমন তাঁর সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের

বিখ্যাত বাস্তববাদী চিত্রকর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মুল্যায়নে বলেছেন — 'শৈলজানন্দের গ্রাম্যজীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ —কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এর বাস্তব সংঘাত আসে নি। বস্তিজীবন এসেছে কিন্তু বস্তিজীবনের বাস্তবতা আসেনি — বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তের রোমান্টিক ভাবাবেগ"।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় উপন্যাস ও গল্পসহ প্রায় ১৫০টি বই লিখেছেন। এর মধ্যে রয়েছে 'ঝড়ো হাওয়া' (১৯২৩), 'মাটির ঘর' (১৯২৪), 'বাংলারমেয়ে' (১৯২৫), 'জোয়ার ভাঁটা' (১৯২৬), 'নারীমেধ', 'বানভাসি', 'দিনমজুর', 'পাতালপুরী','আকাশকুসুম', 'সারারাত কয়লাকুঠির দেশ', 'চাওয়া পাওয়া', 'বন্দী' ইত্যাদি। নজরুল ইসলামকে নিয়ে লেখেন 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে'। তাঁর অনেক উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িতও হয়েছে। তিনি নিজে একজন পরিচালক ছিলেন। তাঁর প্রথম ছবি ছিল 'পাতালপুরী'। নিজের কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় শৈলজানন্দ মখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ছবি 'নন্দিনী'। তাঁর বন্ধু ও সহপাঠী নজরুল ইসলাম এই সিনেমার একাধিক গান লিখে দিয়েছিলেন। ছবিটি দারুন জনপ্রিয় হয়। এর পরে তিনি বন্দী, শহর থেকে দূরে, মানে না মানা, বাংলার নারী, ঘুমিয়ে আছে গ্রাম, আমি বাড় হব ইত্যাদি চলচিত্র পরিচালনা করেন। ছবি তৈরীর জগত থেকে আবার সাহিত্য জগতে ফিরে এলেন। যোগ দিলেন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের নাট্য বিভাগে। আকাশবাণীতে তিনি বহু নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনাও করেছিলেন। যার মধ্যে গ্রহচক্র, কবি, কালরাত্রি, নারায়নী, নিরুদ্দেশ, রাহু প্রভৃতি।

সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য ১৯৫৯সালে প্রফুল্লকুমার ও সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরষ্কার, ১৯৬০ সালে আনন্দ পুরস্কার, ১৯৬৬ সালে উল্টোরথ পুরস্কার এবং যাদবপুর এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট এবং ১৯৭৬ সালে মরণোত্তর শরৎ পুরস্কার লাভ করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

১৯৭৬ সালে ২ জানুয়ারি কলকাতা শহরে এই চিরস্মরণীয় কথাসাহিত্যিকের তিরোধান হয়। 'কয়লাকুঠির দেশ'- গল্পটি সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চিরস্মরণীয় কথাসাহিত্যিককে উদ্দেশ্য করে যা বলেছিলেন, সেটা মনে হয় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সমগ্র সাহিত্য জীবন সম্বন্ধ সবচেয়ে গভীর অনুভাবী মন্তব্য—"আমরা দোতলার জানলা দিয়ে গরীবদের দেখেছি, তুমি তাদের সাথে মিলে মিশে একাত্ম হয়ে তাদের সুখ দুঃখ অনুভব করেছ গভীরভাবে। তোমার লেখা আমার ভালো লাগে। সাহিত্য তোমায় স্থায়ী আসন দেবে"।

ছোটগল্পে শৈলজানন্দ : এক স্বতন্ত্র পথের নিঃসঙ্গ পথিক

মা ন স আ চা র্য্য

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে একদল তরুণ তুর্কির আগমন ঘটে যাদের চোখে ছিল তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, চাঞ্চল্য বিদ্রোহ এবং স্বপ্নদর্শন প্রবণতা, তারা ছোট গল্পে এক 'রবীন্দ্র-উত্তর' যুগ আনতে চেয়ে ছিলেন। তাদের মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ অনেক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে উত্তীর্ণ করার বাসনা তাদের মনে প্রবল আকার ধারণ করেছিল। প্রধানত 'কল্লোল' (১৩৩০-৩৬) 'কালিকলম' (১৩৩৩-৩৬) এবং প্রগতি (১৩৩৪-৩৮) এই তিনটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই চলেছিল তাদের সাহিত্য সাধনা। এছাড়া আরো কয়েকটি পত্রিকার নাম করা যায়, কম হলেও 'উত্তরা', 'ধূপছায়া', 'আত্মশক্তি'তে ও তাদের রচনা প্রকাশিত হোত। এই সকল পত্রিকার মধ্যে কল্লোল বিশেষ ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে ছিল বলেই এই পত্রিকার অনুসারে সময়টিকে 'কল্লোলের যুগ' বলা হয়। বুদ্ধদেব বসু খুব সংক্ষেপে কল্লোলের যুগের বৈশিষ্ট্যটি নির্দেশ করে বলেছেন— "যাকে কল্লোলযুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।" [(১)]

কল্লেলের সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ—পত্রিকাটির সাহিত্যিক পরিচয় দিয়ে লেখেন—

"আমি কল্লোল শুধু কলরোল দিশাহীন
অজানা জানার নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি ফিরে আসি নিশিদিন।
মনে নাই মোর কোন আদিকালে কে দিল এমন ধন্না,
মোর নীল জলে কোন্ গতিহীন
ঝাঁপ দিল আসি কবে কোন্ দিন?
চিরদিন তাদের জাগাইল এই বিপুল রোসের কান্না।
জানি এই ধ্বনি জনমে মরণে হবে নাকো তার সারা,
যাবে না শুকায়ে সাগরের বুক
যাবে না ঘুচিয়া মানুষের দুখ
তবু নিরুপায় কেঁদে দিন যায় আমি যে বাক্যহারা!
আশা আছে তবু যদি কোনোদিন শতশত যুগ পরে
বধির শিলার ফেটে যায় বুক
গুঁড়াইয়া যায় তার নিজ সুখ,
জলকল্লোল তুলি কলরোল বক্ষ তাহার ভরে।"[২]

কল্লোলের লেখক বর্গের মনে এক যুগগত অবিশ্বাস ও অস্থির চঞ্চলতা ঘিরে ধরে

ছিল। তখনকার যুব সম্প্রদায়ের মনে হতাশা নৈরাশ্য, অবসাদ, ক্লান্তি অধিকার করে ছিল। কারণ হিসাবে বিশ শতকের প্রথমার্ধের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকাকেই দায়ী করা যায়। বাংলার জন জীবনে আলোড়নসৃষ্টিকারী ঘটনা গুলি হল (১) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫), (২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪), (৩) রুশ বিপ্লব (১৯১৭), (৪) অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), (৫) মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সাম্যবাদ আন্দোলন (১৯১৯-২১), (৬) কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯২৮), (৭) মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বহু রাজনৈতিক কর্মীর দণ্ড (১৯২৯), (৮) আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩১), (৯) বাংলায় মার্কস ও লেনিন চর্চা (১৯৩১-৩৫), (১০) ফ্রয়েডিয় মনস্তত্বের সঙ্গে পরিচয় (১৯১৩), (১১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯), (১২) আগষ্ট আন্দোলন (১৯৪২), (১৩) বাংলার মন্বন্তর (১৯৪৪), (১৪) নৌবিদ্রোহ (১৯৪৬), (১৫) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬) (১৬) স্বাধীনতা লাভ (১৯৪৭) এ সকল ঘটনা কেবলমাত্র বাংলার জন চিত্তে আলোড়নই সৃষ্টি করেনি। তাদের মধ্যে এক সৃষ্টি ও ভাঙনের যুগপৎ রহস্যময় অভিব্যক্তি ধরা পড়ে ফ্রয়েডের শিষ্য অ্যাডলারওয়ুং এবং হ্যাভলক এলিস-এর প্রেমের দেহবাদী ও যৌনবাদী ব্যাখ্যা, বার্নাড শ ও ফেবিয়ানদের নব অর্থ নৈতিক চিন্তা তৎকালীন যুবকদের উত্তেজিত ও উদভ্রান্ত করে তুলেছিল। তাদের মনে হয়েছিল এই যুগগত চাহিদাটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক মত সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে পারছেন না। তাই একরকম রবীন্দ্র-বিরোধিতার মধ্য দিয়েই এক দল তরুণ বাংলা ছোট গল্পে অগ্রসর হলেন। এদের মধ্যে প্রথম সারির তিনজন হলেন— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু। এরপর যাদের নাম করতে হয় তারা হলেন মনীশ ঘটক, প্রবোধকুমার সান্যাল, জগদীশ গুপ্ত, গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশ রঞ্জন দাশ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়। মাত্র ছ'বছর চলে কল্লোল—বন্ধ হয়ে গেলেও এ আন্দোলনের ঢেউ অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-৭৬) সাহিত্যের জগতে এক বিরল ব্যক্তিত্ব। যিনি কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক হয়েও শিল্পী আত্মার স্বধর্মে তিনি এক স্বতন্ত্র পথের নিঃসঙ্গ পথিক। তিনি কল্লোলের সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রশ্নে প্রথম পরিচয়ের সময় বন্ধু অচিন্ত্যকুমারকে বলেছিলেন—"কল্লোলে না এসে পারি? আজকের দিনে যত নতুন লেখক আছে স্তব্ধ হয়ে, সবায়ের ভাষাই ওই 'কল্লোল'। সৃষ্টির কল্লোল, স্বপ্নের কল্লোল, প্রাণের কল্লোল। বিধাতার আশীর্বাদে তাই সবাই একত্র হয়েছি। মিলেছি এক মানস-তীর্থে। শুধু আমরা ক'জন নয় আরো অনেক তীর্থঙ্কর"[৩] সাহিত্য জীবনের সূচনা লগ্নে 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে তার সংযোগটি বিশেষ তাৎপর্যের দাবি রাখে। যুদ্ধ পরবর্তি সাহিত্যধারা যাদের হাতে নূতন মাত্রা পেল তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম, 'কল্লোল'-এর প্রথম সংখ্যাতে প্রকাশিত হল 'মা'। এর পর দ্বিতীয় সংখ্যায় 'নারীর মন', ষষ্ঠ সংখ্যায় 'বামরু' দশম

সংখ্যায় 'মরণ বরণ' এবং একাদশ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে থাকল ধারাবাহিক উপন্যাস—'পান্থবীণা' ও 'ডাক পিয়ন'। বলাবাহুল্য কল্লোলের সঙ্গে শৈলজানন্দের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মুরলীধর বসুর উৎসাহ ও সম্পাদনায় 'কালি-কলম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ লাভ করে যার অন্য দুজন সম্পাদক হলেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই সময় পর্বে কেবল 'কল্লোল' বা 'কালি-কলম' নয় 'সংহতি' 'বিজলী' 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাতেও তার লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। ইতি মধ্যে তার বিয়ে হয়। পেশা হিসাবে তিনি যেহেতু সাহিত্য সাধনাকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাই অনেকটা আর্থিক কারণেই তিনি 'কাল-কলমে' যুক্ত হন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করেন। অবশ্য 'কালি-কলম'-এর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র বা শৈলজানন্দের সম্পর্কও বেশী দিন থাকে নি। তারা একে একে ফিরে যান 'কল্লোলের" টানে। কিন্তু মুরলীধরের সঙ্গে তার যোগাযোগছিল অবিচ্ছিন্ন। এক দিকে অসুস্থ স্ত্রী-পয়সার অভাবে সুচিকিৎসা করা যাচ্ছে না, অন্য দিকে তিনি বুঝতে পারছেন যে তার লেখা গুলি রসোত্তীর্ণ হচ্ছে না। একথা গুলি তিনি অকপট ভাবে মুরলীধরের কাছে ব্যক্ত করে—আত্মহত্যার প্রবল ইচ্ছাটিও প্রকাশ করেন—তিনি আরো লেখেন—"ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে আমার মৃত্যু কামনা কর। মুরলীদা, লক্ষ্মী দাদা আমার, বাঁচিবার সাধ আর আমার নাই।'[৪] মরবার পূর্বে তিনি একটি অভিলাষ করেন যেন মৃত্যুর পূর্বে তিনি যেন একটি ভালো লেখা লিখে যেতে পারেন। তার মনে হয় মানুষের জীবন নিষ্ঠুর অন্ধ নিয়তির নির্মম পরিহাস, কিন্তু এই মানসিক অবস্থা তার দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়নি। কিছু দিনের মধ্যে তিনি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। তার মনে হল তিনি যেন ভালোর দিকে এগিয়ে চলেছেন, চলেছেন সম্পূর্ণতার দিকে আত্মহত্যার কথা ভুলে আত্মরক্ষার প্রয়াসে তিনি যত্নবান হয়ে ছিলেন, তিনি নতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজের সৌন্দর্য ও আনন্দকে ব্যক্ত করে জগৎস্রষ্টার পাদপদ্মে তা উৎসর্গ করে নিজেকে ধন্য মনে করে ছিলেন।

মুরলীধরের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচয় হয় শৈলজানন্দের মাধ্যমেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র চক্রবেড়ে রোডের ওপর ভাঙাচোরা চিলেকোঠা নিয়ে আড়াই তলার মেসবাড়ী দেখে অবাক হয়ে ছিলেন। অচিন্ত্যকুমার তার 'কল্লোল যুগ'-এ এই ভাঙাচোরা মেসবাড়ীটির বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে—"দোতলা বাড়ি, পুব পশ্চিমে লম্বা, দোতলায় সুমুখের দিকে কাঠের রেলিং দেওয়া একফালি বারান্দা, প্রায় পড়ো পড়ো, জায়গায় জায়গায় রেলিং আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। উপরতলার মেস, নিচে সাড়ে বত্রিশ ভাজার বাসিন্দে। হিন্দুস্থানী ধোপা, কয়লা-কাঠের ডিপো, বেগুনি যুক্ত ফুলুরির দোকান, চীনে-বাদাম'ওয়ালা কুলপিবরফওয়ালা আস্তানা। বিচিত্র রাজ্য। সংহতির সংকেত।...

শৈলজার মতো আরো অনেকে মেঝের উপর বিছানা মেলে বসেছে। চারধারে

জিনিসপত্রের হাবজা-গোবজা। কারু-বা ঠিক শিয়রে দেয়ালে-বেঁধা পেরেকের উপর জুতো ঝোলানো। পাশ-বালিশের জাগায় বাক্স-প্যাঁটরা পোড়া বিড়ির জগন্নাথক্ষেত্র। দেখলেই মনে হয়, কতগুলি যাত্রী ট্রেনের প্রতীক্ষায় প্লাটফর্মে বসে আছে। কোথাকার যাত্রী? ধ্বংসপথের যাত্রী এরা।"[৫] এই মেস জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে। শৈলজানন্দ লিখে ফেলেন 'ধ্বংস পথের যাত্রী এরা' নামক গল্পটি। যা 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হয় এবং সে সময়ে গল্পটি বিশেষ সমাদ্রিত হয়েছিল। আসলে শৈলজানন্দের সাহিত্য সৃষ্টির মূলে ছিল নব বাস্তবতা, আবেগময়তা ও সহানুভূতি বোধ। জনজীবনের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ। শ্রেণী সংগ্রাম চেতনার সংকেত ও আঞ্চলিক জীবন চেতনা তার সাহিত্যকে সর্বজন গ্রাহ্য করে তুলেছিল। অচিন্ত্য কুমার মেনে নিয়ে ছিলেন—যে কল্লোলের যুগের প্রধান দুটি সুর হল—প্রবল বিরুদ্ধবাদ এবং বিহ্বল ভাব বিলাস। সে দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় তিনি কল্লোলীয়দের সবচেয়ে কাছাকাছি থেকেও কল্লোল' চেতনার অংশীদার হতে পারেননি। বিষয় ভঙ্গিও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কল্লোল চেতনার প্রবল বিরুদ্ধবাদের অংশীর না হয়ে নিজেকে এক নিংসঙ্গও স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়ে গিয়েছিলেন। নিজস্ব অভিজ্ঞতায় ভিত্তিতে এক নির্লিপ্ত নিরাসক্ত ভঙ্গীতে সাঁওতাল—বাউড়িদের জীবনের সুখদুঃখের কথা তুলেছে ধরেছেন আপাত উদাসীনতায়। সেখানে বিরুদ্ধবাদ দেখানোর প্রয়াস তিনি করেননি। অপর পক্ষে কল্লোল যুগের ভাববিহ্বলতা আর রোমান্টিকতার অভিঘাত তার রচনায় পড়েনি বরং পড়েছিল সহানুভূতি পূর্ণ অবলোকন তিনি কল্লোল গোষ্ঠীর যাযাবর কল্পনা, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে উচ্ছ্বাস প্রবণতার মিশ্রণ, রোমান্টিসিজিম, অকপট যৌনতার বিবরণ—এর পথ অনুসরণ না করে তৈরী করেছেন এক নিজস্ব রীতি, নববাস্তবতা।

সাহিত্যে বাস্তবতাবাদ কোন নোতুন জিনিষ নয়। বরং বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ থেকেই সে প্রচেষ্টার শুরু, শিলাইদহ পর্বে পদ্মাতীরের সাধারণ মানুষে জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা কিভাবে গল্প হয়ে উঠেছে তার বিবরণ ছড়িয়ে রয়েছে 'ছিন্নপত্রাবলীর পাতায় পাতায় শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, পরশুরাম, প্রথম চৌধুরী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সাহিত্যে বাস্তব প্রবনতা অনেকটাই এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু কল্লোল কেন্দ্রিক লেখক গোষ্ঠীর কাছে বড় ছিল সমাজ-সংসারে যারা পতিত পীড়িত হত দরিদ্র, তাদের কথাকে বাঙ্ময় করে তোলো। জীবনের যে দিকটা অসুন্দর অপ্রিয় সে দিকটাকেই সকলের সামনে তুলে ধরতে চাইল তারা। আর তা করতে গিয়ে বাস্তবের সাহিত্যায়নের দু'টি বিশিষ্ট সীমাবদ্ধতা রোমাণ্টিকতার অতিরেক এবং বাস্তবের রূপায়ণে আত্মপ্রক্ষেপ। তার সঙ্গে যুক্ত হল অবাধ যৌনতার চিত্রবর্ণন। নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে তারা জীবনের পঙ্কিল কদর্যরূপকেই বাস্তবতা বলে মনে করেছিল। কিন্তু শৈলজানন্দের বাস্তবতা অন্য ধরনের। তাকে বাংলায় নিম্নবর্গের সাহিতের জনক বলা যায়। তার সাহিত্যের

কুশি-লবরা প্রধানত কয়লা খনির কুলি-মজদুর তাদের জীবনচর্যা, সুখ দুঃখ, প্রেম-বিরহ, উঁচুতলার মানুষ—সাহেব, নায়ের কর্তৃক শাসন শোষনের বাস্তব চিত্র অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে উঠে এসেছে তার রচনায়। এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ এবং বিদ্রোহ বড় করে দেখা যায়নি পরিবর্তে উঠে আসে নীরব দুঃখ ও অসহায়তার চিত্র এ সব উপাদান সংগ্রহ করতে তাকে বেশী কষ্ট করতে হয়নি। তার বৈচিত্রময় জীবনের এক অধ্যায় কেটে ছিল কয়লাকুটিতে চাকরি করে শৈলজানন্দকে আকৃষ্ট করে ছিল—রানিগঞ্জ-উখড়া-ধানবাদ, অঞ্চলের কয়লাখনির কুলি কামিনদের অবহেলিত নিপীড়িত জীবন যাত্রা। এছাড়াও তার শৈশব ও যৌবনে দিন গুলি কেটে ছিল রানিগঞ্জের কয়লা খনি অঞ্চলে। কারণ তার মামাবাড়ীতে তাকে থাকতে হয়েছিল। এখানকার মানুষ গুলি তাকে যে কি পরিমাণ প্রভাবিত করেছিল, তার প্রথম জীবনের রচনাবলী থেকেই বোঝা যায়। কয়লাখনির সাঁওতাল---বাউড়ি কুলি-কামিনদের জীবনের উপর আধারিত-কয়লাকুঠি—মাসিক বসুমতীতে প্রকাশের পর তাকে একটা আলাদা পরিচিতি এনে দেয়। তিনি এই রচনাটির প্রেরণার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—"কয়লা কুঠির দেশ। রবিবার দিন ছুটি পেলেই দুজনে দুটি খাতা হাতে নিয়ে চলে যাই বহুদূরে। একদিন এক কয়লা খাদের পাশে সাঁওতালি কুলি-ধাওড়ার কাছে আমরা বসে বসে গল্প করছি। আমার বেশ মনে আছে দূরে প্রকাণ্ড চিমনির মুখে ধোঁয়া উঠছে, চানকের মুখে হেড্ গিয়ারের চাপে ঘুরছে, তার উপর পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে, 'ঢং ঢং করে' ঘণ্টা বাজছে মাটির নীচে থেকে কয়লা বোঝাই টবগাড়ি উঠছে, দূরে একটি আম বাগানের পাশে হঠাৎ কোথায় যেন মাদল বেজে উঠল। এইসব মিলিয়ে আমার মনের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব ভাব জাগল যে আমি আর কিছুতেই তাকে ভুলতে পারলাম না। বাড়ি ফিরে এসেই গল্প লিখতে বসে গেলাম। লিখলাম 'কয়লা কুঠি'।"[৬] কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক হলেও রবীন্দ্রনাথ তার কাহিনী বয়ন চয়ন ও ভাষারীতি ও বাস্তব সম্মত শিল্প নির্মানের অভিনবত্বকে স্বীকৃতি জানিয়ে লিখেছেন "আমিও অনেক সাঁওতাল এখানে (শান্তিনিকেতনে) দেখেছি আমার ও একবার ইচ্ছে করেছিল ওদের নিয়ে একটি গল্প লিখবার। কিন্তু লিখিনি, লিখতে পারিনি, কারণ ওরা যে রকমভাবে বাংলা বলে আমি সেরকম ভাবে বলতে ও পারিনা, লিখতেও পারিনা।"

আমি ওদের দেখেছি দোতলার জানলা থেকে, আর তুমি দেখেছ ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। কাজেই তোমার দেখা আর আমার দেখার মধ্যে তফাৎ অনেক। তুমি ওদের সম্বন্ধে লেখার যথার্থ অধিকারী।"[৭] রবীন্দ্রনাথ তার 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের সংকলন কালে একটি পরিত্যক্ত অংশে আরো বলে ছিলেন—"শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র-জীবন যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর

আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র ঘোষণায় কৃত্রিমতা নেই। তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্রের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকেনি। নবযুগের সাহিত্যে নতুন একটা কাণ্ড করছি জানিয়ে পদভরে ধরনী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখিনি-দরিদ্রনারায়ণের পূজারির মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যে সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবার করি-পাউডারি ভঙ্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি।"[৮]

শৈলজানন্দের শিল্পী জীবনকে প্রধানত তিন পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

১। প্রথম পর্ব—

(১) সূচনা থেকে ১৯৪১ খ্রিঃ পর্যন্ত ঃ—

এইপর্বে ১৯২২ সালে প্রকাশিত গল্প কয়লাকুঠি দিয়ে তার জয়যাত্রা শুরু। এই পর্বে লিখিত গল্প এবং উপন্যাসে প্রধানত নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রাম ও উত্থান পতনের কথা উঠে এসেছে।

২। দ্বিতীয় পর্ব—

(২) ১৯৪১-১৯৫৭—এ পর্বটিকে তার সাহিত্য থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন পর্ব হিসাবেও চিহ্নিত করা চলে। এই সময় তিনি এক দিকে আর্থিক অবস্থা কারণে অন্য দিকে রূপালি পর্দায় জনপ্রিয়তা লাভের আকাঙ্খায় ১৭ বছর অতিবাহিত করেন। এক দিকে চিত্র নাট্য রচনা অপর দিকে পরিচালনার কাজ তিনি এক হাতে করেছেন। সিনেমার জগতে অনেক কিছু করবার আশা ছিল। কিন্তু তা সফল হয়নি।

(৩) তৃতীয় পর্ব-তিনি সিনেমা ছেড়ে আমৃত্যু সাহিত্য সেবায় আত্ম নিয়োগ করে ছিলেন।

তার লেখা গল্প ও উপন্যাসের মোট সংখ্যা সঠিক ভাবে পাওয়া যায় না। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা হল—কয়লাকুঠি, ডাক্তার, নারীমেধ বন্দী, আজ শুভদিন, কনে চন্দন, একমন দুই দেহ, বধূবরণ, ক্রৌঞ্চমিথুন, ঝোড়ো হাওয়া, রূপং দেহি, সারারাত, ষোল আনা, অপরূপা, স্ব-নির্বাচিত গল্প, বানভাসি, অতসী, ইত্যাদি যদিও কয়লাখনি বিষয়ক গল্পে শৈলজানন্দের অধিক সিদ্ধি। এই গল্পগুলিতে সাঁওতাল বাউড়িদের নিঃসঙ্কোচ প্রেম, ভালোবাসায় ঈর্ষা, আত্মত্যাগ, প্রতিশোধ ও উদ্দাম যৌনচেতনা পরিস্ফূট। কিন্তু তাই বলে তিনি সেখানেই থেকে থাকেন নি। তিনি সেখানে থেকে সরে এসে বেশ কিছু সাধারণ গল্পও লিখেছেন যার প্রধান বিষয় দাম্পত্যসম্পর্ককেন্দ্রিক বা নারী নির্যাতন বিষয়ক রচনা এছাড়াও কিছু বিবিধ রচনা রয়েছে তিনি 'যখন গল্প লিখতে শুরু করেন তখন। এক অর্থনৈতিক মন্দা সমগ্র সমাজ 'ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। যার ফলশ্রুতি

রূপে- দারিদ্র্য- অভাব-অনটন আর বেকারত্ব লেগেই ছিল। তিনি দেখে ছিলেন ব্রিটিশ অত্যাচার এবং অর্থনৈতিক শোষণ। দেখেছেন নানা রকম রাজনৈতিক অর্থনৈতিক শ্রমিক আন্দোলন। তিনি সাহিত্যে ফ্রয়েড আর মার্কসীয় প্রভাব পড়তে দেখেছেন, তিনি অন্যান্য লেখকদের মতো প্রভাবিত না হয়ে নিজ অভিজ্ঞতা নির্ভর বাস্তব ধারায় নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ছোট গল্পগুলি লিখে গেছেন। তৎকালীন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এবং সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব আর লেখনিতে পড়েনি। তিনি বিভিন্ন সময়ের অন্ডাল আসানসোল রানিগঞ্জ ধানবাদ ঝরিয়া অঞ্চলে দেখেছেন কয়লাখনির শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে লাগাতার আন্দোলন। কিন্তু এদিকটি থেকে তিনি সরে এসে শ্রেণীবিভক্ত মানব সমাজে শোষিত-নির্যাতিত-দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের প্রতি সহানুভূতি শীল মানবদরদী হয়ে গল্প গুলি লিখেছেন।

'কয়লাকুঠী' গল্পটি সর্ব প্রথম সাড়া জাগিয়ে ছিল পাঠক মনে। এই গল্পই শৈলজানন্দকে দিল এক পৃথক পরিচিতি। গল্পটি খুব উন্নত মানের নয়। কিন্তু গল্পটির প্রেক্ষাপট- ভাষা-বর্ণনাভঙ্গী-চিত্রকল্প এমন নিখুত ভাবে তুলে ধরে ছিলেন যে তাকে আর পাঁচ জন কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকের থেকে স্বতন্দ্র পথের পথিক বলে চিহ্নিত করা গিয়ে ছিল। গল্পটি বড়, চারটি ভাগে বিভক্ত। এটি একটি প্রেমের গল্প বাউরি সম্প্রদায়ের মেয়ে বিলাসীর সুতীব্র প্রেমতৃষ্ণা এবং তার করুণ পরিণতি গল্পটির বিষয়বস্তু বিলাসী ঝরিয়া কয়লাখনি ছেড়ে প্রেমিক নানকুর সঙ্গে চলে আসে রানিগঞ্জের কাছে জোড়াজানকী কয়লাকুঠীতে কাজ করতে। তাদের বিয়ে হয়। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের স্বামী নানকুকে তার স্ত্রী বিলাসী প্রচণ্ড ভালোবাসত। কিন্তু তা সত্ত্বেও নানকু মন দেয় মাইনুকে। তারা দুজনে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে বিলাসী রমনা নামে এক জনের সঙ্গে থাকতে শুরু করে। সে তাকে শরীর দিলেও নানকুর প্রতি অবিচল ভালোবাসা থাকায় মন দিতে পারেনি। এবং কোন দিন বিয়েও করতে পারেনি। এক দিন বিলাসী খবর পায় যে মাইনু মারা গেছে এবং নানকু ফিরে এসেছে। এতে বিলাসী আনন্দে আত্মহারা হলেও পরে জানতে পারে কয়লাখনি গর্ভে চাপা পড়ে তার স্বামী নানকুও মারা গেছে। এই খবর শুনে সে প্রচুর মদ খায় এবং রাতের অন্ধকারে খনির তলায় গিয়ে নানকুর মৃতদেহ খুঁজে বার করে এবং তাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো বিলাপ করে। এমন সময় কয়লার একটা বড় চাঙড় তাদের উপর পড়লে চাপা পড়ে নানকুর সাথে সাথে বিলাসী ও সমাধিস্থ হয়ে যায়। এই ভাবেই এক বিয়োগান্তক পরিণতির মধ্যদিয়ে গল্পটি সমাপ্ত।

গল্পটি বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ আসানসোল এলাকার কয়লাখনি অঞ্চলের পটভূমিকায়

অত্যন্ত জীবন্ত হয়েছে। বিলাসী নানকু , মাইনু, রমনার মত চরিত্র এবং তাদের কার্যকলাপ পুরোপুরি এই কয়লা খনি অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের শ্রমিক-মজুর শ্রেণির মানুষদের কথাই স্মরণ করায়। বিশেষ আঞ্চলিক প্রতিবেশের বাইরে এই রকম মানুষজনের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। বাউড়ি কন্যা বিলাসীর স্বামী নানকুর প্রতি প্রেমে একনিষ্ঠ থেকেও রমনা খালাসীকে দেহদান করা গল্পটির একটি বিশেষ দিক। আবার ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নানকুর অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ কয়লাখনি অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শ্রমিক-মজদুরদের মানসিকতাকেও স্পষ্ট করে। এখানে সাঁওতাল-বাউড়িদের মতো উপজাতি সম্প্রদায়ের আদিম প্রেমের চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। বিলাসী যে ভাবে মদ্যপ অবস্থায় মাইনুর সহযোগিতায় কয়লাখনির গর্ভে নেমেছে তা এক মাত্র ওই অঞ্চলের উপজাতি গুলির পক্ষেই সম্ভব। এই গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক আঞ্চলিকতাকে যেভাবে বাংলা কথা সাহিত্যে নিয়ে এলেন—তা একটা নতুন দিক উন্মোচন করেছে—যা পরবর্তী সময়ে আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার পথকে প্রসস্থ করেছে।

এর পর আমরা দেখতে পাই 'রেজিং রিপোট' গল্পটি। এ গল্পে তিনি কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমিক শোষণের মর্মন্তুদ ও কদর্য চিত্র এঁকেছেন। এর কাহিনী অংশে দেখা যায় যে কয়লাখনি ম্যানেজার জেমস সাহেব অধিক লাভের নেশার শ্রমিকদের অবধারিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিওে দুবার ভাবেন না। তার এই উদগ্র আকাঙ্খার বলি হয় কারখানার শ্রমিক টুইলা। সে খনির অতলে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। তার মৃত্যু জেমস সাহেবের মনে কোন অনুশোচনা জায়গা না। তার কাছে এটা কোন নতুন বিষয় নয়। তা বলে থেমে থাকলে চলবে না যেন তেন প্রকারেণ কয়লার রেজিং বাড়াতে হবে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু জনিক ক্ষতিপূরণের বিষয়টিতে মালিক পক্ষের মনোভাব বিশেষ রূপে প্রকটিত হয়ে ওঠে। গল্পটিতে রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমিকদের শোষণের চিত্র সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। আঞ্চলিক গল্প হিসাবে 'রেজিং রিপোর্ট' খুবই প্রশংসা পেয়েছিল।

কয়লাকুঠি সিরিজের আর একটি উল্লেখ যোগ্য গল্প হল 'মা'। গল্পটিতে সাঁওতাল যুবক-যুবতীর সমাজ-বিগর্হিত অসংযত যৌবনলীলা এবং সাঁওতাল সমাজের খণ্ডখণ্ড চিত্র ধরা পড়েছে। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাঁওতাল রমনী পরী। সাঁওতাল যুবক টুরা তাকে ভালোবেসে। পরীর সঙ্গে টুয়ার বিয়ে দিতে টুয়ার বাবা লামার কোন আপত্তি নেই। পরী তাকে ভালোবাসলেও তার জ্যাঠা তথা প্রতিপালক দুখনের আপত্তিতে বিয়ে করতে পারে নি। কারণ দুশ্চরিত্র জামাইয়ের হাতে পড়ে তার এক মাত্র মেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করায় দুখনের বিয়ের প্রতি আস্থা ছিল না। পরীও টুরা দুজনেই কয়লা খনিতে

কাজ করে। টুরা পরীকে বারবার বিয়ের প্রস্তাব দিলেও সে প্রত্যাখ্যান করে। এই অবস্থায় এক দিন কয়লাখনির অন্ধকারে টুরা পরীকে জোর করে ভোগ করলে পরী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তবুও সে টুরাকে বিয়ে করতে রাজি হয় না এবং আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়, তিন নম্বর খাদে আত্মাহুতি দিতে গিয়ে ভাবী সন্তানের কথা ভেবে সে ফিরে আসে। ফিরে আসার পথেই তার সন্তান জন্ম নেয়। সেখানে টুরা এসে পৌঁছালে পরী আর কোন কথা না বলে টুরার পেছনে পেছনে ধীর পদক্ষেপে তার কুটীরে প্রবেশ করে। এই ভাবে এই গল্পে এক প্রান্তিক সমাজের নারী পরীর জননীসত্তার উন্মোচন ঘটানো হয়েছে। পাশাপাশি গল্পটিতে কয়লা খনি অঞ্চলের সাঁওতাল সমাজের বহুমাত্রিক ছবি ধরা পড়েছে।

এই পর্যায়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প হল 'নারীর মন' একটি পুরুষকে নিয়ে দুই নরীর ঈর্ষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা মান অভিমান এবং অবশেষে গভীর ভগিনী-স্নেহ এই গল্পের মূল উপজীব্য। এই গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র ভুলি সাঁওতাল যুবক ভোলার ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে পীরু মাঝির পৌরুষ ও উদ্দামতায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিয়ে করে। কিন্তু বিয়ের পর জানা যায় ভুলি বন্ধ্যা। এই অজুহাতে পীরু ভুলির বোন টুরনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভুলি এতে প্রতিবাদ করার স্বামীর হাতে মার খায়। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ভোলাকে পীরুর বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। প্রতিশ্রুতি দেয় ভোলা যদি পীরুকে পরাস্ত করতে পারে তাহলে সে তাকে 'সাঙা' করবে। কিন্তু ভোলা চরম ভাবে পরাস্ত হয়। বিষয়টিতে ভুলি হতাশ হবার পরিবর্তে পীরুর জয়ে উল্লসিত হয়। এসব দেখে টুরনী-পীরুকে স্ত্রী ভুলির কাছে রেখে আসামে কুলি-মজুর হয়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু ভুলি তা হতে দেয় না। সে বোনের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিজেই আসাম যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ট্রেনে চেপে বসে। টুরনী স্টেশনে পৌঁছানের আগেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। দূরে পলাশ বনে বোনের দৌড়ে আসা দেখে তুলির চোখ ছল ছল করে। সে প্রাণ ভরে বোনকে দেখে নিয়ে জানালর পাশে সরে বসে। এভাবে গল্পটিতে কয়লাখনি অঞ্চলের অন্ত্যজ নারীর প্রেম-বঞ্চনা-প্রতিশোধস্পৃহা এবং ভগিনীপ্রীতির চিত্র দেখানো হয়েছে।

'জোহানের বিয়া' গল্পটিও কয়লাখনি অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুখীর মাধ্যমে গল্পকার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নারীর আপাত নির্দয় বুকে প্রচ্ছন্ন বেদনা লুকিয়ে থাকার ছবি এঁকেছেন। উচ্ছল যুবতী সুখী পরিস্থিতির চাপে পড়ে খোঁড়া জোহানকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। শারীরিক দিক দিকে পঙ্গু জোহানের দৈহিক মুখ দেবার ক্ষমতা না থাকায় সুখী তাকে নানা ভাবে অবজ্ঞা করে। আর জীবনে জোহানের উপস্থিতিকেও সে অস্বীকার করতে চায়। ঘটনাক্রমে জোহানের অপমৃত্যু ঘটলে সুখী

প্রথম বুঝতে পারে তার হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে জোহানের প্রতি ভালোবাসা জন্ম নিয়েছে। এইজন্য সে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই গল্পে শৈলজানন্দ কয়লাখনি অঞ্চলের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সারল্যময় ভালোবাসা ও বেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। দেহকে আশ্রয় করে এই ভালোবাসা বিকাশ লাভ করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত দেহাতীত ভালোবাসায় পর্যবসিত হয়েছে।

'মরণ বরণ' গল্পটি দাঁড়িয়ে রয়েছে বহুল প্রচলিত জনশ্রুতির উপর। যেখানে উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা এদেশে এসে সাঁওতাল রমনীদের ভাস্কর্য সুলভ সুঠাম শরীর ভোগ করত। এর পরিণতিতে কালো মায়ের কোলে গৌরবর্ণ সন্তান আসত। কিন্তু সে সন্তানের কোন দায় নিত না সেই সব ইংরেজ কর্মচারী। গল্পটির শুরুতে লেখক যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে করে তার সমাজ-সচেতনতা পরিস্ফুট। তিনি দেখেছেন ইংরেজ মালিকদের তিন রকম শোষণ প্রক্রিয়া—অর্থশোষণ, শ্রম শোষণ, শারীরিক শোষণ। এখানে রয়েছে এক সাঁওতাল রমনীর করুণ পরিণতি। সাঁওতাল ভাটুল মাজি খাদের নিচে ব্লাস্টিং-এর কাজ করত। বড় হলে তার ছেলেরাও এই কাজ করতে খাদে নামে। অর্থ আসে, সুখের সংসারে দুঃখের প্রবেশ ঘটে। প্রথমে ভাটুলের স্ত্রী মারা যায়। এর পর একদিন তার ছয় সন্তানকে খাদ টেনে নেয়। সেখানেই চার পুত্র সমাধিস্থ হয়। এরপর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ভাবনায় সে বিয়ে করে রূপ যৌবন সম্পন্না রুকিকে। রুকি বৃদ্ধের কাছে সন্তুষ্ট না হতে পেরে এক সাহেবের সঙ্গে অবৈধ দৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে তাদের একটি সন্তান ও হয়। প্রথমে ভাটুল সন্তান দেখে খুশি হলে ও পরে খেয়াল করে গৌরবর্ণ সন্তান জন্ম নিয়েছে। তাই সে সাহেব ও রুকিকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু বিফল হয়। শেষ পর্যন্ত রে আত্মহত্যা করে। রুকির আশা ছিল যে সাহেব তার যৌবন লুটে তার গর্ভে যে সন্তান এনে দিয়েছে, তাকে অন্তত শেষ আশ্রয় দেবে। কিন্তু সাহেব তা করেনি। সাহেব ট্রান্সফার নিয়ে চলে যাবার সময় রুকিকে তার সন্তানকে 'রসগুল্লা' খাওয়াবার জন দু-টাকা বকশিস দিয়ে চলে যায়। লেখক নিরাসক্ত ভাবে বৈধ অবৈধ বিচার না করে বর্ণনা দিয়ে যান।

অপর পক্ষে 'রহস্যময়ী' গল্পে আমরা দেখি সাঁওতাল কন্যা মাইনু মায়ের স্মৃতিকে মনে রেখে সাহেবের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। এক সাহেব রূপমোহে তার মাকে বিয়ে করলেও যৌবন চলে গেলে—তার মাকে ফেলে রেখে চলে যায়। মারা যাবার সময় মা মেয়েকে সে বলে যায় কখনো সাহেবদের বিয়ে না করতে। সেই থেকে মনে মনে সাহেবকে ভালো বাসলেও তাকে এড়িয়ে চলে। তাই ভালোবাসা ও ঘরবাঁধার ব্যার্থ যন্ত্রণা

বুকে নিয়ে বেড়ায় মইনু। নিজের জৈব প্রবৃত্তিকে যে বশে রাখে—সাহেবকে ফিরিয়ে দিয়ে সে কাঁদে। একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আরো যে সব গল্প লেখা হয়েছে সেগুলি অভাগা, মরণ, বিচার, বনবিহগী, সাঁওতালপল্লী ইত্যাদি।

এবার আমরা যে গল্পগুলি দেখে নেবার চেষ্টা করব তাদের সাধান বিষয় প্রেম। এরকম কয়েকটি গল্প হল 'পরাজয়', 'অসমাপ্ত', 'মন যারে চায়', 'বদলি মঞ্জুর', 'দেখার ভুলে', 'জয়পরাজয়'। 'প্রোতিনী', 'চিরশত্রু', 'বনহংসীর প্রেম' ইত্যাদি। পরাজয় একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। চলচ্চিত্র পরিচালনার সময় কালীন গল্প। তাই গল্পটি সংলাপ ধর্মী গল্পের তিনটি চরিত্র শিশির, সমর, এবং নীলা। শিশির সমর দুই বন্ধু। নীলাকে সমর ভালাবসে কিন্তু তার মা এ বিয়েতে রাজি নয় সমর বিলেতে চলে যায়। তিন বছর পর সমর ফিরে এসে বালিগঞ্জে বন্ধু শিশিরর বাড়িতে গিয়ে দেখে—নীলা (নীলিমা)-র সঙ্গে শিশিরের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু অবিবাহিত সমর তখনো ভালোবাসে নীলাকে। লেখক সমরের সঙ্গে নীলার একটি অসামাজিক সম্পর্ক তৈরী করে বিষয়টিকে রসাল করে তুলতে পারতেন। সেই সময় কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকগণ যাকে চূড়ান্ত বাস্তবতা। বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শৈলজার সামাজিক মূল্যবোধ তাকে সংযত রেখেছে। কিছুদিন বিলাতে থাকলেও উগ্র আধুনিকতাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। তার কাছে নারী-পুরুষের মধ্যে শারীরিক ভোগের সম্পর্ক গড়ে তোলাটা আধুনিকতা নয়—প্রগতিশীলতা তো নয়ই। এখানেই তিনি অনন্য অসমাপ্ত (রাখাল মাষ্টার) গল্পটি গড়ে উঠেছে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-সম্পর্কের সূত্র ধরেই। গল্পটির গঠন শৈলী লক্ষ্যকরার মতো। গল্পে উত্তমপুরুষ লেখক; রাখাল মাষ্টারকে নিয়ে গল্প লেখা যায় কিনা এরকম একটা প্রশ্ন তুলে গল্পটি শুরু করেন। রাখাল পোস্টমাস্টার। কিছুটা পাগল প্রকৃতির। নিবারণকে সে পাগলা বলে মনে করে কারণ সে চব্বিশ ঘণ্টা বৌ-বৌ করে। স্ত্রী সম্পর্কে ও সে বিরূপ মন্তব্য করে গলার আওয়াজ তার কানে সুধা বর্ষণ করে না—'কাঠে যেন চোট মারছে' কিন্তু তাই বলে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসায় কোন খাদ নেই। লেখকের ভুল ভাঙে যখন সে প্রথম রাখালের স্ত্রীকে দেখে। রাখাল যে বর্ণনা দিয়ে ছিল তার সাথে মেলেনা।—আয়ত দুই চক্ষু ম্লান হাসি-গৌরবর্ণ কৃষ্ণাঙ্গী যুবতি—সুন্দরী বলাই যায়। আসলে দুঃখ দারিদ্রে আর সৌন্দর্য ম্লান হয়ে পড়েছে। মাষ্টার-গৃহিনীর সম্ভ্রমতা লেখককে কল্পনা ছেড়ে বাস্তবতায় এনে দাঁড় করায়। তিনি মনে মনে ভাবেন, যাকে গল্পে কুৎসিত রূপে বর্ণনা করেছেন—সেই অংশটি বদলে দেবেন। তিনি ভাবতে পারেননা এই মহিলা কিভাবে মাষ্টারের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতে পারে রাখাল সম্পর্কে লেখকের একটা স্ত্রী

বিরোধী ইমেজ সহসা চুরমার করে ভেঙে যায় যখন সে অনুরোধ করে বলে, গল্পের যে অংশটায় লেখা আছে ও আমাকে ভালো বাসেনা-ওই অংশটা কেটে দিস। দারিদ্র্য লাঞ্ছিত, সংযত বাস্তব বোধ সম্পন্ন এক অসামান্য প্রতিমার কাছে রাখালের যাবতীয় মন্তব্য ও লেখককৃত কল্পনা মিথ্যে হয়ে যায় এক লহমায়। মন যারে চায়' গল্পের নায়ক বিভূতি এক জন টিউশনি করা স্কুল মাষ্টার। তার স্ত্রী রেণুর সঙ্গে দূর সম্পর্কের খুড়তুতো ভাই বিমলের সঙ্গে চিঠির আদান প্রদানে অবৈধ সম্পর্ক থাকায় কোর্টের নির্দেশ মতো স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠায় সঙ্গে ছেলেও যায়। কোর্টের নির্দেশ মতো প্রতি মাসে কুড়ি টাকা পাঠায়। দুজনের বিচ্ছেদে কোন রাগ নয়, থাকে-বেদনা থাকে প্রতীক্ষা। টাকা পাঠাতে দেরি হলেও সে আর ব্যাকুল হয় না। স্বামীকে সে ভুলতে পারে না, রেণু স্বামী সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে প্রতিবেশীদের বলে বিভূতি লিখেছে আমি আর টাকা পাঠাব না, একদিন চুপি চুপি গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসব—আর থাকতে পারছিনা। একই রকম ভাবে প্রতীক্ষায় থাকে বিভূতি। তার মনে হয় রেণু কি তার কথা ভাবে না, ছেলের মোজা দেখে সে আবেগে অবিভূত হয়।—একদিন সে দেখে তার চোখের জল পড়ে রেণুর সই করা কুপনে 'দেবী' শব্দটি মুছে গেছে। এই ভাবেই দুই বেদনা বিদ্ধ স্বামী স্ত্রীর মানস মিলন ঘটে। গল্পটি শেষ হয় বিভূতির সশরীরে রেণুর কাছে যাওয়ার অঙ্গীকারে। এ ভাবেই স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদান্তে প্রেম সম্পর্কের আসন্ন নবজীবনের পুনর্জন্মর মধ্য দিয়ে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে। 'বদলি মঞ্জুরি' গল্পে শৈলজানন্দ এক নিঃসঙ্গ স্ত্রীর জীবনের করুণ পরিণতির দিকটি দেখিয়েছেন। গল্পটি কর্মব্যবস্ত সংসার ও স্ত্রীর ভাবনাহীন স্বামীর প্রেমবোধ ও স্ত্রীর নিঃসঙ্গতার অসহায়তা বোধ—এ দুয়ের মধ্যেকার প্রেমভায্যের সত্যচিত্র। 'দেখার ভুলে' গল্পটিতেও প্রেমের জটিল মনস্তাত্ত্বিক দিকটি দেখানো হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র হাবা যুবক। হাবার সঙ্গে অনিমার জটিল আকর্ষণ ও অনিমার সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্যই তার প্রাণ দান তা বুঝতে পেরে অনিমার সমবেদনা বোধ চিরকালের জটিল মনের অন্ধকারের গহ্বরে চকিত আলো হয়ে 'নিভে যায়। 'প্রেতিনী' একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। প্রেমের নামে যুবতী নারীর রূপ সৌন্দর্য ও সংসারী স্ত্রীর সঙ্গে মানবতার সম্পর্ক—দুয়ের তীব্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রেমের জটিল দ্বন্দ্ব গল্পটিতে অঙ্কিত হয়েছে। 'চিরশত্রু' গল্পটি একই মায়ের পেটের দুই-ভাই বোনের ভালোবাসার গল্প।

এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের যে গল্পগুলি উল্লেখ যোগ্য সেগুলি হল—'একূল ওকূল', 'ভঙ্গুর', 'পাঁচ মিস্ত্রী', 'গরীব', 'প্রতিনিধি', 'নারীমেধ'। আমরা 'নারীমেধ' গল্পটি আলোচনা করে শৈলজানন্দের ছোট গল্প পরিক্রমা সমাপ্ত করতে চাই। 'নারীমেধ' নামকরণের মধ্য

দিয়েই নারীও নারীত্বের পূজারী ভণ্ড নারীলোলুপ পুরুষদের প্রতি দুর্বার ব্যঙ্গের অসাধারণ-ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়। গুরুদেব মারা গেলে গুরুমা তার সন্তান এবং এক কুড়ি বছরের শূদ্র যুবতী ছবিকে নিয়ে এলেন রাণিগঞ্জের বাকুলিয়া গ্রামের শিষ্য পরাশরের বাড়িতে। পরাশরের স্ত্রী নয়নতারার অনুরোধে গুরুমা ছবিকে রেখে যায়। নয়নতারার কাছে থাকে তার ভাই পঞ্চু। সে বিবাহিত স্ত্রীর নাম মায়া। সুযোগ বুঝে পঞ্চু একদিন ছবিকে ধর্ষণ ধরে। ছবি গর্ভবতী হলে পঞ্চুকে জানায়। পঞ্চু নয়ন তারাকে বলে ছবিকে খেয়াঘাট পার করে দিয়ে ফিরে আসবে। ছুটি ও খেয়াঘাটের নাম করে পঞ্চু আদিবাসী এক ধাইকে দিয়ে তার গর্ভের সন্তানকে নষ্ট করে তাকে পথে ফেলে রেখে ফিরে আসে। ডাক্তার কয়লা খাদের কাছে বিড়াল ছানার মতো মৃত শিশুর পাশে মুমূর্যু ছবিকে দেখতে পায়। সে ডাক্তার বাবুর পা জড়িয়ে ধরে বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা করে। ছবি মারা যায় কিম্বা বলা ভাল ছবিকে মেরে ফেলা হয়। গ্রামে রটল যে পরাশরের গোপন পাপের ফলে ছবির এই দশা। একমাত্র পঞ্চুর স্ত্রী এ গুজবকে বিশ্বাস করে না। গল্পটির শেষ হয় এই ভাবে তার পরিণতির কথা ভাবা মায়াকে পঞ্চু মারল না বা শাস্তি দিল না—এক গভীর আশ্লেষে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুম্বন করল। গল্পটিতে লেখকের সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। জৈবিক প্রবৃত্তি তাড়িত পঞ্চুর মতো এক পাশবিক চরিত্রের পাশে সরল নয়নতারা, বুদ্ধিমতী মায়া, সাংসারিক পরাশর ও মানবদরদী ডাক্তারকে রেখেছেন বলেই গল্পটিতে অমানবিকতার আড়ালে মানবিক দৃষ্টি ভঙ্গী প্রকাশিত করতে পেরেছেন লেখক।

এত রকম ছোট গল্প লিখলেও এক অপূর্ণতা শৈলজানন্দের মনে ছিল। যা যে কোন শিল্পীমানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি লিখেছেন "আশা ছিল, অনেক কিছু করব, কিন্তু যে আশা আমার পূর্ণ হয়নি। কেন পূর্ণ হয়নি। সেকথা লিখতে গেলে অনেক অপ্রীতিকর কথা লিখতে হয়। সব আশা মানুষের পূর্ণ হয় না। সকলের ভাগ্য সমান নয়—এই টুকুই আমার সান্ত্বনা।"[৯] এক অর্থে কল্লোল গোষ্ঠী ভুক্ত হলেও তা স্বতন্দ্রতা প্রদর্শনের জন্যই তিনি সাহিত্যে সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থান তৈরী করে নিয়ে ছিলেন। উল্লেখ্য বাস্তবতার উগ্র অসংযত বর্ণনার বিপক্ষে সনাতনপন্থীরা যে অভিযোগ তুলে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সেই বিতর্কের ঢেউ প্রসারিত হয়েছিল —আগেই বলেছি—রবীন্দ্রনাথ অবশ্য শৈলজানন্দের রচনায় অকৃত্রিক বাস্তবতা বোধের উদ্বোধন দেখে দ্বিধাহীন ভাবে প্রশংসা করে ছিলেন। তার সাহিত্য রচনার মূল বৈশিষ্ট্য বলা যায়, বাস্তব জীবনকে অনাড়ম্বর সহজ সরল ভাবে চিত্রিত করা, কোন দ্বন্দ্ব সংঘাতময় জটিলতার দিকে তার লক্ষ্য ছিল না। সম্পূর্ণ

নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের নিজস্বতায় তার কাহিনী বর্ণনায় সাফল্য নিরাসক্ত বলার ধরণটি তার সাহিত্যে সপ্রতিভ মাধুর্য দান করেছে। ভালোর মন্দয় মেশানো অসহায় মানুষের অন্দরমহলে আলো ফেলে জীবনের প্রকৃত রহস্যটিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তিনি পরিবেশকে চরিত্রের সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পৃক্ত করে রচনা করে ছিলেন—যা থেকে তাকে পূববর্তী ও সমকালীন সাহিত্য থেকে ভিন্ন গোত্রের ও ভিন্নস্বাদের বলে মনে হয়। একথা স্বীকার্য শৈলজানন্দের গল্পে যে নবযুগের সাহিত্যের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে—সেখানে সাহিত্যের তত্ত্ব বা তথ্য বড়ো কথা নয়—শ্রমজীবী হতদরিদ্র অশিক্ষিত-অজ্ঞ মানুষগুলির জীবন চর্চার অভিজ্ঞতাই আশ্চর্য জনক ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে—যা বাংলা সাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ ছিল। শৈলজানন্দ শ্রমজীবী মানুষের সমাজগত জীবনের দিকটিকে প্রাণবন্ত করতে চেয়ে বাংলা সাহিত্যে যে পালা বদলের সূচনা করে ছিলেন—সেখানেই বাংলা ছোটগল্প অন্যপথ ও মতের মুক্তির দিশা খুঁজে পেয়েছে। আর এখানেই সেই নিঃসঙ্গ পথিকের স্বতন্ত্রতা।

তথ্যসূত্র ঃ

১। কালের পুত্তলিকা, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় পৃ—১৭৮
২। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার—ভূদেব চৌধুরী পৃ—৩০০
৩। পশ্চিমবঙ্গ শৈলজানন্দ জন্মশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা—পৃ—১৭
৪। ঐ পৃ—১৮
৫। ঐ পৃ—১৯
৬। গল্প লেখার গল্প শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পৃ—২১৭
৭। সাহিত্য জীবনের প্রথম স্বীকৃতি-শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—পৃ—১২৮
৮। সাহিত্যে নবরত্ন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃ—২১৭
৯। পশ্চিম বঙ্গ শৈলজানন্দ জন্ম শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা—পৃ—৪৯

————

প্রেমেন্দ্রের গল্পে পতিতা বৃত্তি-এক মরমী অনুভবে

স ম রে শ ভৌ মি ক

পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র সামাজিক জীব। সমাজে থাকার জন্য তাই তার জীবিকার প্রয়োজন আছে। আবার কথায় আছে জীবনের থেকে জীবিকা বড়। জীবিকার শ্রেণি আবার বিচিত্র লিঙ্গ ভেদে, সমাজ ভেদে, জাতি, বর্ণ, প্রথা এমন নানান কারণে সামাজিক জীব মানুষ আবার বিভিন্ন জীবিকা বা পেশায় নিযুক্ত। কোনো পেশা যদি হয় সম্মান প্রতিপত্তির, আবার কোনো পেশা অসম্মানের, অপরাধের। হয়তো মানুষ যেদিন সমাজ গড়েছে, সভ্যতা নামক তথাকথিত অগ্রগতির দিকে যাত্রা শুরু করেছে, সেদিন থেকেই নারীর জীবন জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তার দেহসর্বস্ব আদিম বাসনার পসার সাজিয়ে জীবন চালনার প্রয়োজনীয়তা। কত কান্না-অশ্রু-বেদনা, যন্ত্রণার নীরব ইতিহাস প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে, আবার কত ভাঙছে তার হিসাব কে রাখে? সামাজিক দায়বদ্ধতার মানদণ্ডে কোন কোন সাহিত্যকার তাঁদের কাহিনীতে পতিতাবৃত্তি এই বিষয়টিকে স্থান দিলেও কোনোভাবেই তা মূল কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু হতে পারেনি। আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের প্রথম রূপকার অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্রের পতিতাবৃত্তির নারী মাতা মহীয়সী, আরো পরবর্তীকালে বিশেষত কল্লোলের যুগে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিছু গল্পে পতিতা নারীরা উঠে এলেন গল্পকারের এক মরমী অনুভবে। তাঁর 'মহানগর', 'সংসার সীমান্তে' ও 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্প তিনটিতে আপাত জীবিকার জন্য সামাজিকভাবে পতিতা নারীর মধ্যেও যে বাঁচার স্বপ্ন, সুখী সংসার বাসনা, কিংবা আত্মমর্যাদা বোধ আছে তার এক বাস্তব দলিল রচনা করলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

'মহানগর' 'সংসার সীমান্তে' ও 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' ছোটগল্প তিনটিকে যদি ক্রমানুসারে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রথম গল্পে আছে সামাজিক বঞ্চনার কারণে এক হতভাগ্য নারীর পতিকুল ও পিতৃকুলের আশ্রয়হীনতা তাকে ঠেলে দিয়েছে জীবনধারণের জন্য হীনতম বৃত্তি পতিতালয়ের পথে। দ্বিতীয় গল্পটিতে এক পতিতা নারীর কথা আছে, তবে এ পেশায় আসার পিছনের কারণগুলি নেই। তবে আর পাঁচজন সুখী সংসারী রমণীর মত তার মনের কোন এক গোপন কোণে যে স্বামী, পুত্র ও পরিবারের পরিপূর্ণ সংসার বাসনা থাকতে পারে নানা ঘটনার বিবরণ দিয়ে তাকে গল্পকার তুলে ধরলেন অসাধারণ মুন্সিয়ানায়। শেষ গল্পটিতে এই পেশামূলক কাহিনী বৃত্তের পরিণতি। যেকোনো কারণে সে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাই হোক না কেন এ পেশায় আসা মানবী যে কেবল দেহ সর্বস্ব সম্ভোগের আধার নয়, তার অন্তরে যে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ আত্মমর্যাদা বোধ থাকতে পারে, পেশার দায়বদ্ধতা থাকলেও পছন্দ অপছন্দের স্বাধীন ভাবনা থাকতে পারে তা প্রতিষ্ঠার শেষ লড়াইয়ে হেরে যাওয়া বেগুনের মধ্যে তুলে ধরে লেখক তথাকথিত সভ্য সমাজের চোখ খুলে দিতে চেয়েছেন।

প্রেমেন্দ্রের গল্পে পতিতা বৃত্তি-এক মরমী অনুভবে

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যিক সত্তার পটভূমি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আধুনিক সাহিত্য সমালোচক বলেন—"প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোলের লেখক। এখানে আদৌ আক্ষরিক অর্থে নয় একমাত্র ভাবগত ও আদর্শগত অর্থেই প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোলের লেখক- কল্লোলীয়"।(১)

কবি ও ছোটগল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য রচনার বিষয় নির্মাণে এই পটভূমি প্রতিবেশ যা তাঁকে আলাদা মাত্রায় ভূষিত করেছিল তা ছিল কল্লোলীয়। তাই কল্লোলের ভাবধারা ও তার অনুষঙ্গে প্রেমেন্দ্রের গল্পে পতিতা সমস্যার আলোচনা চলতে পারে।

'কল্লোল' একটি মাসিক পত্রিকার নাম, প্রকাশকাল ১৩৩০ বঙ্গাব্দ বা ইংরেজি ১৯২৩ সালের পয়লা বৈশাখ। সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাস ও সহ-সম্পাদক গোকুল চন্দ্র নাগ। মূলত প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক অস্থিরতা ও রবীন্দ্র ভাবাদর্শ বিরোধী চিন্তাকে আশ্রয় করে একদল উচ্চশিক্ষিত ও বিদেশি শিক্ষায় পরিমার্জিত যুব সম্প্রদায় বাংলা সাহিত্যে নিয়ে নিলেন নতুন নতুন ভাবধারা। প্রেম যে কেবল রোমান্টিক বিষয় নয়, দেহজও বটে, মানব মনের কেবল আলোকিত দিকগুলি নয় অন্ধকারময় জগত যে সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষও যে সাহিত্যে বিশেষ স্থান করে নিতে পারে এসবের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল এই যুগে। যুগের পরিচয় দিতে গিয়ে আধুনিক সাহিত্য সমালোচক তাই যথার্থ বলেন—

"আসলে যুগটাই একটা অস্থিরতার, অনিশ্চয়তার, হতাশার, অসহায়তার। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলো, দেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি একের পর এক জ্বলছিল যুবক প্রাণের স্বদেশীয় আবেগে আবার উদ্যমহীনতায় নিভছিল কিছু পরেই। এভাবেই ওঠানামা করতে করতে যুবকরা কোন গভীর হতাশায় নিমজ্জিত মুখ হচ্ছিল বুঝি বা ভাগ্যের নির্দেশেই। যখন বেকারত্ব চরম, উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় দেশীয় অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রায় পঙ্গু রবীন্দ্রনাথের শিল্প প্রাণ এক নির্দিষ্ট আদর্শের আলোয় বিভাসিত, তখনই আসে কল্লোল আর কল্লোলের লেখকরা। লক্ষ্য সমস্ত স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে রিক্ত প্রতিবাদ যাকে বড় অর্থে বিদ্রোহ বলে তা নয়, বিদ্রোহ তৈরি হওয়ার উৎসে যে প্রতিবাদ প্রচ্ছন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় তাই"(২)

'মহানগর' গল্পটি ১৯৩৩ সালে 'দেশ' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বোঝাই যাচ্ছে প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়কাল ও তার ছায়াপাত ঘটবে গল্পটিতে। কাহিনীক্রম অতি সাধারণ কিন্তু নাগরিক সভ্যতার বৈভব, অসহায় মানুষের জন্য আধুনিক স্বার্থান্ধ মানুষের উদাসীনতা কীভাবে সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করছে তার এক নির্মম দলিল লেখা হয়েছে, কিশোর বালক রতন ও তার দিদি চপলার অবাধ ভালোবাসা ও স্নেহ বন্ধনের মধ্য দিয়ে। যে সমাজ স্বার্থপর, মেয়ের বিবাহের পর শ্বশুরকুলে আশ্রয়হীনতা ঘটলে তার দায় যে পিতৃকুল নিতে অস্বীকার করে, বাঁচার তাগিদে সব কুল বিতাড়িত অসহায় মেয়েটির আশ্রয় হয় সেই নগরের কানাগলিতে যে শহরের পরিচয় দিতে গল্পকার দেখিয়েছেন নাগরিক সভ্যতার দুই চরম বৈপরীত্যের ছবি।

"আমার সঙ্গে চলো মহানগরে, যে মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মত, আবার যে মহানগর উঠেছে মিনারে, মন্দিরে, চূড়ায় আর অভ্রভেদী প্রাসাদ শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মত মানবাত্মার।

আমার সঙ্গে এসো মহানগরের পথে, যে পথ জটিল দুর্বল মানুষের জীবনধারার মতো, আর যে পথ প্রশস্ত আলোচন মানুষের বুদ্ধি মানুষের অদম্য উৎসাহের মতো"।

এই যে নগরের একদিকে সমৃদ্ধি আর একই সঙ্গে গভীর ক্ষত তা আসলে ব্যঞ্জনায় উপমিত হয়েছে মানব সমাজের আলো অন্ধকারময় সভ্যতার সঙ্গে।

প্রথম দুই অনুচ্ছেদে নগরের দুই বিপরীত দিক দেখানোর প্রয়োজন লেখক অনুভব করেছেন, কারণ গল্পের মূল চরিত্র চপলা নামক এক দুখিনী নারীকে আশ্রয় দিয়েছে এই নগর সভ্যতা। তবে কোনোভাবেই নাগরিক আতিশয্য নয়, বরং মানুষের স্বাভাবিক সমাজ সংসারচ্যুত হয়ে নগরের ক্লেদাক্ত অন্ধকার গলিতে পতিতাবৃত্তিকে জীবনের সম্বল করেই তাকে বাঁচতে হয়েছে।

চপলা কেবল গ্রাম বাংলার একজন নারী নয়, দরিদ্র পিতার ঘরে আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো কন্যাদায়ের সামগ্রী। অল্প বয়সে বিবাহ, কোনো কারণে স্বামী শ্বশুরের ভিটে থেকে বিতাড়িত হয়েছে কিন্তু পিতৃপুলে আর স্থান হয়নি, বাঁচার শেষ আশ্রয় হয়েছে মহানগরের গলিতে। চপলার ভাই রতন কেবল একদিন বুঝতে পারে দিদির সঙ্গে তার দূরত্ব বেড়েছে অনেকখানি। অবোধ শিশুমন দিদির প্রতি ভালবাসায় তাকে খুঁজে ফেরে নানাভাবে। সে শুনেছে দিদিকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে, তাহলে তার বাবা দিদিকে ফিরিয়ে আনছে না কেন? রতনের বাবা মুকুন্দ সব জেনেও স্বার্থান্ধ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে শিশু রতনকে অনায়াসে মিথ্যা কথা বলে—'আসবে বৈকি বাবা, শ্বশুর বাড়ি থেকে কি রোজ রোজ আসতে আছে?' এবার শুরু হয় রতনের দিদিকে খোঁজার পালা। সে এক দুর্বোধ্য পণ করে পোনার নৌকায় শহরের বাজারে পৌঁছায়। দিদিকে খুঁজেও পায়। ঘটনাটি কী অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়। রতনের জীবনে ঘটনা যেন ব্যক্তিবিশেষের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র মানুষের অজানা রহস্যকে ধরিয়ে দেয়—"রতনকে আমরা এখানে ছেড়ে দিতে পারি। মহানগরে অনেকে আসে অনেক কিছুর খোঁজে, কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বিস্মৃতি কেউ আরও বড় কিছু। সবাই কি পায়? পথের অরণ্যে তারা হারিয়ে যায়। মহানগর তাদের চিহ্ন দেয় মুছে। রতনও তেমনি হারিয়ে যাবে ভেবে আমরা তাকে ছেড়ে দিতে পারি"।

রতন সত্যি তার দিদিকে খুঁজে পায়। গল্পের ক্লাইমেক্সে পৌঁছে ভাই ও দিদি পরস্পরকে পেয়ে বিস্মিত, অভিভূত। সে একা এসেছে কিনা দিদির প্রশ্নের উত্তর বাক্যে না দিয়ে রতন দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদে। দিদিকে পেয়েও যে তাকে আর নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, দিদি যে যেতে পারে না তার দিদি বুঝলেও রতন বোঝেনি। কিন্তু গল্পকার তার আগাম আভাস দিয়েছেন যা সচেতন পাঠক মাত্রই বুঝতে পারে অনায়াসে।

"মহানগরের পথে ধুলো আকাশে ধোঁয়া বাতাসে বুঝি বিষ আমাদের আশা এখানে কখনও পূর্ণ হয়। যা খুঁজি তা মেলে। তবু বহুদিনের কামনার ফলও কেমন বিস্বাদ লাগে। মহানগর সবকিছুকে দাগী করে দেয়, স্বার্থকে ও দেয় একটু বিষিয়ে।'

গল্পের বাস্তবতার সঙ্গে গল্পকারের মানস অনুভব সমান্তরাল গতিতে এগিয়ে চলে। মানুষ যা খোঁজে তার অধিকাংশ হয়তো মহানগরে মেলে রতনেরও মিলেছিল। অসাধ্য সাধনে সে তার দিদিকে খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু ওই যে এখানে ফলপ্রাপ্তির পরও তা কেমন বিস্বাদ লাগে বলে যে মানস অনুভূতির কথা বলা হয়েছে তা রতনের জন্য ঘটলো। দিদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার শত চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হল। কারণ চপলা জানে মহানগরের যে অন্ধকার গলি তার জীবন লেখার বৃত্ত রচনা করেছে সেখান থেকে তথাকথিত সভ্য সামাজিক মানুষের সংসারে ফিরে যাওয়ার পথ তার জন্য চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও তার জীবন বৃত্তি ভালো না মন্দ সম্মান না অসম্মানের সে বিশ্লেষণ অনধিকার চর্চা, হয়তো আমাদের সম্মানের পরিপন্থী হলেও তার প্রতিবিধানের জন্য আমরা কতখানি এগিয়ে আসতে পারি যেভাবে পারেনি চপলার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার বাবা মুকুন্দ প্রমুখ।

"বড় হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাবো দিদি। কারুর কথা শুনবো না"

এই প্রতিশ্রুতি বেশ বড়। এরপর গলির অন্ধ মোড়ে রতনের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ও লেখকের উক্তি মিলেমিশে গল্পের বৃত্তটি পূর্ণ হয়।

"মহানগরীর উপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মত গাঢ়।"—এখানে মহানগরের সন্ধ্যা যখন উপমহিত হয় গাঢ় বিস্মৃতির সঙ্গে তখনই সচেতন পাঠক বুঝে উঠতে পারেন রতন যতই প্রতিশ্রুতি দিক দিদিকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যখন সে বড় হবে তখন দিদির পেশাগত সামাজিক অবস্থান জেনে সেও হয়তো তার বাবার মতো তথাকথিত সভ্য সমাজের মেকি প্রতিনিধি হয়ে পতিতা দিদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি বিস্তৃত হবে। আর পরিবার সমাজ অনুশাসনের বলি হয়ে প্রতিদিনের কত চপলা এভাবে মহানগরের অন্ধকার গলিতে দেহের পসরা সাজিয়ে হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অন্ধকারে। গল্পটি তাই এক অসহায় নারীর মর্মযন্ত্রণা ও জীবিকার তাগিদে দেহময় পতিতা হয়ে ওঠার নির্মম কাহিনী।

কল্লোল কালে বাংলা সাহিত্যে একদল লেখক মানুষের অন্তরের সুপ্ত আবেগ জাগিয়ে তোলার জন্য এক প্রকার সেন্টিমেন্টাল ভাবধারার প্রয়োগ করেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই ধারায় সফল স্রষ্টা। কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যে চলমান বিষয়কে নিয়ে নতুন ভাবনা ও আঙ্গিকের উপস্থাপনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র অনন্য।

পতিত বৃত্তি সামাজিক ব্যাধি না ব্যাধির নিরসন তা তর্কাতীত। বহু প্রাচীনকাল থেকে আজও এই বৃত্তি নারী পুরুষ নির্বিশেষ গ্রহণ করছে নানাভাবে নানা কারণে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ন বস্ত্র বাসস্থানই অন্যান্য জীবিকার মত এই জীবিকারও মূল কথা। সমাজ তাদের

যতই অপাক্তেয় ভাবুক, ঘৃণা করুক, তবু তাদের মনের মধ্যেও যে স্বামী সন্তান সুখী গৃহ কোণের বাসনা থাকে তার প্রমাণ প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্তে' নামক গল্পটি। এক পতিতা নারী রজনী ও ছিঁচকে চোর অঘোর দাস এ গল্পের নায়ক-নায়িকা।

লেখক এখানে পতিতাবৃত্তির সামাজিক সমস্যা ও তার প্রতিকার বিষয়ে কোনো কথা বললেন না ,বরং একজন পতিতা নারীর মনের কোণে সুপ্ত থাকা স্থায়ী সংসার বাধার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ করেছেন। বাস্তবে তা সম্ভব না হলেও এভাবে যে একজন অসহায় নারীকে অন্ধকারময় জীবন থেকে আলোর বৃত্তে ফিরিয়ে আনা যায় তারই এক পরীক্ষা করেছেন গল্পকার। তবে গল্পের শুরুতেই সাবধান বাণীর মতো লেখকের যুগজনিত অনুভূতির বেদনা প্রকাশ পেয়েছে—

"সত্যই এ কাহিনী লিখতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় যে দুটি মানুষকে লইয়া এই গল্পের আয়োজন তাহাদের কথা লিখিবার অধিকার আমার নেই। যাহাদের জন্য লিখিতেছি তাহারাই শুধু যে নিজেদের কঠিন ঔদাসীন্যের দ্বারা ইহাদের অপমান করিতে পারে তা নয় এই দুইটি জীবনের গভীর মর্ম বুঝিবার মত দরদ আমারও আছে কিনা সন্দেহ হয়। হৃদয়ের উদ্বৃত্ত আমাদের আর কতটুকু? নিজেকে ছাড়াইয়া আশেপাশের কয়েকজনকে বিলাইতে ফুরাইয়া যায়। আর উদারতা এই শব্দটিকে এ পর্যন্ত কত ভাবেই না লাঞ্ছিত করিয়া আসিয়াছি?"

'সংসার সীমান্তে' গল্পটির নামকরণে লেখক শুরুতেই একটি ব্যঞ্জনা ব্যবহার করেছেন, হতে পারে এখানে যে পাত্র পাত্রীর কথা বলা হবে, তারা সংসারের প্রান্ত সীমায় অবস্থান করে বা সংসার বাঁধার চেষ্টা করেও সংসারের সীমারেখা তারা বুঝে উঠতে পারেনি। গল্পটির সূচনা এক দুর্যোগময় বর্ষণমুখর রাতে নগরীর এক অপরিচ্ছন্ন গলিতে রজনী নামক এক পতিতা নারীর খদ্দের পাওয়ার আশায় নিভু নিভু কেরোসিনের আলোয় অনন্ত অপেক্ষা। সমস্ত আশা যখন প্রায় শেষ ঠিক তখন কৃষ্ণকায় এক বিশাল মানুষ হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় তার দরজার সামনে, তারপর চাপা গলায় সে রজনীকে বলে 'চ তোর ঘরে চ'। হঠাৎ আগন্তুক মানুষটির আচার ব্যবহারে সন্দেহ হলে শরীর খারাপের অজুহাতে রজনী তাকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েও পারেনি। এক টাকার বিনিময়ে মনের চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাত কাটানো রজনী হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখে অঘোরের দেওয়া এক টাকা তার আঁচলের খুট থেকে খুলে নিয়ে পালিয়েছে অঘোর। তারপর জানা যায় এখন একজন সিঁধেল চোর। বেদনার অশ্রু রজনীর চোখে বাঁধ মানতে না চাইলেও অপরের কাছে হাস্যাস্পদ না পাওয়ার জন্য নিদারুণ প্রবঞ্চনার মধ্যেও স্থির হয়ে থাকতে বাধ্য হল। রজনী পতিতা হলেও তারও যে পছন্দ অপছন্দ আছে, নিজের ভালো-মন্দ কিসে হয় জেনেও পেশার তাগিদে অপ্রিয়কে সঙ্গ দিতে বাধ্য হয়। তা বোঝাতে লেখক এর বর্ণনা অসাধারণ—

"বিশাল পৃথিবীর দুইটি হতভাগ্য নর-নারীর প্রথম মিলনের ইতিহাস এমনি কুৎসিত এমন স্বার্থ ও লোভের কালিতে কলঙ্কিত।"

—এই মিলন মূলত ছিল দৈহিক। লেখক জানিয়েছেন, তা এখানেই শেষ হতে পারত কিন্তু তাহলে তো আর গল্প হয় না। তাই কাহিনীকে সম্প্রসারিত করতে আবারও অঘোর ও রজনীর সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন। তবে সেখানেও তাদের মনের মিল হওয়ার থেকে এক উপায়হীন দায়বদ্ধতা থেকে আহত সিধেল চোর অঘোরের সেবা সুশ্রূষা করতে হয় রজনীকে। ধীরে ধীরে হাজারো বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ে উভয়ে মনের কাছাকাছি আসতে থাকে। চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও অঘোরকে চুরি না করার শপথ পাঠ করিয়ে তার সঙ্গে কলকাতার বাইরে গিয়ে ঘর বাঁধতে একসময় মন স্থির করে রজনী। কিন্তু তা করতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন তা তাদের কোনো দিন ছিল না। তাই অঘোরকে শেষবারের জন্য চুরি করতে হয়। সে ধরা পড়ে। সংসারের নিয়মে তার জেল হয়, মুক্তির জন্য জজ সাহেবের কাছে কাতর মিনতি ও কেঁদেও সে রেহাই পায় না। শুরুতেই যে ব্যঞ্জনার কথা বলা হয়েছিল গল্প-শেষে তাই প্রমাণিত হলো। সংসারের প্রান্তে থাকা এক পতিতা নারী নানা ঘটনা উপঘটনার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক মানুষের সংসারে ফিরতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত পারল না।

প্রতিদিনের নিত্যনতুন ঘটনা প্রবাহের মত তার স্বপ্ন বুদবুদের মত জেগে উঠেও হারিয়ে গেল। তার স্থান পরিবর্তন হলো না, সে ফিরে যেতে বাধ্য হল তার পূর্ববর্তী ক্লেদাক্ত জীবনে। গল্পের শেষ কয়েকটি পংক্তি কি মর্মান্তিক বেদনাদায়ক যা অনুভূতিশীল সহৃদয় পাঠককে ঘা দিয়ে যাবে বারংবার।

“অঘোর দাস' এখনো জেলে পচিতেছে নিরবিচ্ছিন্ন বর্ষার রাতে, এখনো নিশ্চয় কলকাতার একটি নোংরা ও কুৎসিত পথের ধারে কেরোসিনের ডিবিয়ায় ম্লান আলো দেখা যায়। ডিবিয়ার ধুম বহুল শিখাকে শীর্ণ হতে সযত্নে বৃষ্টির ঝাপটা হইতে আড়াল করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত এখনো নিশ্চয় বিগত যৌবনা রূপহীনা রজনী এক রাত্রের অতিথির জন্য হতাশ নয়নে পথের দিকে চাইয়া প্রতীক্ষা করে।'

প্রেমেন্দ্রের ‘বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে’ গল্পটি একজন বিগত যৌবনা গণিকা বা পতিতা নারীর দারিদ্র্য ও জীবন যন্ত্রণার মর্মান্তিক কাহিনী।' এই বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে ‘গল্পে গণিকা জীবনের এক ভয়ঙ্কর বাস্তব যে চিত্র লেখক প্রেমেন্দ্র অংকন করেছেন তা হল অস্তিত্বের সংকট। যৌবন অটুট আর যৌবনগত পতিতাদের মধ্যে ফারাক কেমন তার বাস্তবসম্মত রূপটি লেখক আমাদের কাছে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন—‘মাসিকে কেন্দ্র করে বেগুন ও শশীকে সামনে রেখে’—[৩]

পতিতা নারীর সমস্যা কেন্দ্রিক পূর্বের দুটি গল্পের মত এই গল্পটিও কল্লোলীয় ভাবধারার অনুবর্তন বলে মনে করেন আধুনিক সাহিত্য সমালোচক—

“বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পের বিষয় অবলম্বনে এই লেখক নিশ্চিতভাবে কল্লোলীয় এই গল্প এক বিগত যৌবনা অত্যন্ত গরিব গণিকার গল্প। কিন্তু সে গণিকা শরৎচন্দ্রীয়

ভাবনার অনুগ নয়। তার মধ্যে মধ্যবিত্ত সংস্কারের বাঁচার অনিশ্চয়তার প্রলেপ নেই, আছে ফরাসি ন্যাচারালিজমের স্পষ্ট স্বাক্ষর, সংশয়, হতাশা, অনিশ্চয়তা, সুগভীর যন্ত্রণা; যেগুলি সে সময় তরুণদের মধ্যে সমকালের প্রতিক্রিয়ার অবধারিত প্রকাশ। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেগুলিতে বৃদ্ধ হয়েই নিরাবেগ বুদ্ধি দিয়ে জীবনের পোস্টমর্টেমে ব্যস্ত থেকেছেন। তাঁর এই জীবন ব্যবচ্ছেদ কেবল মধ্যবিত্তের জীবনসীমায় স্থির থাকেনি, একেবারে নিচের তলার মানুষদের কদর্য বাঁচার আর্তির মধ্যেও নিহিত থেকে গেছে"।[৪]

পতিতাকেন্দ্রিক আরো অনেক গল্প অনেক লেখকের কলমে বাংলা সাহিত্যে হাজির হয়েছে। কিন্তু কল্লোলীয় ভাবধারার যে অনুষঙ্গগুলি এখানে লেখক হাজির করেছেন তা হল মানুষের ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ, সর্বোপরি আত্মমর্যাদা-লড়াই। জীবনযুদ্ধে গণিকা বেগুন হয়তো হেরে গেছে, কিন্তু হারার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে লড়াই চালিয়ে গেছে—কখনো বাড়িওয়ালির সঙ্গে, কখনো বা তার রূপহীন বিগত যৌবনের সঙ্গে। একজন পতিতাকে সমাজহীন চোখে দেখে। সহানুভূতিশীল মানুষের হৃদয়ে তার জন্য অনুকম্পা সৃষ্টি হতে পারে, তা থেকে মুক্তির জন্য কবি সাহিত্যিক তাকে 'মা' বলে সম্বোধন করেন, মহীয়সী নারীর স্থানে বসাতে পারেন। কিন্তু এই পেশায় থেকে যে নিজের সম্মান রক্ষার লড়াই করা যায় তা কল্লোলীয় চিন্তারই প্রতিফলন।

গল্পটির কাহিনীক্রম ও সময় খুবই কম। এক সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। বিগত যৌবনা গণিকা বেগুনের কাছে দীর্ঘদিন কোন খদ্দের না আসায় তার বাড়িওয়ালী তাকে ধারের টাকা মিটিয়ে দিতে বলে, না হলে অন্য রাস্তা দেখার পরামর্শ দেয়। তাই তাকে বাধ্য হয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা সাহেবদের মেলায় খদ্দের ধরার জন্য বেরোতে হয়, পুরনো সেলাই করা সিল্কের শাড়িকে সম্বল করে। কিন্তু প্রথম যাকে খদ্দের ভেবে সে আশায় বুক বাধে সেই বিকৃত মুখওয়ালা পুরুষকে দেখে তার সমস্ত আশা এক লহমায় নিভে যায়। তবুও সে তার শেষ পারানির কড়িটুকু দিয়ে মেলায় প্রবেশ করে। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কেবল অপমান ছাড়া আর কিছুই জোটে না। নিঃসম্বল অবস্থায় এবার তার বাড়ি ফেরার পথ বর্ণনায় গল্পকার কি নাটকীয় উপস্থাপনা এনেছেন, যা পাঠককে মোচড় দেবেই দেবে।

"লোকের ভিড় অনেক কমে গেছিল। রাত্রি অনেক হয়ে এসেছে যে পথে প্রথম একজিবিসনের ভিতর গিয়েছিল সেই পথেই আবার বেগুন চলতে আরম্ভ করলে। এখন তার মনে হচ্ছিল প্রথম সুযোগ ত্যাগ করা তার ভয়ানক বোকামি হয়েছে ভাগ্যহীনার আবার সুরূপ কুরূপ?'

বেঞ্চিটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল তার উপর কে যেন শুয়ে আছে মনে হল। ভাগ্যের এত পরিহাসের পর আর দুরাশা করবার তার সাহস ছিল না। কিন্তু নিজের সৌভাগ্য সে প্রথম বিশ্বাস করতেই পারল না। যাকে দেখে সে কিছু পূর্বে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল আর সেই বীভৎস মূর্তি খানিক পরে তার এত আনন্দের কারণ হবে—এ কথা সে কল্পনাও করতে

পারেনি। সেই মূর্তিমান স্বপ্নই বেঞ্চির উপর শুয়ে ঘুমিয়েছিল। মনের অদ্ভুত বিতৃষ্ণা ভরা আনন্দ দমন করে সে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বললে, রাত তো অনেক হয়ে গেছে।' এই জাগানোর অধিকার নিয়ে কোনো সন্দেহ কোনো দ্বিধা তার মনে ছিল না। লোকটা হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে তার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। লোকটার গায়ে ছেঁড়া খাকি কোট, পরনে আধ ময়লা কাপড় দেখে নিম্ন শ্রেণীর মিস্ত্রি টিস্ত্রিই হবে বলে মনে হয়। লোকটার হাত ধরে তুলে বেগুন কিন্তু অবিচলিতভাবে বললে, 'চলো যাবে না'? লোকটা বেগুনকে অনুসরণ করতে করতে এগিয়ে চলার পথে তার তিনটে পকেট উল্টে দেখালো তার কাছে কিছুই নেই। স্বাভাবিকভাবেই বেগুনও তেলে বেগুনে জ্বলে গিয়ে স্বভাবসুলভ ভাবে বলে ওঠে 'বিনি পয়সার ইয়ার্কি নিতে এসেছ হারামজাদা চোর?'

লোকটা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো তার অন্তরের কোন ভাবই মুখের বিকৃত ভগ্ন আয়নায় প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, বেগুন হতাশ হয়ে আর একবার তার পকেট ও পয়সা লুকোবার সমস্ত সম্ভাব্য স্থান নিজে হাতে দেখলে—একটি দেশলাই ও গুটিগতক বিড়ি ছাড়া তার কোনো সম্পদ ছিল না। দাঁতে দাঁত চেপে অসীম অসহায় হতাশায় কপর্দকহীন সেই মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের হাত ধরেই বেগুন বললে,

"চলো এবার তাদের পথে কেউ বাধা দিল না।'

গল্পটি এখানেই শেষ কিন্তু গল্পের রেশ থেকে যায় সচেতন সহৃদয় পাঠকের মনে জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া একজন মানবী যে কিভাবে আত্মসম্মান রক্ষার লড়াইয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে তার উদাহরণ হয়ে রইল বেগুন। কল্লোলীয় ভাবধারার অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে প্রেমেন্দ্র—গল্পে পতিতাবৃত্তির নারীরা উঠে এলেন মরমী অনুভবে।

তথ্যসূত্র :

১। দত্ত বীরেন্দ্র; 'বাংলা ছোট গল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ'; মে ২০১৩; পুস্তক বিপনী;বেনিয়াটোলা লেন;পৃষ্ঠা ৬২৩।

২। তদুক্ত; পৃষ্ঠা ৬২২।

৩। চৌধুরী শীতল; 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প শিল্প ও নির্মাণ' প্রতিভাস; জানুয়ারি ২০১৪; পৃষ্ঠা ১৭৪ - ৭৫।

৪। দত্ত বীরেন্দ্র; 'বাংলা ছোট গল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ'; মে ২০১৩; পুস্তক বিপনী;বেনিয়াটোলা লেন; পৃষ্ঠা ৬৩৫-৩৬।

৫। 'গল্পের ভুবন : প্রেমেন্দ্র মিত্র' ডঃ রামরঞ্জন রায়; প্রজ্ঞা বিকাশ।

৬। 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প' সম্পাদনা: সৌরিন ভট্টাচার্য; দেশ পাবলিশিং; কলকাতা ৭০০০ ৭৩।

কল্লোল ও তারাশঙ্কর: বাংলা সাহিত্যের এক নব অধ্যায়

সং হি তা ব্যা না র্জী

সারসংক্ষেপ :

কল্লোল পত্রিকায় আত্মপ্রকাশকারী বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় সাহিত্যিকবৃন্দের অন্যতম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৩৪- এ কল্লোলে 'রসকলি' প্রকাশের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্করের জীবনে পালাবদলের সূচনা। ১৩৩৪- এর ফাল্গুনে 'রসকলি' প্রকাশের পর ১৩৩৫-এর বৈশাখে 'হারানো সুর', শ্রাবণ সংখ্যায় 'স্থলপদ্ম', ১৩৩৫- এর জ্যৈষ্ঠে 'রাইকমল' পরপর চারটি গল্প 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশ তারাশঙ্করকে সাহিত্যিক রূপে পরিচিতি দানের পক্ষে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল হয়েছিল। যদিও পাশচাত্য সাহিত্য রীতিকে অনুসরণ করে রবীন্দ্র ভাবধারায় থেকে পৃথক সাহিত্য রীতি তথা রবীন্দ্রবিরোধিতা, আধুনিকতা—মূলত ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ও মার্কসবাদের অবাধ প্রকাশ ছিল কল্লোল যুগের অন্যতম সাহিত্য রীতি। সেখানে তারাশঙ্কর মানুষের প্রবৃত্তির ক্ষুধাকে স্বীকার করে নিয়েও মানুষকে প্রবৃত্তি জয়ের পথে উত্তীর্ণ করেছেন। এই পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেও তারাশঙ্কর এই কল্লোলের ভাবধারার উর্দ্ধে স্বকীয় চিন্তা-চেতনা স্ফূরণ ঘটিয়েছেন।

সূচক শব্দ: কল্লোল, আধুনিকতা, মনস্তত্ত্ব, প্রেমচেতনা, নারী।

মূল পত্র:

আধুনিক বাংলা সাহিত্য জগতে 'কল্লোল' পত্রিকার সময়কাল সীমিত পরিধিতে অবস্থান করলেও নব ভাবধারা, চিন্তাচেতনার স্ফুরণে এক নবযুগের বার্তা বাহক রূপে স্বমহিমায় ভাস্বর। রাবীন্দ্রিক যুগের কল্পনাচারিতা, ভাবালুতা, অতীতচারিতাময় রোমান্টিকতাকে বিদ্রোহ করে অতি আধুনিকতা, ঘোরতর বাস্তববাদিতা, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের অবাধ প্রকাশ-বাংলা সাহিত্যে যে নব জোয়ারের আবির্ভাব ঘটে তা 'কল্লোল' যুগ নামে অভিহিত। নব নব সাহিত্যিক গোষ্ঠী তাদের স্বকীয় অভিব্যক্তিতে বাংলা সাহিত্যকে তথাকথিত 'আধুনিক' করে তোলেন। বাংলা সাহিত্যের ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অর্থে কল্লোলীয়—পন্থী সাহিত্যিক পদবাচ্য না হলেও কল্লোল পত্রিকার হাত ধরেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের যাত্রার সূচনা। সীমিত আয়ুষ্কাল হলেও এই পত্রিকাকে তারাশঙ্করের ন্যায় এক মহান কথাসাহিত্যিকের স্রষ্টা বললে নেহাৎ অত্যুক্তি হবে না। বর্তমান আলোচনায় সেই সত্যেরই উদ্ভাস লক্ষণীয়।

কল্লোল পরাধীন, অবিভক্ত ভারতবর্ষে প্রকাশিত এক সাহিত্য পত্রিকা, যা ১৯২৩ সালে বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্তের সূচনা করে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, মণীন্দ্রলাল বসু এবং সুনীতা দেবীর সমবেত প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ কলকাতার হাজরা রোডে সাহিত্য, নাটক, সংগীত ও ললিতকলার চর্চা ও বিকাশের প্রচেষ্টায় যে 'ফোর আর্টস ক্লাব' নির্মাণ করেন, তাদের উদ্যোগে একদিকে যেমন 'ঝড়ের দোলা' নামক ছোটগল্প সংকলন

প্রকাশিত হয়, অন্যদিকে দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগের যৌথ প্রচেষ্টায় 'কল্লোল' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত কল্লোল পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আধুনিকতার ধারক-বাহক সাহিত্যিকমন্ডলী 'কল্লোল গোষ্ঠী' নামে খ্যাত। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই গোষ্ঠীর অন্যতম মুখপাত্র। সেইসঙ্গে কল্লোল যুগের (১৯২৩-১৯২৯) অন্যতম সাহিত্যিকবৃন্দ যেমন কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখের রচনায় কল্লোলিত ভাবধারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। বস্তুত পাশচাত্য সাহিত্য রীতিকে অনুসরণ করে রবীন্দ্র ভাবধারায় থেকে পৃথক সাহিত্য রীতি তথা রবীন্দ্রবিরোধিতা, আধুনিকতা মূলত ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ও মার্কসবাদের অবাধ প্রকাশ ছিল এই যুগের অন্যতম সাহিত্যরীতি।

'কল্লোল' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশকারী বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় সাহিত্যিক বৃন্দের অন্যতম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলেড়ায় বৈষয়িক কাছারি বাড়ির নিকটস্থ বাউলের আখড়ার বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি স্বরূপ তারাশঙ্কর লেখেন তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি'। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে দুর্ভাগ্যবশত গল্পটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় নির্বাচিত হয়নি। আশাহত তারাশঙ্কর সাহিত্যচর্চায় বিরতি দিয়ে জনকল্যাণকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং পরিশেষে সদ্যোজাত কল্লোল পত্রিকার সন্ধান প্রাপ্তি, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক কল্লোল পত্রিকায় গল্পের মনোনয়ন, ১৩৩৪- এ কল্লোলে 'রসকলি' প্রকাশের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্করের জীবনে পালাবদলের সূচনা। ১৩৩৪- এর ফাল্গুনে 'রসকলি' প্রকাশের পর ১৩৩৫-এর বৈশাখে 'হারানো সুর', শ্রাবণ সংখ্যায় 'স্থলপদ্ম', ১৩৩৫- এর জ্যৈষ্ঠে 'রাইকমল' পরপর চারটি গল্প কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশ তারাশঙ্করকে সাহিত্যিক রূপে পরিচিতি দানের পক্ষে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল হয়েছিল। বস্তুত 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থের তারাশঙ্কর স্বয়ং তাঁর সাহিত্যিক জীবনের নেপথ্যে কল্লোল পত্রিকার অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তথাকথিত 'কল্লোলপন্থী' সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও সাহিত্যিক রূপে আত্মপ্রকাশ ও জনপ্রিয়তা প্রাপ্তিতে তারাশঙ্করের জীবনে কল্লোল পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য।

বৈষ্ণব আখড়ার জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা সম্বলিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রসকলি' আপাতদৃষ্টিতে ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্কের কাহিনী হলেও নারী মনস্তত্ত্বের এক নিপুণ আলেখ্য। পিতৃ-মাতৃহীন পুলিনের বাল্যসাথী মঞ্জুরির সঙ্গে সখ্যতা অবিচ্ছেদ্য প্রণয় রূপান্তরিত হলেও তা বিবাহে পরিণতি প্রাপ্ত হয় না। কারণ পিতৃ-মাতৃহীন পুলিনের একমাত্র প্রতিপালক গুরু রামদাস শ্রীমতী কন্যা অসহায় গোপিনীর সঙ্গে তার বিবাহ স্থির করলে কর্মহীন পুলিনের পক্ষে তার বিরোধিতা করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে একদা পত্নী বর্তমানে অন্য পুরুষের স্ত্রী শ্রীমতীর অন্তিম রোগশয্যায় তার অনুরোধ উপেক্ষা করা রামদাসের পক্ষে সম্ভব হয়নি। রামদাস শ্রীমতীর কন্যা গোপিনীর নিজ ভাইপোর সঙ্গে বিবাহ সংঘটনের মাধ্যমে শ্রীমতীর কন্যাকে নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ দানের আশ্বাস দেন। রামদাস কুপুরুষ হওয়ায় শ্রীমতি তাকে পরিত্যাগ করলেও রামদাস শ্রীমতীর অন্তরে শ্রীরাধিকার উপস্থিতি অনুভব করে। তাই বিশ্বাসভঙ্গকারিনী,

বিপথগামিনী শ্রীমতীর প্রতি বিন্দুমাত্র ক্ষোভ বা অভিমান প্রকাশ করতে তাকে একমুহূর্তের জন্য দেখা যায়নি। উপরন্তু প্রাক্তন স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা পূরণার্থে তার আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। কিন্তু বাল্যসখি রসকলি সম্বন্ধী মঞ্জুরিকে বিবাহের সংকল্পের অটুট পুলিন প্রতিপালক খুড়ো মহাশয়ের নির্দেশে অবশেষে গোপিনীকে বিবাহ করলেও মঞ্জুরিকে ত্যাগ করতে পারল না। অন্যদিকে মঞ্জুরীর মা সৌরভী রামদাসের নিকট পুলিনের মুক্তিপণ নিলেও মঞ্জুরীর অন্যত্র বিবাহ ও গমনে অসম্মতই রইল। তাই সৌরভের অন্যত্র গমনও মঞ্জরীকে পুলিনের নিকট থেকে দূরে সরাতে পারল না। স্বাভাবিকভাবেই স্বামীর পরনারী আসক্তি, দিবস রাত্রি মঞ্জুরীর গৃহে যাতায়াত, সময় অতিবাহিত করা এমনকি স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যেও মঞ্জুরীর প্রসঙ্গ উত্থাপন পুলিন ও গোপিনীর দাম্পত্য সম্পর্ককে ক্রমশ নস্যাৎ করে তোলে। কিন্তু রামদাসের মৃত্যু পরবর্তী অধ্যায়ে সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হয়। পুলিনের বৈষ্ণবী মঞ্জুরী সংসর্গের কারণে গোপিনীর ভবিষ্যৎ সুরক্ষার্থে রামদাস তার যাবতীয় সম্পত্তি গোপিনীকে দান করলে স্ত্রীর অনুগ্রহ গ্রহণ পুলিনের পৌরুষে আঘাত করে এবং সে মঞ্জুরিকে বিবাহের সংকল্প করে। এই পরিস্থিতিতে পুলিনের বাল্যবন্ধু বলাইয়ের ইন্ধনে গ্রামের জমিদারের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত পুলিন গোপিনীর বিবাহবন্ধন অটুট থাকে। কিন্তু রামদাসের মৃত্যুদিন এবং জমিদার কাছারিতে গোপিনীর অসহায় মুহূর্তে মঞ্জুরীর ভগিনীর ন্যায় গোপিনীকে রক্ষা এবং রসকলি সম্বন্ধ পাতানোর ঘটনায় মঞ্জুরীর প্রতি গোপিনীর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। গোপিনী মঞ্জুরীকে সখির ন্যায় বরণ করে পুলিনের সাথে তিনজন সুখে জীবন অতিবাহিত করতে চায়। কিন্তু মঞ্জুরি পুলিন এবং গোপিনীর দাম্পত্যজীবন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে নতুন করে রসকলি অঙ্কন করে অনির্দেশের পথে যাত্রা করে।

'রসকলি' একটি নিটোল প্রেমের গল্প। এই গল্পটি রচনার নেপথ্যে তারাশঙ্করের বাস্তব অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল। তিনি 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, তার মহলের এক পল্লীগ্রামে ডাহুকী নদীর তীরে বটগাছের সামনে এক ছায়াসুনিবিড় বৈষ্ণব আখড়া ছিল। 'গ্রামের লোকে বলে কমলিনীর আখড়া, রসিক জন রসান দিয়ে বলে কমলিনীর কুঞ্জ।'[১] সেখানে এক শ্যাম বর্ণা বৈষ্ণবী কমলিনী এবং এক পাগল বৈরাগী বোষ্টম পুলিন দাসের জীবনযাত্রাই তার 'রসকলি' গল্পের রসদ। বস্তুত 'রসকলি'র মঞ্জুরী দেহাতীত প্রেমের প্রতীক। "গল্প পেলাম। আমার নায়িকা মঞ্জুরী জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মতো জীবন নিয়ে ফুটে উঠল। শুধু আমার গল্পের নায়িকা মঞ্জুরীই ফুটল না- আমার মনে হল, আমি কেমন করে আচম্বিতে পৃথিবীর মায়া পুরীতে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে সোনার কাঠি কুড়িয়ে পেলাম।"[২] গল্পের নায়িকা মঞ্জুরী পুলিনের অন্যত্র বিবাহ মেনে নিয়ে কৃষ্ণ ভজনে দিনাতিপাত করলেও পুলিনের মঞ্জুরির প্রতি দুর্নিবার আসক্তি মঞ্জুরীর কুটিরে বাস মঞ্জুরিকে কলঙ্কিত করেছে। মঞ্জুরি শত অপমান সত্ত্বেও পুলিনের স্ত্রী গোপিনীর পাশে সদা সর্বদা সহায়দাত্রীর ন্যায় অবস্থান করেছে। এমনকি সে পুলিন গোপিনীর দাম্পত্য সম্পর্ককে অটুট রাখতে এবং জমিদারের নির্যাতন, পুলিনের উদগ্র কামনার হাত থেকে উদ্ধার পেতে কৃষ্ণের উদ্দেশে

বৃন্দাবন যাত্রা করেছে। এই নিঃস্বার্থ দেহাতীত প্রেমের বর্ণনা কল্লোল যুগে সত্যিই বিস্ময়কর। 'রসকলি'র মঞ্জুরি যেন প্রেমের প্রতীক। রোমান্টিক নায়িকার ন্যায় তার স্বরূপ যেন দুর্জ্ঞেয়, কখনও প্রেয়সী, কখনও লাস্যময়ী, কখনও ধ্যানমগ্ন শান্ত সমাহিতা। "বড় ভালোবাসি আমি কলঙ্কিনী নাম গো, কলঙ্কের তরে আমি হারাই কি শ্যাম গো।/লোকে কয় আমি কৃষ্ণ কলঙ্কিনী;/ সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো,/আমি গরবিনী।"[৩]

কল্লোলে প্রকাশিত তারাশঙ্করের দ্বিতীয় গল্প 'হারানো সুর'। সাংসারিক জীবনের যান্ত্রিকতায়, প্রাত্যহিকতায় কিভাবে এক শিল্পীমন সুরের জগত থেকে নিরস কর্মহীন জগতে আত্মসমর্পণ করে যন্ত্রে পরিণত হয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় দুর্দশার অন্তে পুনরায় সুরের জগতে মুক্তি লাভ করল তারই মর্মস্পর্শী কাহিনী 'হারানো সুর'।

সংগীতের সাধনায় আত্মনিয়োজিত ননী সাংসারিক কর্মজীবনে অকর্মণ্য হিসেবে পরিচিত। বাল্যে পরিণীতা স্ত্রী গিরি কৈশোরে স্বামীর ঘর করতে এলে প্রথমদিনেই সংকট উপস্থিত হয়। রন্ধন কার্যের জন্য গিরি প্রয়োজনীয় জ্বালানির অভাবে ননীর প্রাণাধিক প্রিয় বাঁশি গুলিকে উনুনের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে আহুতি দিলে বিপর্যস্ত, সর্বশূন্যতায় পতিত ননী তার জীবন থেকে সুরকে বিসর্জন দিয়ে কর্মজগতে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে। অন্যদিকে বাস্তববাদী স্ত্রী গিরির সঙ্গে মানসিক সম্পর্করহিত নীরস দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। ননীও চাষবাস ইত্যাদি অর্থোপার্জন ও সংসার নির্বাহের কাজে আত্মমগ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু গিরি এই নীরস যন্ত্রবৎ ননীকে দেখে আহত হয়। একদার সুরের সাধক ননীর এই পরিবর্তনের যাবতীয় দায়ভার ননী গিরির ওপরই আরোপ করে। কিন্তু গিরি চেয়েছিল ননীর সুরের সাধনা এবং বাস্তব কর্মজীবনের মধ্যে সমন্বয়। তাই কর্মে লিপ্ত ননীকে বারবার সংগীত সাধনার জন্য অনুরোধ করে ব্যর্থ হলে সে সংসার ত্যাগ করে মায়ের সঙ্গে শ্রীধাম যাত্রার পরিকল্পনা করে। অন্যদিকে যে গিরিকে সন্তুষ্ট করতে ননী একদা বাঁশি ছেড়েছিল, গান ছেড়েছিল সেই গিরিকে আজীবনের জন্য হারানোর সংবাদ জীবনের একমাত্র অবলম্বন সংগীতের মূল্যে গড়ে তোলা সংসার বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দিশেহারা ননী অন্যমনস্ক ভাবেই শিষ্য কড়ির ফেলে যাওয়া বাঁশিতে পুনরায় সুর তোলে। গিরিও ননীর সুরের মূর্ছনায় গৃহকোণে শ্রীধামের সন্ধান পায়। গিরি ননীর জীবনের হারানো সুরের প্রত্যাবর্তনেই কাহিনীর ইতিবাচক পরিণতি ঘটে। "এইতো আমার তীর্থ, মধুর মধুর বংশী বাজে, এইতো বৃন্দাবন।"[৪] বস্তুত প্রেম ও প্রয়োজনের দ্বন্দ্বই যেন এই গল্পে প্রধান হয়ে উঠেছে। নিছক প্রেমের তথা রসের সাধনা কিংবা শুধু প্রয়োজনের গর্ভে কালক্ষেপ কোনটাই জীবনের লক্ষ্য নয়। উভয়ের সমন্বয় সাধনেই জীবনের যথার্থ স্বরূপ প্রাপ্তি ঘটে। 'হারানো সুর' গল্পে লেখক এই সত্যের সন্ধান করেছেন।

কল্লোলে প্রকাশিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় গল্প 'স্থলপদ্ম'। এক সন্তান বুভুক্ষ নারীর সন্তান লাভের আশায় সর্বতো প্রচেষ্টা, ব্যর্থতা এবং জীবনের করুণ পরিণতির হৃদয়বিদারক কাহিনী 'স্থলপদ্ম' গল্পে বিধৃত হয়েছে।

গ্রামের প্রান্তে এক দরিদ্র পল্লীতে মানুষের চটুল আমোদ-প্রমোদ, আনন্দ বিষাদময় জীবনের গড্ডালিকা প্রবাহে পরিচিত কাহিনীর মাঝে এক মাতৃহৃদয়ের অব্যক্ত কাহিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কলেরা মহামারীতে গ্রামের একের পর এক মৃত্যুর মাঝেও তাদের নিস্তরঙ্গ জীবন প্রবাহ স্তব্ধ হলো না। কলেরায় রাখার শিশুপুত্র মারা গেলে নেশাগ্রস্ত রাখাকে শত চেষ্টাতেও প্রকৃতিস্থ করা না গেলে গ্রামের নারী মহলে সমালোচনার পাত্রী বিধবা যুবতী বেলে রাখার মৃত পুত্রের সৎকার করতে সচেষ্ট হয়। কলেরায় মৃত্যুর সৎকারে বেলেকে সাহায্য করতে গ্রামের কেউই অগ্রসর হয় না। একমাত্র হারা বাউরী বেলের সহগামী হয়। রাখার গৃহে সদ্য পুত্রহারা রাখার স্ত্রীর আকুল ক্রন্দন হারার হৃদয়ে যন্ত্রণার উদ্রেক করলেও নিঃসন্তান বেলের চিত্তে কোনো রেখাপাত করে না। 'মায়ের পরান'-এর কোনো মূল্য সে উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু শ্মশানে হারার কাছে মৃত সন্তানের সৎকারে নারী নিঃসন্তান দোষে দুষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বেলেকে প্রথম চিন্তিত করে। গনি মিস্ত্রীর কাছে নিয়মিত কাজ প্রাপ্তি এবং তাকে কেন্দ্র করে অনেক রটনা সহ্য করেও সে একদিনও কর্মে অব্যাহতি দেয় নি। কিন্তু আজ শ্মশান থেকে ফিরে বেলের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে। বুড়ি মার কাছে বুকের রক্ত মানত করে সন্তান কামনায়। সকলের অনেক কটূক্তি, বিদ্রুপ সহ্য করেও হারাকে বিবাহ করে সন্তানের প্রত্যাশায়। আসন্ন প্রসবা বেলে মেলা থেকে ভাবী সন্তানের জন্য খেলনা সামগ্রী কিনে আনে যেখানে হারা তার প্রিয়তমা পত্নীর জন্য প্রসাধনসামগ্রী কেনে। হারা যেখানে তাদের নববিবাহিত দাম্পত্য জীবন নিয়ে আগ্রহী সেখানে বেলের একমাত্র সন্তানকেন্দ্রিক ভাবনা উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করে। ভাবী সন্তানের প্রতি সামান্য তীর্যক মন্তব্যের অপরাধে বেলে হারাকে তার গৃহ থেকে বিতাড়িত করে। হারা বিনা বাক্যব্যয়ে দেশান্তরী হয়। কিন্তু মাসাধিককাল অতিক্রান্ত হতেই তীব্র অর্থকষ্টে অন্নাভাবে আসন্ন প্রসবা বেলে গনি মিস্ত্রীর কাছে কাজ করতে যেতে বাধ্য হয়। সেখানে কামিনদের কটূক্তি, অসুস্থ শরীরে পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ইষ্টক প্রস্তরে আঘাতপ্রাপ্ত ভূলুণ্ঠিত বেলের ভাবী সন্তানের মৃত্যু ঘটে। সন্তান হারিয়ে উন্মাদ বেলে শ্মশানে মৃতশিশু পুত্রের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। পাঁচ মাস গৃহত্যাগের পর ৫০০ টাকা উপার্জন করে প্রিয়তমা পত্নী ও সদ্যজাত সন্তানের মুখ দর্শনের বাসনায় গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে শ্মশান থেকে কঙ্কালসার উন্মাদ গ্রস্ত বেলেকে উদ্ধার করে হারা। হারার ভাবী সুখী সংসার জীবনের স্বপ্ন চিরতরে অপমৃত্যু ঘটে।

বাস্তবিক যে নারীর জীবনের চরম সার্থকতা মাতৃত্বে। পুত্র কামনায় তাই বিধবা বেলে দ্বিতীয়বার সাঙা করে হারা বাউরিকে। তাদের দাম্পত্য প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ এই নবনির্মিত সংসার থেকে দুজনের চাহিদা ছিল ভিন্ন। হারা চেয়েছিল দারিদ্র্যমুক্ত সুখী দাম্পত্য জীবন এবং বেলের ভালোবাসা। অন্যদিকে বেলের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান সন্তানলাভ। ভিন্ন মনস্তত্ত্বের দুই মানুষের তাই দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হলেও মিলন হলো না। "জীবনের রাজ্যের আহ্বান বুঝি মরণের দ্বারপ্রান্ত বাসিনী নারীটির কানে পৌঁছে ছিল না"।[৫] হারার

পত্নীপ্রেম ও বেলের বাৎসল্যপ্রেমের দ্বন্দ্বের কাহিনী 'স্থলপদ্ম' এক নারীর জায়া জননী সত্তার দ্বন্দ্বের মর্মান্তিক পরিণতির কাহিনী হয়েই পরিসমাপ্ত হল।

'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ তথা শেষ গল্প 'রাইকমল'। 'রাইকমল' গল্পটিও বৈষ্ণব আখড়া কেন্দ্রিক ঘটনা সম্পর্কিত। নলিনী কমলিনী মাতা কন্যার আখড়ায় রসিক দাস বোষ্টমের কাছে সংগীত শিক্ষা করে মাতা কন্যা তাদের সাধন ভজন ও মাধুকরীর দ্বারা জীবন অতিবাহিত করে। কমলিনী বাল্য সুহৃদ গ্রামের মোড়ল পুত্র রঞ্জনের সঙ্গে শৈশব থেকে বর-বৌ খেলার মধ্যে দিয়ে তাদের পরস্পরের প্রতি এক অদৃশ্য বন্ধন সৃষ্টি হয়। রঞ্জনের মাও কমলিনীকে ভালোবাসতো। কিন্তু একদিন কমলিনী কর্তৃক ভুক্তাবশিষ্ট কুল রঞ্জনকে খাওয়ানোর অপরাধে দুই পরিবারের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। মোড়লের নির্দেশে রসিক দাসের সঙ্গে নলিনী কমলিনী গ্রাম ত্যাগ করে। অন্যদিকে রঞ্জনও পিতা-মাতার সঙ্গে বিবাদ করে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে পরীকে মালাচন্দন তথা বিবাহ করে আখড়া স্থাপন করে। কিন্তু মাতার মৃত্যুর পর কমলিনী বৃদ্ধ রসিক দাসকে মালাচন্দন পরিয়ে অর্থাৎ বিবাহ করে কিছুদিন আশ্রমিক জীবনযাপন করে পুনরায় নতুন জীবনের সন্ধানে পথে বের হয়। কারণ রসিক দাসের চোখে উদগ্র কামনা তার মনকে বিষময় করে তোলে। ফেলে আসা গ্রামে ফিরে এসে পরিত্যক্ত বসতভিটেতে নতুন করে ঘরকন্না পাতে। রঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু গতানুগতিক জীবনে ক্লান্ত কমল একদিনে রসিক দাসকে বিদায় দেয়। অন্যদিকে রুগ্না মৃত্যুপথযাত্রী পরীকে নিয়ে শ্বাসরুদ্ধ রঞ্জন কমলের রূপজ মোহে আচ্ছন্ন হয়ে কমলকে মালাচন্দন করে। ক্ষোভে-দুঃখে পরীর জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু রূপের ক্ষণস্থায়ী মোহ রঞ্জনের শীঘ্রই ভঙ্গ হয়। রসের পূজারী রঞ্জন পুনরায় এক তরুণীকে বিবাহ করে ঘরে আনে। নববধূকে সাদরে বরণ করে কমল অনির্দেশের পথে কৃষ্ণের সন্ধানে চিরতরে বের হয়।

'রাইকমল' গল্পটির লেখক প্রদত্ত নাম স্বৈরিণী'। কল্লোলের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'রাইকমল' নামটি প্রদান করেন। এই গল্পটি সম্পর্কে স্বয়ং কবিগুরুর অভিমত 'রাইকমল' গল্পটির রচনায় রস আছে এবং জোর আছে, তাছাড়া এটি ষোলআনা গল্প, এতে ভেজাল কিছু নেই। পাত্রদের ভাষায় ও ভঙ্গিতে যে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া গেলো সেটি ভোলা সহজ নয়"।[৬] রাইকমল, কমলিনী বিশুদ্ধ প্রেমের অন্বেষণে বহু স্থানে যাত্রা করেছে। একে একে বৃদ্ধ রসিক দাস, রঞ্জনকে মালাচন্দন করে পতিরূপে বরণ করেছে। কিন্তু সকলে দৃষ্টিতে সে উদগ্র কামনা। "এতো কোমল কিশোরী নয় নয়নের কোলে সে আনন্দ নেই। এ যেসব যুবা পাথরের মত বুক প্রবাহ নয়নে উদগ্র ক্ষুধা নারীর দৃষ্টি আরো দেখিল ওই বুকের অন্তরালে সুধার সন্ধান তো মেলে না তীব্র বিষ নিল সে হৃদয়"।[৭]

তাদের স্মরগরল থেকে উদ্ধার পেতে বিশুদ্ধ প্রেমের অন্বেষণে সে পথকেই ঘর করেছে। বলাবাহুল্য এই গল্পেও লেখক কল্লোলীয় ভাবধারার ঊর্ধে উঠে দেহাতীত প্রেমের জয় ঘোষণা করেছেন।

'কল্লোল যুগে'র গোড়াপত্তন হলেও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একান্তভাবেই রাঢ়বঙ্গের সাহিত্যিক। রাঢ় ভূখন্ডের ইতিহাস- সমাজ- সংস্কৃতি- ভাষা- ধর্মবিশ্বাস, অসংস্কৃত মানুষের বাসনা প্রবৃত্তির বাস্তবনিষ্ঠ পরিস্ফুটনের মাধ্যমে তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পের অবয়ব নির্মাণ করেছেন। পরিশীলিত শ্রী-শোভনতার পরিবর্তে এই রাঢ়বঙ্গের মানুষের অন্ত্যজ জীবনযাত্রা ও আদিম প্রবৃত্তির বাস্তবায়নের পাশাপাশি বৈষ্ণবীয় আখড়ার জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন তারাশঙ্করের গল্পগুলিকে বহুমাত্রিকতা প্রদান করেছে। বস্তুত কল্লোল পন্থী লেখকগণ যেখানে মানুষকে প্রবৃত্তির দাসরূপে অঙ্কন করেছেন, সেখানে তারাশঙ্কর মানুষের প্রবৃত্তির ক্ষুধাকে স্বীকার করে নিয়েও মানুষকে প্রবৃত্তি জয়ের পথে উত্তীর্ণ করেছেন। 'রসকলি', 'রাইকমল' গল্পের মঞ্জুরি ও কমলিনী তাই মানুষের প্রবৃত্তির জান্তবতার ঘৃণ্য রূপ দর্শনে মুক্তি পথের সন্ধানে অনির্দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রূঢ় বাস্তবতার প্রতিফলন, রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধাচারণ রূপজ মোহ, দেহ সচেতনতা, নৈরাশ্য, অবক্ষয়, ক্লেদাক্ত নাগরিকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিফলন কল্লোল পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এই পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেও তারাশঙ্কর এই কল্লোলের ভাবধারার উর্ধে স্বকীয় চিন্তা-চেতনা স্ফূরণ ঘটিয়েছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলে আত্মপ্রকাশ করে কল্লোলীয় ভাবধারার উর্ধে রোমান্টিকতা, দেহাতীত প্রেম সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন একদিকে ফ্রয়েডের লিবিডো তত্ত্ব অন্যদিকে মার্কসবাদী ভাবনার স্ফূরণ ঘটিয়েছেন, নৈরাজ্যবাদ, নৈরাশ্য বা, দেহজ কামনা, রূঢ় বাস্তবতা ইন্দ্রিয়জ প্রবৃত্তিকে সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন, সেই সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করে তারাশঙ্কর যেন কল্লোল যুগের সাহিত্যিক হয়েও কল্লোলকে অতিক্রম করে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। এখানেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্যতা সর্বজনস্বীকৃত।

তথ্যসূত্র :

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'আমার সাহিত্য জীবন' (১ম খণ্ড), কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ৫৩
২। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৪
৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'রসকলি', কলকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং, ১৩৫১, পৃষ্ঠা ১৯৭
৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'হারানো সুর', কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬২, পৃষ্ঠা ২৪
৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'স্থলপদ্ম', কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ২৭
৬। ভট্টাচার্য্য, জগদীশ, 'চিঠি তারাশঙ্কর গল্পগুচ্ছ' (২য়), কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৪৩ পৃষ্ঠা ১২
৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'রাইকমল', কলকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং, ১৩৫২, পৃষ্ঠা ১১৫

পটলডাঙার পাঁচালী : মান্ধাতার বাবার আমলের কথকতা
সা গ্নি ক মি ত্র

False সমুদ্র-কল্লোল না 'জোয়ান ঘোড়া'র হ্রেষাধ্বনি

"সবে যাত্রা শুরু করেছিলাম নির্ঝর তখনও গিরিবর্ত অতিক্রম করে নাই দিগন্তপ্রসারী সমতল শ্যামল প্রান্তর তখনও বহুনিম্নে ক্ষীণ রজতমেখলামণ্ডিতবৎ বোধ হইতেছিল, সহসা জল-কল্লোল কানে আসিল। যুক্তিবিচারহীন অসাবধানী আত্মভোলা পথিকের নিশ্চয়ই সমুদ্র বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল কিন্তু আমরা খেলাচ্ছলে যাত্রা করলেও উৎকর্ণ হইয়াই ছিলাম, শ্রবণমাত্র একটু চকিত হইয়াই বুঝিতে পারিলাম, গিরি-প্রপাতেরই কল্লোল সমুদ্রের নহে। পূর্বগামী অন্য এক নির্ঝরিণী পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ এক স্থানে স্খলিত হইয়া বড় রকমের পতনের ফলে (falls) সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা সর্বৈব (false) সমুদ্র-কল্লোল। আমরাও নাগাল ধরিয়া ফেলিলাম, ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল।"[১]

"আত্মস্মৃতি" গ্রন্থে "কল্লোল" সম্পর্কে বলতে গিয়ে বঙ্কিমী গদ্যের ঢঙে সজনীকান্ত দাশের ক্ষুরধার ব্যঙ্গোক্তি এখানেই থেমে থাকেনি। বরং আরো শাণিতভাবে তিনি উপরোক্ত সংঘর্ষকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছেন অঞ্জনা পুত্রের অপরিণামদর্শিতার উপমায়। নিদারুণ ক্ষুধার বশে রক্তবর্ণ সূর্যকে পাকা ফল বলে মনে করে লম্ফ প্রদানের ফল সুখদায়ক হয়নি। তারুণ্যের ভ্রমে বস্তু ও মানুষের যথাযথ মূল্যবোধ না থাকাতেই এই বিপত্তি। ছোটকে বড় আর বড়কে ছোট মনে করায় কল্লোল যুগের লেখকেরাও সে বিপত্তি এড়াতে পারেননি।

আর, আমরা যাঁরা ছোটগল্প নিয়ে কথা বলতে চাই, তিনি এই যুগেরই একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি-কথক। গুরুত্বপূর্ণ অথচ মূলস্রোতের পাঠকের কাছে অবহেলিত, কালোত্তীর্ণ অথচ বিশেষ একটি পত্রিকা বা যুগের গণ্ডীতে আবদ্ধ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় লাভ করার জন্য অবশ্যপাঠ্য হয়েও অধিকাংশত অপঠিত। বলা বাহুল্য, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা ছিল যাঁর মজ্জাগত ব্যাধি, প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যচর্চার জগতে স্বভাবতই তিনি অপাংক্তেয় থেকে গেছেন বরাবর। যিনি পৌরাণিক চরিত্র 'মান্ধাতার' (সূর্যবংশীয় রাজা) বাবার ছদ্মনামে মান্ধাতার আমলের চিরাচরিত সাহিত্য রীতিকে পরিহার করে রুচি বা নীতি, শ্লীলতা বা অশ্লীলতার উপরিতলের কূটতর্ককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে চেয়েছিলেন, বিকৃত যৌনতা এবং দারিদ্র্যক্লিষ্ট পঙ্কিল জীবনচর্যার অন্তর্নিহিত রূঢ় সত্যকে উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন; সমকালের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অসাধারণ বিশ্লেষণী দক্ষতায় তাঁর ছদ্মনামের অন্যতর এবং স্পষ্টতর তাৎপর্য আবিষ্কার করে তাঁকে যথার্থ অভিধায় ভূষিত করেছেন—

'কল্লোলে' আত্মপ্রকাশ করে সে যুবনাশ্বের ছদ্মনাম নিয়ে। সেদিন যুবনাশ্বের অর্থ যদি কেউ যদি করত 'জোয়ান ঘোড়া' তাহলে খুব ভুল করত না, তাঁর লেখায় ছিল সেই উদ্দীপ্ত

সরলতা। কিন্তু এমন বিষয় নিয়ে সে লিখতে লাগল যা মান্ধাতার বাপের আমল থেকে চলে এলেও বাংলাদেশের 'সুনীতি সংঘের' মেম্বাররা দেখেও চোখ বুজে থাকছেন।......বলতে গেলে (তিনিই) কল্লোলের প্রথম মশালচী"।[২]

প্রথম আলোর চরণধ্বনি

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে (পৌষ ১৩৩১) এই পত্রিকার পাতাতেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম ছোট গল্প 'গোষ্পদ'। এর পরবর্তী দু'বছরে বিভিন্ন সংখ্যায় একাদিক্রমে প্রকাশিত হয় আরো সাতটি যুগান্তকারী ছোটগল্প। যথা 'মৃত্যুঞ্জয়' (মাঘ ১৩৩১), 'কালনেমি' (ফাল্গুন ১৩৩১), 'রাতবিরেতে' (চৈত্র ১৩৩১), 'ভুখা ভগবান' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২), 'মন্থশেষ' (কার্তিক ১৩৩২), 'দুর্যোগ' (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) পটলডাঙার পাঁচালি (শ্রাবণ ১৩৩৩)। ১৩৫৭ সাল নাগাদ অচিন্ত্যকুমার লিখছেন, "ভাবতে অবাক লাগে যুবনাশ্বের সেই সব গল্প ('কল্লোলে' প্রকাশিত) আজও পর্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। চব্বিশ বছর আগে বাংলাদেশে এমন প্রকাশক অবিশ্যি ছিলেন না যে এই গল্পগুলি প্রকাশ করে নিজেকে সম্ভ্রান্ত মনে করতে পারত। কিন্তু আজকে অনেক দৃষ্টিবদল হলেও এদিকে কারু চোখ পড়ল না। ভয় হয়, অগ্রনায়ক হিসেবে যুবনাশ্বের নাম না একদিন সবাই ভুলে যায়।"[৩] যদিও সৌভাগ্যের কথা এই যে, অচিন্ত্যকুমারের এই আক্ষেপোক্তির ছ'বছর পর ১৯৫৬ সালে (ভাদ্র ১৩৬৩) উপরোক্ত আটটি গল্প এবং 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্বাহা' গল্পটি সহ মোট নয়টি গল্প নিয়ে প্রকাশক মানিক মুখোপাধ্যায়ের সেঞ্চুরি প্রেস থেকে ১১৬ পাতার গল্পগ্রন্থ 'পটলডাঙার পাঁচালি' প্রকাশিত হ'ল। প্রচ্ছদ আঁকলেন সত্যজিৎ রায়, বইয়ের ভিতরের পাতায় অলংকরণ করলেন মাখন দত্তগুপ্ত।[৪]

মান্ধাতার বাবার আমল

মনে রাখতে হবে, এই গল্পগুলি রচনা শুরুর পিছনে এক চমকপ্রদ কাহিনি আছে। মণীশ ঘটক তাঁর স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ 'মান্ধাতার বাবার আমলে' এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন—

"একবার কলেজ স্ট্রিটে এক পুরনো বইয়ের দোকানে সাবধানী মণীশের পকেটমারি হয়। একটি চোখ কানা এবং একটি হাত অকেজো হলেও পকেটমারটির এই নিপুণ হাতসাফাইয়ের কসরত দেখে অবাক হয়ে যায় মণীশ। গ্যাঁড়াতলা পার্কের (অধুনা মহম্মদ আলি পার্ক) এক বেঞ্চিতে বসিয়ে অনেক জেরার পর মণীশ এবং তাঁর বন্ধু বিজয় ছোকরা পকেটমারটির নাম এবং তার বাসস্থানের হদিশ জানতে পারে। নাম ফজল। থাকে রাজাবাজারের অদূরে ওয়াই-এম-সি হস্টেলের কাছে অবস্থিত কালোয়ার পাড়ার পিছনের বস্তিতে। এই বস্তিতেই চলে এক অপরাধচক্র। সেই চক্রের অধিষ্ঠাত্রী 'লেংরাবিবি' ডাকু, গুণ্ডা এবং জিনপরীদের সাহায্যে তার সাগরেদদের ওপর কড়া নজর রাখে। হাতসাফাই না করে ভিক্ষালব্ধ সিকি-আধুলি নিয়ে ফিরলে তাদের পিঠের চামড়া আস্ত রাখে না। অতঃপর এ হেন আকর্ষণীয় চরিত্র ফজলের সঙ্গে দহরম-মহরম বাড়িয়ে মণীশ জোগাড়

করে ফেললেন তাঁর নতুন গল্পের উপাদান। যদিও এ সব 'অবিচার-অন্যায়-অসাধুতা-ভন্ডামি' কিংবা 'চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-বলাৎকার' সাহিত্যের উপজীব্য হ'তে পারে কিনা এ নিয়ে তাঁর মনে যথেষ্ট দ্বন্দ্ব ছিল। তবু, রাত জেগে দিন দুয়েকের মধ্যেই লেখা হয়ে গেল 'গোষ্পদ' (ঠিক গল্প নয়, 'গল্পারম্ভ') এবং 'মৃত্যুঞ্জয়'। তারপর একদিন গল্প দুটো নিয়ে পটুয়াটোলা লেনে 'কল্লোলে'র অফিসে গিয়ে হাজির হলেন। গল্প না পড়েই দীনেশ দাশের উৎসাহব্যঞ্জক প্রশংসাবাক্য কপালে জুটলেও গোকুল নাগ প্রথম প্রেমে পড়ার গল্প মনে করে কিছুটা রসিকতা করতে ছাড়লেন না। জবাবে মণীশ শুধু বলতে পেরেছিলেন 'পড়ে দেখবেন সময়মতো। বিচ্ছিরি লাগলে ছিঁড়ে ফেলে দেবেন।' এরপর ছুটতে ছুটতে গিরীন মিত্তিরের মনীষা গ্রন্থালয়ে এসে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। পিছনের আলমারিতে অবিক্রীত অনেক ইংরেজি পত্রিকা থরে থরে সাজানো ছিল। সেখানেই H. G Wells -এর লেখা একটি প্রবন্ধের ('গল্প লেখকের কর্তব্য' গোছের নাম) কয়েকটা পংক্তি তাঁর ভাবনায় গভীর রেখাপাত করল। প্রবন্ধটি পরে আর খুঁজে না পেলেও নিজের গল্পের খাতায় কতগুলো লাইন তিনি টুকে রেখেছিলেন—

'We are going to write subject only to our limitations about the whole of human life. We are going to write about business and finance and politics and precedents and pretentiousness and decorum and indecorum until a thousand pretences and ten thousand imposters shrivel in the cold clear air of our elucidations.'

তাঁর মনে পড়ে গেল; ডিকেন্স, ডস্টয়ভস্কি, গোগোল আর গোর্কির কথা। দেশীয়দের মধ্যে কারো নাম তৎক্ষণাৎ মনে না পড়লেও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সমকালের শৈলজানন্দকে একটু পরেই। কিন্তু এঁদের সামনে নিজের লেখা গল্প দু'টোকে দাঁড় করিয়ে অপ্রতিভ হওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার ছিল না। অতঃপর সব দ্বন্দ্ব নিরসন হল সন্ধের পর। বিজয় 'কল্লোল' থেকে ফিরে এসে তাঁর পিঠে চড় কষিয়ে বলল, এ মাসেই লেখা ছাপা হবে। দীনেশদা পুরনো এক কপি ম্যাগাজিনও সঙ্গে পাঠিয়েছে পড়বার জন্য। সংবিৎ ফিরলে সেই পত্রিকাটা খুলে মণীশ দেখলেন নরেশ সেনগুপ্তের একটি প্রবন্ধের কয়েকটি লাইন লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া 'কথা সাহিত্যে দরিদ্র পরাভূত জীবনের চিত্র যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দরদ দিয়ে কেউ আঁকতে চেষ্টা করেননি। অবনত পিষ্টহীন নরনারী দৈহিক ও নৈতিক বৈক্লব্যে পঙ্গু দীন বুভুক্ষুর দল এদের কথা কেউ বলতে এগোননি।'[৫] সহজে অনুমান করা যায়, মণীশের লেখার সঙ্গে এই কথাগুলির বৈপরীত্যই চিহ্নিতকরণের কারণ। বস্তুতপক্ষে, মণীশ ঘটক যখন 'পটলডাঙার পাঁচালী'র গল্পগুলি লিখছেন তখন সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে রুশ বিপ্লব ঘটিত কারণে কিছু ভিন্নতর মূল্যবোধের সঞ্চার হয়েছে। তাঁরাও রুশ সাহিত্যের আদলে সাহিত্য রচনার কথা ভাবছেন। মণীশ ঘটক ছিলেন এঁদেরই একজন। তাঁর কন্যা

মহাশ্বেতা দেবী লিখছেন, "১৯২৪-এর যে খাতায় 'গোষ্পদ', 'কালনেমি' এ সব গল্প লেখা হয় তাতেই দেখি গোর্কি ও অন্যদের অনুবাদ।"[৬]

পটলডাঙার পাঁচালী

এবার আসা যাক গল্পের কথায়। 'গোষ্পদ' গল্পটি একটি 'ক্ষণকালিক সদিচ্ছার কাহিনী'।[৭] এটি আসলে একটি সিরিজের মুখবন্ধ। সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে থাকা মানুষদের ক্ষুধা আর কামনার সিরিজ। এই গল্পে পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ ঘরের একটি বউ এক পরপুরুষের সঙ্গে কলকাতার কালীঘাট দেখতে এসে প্রতারিত হয়। নেবুতলার এক বাড়িওলির কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া সেই মেয়েটি তার গয়নাগাঁটি, টাকাপয়সা এবং সম্ভ্রম সবকিছু হারিয়ে পটলডাঙার ভিখিরিদের দলে এসে ভেড়ে। মোড়লনি খেঁদি-পিসি কড়া ধাঁচের মানুষ। এত সহজে কাউকে দলে ভিড়তে দিতে রাজি নয়। তাকে বস্তিতে নিয়ে এসে পরিচয় জানতে চায়। কান্না শুনে ধমকের সুরে বলে "...আমাদের দলে যাদের দেখলে, সবাই তো ওই ক'রতো এককালে! পরে, বুড়ো হয়ে, কেউ ব্যারামে প'ড়ে পতে বেরিয়েচে। তোমার এই বয়সে অমন চেহারা তা বাপু নিজে বোঝ।" এ কথা শুনে মেয়েটি আরো জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। আর তখনই খেঁদির উচ্চারণে মানবিক আবেগের স্পর্শ এই হতদরিদ্রদের নতুন করে চিনতে শেখায় 'এবার আর খেঁদি কান্না শুনে খিটখিট ক'রে উঠল না। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কী ভাবল।" হয়তো ভাবল এই অবুঝ মেয়েটাকে বাঁচানো যায় কিনা। যায় না, তবু যতদিন যায়। তাই সে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আচ্ছা থাকো! কিন্তু এ চেহারা নিয়ে কোলকাতা হেন জায়গায় কি সামলে থাকতে পারবে? আমার খবরদারিতে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ অবিশ্যি ভয় নেই। কিন্তু সবসময় তো আমিও চোক রাখতে পারব না?"[৮]

'মৃত্যুঞ্জয়' গল্পের বিষয়বস্তুও দলে দু'জন নতুন সদস্যের আগমনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। মেয়ে ভিখিরিদের দলে কোন পুরুষ সদস্য না থাকলেও তাদের আস্তানার অন্ধকূপগুলিতে দু'একজনের ঘর ছাড়া প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই দু' একটি করে পুরুষ থাকতো। বছর চারেক আগে ক্ষ্যান্তর ভাইপো পরিচয়ে দলে এসে ভর্তি হয় এমনই এক হৃদয়হীন পুরুষ চঞ্চু। প্রথমদিকে খেঁদি তার ডানহাত ক্ষ্যান্তর খাতিরে নিমরাজি হলেও পরে চঞ্চুর কার্যকলাপ দেখে রীতিমতো আহ্লাদিত হয়। ভিনদলের একটি মেয়ে তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় মেয়েটির কান কেটে নিতেও সে দ্বিধাবোধ করেনি, আবার পথে একটা ছোট ছেলের গলার হার ছিনিয়ে নিতে গিয়ে তার চোখ দুটো আঙুলে টিপে গেলে দেয়। এ হেন পাশবিক চঞ্চুই একদিন যখন ময়লা, রোগা, বোবা একটা মেয়েকে দলে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করতে লাগলো তখন সবাই অবাক হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত ক্ষ্যান্তর অপেক্ষাকৃত বড় ঘরটিতেই মেয়েটির স্থান সংকুলান হলো এবং চঞ্চুর কড়া নজরদারিতে দলের অন্য পুরুষদের সঙ্গে তার মেলামেশা বন্ধ হল। চঞ্চু নিজে কাজে যাওয়া কমিয়ে দিল। তার মনে যেন আর আগের মত ফূর্তি নেই, রোজগারের ইচ্ছে নেই, দিনরাত ঘরে বসে থাকে আর মেয়েটি

ফিরে এলে তাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। রাত বারোটা-একটায় ফেরে। এই অবধি তবু ঠিক ছিল। কিন্তু একদিন পটলা যখন একটা মেয়ের হাতের বালা ছিনিয়ে নিয়ে তার একটা আঙুল মুচড়ে ভেঙে দেয় তখন কোথা থেকে চঞ্চু এসে তার গালে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় কষিয়ে চলে যায়। চঞ্চুর এই আকস্মিক পরিবর্তনে দলের সকলে খাপ্পা হয়ে খেঁদির কাছে নালিশ করে। "সত্যি করে বল তুই ও মাগী তোর কে? আমি কেন দশজনে দেখছে, ওই তোকে সারছে। ও কে তোর?" খেঁদির এই চোখা প্রশ্নের সামনে মেয়েটিকে নিজের বোন বলে পরিচয় দেয় চঞ্চু। আর এই জবাব শুনে তাড়িখোর রতন গাঁজার কল্কে হাতে বলে "বাবা, পিরিত বাঁধিয়েছ সে কথা বললেই হয়? আচ্ছা সত্যি ক'রে বলদিকি, কী রস তুই পেলি ওর মধ্যে।" এরপর খেঁদির সামনেই মারামারি শুরু হয়ে গেল। সবদিক বজায় রেখে খেঁদি আদেশ দেয় যে, মেয়েটিকে ছেড়ে আগের মতো হলে তবেই দলে থাকা যাবে, নচেৎ নয়। কিন্তু ভোর রাতের আবছা আলোয় খেঁদি পিসির আস্তানা ছেড়ে সেই বোবা মেয়েটার হাত ধরে বেরিয়ে এলো চঞ্চু। অনেক দিন তাদের আর কোন হদিশ পাওয়া গেল না। রতন টিপ্পনী কাটল "বলেছিনু কিনা। শক্ত একটা কিছু বেঁধেছে বাবা। নইলে চঞ্চুর মত স্যায়না ঘাগী"[৯]

অভূতপূর্ব সমাজ পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতার পাশাপাশি মান্ধাতার বাবার ছদ্মনাম গ্রহণের মতো 'কালনেমি' গল্পটির নামকরণে গল্পকারের সুগভীর পৌরাণিক বোধের আঁচ পাওয়া যায়। হনুমান বধের পুরস্কার স্বরূপ অর্ধেক লঙ্কার স্বপ্নে নিমগ্ন রাবণের মামা কালনেমিকে মাত্রাতিরিক্ত লাভের আশায় শেষপর্যন্ত নিরাশ হতে হয়। কালনেমির লঙ্কাভাগ প্রবাদটির তাৎপর্য হল কোনরকম পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার অন্তঃসারশূন্য পরিণাম। এই গল্পের ডাকু চরিত্রটির পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এই নামকরণ। রেলে একটা পা কাটা পড়া ডাকু তামাম দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কোন উপায় না পেয়ে সমর্থ স্ত্রীকে নিয়ে পটলডাঙার ভিখিরিপাড়ায় খুঁটি গাড়ে। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ওজর ব্যাতিরেকে সেখানকার বাসিন্দাদের আর কোন আপত্তি হয়নি। পঙ্গু ডাকুকে রোজ রাস্তার মোড়ে বসিয়ে দিয়ে ময়না দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষের সন্ধানে। ফিরে এসে আবার স্বামীকে তুলে নিয়ে যায়। একদিন সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে রতন এবং তার দুই সাগরেদের কবলে পড়ে যায় ময়না। শেষপর্যন্ত আত্মরক্ষার কোন উপায় না পেয়ে রতনের পশুলালসার বলি হয়। খেঁদি স্পষ্ট ভাষায় বলে "যেকানকার যা নিয়ম, তা মানতে হবে তো? পেট চালাবার জন্যে পতেই বেরুতে হচ্ছে যকন, তকন কি আর সোয়ামী- ইস্তিরি ওসব ভড়ং চলে? ভদ্দরনোকি করতে হলে তার ঠাঁই আলাদা।" ময়না স্বামীকে বলে- "তু একটা বিহিত করবিনে?" একটু চুপ করে থেকে তাকে সাপটে ধরে লালসাজড়িত এন্ট্রি ডাকু বলে "তা হোকগে। থাকতেই হবে যখন হেতায় তখন কি হবে আর ঘাঁটিয়ে? আয় তুই"। ময়না তখন স্বামীর ডাক উপেক্ষা করে চলে যায় রতনার কাছে। কিন্তু ডাকু তাতেও দমে না। বলে—"আমাকে একেবারে ফাঁকি দিসনে। একটিবার

আসিস রেতে" [১০] গল্পটির এ হেন পরিণতি যেন রস বিমোক্ষণের সহজ পথ আগলে দাঁড়ায়। সমালোচক মহলেও এ নিয়ে বিভ্রান্তি নেহাত কম নয়। সমালোচক শান্তি লাহিড়ী যেখানে ময়নার আচরণে 'নারীবাদে'র জয়ধ্বজা উড়তে দেখেছিলেন"।[১১] কণিকা বিশ্বাস সেখানে মনুষ্যেতর অবস্থানে থাকা মানুষের জীবনে "পশু জগতের নিয়মানুগত্যের নীতিকে" (১২) পরিস্ফুট হতে দেখেছেন। প্রসঙ্গত, তিনি "শিলালিপি" কাব্যের "তারা" কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করেছেন :

নরের ইতর আমরা বানর জাতি,
মোরা মানি বীরভোগ্যা বসুন্ধরা
আমাদের তরে পৃথক শাস্ত্র পাঁতি
স্বামীহন্তায় হয়েছি স্বয়ম্ভরা।[১৩]

তাঁর ব্যাখ্যায় 'কালনেমি'তে ময়না তার স্বাভাবিক জৈবিক প্রণোদনা থেকে পঙ্গু স্বামী ডাকুকে ছেড়ে দিয়ে তার ধর্ষক রতনের কাছে চলে গেছে। টিকে থাকাটাই আদিম জীবধর্ম।"[১৪] কিন্তু আমাদের মনে হয়, ডাকুর 'লালসাজড়িত এন্ট্রি'র আহ্বানটিই ময়নার এই আচরণের প্রকৃত কারণ। গল্পের শুরুতে সে ভিখিরিপাড়ার এই আশ্রয় গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল। কিন্তু নিরুপায় স্বামীর অসহায়ত্বের কথা ভেবেই থাকতে রাজি হয়েছিল। পঙ্গু স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালনের সঙ্গে নিজে উপার্জনের পথ বেছে নিয়েছিল, কিন্তু সেই স্বামীই যখন কালনেমির মতো মাত্রাতিরিক্ত লাভের অপরিণামদর্শিতায় ধর্ষিতা স্ত্রীর অপমানের প্রতিবিধান না করে নিজের জৈবিক ভোগকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে চাইল তখন ধর্ষক রতনকেও ময়নার শ্রেয় বলে মনে হয়েছে। অন্তত তার মধ্যে ভালোবাসার ভান নেই। তাই জৈবিক প্রণোদনার ফলে ময়না রতনের কাছে চলে গেছে—এই ব্যাখ্যায় ময়না চরিত্রটিকে নির্দয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, গল্পের নামকরণের মধ্যেই গল্পকারের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে নিহিত।

'দুর্যোগ' গল্পেও অন্যতর প্রেক্ষাপটে (এটি পটলডাঙার গল্প নয়) অবিনাশ বোস চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নারীলোলুপ বর্বর পুরুষের লুব্ধতা, নির্লজ্জতা আর সংকীর্ণতাকে তুলে ধরা হয়েছে। পদ্মার ঝড়ে দোদুল্যমান স্টিমারের মেয়ে—কামরায় বিপন্না স্ত্রীকে বসিয়ে রেখে মাল গাদিতে শুঁটকি মাছের চ্যাঙারির মধ্যে ঘাড় দাবিয়ে উবু হয়ে বসে তিনি একটি অর্ধনগ্ন কুলি-মেয়ের দিকে এমনভাবে হাঁ করে তাকিয়ে বসে আছেন যেন কাব্যচর্চা করছেন। শুধু তাই নয়, তার স্ত্রী যখন গল্প-কথকের সাহায্যে তাকে ডেকে পাঠালেন তখন একটি অপরিচিত ছোকরা তার স্ত্রীর হয়ে ওকালতি করতে আসায় এবং সঙ্গোপন রসানুভূতিতে ব্যাঘাত ঘটায় কথক এমনকি নিজের স্ত্রীর চরিত্রহননেও পিছপা হলেন না"... নবেলি করে একজন বাইরের পুরুষের সাথে কথা কইলেন আজ, কাল ইয়ে, করবেন কী কে জানে! আমায় না দেখতে পেয়ে ইয়ে অধীর, ! ...ইয়ে, বিরহ!"[১৫] অবশেষে সেই স্ত্রীর অকস্মাৎ আগমনের ফলেই ক্রুদ্ধ

কথকের প্রহরোদ্যত মুষ্টির হাত থেকে অবিনাশ বোস রেহাই পায়। অতএব "কলম যেন ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে।"[১৬] এ গল্পের প্রাকরণিক অভিনবত্বের কথা বলতে গেলে অচিন্ত্যকুমারের বিশ্লেষণটি সব অর্থেই যথাযথ।

'রাতবিরেতে' গল্পটি রাতের অন্ধকারে বেওয়ারিশ শিশু পাচারের নির্মম উপাখ্যান। অথচ পশুসুলভ আচরণের অনিবার্যতায় মানবতার সার্বিক অবমাননাকে প্রতিষ্ঠিত করাটাই গল্পকারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তাই 'মন্থশেষ' গল্পে তিনি বলতে চাইলেন অবদমিত মাতৃত্বের কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'কল্লোলে' গল্পটি প্রকাশ পায় কার্তিক ১৩৩২ সংখ্যায় তার ঠিক তিন মাস আগের শ্রাবণ সংখ্যায় "আজ আমি চ'লে যাই" কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন "উপবাসী কাঁদে মাতা মোহমত্ত নারীর অন্তরে"[১৭] এইরকমই এক নারীর বেদনাময় জীবন পরিণতির গল্প লিখেছেন মণীশ ঘটক। রাজাবাজার মোড়ের পরামাণিকের বাড়ি থেকে একটি বাচ্চা ছেলেকে অপহরণ করে আনে বাঞ্ছা। আসলে ছেলেটির গলার একটি হার কব্জা করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু পুলিশের তাড়া খেয়ে অতঃপর ছেলেটিকে তুলে আনতে বাধ্য হয় সে। হার কব্জা করা হয়ে গেছে কিন্তু এই অবস্থায় ছেলেটিকে বাড়ি ফিরিয়ে দিতে গেলেই পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হবে। সুতরাং খেঁদির সঙ্গে ছেলেটিকে সাবাড় করে ফেলার পরামর্শ করে। এই সময় খেঁদি পিসির ঘরে হঠাৎই সাতাশ-আটাশ বছরের একটি স্ত্রীলোক ঢুকে পড়ে। তার নাম বিন্দি দাঁতী। পেশায় রূপোপজীবিনী। ছেলেটিকে দেখেই তার অবদমিত বাৎসল্য উৎসারিত হয়ে ওঠে "তার খামকা ইচ্ছে হচ্ছিল ছেলেটির গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দ্যায়, একটু কোলে নেয় ধ্যেৎ।"[১৮] খেঁদি এবং বাঞ্ছার অসৎ উদ্দেশ্যও সে কিছুটা আঁচ করতে পেরে ছেলেটিকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চায়। বাঞ্ছা মৃদু আপত্তি করলেও প্রত্যুৎপন্নমতি খেঁদি তাতে সম্মতি দেয়। এই অবকাশে অন্তত ছেলেটিকে নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কিছুটা সুযোগ পাওয়া যাবে। আর এই অবস্থায় ছেলেটিকে কাছে পেয়ে বিন্দির মনের প্রতিক্রিয়া গল্পকার ব্যক্ত করেছেন অত্যন্ত মরমী এবং ইঙ্গিতঘন কয়েকটি বাক্যে :

'পেটের ক্ষিদে, সারা গায়ে ক্ষিদে ক্ষিদে, এ সবের অনুভূতি তার অজানা ছিল না; সেই ক্ষিদের পথও জানা ছিল। কিন্তু বুকের ঠিক মাঝখানটাতে কিসের এ ক্ষিদে! এ একদম নতুন! ঘরে এসে ছেলেটাকে বুকে চেপে চুমোয় চুমোয় তার দু-গাল ভরিয়ে দিয়েও তার তৃপ্তি হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল আরো আরো কিন্তু আশ মিটছিল না।'[১৯]

"ছেঁড়া কাঁথা, কম্বল, এঁদো গলির পচা পাঁক, অভাব ও অসুখের কাৎরানি, ক্ষিদে ও পশুলালসার হাহাকার"[২০]-এর মধ্যে আজন্ম প্রতিপালিত বিন্দির জীবনে এ যেন এক অভূতপূর্ব অত্যাশ্চর্য অনুভব। ছেলেটার কাছ থেকে তার বাড়ির মোটামুটি বর্ণনা আর বাঞ্ছার গতিবিধির অঞ্চল মিলিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিল। দলের কথা কিছু ফাঁস না করায় শেষমেশ হার চুরির অপরাধে তারই জেল হ'লো। ওদিকে মুক্তির আনন্দে হেসে উঠলো বাঞ্ছা। মন্থশেষে

অমৃত আর গরলের যে ভাগাভাগি হয়েছিল সুরাসুরে এখানে যেন তারই অনুরূপ পুনরাবৃত্তি ঘটল। এ হল পশুত্বের সঙ্গে সংগুপ্ত মনুষ্যত্বের দ্বৈরথ। বলার অপেক্ষা রাখে না, যে হারটি বাঞ্ছা পেল অমৃত সেটা নয়; যে মাতৃত্বের সাধ বিন্দি পেল সেটাই প্রকৃত অমৃত। আর বিন্দির আপাত করুণ পরিণতির অন্তরালে এ ভাবেই সঞ্চারিত হল এক অন্যতর প্রাপ্তির অনাবিল আনন্দ।

"মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়" —জীবনানন্দের এই বিশ্বাসই যেন "আরও স্থির দিকনির্ণয়ের মতো চেতনার পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ"[২১] সুসম্পন্ন করেছে 'পটলডাঙার পাঁচালী'র এইসব ইতিবাচক গল্পে। 'মৃত্যুঞ্জয়' গল্পে চঞ্চু তার "ময়লা- বোবা-রোগা ভিখারিনী প্রণয়নীকে ভালোবেসে ভেতরে ভেতরে বদলে গেছে এবং তার হাত ধরে খেঁদি পিসির অন্ধকার আস্তানা ত্যাগ করেছে, 'মন্থশেষ' গল্পে বেশ্যা বিন্দি দাঁতী তার অন্তর্লীন মাতৃত্ববোধ থেকে অপহৃত শিশুটিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। আর নাম-গল্পটিতে ('পটলডাঙার পাঁচালী') ভিখারিনী-বেশ্যা সদি আর কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত নফর পরস্পরের সঙ্গে সহানুভূতির বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। পটলডাঙার এইসব গল্পের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পটির সাদৃশ্যের কথা মণীশ ঘটক উল্লেখ করেছিলেন 'মান্ধাতার বাবার আমলে' 'বয়োধর্মে আঘাত দেবার জন্য, ঝাঁকি দেবার জন্য গল্প লেখায় প্রবৃত্ত হয়েছিল প্রেমেন, হয়েছিলাম আমিও। "বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' অমনি গল্প। আমার পটলডাঙার পাঁচালির গল্পগুলোও তাই। মানুষ কত রকম ফাঁদে জড়িয়ে চিরসুন্দর জীবনকে বাঁধে বিকৃত বিকলাঙ্গ করা সত্ত্বেও নির্মূল করতে পারে না। নিজের অতিসীমিত ক্ষমতায় আমিও তাই করেছি বস্তির জীবনালেখ্য, কানা খোঁড়া খাঁদা লম্পট চোর জোচ্চোর পকেটমারের ছবি এঁকে।'[২২] প্রসঙ্গত 'সাগরসংগমে' বা 'সংসার সীমান্তে'র মতো গল্পের কথা মনে পড়াও অস্বাভাবিক নয়।

অপরপক্ষে 'ভূখা ভগবান' গল্পটির সঙ্গে মিলে যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্মম জীবনদৃষ্টি। মানিকের 'নমুনা' গল্পের কেশব চক্রবর্তী নিদারুণ ক্ষুধার তাড়নায় কয়েক বস্তা চালের বিনিময়ে তার মেয়ে শৈলকে বিক্রি করে দেয় কালাচাঁদের কাছে। অথচ বিবেকের তাড়নায় ব্রাহ্মণ কেশব একটি মাত্র নিস্তেজ প্রদীপ জ্বেলে শৈল এবং কালাচাঁদের বিয়ে দিয়ে দেয় নিজে মন্ত্র পড়ে। শৈল কালাচাঁদের সঙ্গে যেতে রাজি না হওয়ায় কালাচাঁদ তাকে ধর্ষণ করে বলপূর্বক নিজের তৈরি করা বেশ্যালয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু একদিন নিজের সেই তথাকথিত স্ত্রীর ঘরের লোক ঢুকেছে শুনে বাড়িউলি তথা তারই দাদার বেওয়ারিশ দ্বিতীয় পত্নী মন্দোদরীর কাছে কৈফিয়ত দাবি করে। মন্দোদরী নিঃশব্দে শুধু একতাড়া নোট কালাচাঁদের সামনে মেলে ধরে। গোনা শেষ হয়ে যাবার পর, যেন 'মন্ত্রবলে ঠান্ডা' কালাচাঁদকে বলে, লোকটির নাম গজেন যে "চাল বেচে লাল হয়ে গেছে।"[২৩] অন্যদিকে 'ভূখা ভগবান' গল্পে হতদরিদ্র মুসলমান চাষী কালু সেখকে খাজনা বাকির দায়ে ধরে নিয়ে যায় জমিদারের পেয়াদা। সেই

সুযোগে জমিদারের ছেলে তার এক ইয়ার সহ কালুর বউ ফতিমাকে ধর্ষণ করে। বিনিময়মূল্য হিসেবে দিয়ে যায় একটি পাঁচ টাকার নোট। কালু ফিরে এসে টাকাটি পেয়ে 'খোদার দান' মনে করে যারপরনাই আনন্দিত হলেও প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে নোটটি দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং ধারালো দা হাতে তুলে নিয়ে এর প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পড়ে। ফতিমা কোনক্রমে সেই রাতের মতো তাকে নিরস্ত করে। পরদিন সকালে কালু সেখ আবিষ্কার করে আত্মঘাতী বিবির জলে ডোবা শরীর। তখন তার বত্রিশ নাড়িতে ক্ষুধার তীব্র পাক শুরু হয়েছে। ফতিমার প্রাণহীন মুখের দিকে তাকিয়ে অভিভূত ভাব কেটে গেলে তারই ইজ্জতের দাম বাবদ দলা পাকিয়ে ফেলে দেওয়া পাঁচ টাকার নোটটি তুলে নিয়ে সে রওনা দিল খাবারের দোকানে উদ্দেশ্যে।

একটি নাগরিক গল্প

'পটলডাঙার পাঁচালী' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সর্বশেষ গল্পটি সব অর্থেই ব্যতিক্রমী। আগেই বলেছি, প্রথম আটটি গল্প 'কল্লোল' পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হলেও এই গল্পটি ('স্বাহা') বেরিয়েছিল পরিচয় পত্রিকার পাতায়। আগের গল্পগুলিতে অপরাধপ্রবণ ভিখিরি পাড়ার অথবা একেবারে অন্ত্যজ-অবজ্ঞাত সমাজের অবদমিত ভালবাসা- আকাঙ্ক্ষার কথা বললেও এই গল্পে তিনি এলিট উচ্চবিত্ত নাগরিক সভ্যতার অসঙ্গতিকে নির্মম ব্যঙ্গের কশাঘাতে বেআব্রু করে তুলেছেন। গল্পটিতে একই সঙ্গে বিদেশি গল্পের অনুপ্রেরণা এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'মান্ধাতার বাবার আমলে' গল্পকার লিখছেন—

" 'স্বাহা' গল্পের সঙ্গে Edna Ferber এর 'Mother knows best' গল্পের অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য আছে, অথচ আমার গল্পটি সে আমলের কোন বিশিষ্ট পরিবার ও সমাজের আদ্যোপান্ত সত্য ঘটনার গল্পায়ন।" [২৪]

উক্ত বইটিতে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। গল্পের শুরুতেই 'সরকারের খেতাবি উজির' পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ দাস সাহেবের ফুঁপিয়ে কান্না আর মিসেস দাসের কোমরে হাত দিয়ে চুল ঠিক করে নেওয়ার মুখবন্ধের পর একটি মৃত্যু সংবাদের আকস্মিক সমাপতন ঘটে, তেইশের কোঠা না পেরনো দাস সাহেবের মেয়ে লটির মৃত্যু। এরপর ফ্ল্যাশব্যাকে উঠে আসে 'সোসাইটির নামকরা সুন্দরী'র আত্মহননের ইতিবৃত্ত। (যদিও সামাজিক মানরক্ষার তাগিদে একে দুর্ঘটনা বলেই চালানো হয়)। এ হেন সিরিয়াস বেদনাসিক্ত প্লটকে কীভাবে সামাজিক ব্যাঙ্গের খোঁচায় জর্জরিত করে তোলা যায় তা গল্পটি না পড়ে থাকলে বোঝানো বেশ কঠিন। মিসেস দাসের হৃদয়ে মায়া-মমতার পরিবর্তে সোসাইটি ও ফ্যাশন যেভাবে অধিকার বিস্তার করেছিল তাতে স্বামীর কর্মস্থল পিরোজপুর মহকুমা ত্যাগ করতে তিনি এক রকম বাধ্য হলেন এবং মেয়ে লটিকে নিয়ে দার্জিলিং-এ সমারূঢ়া হলেন। ফিরিঙ্গিয়ানা পুরোদমে অনুকৃত হতে থাকলো যার ফলে সতেরো বছর বয়সে লটি 'পিয়ার্সন' ম্যাগাজিনে

কবিতা লিখে ফেলল ও ত্রিলোক মানে তিনঠো আদমি বলতে শিখল।"[২৫]) এরপর দাস সাহেব কলকাতায় বদলি হয়ে এলে মিসেস দাস নিতান্ত অনিচ্ছায় লোয়ার সারকুলার রোডে ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন। আসবাবপত্র এলো পার্কস্ট্রিটের বিলিতি দোকান থেকে, মল্লিক সাহেবের মেমের ডেমলার গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেনা হ'ল একখানা ফোর্ড। এরপরে লেডি দত্তের পার্টির বর্ণনায় সাহেবি কেতাদুরস্ত বাঙালির যাবতীয় অনুকরণ প্রিয়তা আর ভ্রষ্টাচারের বিকৃত মুখচ্ছবি উন্মোচিত হ'ল। লটির এসব ভালো না লাগলেও মায়ের প্ররোচনায় টুটু মল্লিকের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনে সে বাধ্য হ'ল। ভায়োলেট মিত্তিরের সঙ্গে টুটুর কথোপকথনে উঠে এলো এক 'old sport' এর প্রসঙ্গ। অন্যদিকে লটির মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গোঁফ কামানো সরকার ড্রয়িং রুমে বসে সানবিমে টুটু মল্লিকের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

গল্পের দ্বিতীয় ভাগে নোয়াখালির পূর্ব প্রতিবেশী মিস্টার রায়ের ছেলে শঙ্কর রায় ওরফে ডাকুর আবির্ভাব, লটিকে প্রেম নিবেদন, চিঠি লিখে সম্মতি জানানোর প্রতিশ্রুতি আদায় করে ডাকুর বিদায়, লটিকে বিয়ের জন্য ডাকুর প্রস্তাব, মিসেস দাসের অসম্মতি (ডাকুর বিলেত না যাওয়ার অপরাধে) আর টুটুর হাতে 'নারীজীবনের প্রথম জৈবযজ্ঞে' পরাজিত লটির আত্মহনন ইত্যাদি ঘটনা পরম্পরা অত্যন্ত দ্রুত সমাপতিত হয়। আর 'Comedy of intrigue'-এর লঘুতায় লটির বিরুদ্ধে সংঘটিত সার্বিক ষড়যন্ত্রের বর্ণনায় গল্পকার লেখেন—

'ডাকুর চিঠির জবাব আসে না। লটির দিন কাটে না। একা ঘরে থাকা আর ওষুধ খাওয়া এই কাজ। তার অসুখ।'

তার অসুখ এই দুশ্চিন্তায় দাস সাহেবের মাথার সব কটা চুল সাদা হয়ে উঠল। সে শুনেছে, টুটুর সাথে তার বিয়ের প্রস্তাবে আপত্তি উঠেছে। আপত্তিকারী টুটু নিজে। কানাঘুষো শোনা যায়, সে বিলেতে বিয়ে করে এসেছে; তার বিলিতি স্ত্রী চিঠি দিয়েছে, আসচে।

মিসেস হাল ছাড়েন না। মনে মনে ঠিক করেন, সার এস.এন-এর ভাইপো অরুণ সিভিলিয়ান হয়ে আসছে, তার সাথে লটির বিয়ে দেবেন। এই আপদটা এখন ভালোয় ভালোয় চুকলে হয়।

"ডাকু কাজে লাইনে ছিল। ফিরে চিঠি পেয়ে, সে লটিকে নিতে এসেছিল এইটুকু লটির জেনে যাওয়া হয়নি।"[২৬]

গল্পে নামের ব্যঙ্গটি যেন চকিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ঋকবেদে উল্লিখিত 'স্বাহা' আর লটির বিপরীত পরিণতিতেই এই তির্য্যকতার পর্যাবসান। স্বাহা অগ্নিকে বিবাহ করে অমরতা পেয়েছিল আর ভালোবাসার পরিণতি লটির জীবনে নিয়ে এলো আত্মহননের পরিহসিত নিয়তি। যে মৃত্যুর পর অবাঞ্ছিত মৃতদেহটি সামাজিক সম্মানকে ধূলিসাৎ করে; old sport-এর জৈবযজ্ঞের আগুনে সেই মৃতার জীবন্ত শরীরটাকেই আহুতি দিতে হয়েছিল।

ধর্মীয় যজ্ঞে স্বাহা নামের উচ্চারণের মতো নব্য আদর্শের এলিট সমাজে তা অনিবার্য কর্তব্যরূপেও বিবেচিত হতে পারে। শুধুমাত্র একটি গল্পের নামকরণের অন্তরালে নিহিত পৌরাণিক রেফারেন্স তথাকথিত সভ্য অথচ ভ্রষ্টাচারী সমাজব্যবস্থার নগ্ন স্বরূপ যে কত সহজে উন্মোচন করতে পারে যুবনাশ্বের এই গল্পের সঙ্গে অপরিচিত পাঠকের পক্ষে তা অনুমান করা সহজ নয়।

কথাশেষ

মুন্সিগঞ্জে এক সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে শরৎচন্দ্র বলেন "... পূর্বের মত রাজা-রাজড়া জমিদারের দুঃখদৈন্যদ্বন্দ্বহীন জীবনে ইতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না। তারা নিচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মতো যেদিন সে আরও সমাজে নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশ নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।"[২৭]

পটলডাঙার বস্তিকেন্দ্রিক গল্পগুলি যেন ঠিক এই কথারই শৈল্পিক বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা। আবার অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতে, "যে বস্তু গত কয়েক শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া সাহিত্যে taboo হয়েছিল কিংবা বড় জোর রেস্টোরেশন যুগের ইংলন্ডে বা ভারতচন্দ্রীয় যুগের বাংলাদেশে বৈঠকখানাবিহারী বাবুদের মদের সঙ্গে চাটের স্থান নিয়েছিল"[২৮] সেই প্রবৃত্তির কথা কোনরকম sophistication-এর তোয়াক্কা না করেই খোলাখুলি ব্যক্ত হয়েছে। এমনকি বুর্জোয়া সমাজও তার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনার বলিষ্ঠতার কারণেই তৈরি হয়েছে বিরূপতা। মহাশ্বেতা দেবী লিখছেন—"যথেষ্ট খ্যাত এক সাহিত্যপত্রের সম্পাদক বলেছিলেন, যুবনাশ্ব? মানে মণীশ ঘটক। সে তো ভারী অশ্লীল সব বিষয় নিয়ে লেখে।" [২৯] আবার তাঁর গল্পের ফর্ম নিয়ে এ কালের এক সমালোচকের অভিমত—

'পটলডাঙার পাঁচালী'তে প্রকরণ চিন্তার কোন বালাই নেই। দুর্জয় নেশা, অন্ধকার রাজ্যে বিচরণের। সেই নেশা থেকে মুক্তি পাননি তিনি, চানও নি হয়তো। তাই একই মানচিত্রে ফিরে এসেছেন বারবার মনে হয়, বলার জন্যই বলা। চেঁচিয়ে বলা। আসলে গল্পকারের অন্তরঙ্গ প্রেরণাকে ছাপিয়ে গেছিল নতুন কিছু দেখানোর উন্মাদনা।"[৩০]

কিন্তু এ কথায় যথেষ্ট অনবধানতা রয়েছে। প্রকরণ চিন্তার সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও একটু ভেবে দেখলেই বেশ কিছু অভিনবত্ব চোখে পড়ে। যেমন, 'পটলডাঙার পাঁচালী' নামের গল্পটি যেখানে নাটকীয় প্রত্যক্ষতা (visuality) সমৃদ্ধ সংলাপের ধরনে লিখিত, 'গোষ্পদ' বা 'মৃত্যুঞ্জয়' সে তুলনায় অনেকাংশেই বর্ণনা প্রধান। আবার 'রাতবিরেতে' গল্পে কয়েক টুকরো স্কেচের মতো আঁকা দৃশ্যকল্পে বুনে ফেলা হয়েছে অকিঞ্চিৎকর অথচ আকর্ষণীয়

কাহিনীর জাল। সুকুমার সেন সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই বইটিকে 'গল্পচিত্র' [৩১] আখ্যা দিতে চেয়েছেন। অন্যদিকে বিনির্মাণের প্রচেষ্টায় 'কালনেমি', 'মন্থশেষ' বা 'স্বাহা' গল্পের নামকরণে সূচিত হয়েছে পুরাণ থেকে বর্তমানের দিকে পাড়ি দেওয়ার তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি। ভিখিরি পাড়ার পরিধি ছাপিয়ে 'দুর্যোগ' গল্পটির পটভূমিতে স্থাপিত হয়েছে একটি চলন্ত স্টিমার যা গল্পটির গতির সঙ্গে বেশ মানানসই। আবার 'ভুখা ভগবান' গল্পের পরিসমাপ্তি আক্ষরিক অর্থেই whip cracking, 'কালনেমি' গল্পের পত্নীবর্জিত মনুষ্যেতর মানুষটির সঙ্গে 'স্বাহা' গল্পের প্রেমবঞ্চিত সুসভ্য নায়ক সমনামী কেন, সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। তাছাড়া এই গল্পগুলি লেখার অন্তরঙ্গ প্রেরণা 'মান্ধাতার বাবার আমলে'র প্রতিটি পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। নতুন কিছু করে দেখাতে গিয়ে কোথাও তার হানি ঘটেছে বলে মনে হয় না। বরং এই বইতে 'স্বাহা' গল্পটির অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এর উত্তরেও অন্নদাশঙ্কর কথিত সেই প্রবৃত্তির কথাই উঠে আসে ..."অসার এই সংসারে কেবল সেই প্রবৃত্তিই সার। অনিত্য এই জগতে কেবল সেই প্রবৃত্তিই নিত্য। এ যুগে ঋষিরা যেন সেই কথাই ঘোষণা করেছেন। Personal Immoralit-তে তাঁদের আস্থা নেই' race Immorality-ই তাঁদের একমাত্র আশা।"[৩২] আর এই গল্পগ্রন্থে উক্ত race- শব্দটিকেই যুবনাশ্ব নিরন্তর প্রশ্নচিহ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন। ক্ষীণ-তারে Immorality-র আশাও বেজেছে তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে।

তথ্যসূত্র :

১. সজনীকান্ত দাস, 'আত্মস্মৃতি', প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬১, সুবর্ণরেখা, পৃ.১১৬

২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', দশম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, পৃ.৫৫
মণীশ ঘটকের গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি বলেন—"এ একেবারে একটা নতুন সংসার, অধন্য ও অকৃতার্থের এলাকা। কানা খোঁড়া ভিক্ষুক গুন্ডা চোর আর পকেটমারের রাজপাট। যত বিকৃত জীবনের কারখানা।"

৩. তদেব, পৃ.৫৬
এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন—"অন্তত এই অগ্রদৌত্যের দিক থেকে এই গল্পগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে গণনীয় হয়ে থাকবে। এরাই বাংলা সাহিত্যে নতুন আবাদের বীজ ছড়ালে। বাস্তবতা সম্বন্ধে সরল নির্ভীকতা ও অপধ্বস্ত জীবনের প্রতি সশ্রদ্ধ সহানুভূতি এই দুই মহৎ গুণ তার গল্পে দীপ্তি পাচ্ছে।"

৪. গ্রন্থপরিচয়, সোমা মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), মণীশ ঘটক রচনা- সংকলন, প্রথম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৩৯৩

৫. মান্ধাতার বাবার আমল, সোমা মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), মণীশ ঘটক রচনা- সংকলন, দ্বিতীয় খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ১২৩-১৪৩

৬. মহাশ্বেতা দেবী, 'মণীশ ঘটক', বর্তিকা, মণীশ ঘটক জন্ম শতবার্ষিক সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০১, প্রকাশক ও সম্পাদক মহাশ্বেতা দেবী, পৃ. ১০৬
৭. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', দশম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, পৃ.৫৭
৮. যুবনাশ্ব, 'গোষ্পদ', 'পটলডাঙার পাঁচালী', মণীশ ঘটক রচনা- সংকলন, সোমা মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), প্রথম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৫৪
৯. যুবনাশ্ব, 'মৃত্যুঞ্জয়', তদেব, পৃ. ৮৭-৮৮
১০. যুবনাশ্ব, 'কালনেমি', তদেব, পৃ. ৭৩
১১. শান্তি লাহিড়ী, যুবনাশ্ব, বর্তিকা, মনীশ ঘটক জন্ম শতবার্ষিক সংখ্যা, জুলাই ডিসেম্বর ২০০১, প্রকাশক ও সম্পাদক মহাশ্বেতা দেবী, পৃষ্ঠা ২২
১২. কণিকা বিশ্বাস, 'যুবনাশ্ব-র পটলডাঙার পাঁচালী', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, দেড়শো বছরের বিস্মৃত বাংলা বই প্রাক-শারদ ২০১৪, সম্পাদক তাপস ভৌমিক, পৃ. ২৫৫
১৩. তদেব
১৪. তদেব
১৫. যুবনাশ্ব, 'দুর্যোগ', 'পটলডাঙার পাঁচালী', মণীশ ঘটক রচনা- সংকলন, সোমা মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), প্রথম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ১০৭
১৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', দশম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, পৃ.৫৮
১৭. প্রেমেন্দ্র মিত্র, আজ আমি চ'লে যাই (প্রথমা), কল্লোল কবিতাসমগ্র, সংকলন ও সম্পাদনা অরুণ মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৪২৩, পৃ. ১১৭
'আজ যারা বাসিতে পেল না ভালো/ আমাদের চারিপাশে আজ যত প্রাণ/ অন্যায় দারিদ্র্যে আর হীন লালসায়/ অন্ধ পঙ্গু কাঁদে উষ্ণ অভিশাপে,/ আজিকার মানবের যত গ্লানি পাপ/ আমাদের সাথে যেন মোরা সব মুছে লয়ে যাই' কবিতাটির এই পংক্তিগুলি 'পটলডাঙার পাঁচালী'র মূল বক্তব্যের অনুরূপ।
১৮. যুবনাশ্ব, 'মন্বন্তরশেষ', 'পটলডাঙার পাঁচালী', মণীশ ঘটক রচনা- সংকলন, সোমা মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), প্রথম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৭৭
১৯. তদেব, পৃ.৮০
২০. তদেব
২১. জীবনানন্দ দাশ, মানুষের মৃত্যু হ'লে, বেলা অবেলা কালবেলা, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, দ্বাদশ মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ১১৫-১৭
কবিতাটির শেষ কয়েকটি পংক্তি এই রকম—'মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব/ থেকে যায়, অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে/ আরো ভালো আরও স্থির দিকনির্ণয়ের মত চেতনার/ পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ/ কত দূর অগ্রসর হ'য়ে গেল জেনে নিতে আসে।"
২২. মান্ধাতার বাবার আমল, সোমা মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), মণীশ ঘটক রচনা- সংকলন, দ্বিতীয় খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ১৪৬

২৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নমুনা, আজ কাল পরশুর গল্প, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, পঞ্চম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১৭৯-৮৪

২৪. মান্ধাতার বাবার আমল, সোমা মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), মণীশ ঘটক রচনা- সংকলন, দ্বিতীয় খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ১৪৬
প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে বিদেশি গল্প থেকে অধীত ও অনুভূত ভাবনার পুনঃরূপায়ণে ব্যক্তিগত ব্যঞ্জনার সংযোগ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি নিজের গল্পে একই সঙ্গে বিদেশি প্রেরণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার অদ্ভুত মেলবন্ধনের উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই **Leonard Merrick** -এর **'Call of the Past'** গল্পের সঙ্গে 'পঞ্চশর' এর 'চিত্রা' গল্পের সাদৃশ্য দেখে তিনি অবাক হননি। কারণ সে গল্প একান্তভাবেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মৌল অনুভূতি সমুদ্ভব' তা বোঝা যায়।

২৫. যুবনাশ্ব, 'স্বাহা', 'পটলডাঙার পাঁচালী', মণীশ ঘটক রচনা- সংকলন, সোমা মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), প্রথম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ১১১

২৬. তদেব, পৃ.১২৯

২৭. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', দশম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, পৃ.১৫৭

২৮. তদেব, পৃ. ১৫৮ (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "বেদে" উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে লন্ডন থেকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা একটি চিঠির অংশবিশেষ।)

২৯. মহাশ্বেতা দেবী, 'মণীশ ঘটক', বর্তিকা, মণীশ ঘটক জন্ম শতবার্ষিক সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০১, প্রকাশক ও সম্পাদক মহাশ্বেতা দেবী, পৃ. ১২৪

৩০. দেবলীনা মুখোপাধ্যায় (শেঠ), 'কনখল: ফিরে দেখা', বিস্মৃত বাংলা উপন্যাস, পরিকথা, মে ২০১০, পৃ. ২৮৬

৩১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খন্ড (১৮৯১-১৯৪১) চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, গল্প-উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৮৩, পৃ.৩৫৩

৩২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', দশম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, পৃ.১৫৮ (অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে লন্ডন থেকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা একটি চিঠির অংশবিশেষ।)

কল্লোলের সাথী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্প

মৌ সু মী সা হা

সময়টা ছিল তেরোশ-একত্রিশ সালের পয়লা জৈষ্ঠ্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিশির চন্দ্র বসু, বিনয় চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত— এই চারজন সাহিত্যিক বন্ধু একসাথে মিলে প্রতিষ্ঠা করলেন একটি সংঘ, যার নাম ছিল 'আভ্যুদয়িক'। এই আভ্যুদয়িককে ঘিরেই ছিল তাদের স্বপ্ন, সাহিত্যিক আড্ডা, আর একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা, 'আভ্যুদয়িকে' বৈঠক চলত প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, আভ্যুদয়িকে'র সভায় চলত স্বরচিত গল্প-কবিতা পাঠ, এরপর হঠাৎ একদিন 'কল্লোল' পত্রিকার সহ-সম্পাদক গোকুল নাগের সঙ্গে পরিচয় হয় অচিন্ত্যকুমারের। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে কল্লোল পত্রিকায় তিনি জানিয়েছিলেন—

'কল্লোল বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত-যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন'।

গোকুল নাগের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে কল্লোল পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর 'গুমোট' গল্পটি। এরপর তিনি সাহিত্যিক ব্রতে একনিষ্ঠ হয়ে রচনা করেন একের পর এক গল্প। শিল্পী হিসাবে তাঁর লেখার ঋতুবদল হয়েছে বারবার। কল্পনার অজস্রতা, বিরুদ্ধ, নতুন জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গির বিচিত্রতা, কবিত্বময় ভাবুকতা, বিদেশী সাহিত্যের প্রেরণা তার মনের মুক্তি ঘটাল।

সরকারী চাকরি করতে গিয়ে বাংলার শহরে-শহরে ঘুরে বেড়ানোর মধ্য দিয়ে বিচিত্র পরিবেশ ও বিচিত্র নর- নারীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। বিড়ম্বিত- অসহায়- উন্নাসিক- স্বার্থপর ইত্যাদি নানাধরণের মানুষ পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাদের জীবনকে তিনি তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জবানীতে জানতে পারি, 'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল', সরে' এসেছিল অপজত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে, কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে, প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়'।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার বন্ধুর পথে চলতে চলতে কল্লোকে নিয়ে যে প্রাণের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল তাতে ছিল দুঃসাহসিকতা ও বিরুদ্ধ মনোভঙ্গি, স্থবির সমাজের বিরুদ্ধে সত্যভাষণের তীব্রতার মধ্য দিয়ে বাস্তবতার পথে চলার কষ্ট স্বীকার করে নিয়েই 'কল্লোল' সাধনা করেছিল 'নবীনতার, অনন্যতার'। জীবনরহস্যসন্ধানী অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, 'যার ক্ষুদ্রপ্রাণ, মূঢ়মতি, তারাই শুধু মামুলি হবার পথ দেখে- আরামরমণীয় পথ-যে পথে সহজ খ্যাতি বা কোমল সমর্থন মেলে, যেখানে সমালোচনার কাঁটা-খোঁচা নেই, নেই বা নিন্দার অভিনন্দন। কিন্তু কল্লোলের পথ সহজের পথ নয়, স্বকীয়তার পথ।'

একদিকে অচিন্ত্যকুমারের লেখনীতে কল্লোলের ভাব-ভাবনার প্রতিফলন আর অন্যদিকে শহরের সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবন ছাড়িয় প্রত্যন্ত পাল্লীর সাধারণ মানুষের সুখ- দুঃখের চিত্র। হতভাগ্য মানুষের জীবনকে সহানুভূতি ও সহৃদয়তা দিয়ে দেখার চেষ্টা বা কোন বিশেষ ঘটনা বা চরিত্র-রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা তাঁর গল্পের সুর

"কল্লোল-কালে লেখা 'দুইবার রাজা' তখনকার দিনের একটি 'সাড়া জাগানো গল্প'।

একটি রুগ্ন, ব্যর্থ যুবকের দারিদ্র্য আর হপানি রোগের সঙ্গে সংগ্রামমুখর জীননের কাহিনী, প্রশ্নের নায়ক অমর তার মাকে নিয়ে এক কদর্য, নোংরা, খোলার ঘরে থাকে। মায়ের গয়না বন্ধক দিয়ে কোনরকমে বি. এ পড়ার খরচা জোগাড় করে। অথচ তার দু'চোখ ভরা স্বপ্ন, 'এমুঠো ভাত একখনি কুঁড়ে ঘর আর একটি কল্যাণী নারী।' কিন্তু সব সাধই তার অপূর্ণ থাকে। অবশেষে তার পড়াশুনোর খরচ চালানোয় রাজী হওয়ার বিনিময়ে এক ধনীগৃহের অরক্ষণীয়। 'যমের অরুচি' পাত্রীর সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ হয় ও সেইসাথে তার মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় একহাজার টাকার নোট।

জীবনের অন্তত একটা দিন অমর রাজার সম্মান পেলো, তাকে কেন্দ্র করে উৎসবের যত-কিছু আয়োজনে, কিশু শুধু একবারই নয়, আরো একবার সে রাজসম্মান পে'ল, যখন পথ চলতে গিয়ে মোটর চাপা পড়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ হলো, সেদিন সে সবার কাঁধে চড়ে মহাযাত্রায় গেলো, কি অদ্ভুত মানুষের জীবন! যেকোনো মানুষই জীবনে দুবার রাজা হয়। যখন সে বিয়ে করে। আর একবার, যখন সে মরে।

প্রায় চল্লিশ বছরের উপর গল্প লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার, ১৯২১-৬৫ সমস্ত খণ্ডকালকে ছুঁয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পঠিকের দরবারে পৌঁছেছেন, 'হরেন্দ্র' গল্পে ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখের প্রধান নিয়ন্তা যে সমাজ তার প্রভাব প্রত্যক্ষ। মানুষের পরাজিত জীবনের যন্ত্রণার আখ্যান 'হরেন্দ্র'। লেখকের মুখে শোনা যাক তার করুণ জীবনকাহিনী।

'হরেন্দ্রকে দেখেছি নেত্রকোণায়। কোর্টে পাখা টানত ছ-ফুট লম্বা, শুকনো দড়ি-পাকানো' চেহারার নিরন্তন মাথা ধরায় ভুগছে। রোগের বুঝি প্রতিকার হয় যদি সে বেগুনিকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু বেগুনির বাবা সমাজ মানে, বিনাপণে মেয়ের বিয়ে দেবে না, অথচ ছ-কুড়ি টাকা পণ দিতে পারে হরেন্দ্র সে সাধ্য নেই। তারপর গুণ্ডারা এসে যখন বেগুনিকে সমাজের বাইরে এনে ফেলে দিল তখনও হরেন্দ্র তাকে বিয়ে করতে পেল না।" -

এবিষয়ে হরেন্দ্রর কাতর স্বীকারোক্তি — "কাউকে রাজী করাতে পারলাম না হুজুর।'

স্বার্থপর সমাজের কাছে গরীর মানুষের কোনো দাম নেই। সেই উপলব্ধিতেই, অসহায় মানুষের বেদনা এই গল্পে আরও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

'চুরি' গল্পে লক্ষণীয় সমাজের পরীক্ষার চরমসীমায় গৌরীয়া উত্তীর্ণ হোয়েছে।

মফস্বল শহরের সরকারী এবং অবিবাহিত নায়ক স্বৈরাচারী দৃষ্টিহতে মেয়েদের বিচার করে। শহর থেকে শহরান্তরে বার-বার বদলি হওয়ার জন্য বহু মেয়ে দেখে বেড়ানো তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। শেষপর্যন্ত বিধাতার চক্রান্তে এমন এক স্থানে সে বদলি হয়, যেখানে কোনো তরুণীর দেহরেখা পর্যন্ত করার সুযোগ হয় না। অবশেষে একদিন একদিন এক হিন্দুস্থানী মেয়ে গৌরীয়ার সঙ্গে তার পরিচয় হয়, গৌরীয়া স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছে প্রায় দু'বছর। কিন্তু তার স্বামী যদি আবার ফিরে আসে সেই জন্যে 'বালিসের তলায় ও প্রকাণ্ড একটা ছুরি নিয়ে শোয়।

গল্পের নায়ক একটু ভয় পেলেন। গৌরীয়া নিজের সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। আর তাই

ব্যর্থ মনোর হয়ে বিদায় নিতে হয় নায়ককে। রহস্যময়ী এই নারী চরিত্রটি চিত্রণে লেখকের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

নীচুতলার মানুষের জীবনের প্রতি গভীর কৌতূহল, সংস্কারমুক্ত নির্মোহ দৃভিঙ্গিতে তাদের সমস্যাকে অনুভব করার চেষ্টা এবং এইসব মানুষজনকে উপেক্ষা না করে তাদের স্বপ্নভঙ্গের ট্র্যাজেডিকে রূপদানের চেষ্টার একটি নমুনা 'তিরশটি' গল্পটি।

বিয়ের যোগ্য কালো ও কুৎসিত মেয়ে সুমিতা তার গোপন নিভৃতচারী প্রেমকে বাঁচিয়ে রেখে তার পছন্দের মানুষটির জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু তাতে বাদ সাধে মোটা মাইনের চাকরি করা এক উচ্চশিক্ষিত যুবক। অবশেষে এই মানুষটির থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে তাকে একটি পত্র লেখে। আদর্শবান যুবকটি তৎক্ষণাৎ তাকে মুক্তি দেয়। এই ঘটনার ঠিক তিনবছর পরে সুমিতা দ্বারস্থ হয় এই মানুষটিরই কাছে, যিনি হাকিম পদে বহাল হয়েছেন। সুমিতা তার অর্থলোভী ও চুরির দায়ে অপরাধী স্বামীর হয়ে হাকিমের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। কিন্তু ক্ষমাহীন হাকিমের ব্যবহারে চরম পরাজয় ঘটে সুমিতার। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয় তাকে।

মানুষের জীবনের জটিল রহস্যের গ্রন্থিমোচনে অপূর্ব দক্ষতা ছিল অচিন্তকুমারের। বিষয় বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-ভঙ্গি- আঙ্গিকেও তিনি অভিনবত্বের সঞ্চার করেছেন, সে বিষয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই।

অচিন্তকুমার সেনগুপ্তের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য গল্পগুলি ভীষণরকম বাস্তব হয়ে পাঠকের মন ছুঁয়ে গেছ। 'অপূর্ণ' গল্পের সুরেশ্বর মুন্সেফের চাকরী নিয়ে এক 'ভূতপাড়াগাঁয়ে' এসে পৌঁছয়। স্ত্রী অসীমাকে সাহায্য করার জন্য বহাল হয় বছর তেরো-চোদ্দ বছরের অপরিপুষ্ট একটা ছেলে,' নাম দেবেন্দ্র। নিঃসন্তান অসীমার মধ্যে বাৎসল্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে জীবননাট্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে দেখা যায়, চাকরকে শেষ পর্যন্ত সন্তান হিসাবে ভাবা খুবই কঠিন ব্যাপার। দেবুর কিশোরসুলভ চাপল্যে ক্রোধে অন্ধ হয়ে অসীমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাঁর 'কানটা' সজোরে, মুচড়িয়ে দিয়ে বললে, 'ওঠ্ ওঠ্ এই বিছানা থেকে, চাকর, তুই আমার ছেলে হতে হবি কোন্ লজ্জায় রে, মুখ পোড়া?'

কিংবা, 'যতই নাই দেওয়া যায় ততই কুকুর, এক মাথায় এসে ওঠ, না? যা এখান থেকে ।' বলে অসীমা তাকে ধাক্কা দিয়ে দরজার দিকে ঠেলে দিল।'

'লেখকের উপলব্ধির সূক্ষ্মতায় গল্পটি অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যমহলে কল্লোল একটি যুগচিহ্ন বলা যেতে পারে। কল্লোল ছিল সাহিত্যিকদের জীবন-অভিজ্ঞতার স্নায়ুকেন্দ্র। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মানুষের জীবনকে যেমনভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ঠিক তেমনভাবেই তাঁর লেখা গল্পগুলিকে সাহিত্যের ভাষায় রূপদান করেছন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি—জীবনবোধ—উপলব্ধির সূক্ষ্মতা এবং সর্বোপরি সত্যকে অনাবৃত করে দেখানোর বাসনায় গল্পগুলি ভাষা পেয়েছ।

কল্লোলগোষ্ঠীর প্রতিভাবন লেখকদের মধ্যে অন্যতম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-এর লেখার সহজ-সরল-সাবলীল ভঙ্গি ভাষাকে রূপদান করেছে এবং বাংলা সাহিত্যে মানবিকতার রস সঞ্চার করেছে। জীবনরসিক লেখকের সহৃদয় সহানুভূতির কারণে গল্পগুলি সার্থক হয়ে উঠেছে।

কল্লোল ও সমকালে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প

উ জ্জ্ব ল প্রা মা ণি ক

কল্লোলের আশীর্বাদধন্য, বা বলা ভালো কল্লোলকে যিনি কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেলেন বহুকাল, তিনি নীহারিকা দেবী ছদ্মনামের আড়ালে স্বয়ং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বিদ্রোহের বহ্নিতে বাংলা সাহিত্যকে দেখালেন নতুন পথ, নতুন পৃথিবী। রবীন্দ্র কাব্যাদর্শ ও সাহিত্যে চিত্রিত জগৎ থেকে সরে এসে ভিন্ন ভাবনার সাহিত্যভুবন নির্মাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন,

"সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ম আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর!
গভীর আত্মোপলব্ধি —এ আমার দুর্দান্ত সাহস,
উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছে নব-নর-জন্ম সম্ভাবনা;"[১]

তাঁর চিন্তা-চেতনা ছিল সুদূরপ্রসারী। সাহিত্যকে শুধু কাব্যের সুরে ঝংকৃত করলেন তেমনটা নয়, উপন্যাস, ধর্মতত্ত্ব, সাধক জীবনী এবং ছোটগল্পের বিকল্প ভাবনায় বৈচিত্র্যের সুর তুললেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টির ছাপ সুস্পষ্ট। একদিকে বিপুল কল্পনাশক্তি অপরদিকে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার অতুল প্রসার। অতীন্দ্রিয় ভাবনার বাইরে এসে এক বিকল্প নাস্তিকতার পাঠ দিলেন বাংলা সাহিত্যকে। এক্ষেত্রে তাঁর স্ববিরোধের অবস্থানটি উজ্জ্বল চমক। ঈশ্বরের প্রতি তেমন ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকলেও তিনি মানুষের ঈশ্বরকে নিয়ে লিখেছেন- 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'(১৩৫৮-৫৯),'পরমপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি' (১৩৬০), 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'(১৩৬৫)। অবালবৃদ্ধাবনিতা মহাসমাদরে তা গ্রহণ করলেন। তিনি যেমন গলা-পচা জীবনের গ্লানিময় বীভৎসতার ভাষারূপ দিয়েছেন 'বেদে'(১৩৫৩), 'টুটা-ফুটা(১৩৩০-৩৪)' উপন্যাসে, আবার 'রূপসী রাত্রি'(১৩৩৮) ও 'চলে নীল শাড়ি'র মতো কল্পসুন্দরী মানবজীবন এঁকেছেন উপন্যাস, গল্পের পাতায়। এক সীমান্ত থেকে অপর সীমান্তের ভ্রমনস্বচ্ছন্দতায় ছিল তাঁর সাহিত্য-শিল্পের অভিমুখ। সমাজ ও ব্যক্তিচেতনার আশ্চর্য উদঘাটনে তাঁর ছোটগল্প এক বিকল্পপাঠ। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

"ছোটগল্পের শিল্পরূপ ও জীবন-সমীক্ষায় যে বহুব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টির অন্তর্মুখিতা ফুটেছে তা অন্যত্র দুর্লভ। বাঙালী জীবনের আপাতরূক্ষ মৃত্তিকার তলে যে ভোগবতীধারা অদৃশ্যপ্রবাহিত তাকে অনুভব ও প্রকটিত করার শক্তি আর কোন কথাসাহিত্যিকের অনধিগম্য। অচিন্ত্যকুমারই এই ভূগর্ভস্থ মানস সম্পদকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে ওর প্রচ্ছন্ন জীবনাবেগকে রসসৃষ্টির উপাদানে পরিণত করেছে"।[২]

১৯০৩ সালে ১৯শে সেপ্টেম্বর নোয়াখালিতে তাঁর জন্ম। অবিভক্ত বাংলাদেশের মাদারিপুর

ছিল ফরিদপুর মহকুমার অন্তর্গত। সেখানেই ছিল লেখকেদের আদি নিবাস। নোয়াখালিতেই তাঁর বাল্যশিক্ষা সমাপন। তারপর, ১৯১৮ সালের দিকে সপরিবারে কলকাতায় এলেন। বিখ্যাত সাউথ সুবার্বাণ স্কুলে তিনি সৌভাগ্যবানের মতো ছায়াসঙ্গী পেলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। প্রেমেন এক ক্লাস আগে থাকলেও বয়সের ঘাটতি থাকার কারণে অচিন্ত্যের সহপাঠী হলেন। দু'জনেই মেধাবী ছাত্র। অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। লেখালেখির হাতও তাঁদের ভালো। সেই সূত্রে দুজনে গিয়ে উঠেছিলেন ১০/২ পটুয়াটোল লেনের আড্ডায়, কল্লোলের ঘরে। নিপাট আড্ডা জমাতে জমাতে তাঁরাই হয়ে উঠলেন কল্লোল(১৯২৩) পত্রিকার মধ্যমণি। পত্রিকার সহ-সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগের মৃত্যুর পর অলিখিতভাবে সে দায়িত্ব অচিন্ত্যকুমারের ঘাড়ে এসে চাপল। বেতনভুক্ত চাকরি নয়, ঠিক যেন 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র মতো। তবু তিনি এটাকে নিজের কাজ মনে করেছেন। কর্তব্যবোধে নিটোল থেকে সর্বদা পত্রিকার জন্য নিরলস কাজ করে গিয়েছেন। নিদারুণ আর্থিক অনটনে মাঝে মাঝে অন্য কাজেরও সন্ধান করতে হয়েছে তাঁকে। কিছুদিনের জন্য উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রা' (১৯২৩) পত্রিকায় মাসিক ৫০ টাকার বিনিময়ে সহ-সম্পাদকের কাজও করেছেন। চরম অর্থাভাব, কিছুতেই সংকুলান করতে না পেরে এবাড়ি ওবাড়ি টিউশন করেছেন। কিন্তু এসব কিছুর পরেও তাঁর লেখার কাজে ভাটা পড়েনি। আসলে, তিনি ছিলেন একজন সংগ্রামী অক্ষরকর্মী, সাহিত্যচর্চা তাঁর সাধনা। সমাজ ও দেশকালের প্রতি তিনি যেন কতকটা দায়বদ্ধ থেকে লেখালেখির কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

শৈশবের বাংলাদেশ, গ্রাম-গঞ্জ, নদী-নালা, খাল-বিল, মাঠ-খেত, গাছ-গাছালি, মানুষজন সবই প্রাণিত করেছে তাঁকে। সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে শুধু কেন এলিট সোসাইটি? কেন নিম্নমধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত নয়? এই প্রশ্নে তিনি বারবার পালটে ফেলতে চেয়েছেন তথাকথিত সাহিত্যচর্চাকে? তিনি লিখেছেন 'হাড়ি-মুচি-ডোম', 'কাঠ-খড়-কেরোসিন', 'সারেং খালাসি', 'মুচি-বায়েন'। পরম আদরে অবাঞ্ছিতদের কথা লিখেই তিনি আনন্দ পেতেন। এরাই তাঁর গল্প উপন্যাসের প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে ছিল দেবতুল্য, "ধ্যানে সে মূর্তি ধারণ করলে দেহ মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সংসারে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র ব্যতিক্রম, যাঁর কাছে তোমার কল্পনায় পরাস্ত হবে, তাঁর সঙ্গে ক্ষণকালের পরিচয়ই একটি অনন্তকালের ঘটনা।"[৩] কিন্তু কাব্য-কবিতায়, গল্প-উপন্যাসে প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করার বাসনা নিয়ে একদল যুবার শিকল ভাঙার ডাক শোনা গেল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই। সেই শিকলটি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, এক মহত্তম শিল্পী। বাইরে থেকে সহজ মনে হলেও ভিতর থেকে অপতিরোধ্য। তাঁকে অতিক্রম, অবজ্ঞা করা দুসাধ্য, তবু একপ্রকার চেষ্টা উন্মত্ত-যৌবনের। 'বন্ধন যন্ত্রণা থেকে বন্ধনমুক্তি'র প্রয়াস। পুরাতন মূল্যবোধের অবসানে নতুন জীবন প্রত্যয়ের স্বপ্নে বিভোর। যাঁদের উচ্ছ্বাস প্রকাশের অন্যতম প্রতিষ্ঠান কল্লোল (১৯২৩), কালি কলম (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৮)।

যাদের সহোদর 'উত্তরা'-'আত্মশক্তি'-'ধূপছায়া'-'সংহতি'। কেন্দ্রবিন্দুতে 'কল্লোল' তথা কল্লোল গোষ্ঠী। বুদ্ধদেব বসুর কথায়, "যাকে কল্লোল যুগ বলা বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সেই বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"[৪] সেকালের অনেকের মতেই রবীন্দ্রসাহিত্যে সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত জীবনের স্বাদ অনুপস্থিত। দরিদ্রের ক্রন্দনধ্বনি যেমন নেই, তেমনি নেই মানুষের রক্তমাংসের শরীরটার যৌন আবেদন। এই অভাব পূরণের লক্ষ্যেই আধুনিকতার ডাক উঠেছিল। দুচোখে নতুন কিছু করার স্বপ্নে বিহ্বল একদল তরুণ দ্বিধা-সংশয়-নাস্তিক্যবোধ আর বিদ্রোহের আগুনে জ্বলে উঠতে চেয়েছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল প্রগতিশীল বলে কিছু হয় না, সমকালকে উপেক্ষার ছল মহাকাল। মহাকালের ডাক শোনার ইচ্ছা বা অবসর কোনটাই তাঁদের ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মানুষের জীবন বেদনাকে সাহিত্যের পাতায় রক্তের অক্ষরে লিখে রাখতে চাইলেন কল্লোলের কাণ্ডারীরা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁদেরই একজন। নিত্য দারিদ্রের অতিবাহিত জীবনে নীতি ও নীতিহীনতার ভাবনা বড়ই একপেশে, সেকালের ধারণা মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। মহৎ সাহিত্য রচনা করা জীবনের লক্ষ্য ছিল না, বিত্তহারা অভাবী মানুষের প্রতি সহানুভূতি থেকেই একপ্রকার পক্ষপাতিত্বমূলক জীবনকে আলোকিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পুঁজিবাদী শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে অভাবগ্রস্ত মানুষের কণ্ঠস্বরকেই গল্পে বাঙময় করে তুলতে তিনি কলম হাতে পথে নেমেছিলেন।

'বেদে' উপন্যাসের মতোই ছোটগল্প 'দুইবার রাজা' তাঁর শ্রেষ্ঠ লেখা। লেখনি শক্তির নিঃসংশয় প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ 'লালসার অসংযম', 'দারিদ্রের আস্ফালন' থেকে মুক্ত এক নতুন জীবন অভিজ্ঞান। বিষণ্ণতার কোমায় চলে যাওয়া হতভাগ্য যুবকের পরাজয়ের গ্লানি আর স্বপ্ন থেকে স্বপ্নভঙ্গের স্নিগ্ধ করুণ ফল্গুস্রোত বয়ে চলে গল্পের অন্দরে। একই সঙ্গে গল্পটি রোমান্টিক কবি মনের বহিঃপ্রকাশ, আত্মকথার সুর মেশানো। লেখকের মতো গল্পের নায়ক অমরও দরিদ্র্য আর হাঁপানির সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে। ঝুলো-ঝালা নোংরা দাঁত বের করা খোলার ঘরে তাঁদের মা-বেটার মাথা গোঁজার ঠাঁই। মায়ের শেষ গয়নাটুকু বন্দক দিয়ে অমর কলেজের মুখ দেখলেও শেষপর্যন্ত সফল হয় না। চরম কষ্টের দিনেও মায়ের ঠাকুর ভক্তি দেখে ছেলে ঠাট্টা করে 'তোমার সেই ঠাকুর উড়ে ঠাকুরের মতোই বাজে রাঁধুনে, মা। হয় খালি ঝাল, নয় খালি নুন। পরিবেশন করতে পর্য্যন্ত ভালো শেখেনি।"[৪] দু'টো পেট ঠিক মতো চলে না তারপরেও অন্যের দায়িত্ব কাঁধে নিতে তার মন ছটফট করে। মানে বিয়ে করার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করে গল্পে নায়ক। অনেক কষ্টে একটা টিউশন জোগাড় হলেও ছাত্রের কবি মনের প্রশ্রয় দিতে গিয়ে সেটাও 'বিশ বাঁও জলে'। কিন্তু এরপরেই তাঁর অন্ধকার ভাগ্যরেখার উপর একটুকরো আলোর ঝলকানি পড়ে। প্রজাপতির ঋষির আশীর্বাদে দু'বছরের পড়ার খরচ আর নগদ একহাজার টাকা বরপণে ধনীর দুলালী, যমেরও অরুচি অরক্ষণীয়ার সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। আর আয়োজনও কম নয়! অমরের মনে হয়েছে হোক কালো, কুৎসিত বউ তবু, বিয়ে তো! সাতবার নয় একবার হবে, রাজার মতোই হওয়া চায়।

"রাজা কেন নয়? সবাইর চেয়ে উঁচু জায়গায় আসন, সামিয়ানা খাটানো, তাতে তিনটে ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে, ফুলদানিতে বিস্তর ফুল, গলায় প্রকাণ্ড মালা, গায়ে সিল্কের দামি জাম, জীবনে এই প্রথম পরেছে, পায়ে চৌদ্দ টাকা দামের জুতো, দু-মাস টিউশানি করে' যা জোটেনি।"[৫]

জীবনে আরেকবার রাজা হওয়ার সুযোগ পেল সে যেদিন সবার কাঁধে চড়ে শ্মানের পথে গেল। সেদিনের সূর্যাস্তটা হয়তো তারই জন্য মলিন ছিল, বন্ধুর বোন লুসির চোখের কোনে অশ্রু আসলে তার প্রতি নীরব ভালোবাসার প্রতিমূর্তি। দারিদ্র্য-ব্যাধি-মৃত্যুর পদাঘাতে অমরের কাহিনি অমরত্ব লাভ করে। সে বাঁচতে চেয়েছিল, একবুক হাঁপানি নিয়ে নয় ভালোবাসার ফানুস উড়িয়ে। যেভাবে আর পাঁচটা তরুণ স্বপ্ন দেখে ইচ্ছাডানার উড়ানের! কিন্তু সুদিন আর এল না, "বসন্ত যদি এলেই মহামারী নিয়ে এল চৈত্রের চোখ ভরে রৌদ্রের রোদন।"[৬]

কঠিন বাস্তবতাকে আরও কঠিন করে প্রকাশ করেছেন লেখক। এক্ষেত্রে তাঁর কবি মনের আশ্রয় পাইনি। 'ন যযৌ ন তস্থৌ' বি.এ পাশ করা বেকার ছেলে ও তার মায়ের গল্প। চরম অভাব অনটনের সংসারে ছেলে চাকরির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। অকস্মাৎ টেলিগ্রামে তাঁর চাকরির খবর আসে-দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্টবোর্ডে কেরাণীর চাকরি, শুরুতেই পঞ্চাশ টাকা বছরে দু'টাকা করে ইনক্রিমেন্ট। শেষপর্যন্ত চুয়াত্তর টাকায় দাঁড়াবে। কিন্তু মাইনে যা হোক অভাবী মায়ের কাছে ছেলের চাকরিটাই বড় কথা। আনন্দের কথা। ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপনের নীড় হবে, টুকটুকে রাজলক্ষ্মী বউ আসবে। আর কি চায়! ছেলে চাকরিতে সঙ্গে সঙ্গে যোগদান করতে চায়। টেলিগ্রাম সকালে এসেছে, রাত্রির ট্রেনে তাকে রওনা দিতে হবে। মায়ের দুর্ভাবনাকে সত্য করে খোকার ট্রেন মিশ হল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বাড়ি ফিরে এল খোকা। বৃষ্টিতে জাম-কাপড় ভিজে গেছে মায়ের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। মা শুধু বলে যাচ্ছে, "আর কোনো ট্রেন অন্য রাস্তা দিয়ে আজই যাওয়া যায় না?"৭ মাতৃ-মনস্তত্ত্বের সত্য দর্শন। অভাবী মায়ের কাছে পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় নয়, বিত্ত প্রিয়। যে সন্তানের রোজগার নেই, চাকরি নেই সংসারে তার কোনও দাম নেই। অপত্যস্নেহের বিরুদ্ধে গিয়ে বাস্তবে রূঢ় আঘাতে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করেছেন গল্পকার।

'সাহেবের মা' লেখককে পরিণত শিল্পবোধে এবং সুতীব্র জীবন চেতনায় উন্নীত করে। গল্পের চমকিত আভাস, সাহেবের মার আসলে সাহেব নামে কোন ছেলে নেই। হতভাগিনীর তিন ছেলে দুর্ভিক্ষের নিদারুণ খাদ্যাভাবে বলি হয়েছে। নিরাশ্রয় বৃদ্ধা, ভিক্ষা করেই খেত। দেশকর্মী অমূল্যের দয়াতে তার আশ্রয় হয় দোমজলা গ্রামে। কিন্তু বৃদ্ধার এইরূপ নামকরণের পিছনেও একটা গল্প আছে, সরলপ্রাণ চাষা বাপ মেয়ে জন্মানোর পরেই হয়তো ভেবে ছিল সন্তান তার জীবনের সৌভাগ্য নিয়ে আসবে! নাতি হবে লাটসাহেব। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস! সে নাম ঠাট্টাতে পরিণত হল। বৃদ্ধার জীবননাট্যের চূড়ান্ত দৃশ্যে আর এক প্রহসন। ডুমুরতলা উন্নয়ণ—প্রকল্প পরিদর্শনে আসে মহকুমার শাসক জীবেশবাবু। চারিদিকে বুড়িকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা, 'সাহেব এসেছে, সাহেব এসেছে'। বুড়ির ছেলে এসেছে। আধপাগলি বুড়িও মনে

মনে তার ছেলেদের কথা ভেবেছে। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর জীবেশবাবুর ক্ষুধার্থ মুখে কাগজের ঠোঙায় চিনির বাতাসা এগিয়ে দিয়েছে বুড়ি। যেভাবে বুড়ি নিজের পেটের সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দিত, ঠিক সেই ভাবেই। কর্তব্যবশত জীবেশবাবুও বুড়িকে নিয়ে গেল তাদের বাড়িতে। এখানেই ঘটে গেল গল্পের ভাবমোক্ষণ। জীবেশবাবুর মাকে দেখে দগ্ধ শোক এসে বিঁধল বুড়ির বুকে। সাহেবের মা বুঝতে পারল, বালির উপরে রোদ্দুরে তার জল ভ্রম হয়েছে। জীবেশ কখনো বুড়ির ছেলে হতে পারবে না কারণ তার নিজের মা আছে। যুগের আবহে অন্য এক জীবন দর্শনে, দরিদ্র জননীর মাতৃত্বের অন্য এক অভিজ্ঞানে পাঠকের মন তৃপ্তি খুঁজে নিল।

'অরণ্য' একটি একান্নবর্তী পরিবারের গল্প। অরণ্য যেমন ছোট-বড় নানা ধরণের গাছেদের সমাহার একটি পরিবারও, তেমন বাবা-মা-দাদা-দিদি-কাকা-কাকিমাদের বেষ্ঠিত বলয়। একান্ন পাতের সংসারের প্রত্যেকের চাওয়া-পাওয়াগুলো ভিন্ন প্রকৃতির। প্রত্যেকের আত্ম-চিন্তন স্বতন্ত্র। বিত্তবান তিন ভাইয়ের তিন-তলা বাড়ি। একটাই হাঁড়ি। সুখ-দুঃখে ভাগ হয়নি। বাইরের থেকে বিলাসের প্রাচুর্য্য দেখে তাদের অপ্রাপ্তিকে ছোঁয়া যায় না। কিন্তু যৌথ পরিবারের বাইরে এরা প্রত্যেকেই একা। এক ছাদের তলায় মনের ভিন্ন ছাদ। তাদের একাকিত্বগুলো ভীষণ একা একা! নিঃসঙ্গতার কত বৈচিত্র্য! অন্দরমহলের প্রতিটি কোণে অভিমান মাথা কুটে মরে। প্রত্যের মধ্যেই আছে লক্ষ্যকে ছুঁতে না পাওয়ার গ্লানি। ঠিক যেন অরণ্যের মতোই একই ছায়াতলে থেকেও একে অপরের থেকে আলাদা। কোন আত্মিক যোগ নেই। ভ্রমরের বিয়ে হয়েছে, তবু সে পূর্ব প্রণয়ের চিন্তায় বিভোর। হেনা তার কল্পিত প্রেমের কাব্যজাল বুনতে বুনতে ক্লান্ত। বড়ো ভাই সুধাংশুর আইন পড়ার ব্যার্থ পরিহাস! কেউ বা বাংলা কাব্যমন্দিরে ওমর-খৈয়ম হয়ে উঠতে চেয়েছে! 'সর্বঘাটের কাঁঠালিকলা' সুবল খেলাধূলা থেকে শিল্পবিনোদন সবেতেই সমান আগ্রহ কিন্তু কোনো কিছুতেই সফল হতে পারছে না। এইরূপ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নর-নারীর সংসারে একমাত্র স্নেহের বাঁধন বলতে রুশো। সেই রুশো একদিন উড়ন্ত ঘড়ি ধরতে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল বাড়ির উঠোনে। আকস্মিক শোকের আঘাত নেমে এল সকলের মনে। গল্পের শেষটা নিরাশার অন্ধকারে, আশাহীনতার মরীচিকার মতোই ব্যর্থতার কালো মেঘে ঢাকা।

'তিরশ্চ' একটি ব্যর্থ প্রেমের গল্প। পূর্ণ প্রেমের অভিলাষ নয়, অপূর্ণতার স্বাদে গল্পের নায়িকা সুমিতার সুখ। শুধু প্রিয় মিলনের বাসকসজ্জা রচনা করেই হয়ত সে আজীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল। মিলনের সুখ যেন তার কাছে ব্যথা নিয়ে আসে, বেদনার অভিঘাত তৈরি করে। কালো কুৎসিত মেয়ে সুমিতার জন্য যখন মোটা মাইনের উচ্চশিক্ষিত পাত্র ঠিক করা হল তখন বিয়েটা তার কাছে বিপদ বলেই মনে হল। পাত্রকে চিঠিতে জানলো,

"আপনি আমাকে মুক্তি দিন, এই বিপদ থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। বিয়ে করে নয়, বিয়ে না করে।

আমার এই অসহায় প্রেমকে আপনি মার্জনা করুন। একজন বন্দিনী বাঙালী মেয়ে আপনার কাছে তার প্রেমের পরমায়ু ভিক্ষা করছে।"[৮]

পাত্রটি সে কথা শুনে এবং বিয়েতে মত দেয় না। কিন্তু অদৃষ্টের কী পরিহাস! মাত্র তিন বছর পরে সেই যুবকের সঙ্গে সুমিতার মুখোমুখি আবার দেখা। সেরাস্তাদার অধীনস্ত কেরানি স্বামী পশুপতি চুরির অপরাধে ধরা পড়েছে, সেই স্বামীকে মুক্ত করার জন্যই হাকিমের কাছে আসা। প্রিয় মিলনের প্রতিক্ষায় আজ সুমিতা ব্যর্থ। পশুপতি তাকে ঠকিয়েছে। টাকার লোভে তাকে বিয়ে করেছে। এখন যে হাকিমের কাছে পরিত্রাণের আশায় এসেছে সে আর কেউ নয়, পূর্বের পরিণয়পার্থী। সে আজ সুমিতার বিপর্যয়ে এতটুকু বিচলিত নয়। হওয়ার কথাও নয়। আসল কথা হল, প্রেম ভালোবাসা সাময়িক চাওয়া-পাওয়াতেই আবদ্ধ। আশাভঙ্গের এক বেদনারস্রোত, শুধু পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে আসে গল্পের শেষে পাঠকের মনে।

মন্বন্তরের নিদারুণ চিত্রটি ধরা পড়েছে 'বস্ত্র' গল্পে। খাবারের অভাবের মতই কাপড়ের অভাবও মানুষের জীবনসংকটকে প্রবল করে তোলে। বুড়ো ছাদেম ফকিরের সংসারে স্ত্রী আর তার বিধবা পুত্রবধূ। বস্ত্রাভাবে সভ্যসমাজের সম্মুখীন হওয়া যায় না বলেই তার জীবিকার উৎস বন্ধ হল। অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে জর্জরিত তার কোমরের নিচে একহাত অবধি একটা ন্যাকড়ার ঘের ছিল। সেটি আস্তে আস্তে নেংটিতে পরিণত হয়। তারপর ভদ্রসমাজে বসবাসের অযোগ্য হয়ে একেবারে তন্তুহীন ছাদেম ফকির অন্ধকারে ভূতের মত শ্মশানে শ্মশানে কাপড় খুঁজে ফেরে, যদি মেলে ন্যাকড়ার ফালি, চটের টুকরো, কিংবা বালিশের খোল। অবশেষে দিগম্বর অবস্থায় একদিন শ্মশান পথের অন্ধকারে ধরা পড়ে তার ভাগ্যে জোটে একখানা নতুন কাপড়। কিন্তু এই একটিমাত্র নতুন কাপড় দিয়ে সে কার লজ্জা নিবারিত করবে? নিজের, বৌ-এর, না ছেলের বৌ এর? তাই তাদের লজ্জা বাঁচিয়ে, নিজে লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য নতুন কাপড়খানি গলায় জড়িয়ে আমের ডালে ঝুলে আত্মহত্যা করে। গল্পকার সেই নিদারুণ চিত্রটির বর্ণনা করেছেন,

"তখনও গাছপালা একেবারে ঝাপসা হয়ে আসেনি। দেখলুম একটা সাধারণ আমগাছ। তারই একটা ডালে কি একটা ঝুলছে। সন্দেহ কি, আমাদের ছাদেম ফকির।

তেমনি নিঃস্ব, তেমনি নগ্ন, তেমনি নিরবকাশ।

... নতুন দক্ষিণের বাতাসে রোল ধরা ডালগুলো কাঁপছে মৃদু-মৃদু।

মনে হল আমাকে সে সেলাম করছে। যেন বলছে আমার তুমি মান বাঁচালে বাবু। উলঙ্গতা আর দেখতে হল না নিজেকে।"[৯]

ছাদেমের এই লজ্জার আত্মহত্যায় শোকে বিলাপ করবার মতও বিহ্বল কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। না তার স্ত্রী, না তার পুত্রবধূ। পাওয়া যাবেই বা কি করে? মানুষের সমাজে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে বেরুবার উপায় নেই, কাঁদবারও উপায় নেই। পরিশেষে ছাদেমকে লাশখানায় নিয়ে যাবার পর তার গলা থেকে কাপড়খানি খুলে শাশুড়ি-বৌ দুজন পরবার পর প্রকাশ্যে

কাঁদবার ও শোক প্রকাশের সুযোগ পায়। মানুষের হাতে মনুষ্যত্ব কিভাবে বিবস্ত্র ও বেআব্রু হয়ে লজ্জায় আর অপমানে রুদ্ধকণ্ঠ হয় তারই ভাষারূপ এই 'বস্ত্র' গল্পটি। দারিদ্র্য যে মানুষকে শুধু অন্নে নয়, পরিচ্ছদেও রিক্ত করে দেয় সে বিষয়টিই এখানে অসাধারণ ভাষাশিল্পের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

জীবিকার সংকট মানুষের যাপনক্রিয়াকে নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতম করে তোলে। আপত্যস্নেহ, প্রেম কোথায় যেন উবে যায়। 'বাঁশবাজি' তেমনই একটি গল্প। বাঁশের ডগায় ছোট্ট সন্তানকে তুলে দিয়ে এক মরণ খেলা দেখানো হয় গ্রামের পথে পথে। নিচে থেকে বাঁশ ধরে থাকে বড়োরা। বুড়ো মন্তাজ ও তার ছোট বাচ্চাদের এটাই একমাত্র জীবিকা। দু'মুঠো অন্নের জোগাড় হয় এই খেলা দেখিয়ে। কিন্তু অনাহারজীর্ণ বৃদ্ধদেহে সব সময় টাল সামলাতে পারে না। বাঁশের ডগায় উঠে খেলা দেখাতে গিয়ে এক ছেলে ছিটকে পড়ে মাটিতে। এবার ছোটটা সম্বল। বড়টি মারা যাবার পর ছোটটি ভাবে এবার তার পালা। নিঃসহায় শিশুকণ্ঠের ভীত আর্তনাদ, "এবার আমার পালা। এবার আমার পালা। আমি নিঘাত পড়ে যাব, মরে যাবো আমি।—"[১০]

এই প্রতিকারহীন কাকুতী থেকে আল্লাও রক্ষা করতে পারে না তাকে। মন্তাজ একেবারে নির্বাক। নিষ্ঠুর। নির্লিপ্ত। বুকের উপর পাথর চাপিয়ে রেখেছে। ছেলের কান্নার উত্তরে টু-শব্দটিও করে না। করেই বা লাভ কি! তাকে তো খেয়ে বাঁচতে হবে। দারিদ্র্য জীবিকান্বেষী মানুষকে হৃদয়হীন অমানুষিকতার ক্ষেত্রে কোথায় নামিয়ে নিয়ে গেছে, এ গল্প তারই নির্মমতম উদাহরণ।

'ধন্বন্তরি' গল্পের পটভূমিতে রয়েছে গল্পের অঢেল বিত্ত ও স্বাস্থ্যসম্পদে পরিপূর্ণ ডাক্তার আর বিষহীন, সম্বলহীন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত রোগী। ডাক্তার টগবগে তরুণ, শ্বশুর মশায়ের টাকাতেই ডিসপেনসারি, ল্যাবরেটরি, গাড়ি, বাড়ি সবকিছু। স্বচ্ছকান্তি অভিনবযৌবনা অভিমানিনী স্ত্রী। অপর প্রান্তে রোগী নিম্নবিত্ত কেরানি। তার সংসারে তিনজন মানুষ, স্বামী, স্ত্রী ও তাদের প্রেম-কামনা- ব্যর্থতার প্রতিনিধি একটি অবুঝ শিশু। বাসর রাত্রির প্রেম-বিহ্বল স্বপ্নমদিরতায় স্ত্রীর নাম নিয়েছিল শিপ্রা। অসুস্থ শিশুর যথাযোগ্য সেবা নিশ্চিত করতে অপারগ বলে সেই স্ত্রী অনুযোগ করেছে- "ছেলেকে পথ্য দিতে পারবে না তবে বিয়ে করেছিলে কেন?" শেষপর্যন্ত নিজের চিকিৎসার যৎসামান্য টাকা ছেলের অসুখে নিঃশেষিত করেও তাকে বাঁচানো গেল না। অবশেষে রিক্তহস্তে জীবনযুদ্ধে পরাজিত রোগী হাজির হল ডাক্তারের কাছে। অন্তিম ভিক্ষা তার। বেঁচে থাকার জন্যে নয়, মরবার জন্যে এমন একটা ওযুধ চাই, যা সন্ধ্যাবেলা খেয়ে শুলে সকালবেলা আর ঘুম থেকে উঠতে হয় না। কত দুঃখে এই মৃত্যুকামনা। কিন্তু কতটুকুই বা তারা প্রত্যাশা করে? শুধু রক্ত-মাংসের জীবনটাতে টিকে থাকার জন্য শুধু বুকভরে নিঃশ্বাস নেবার সহজ ও সাধারণ আনন্দটুকুই তো তাদের একমাত্র প্রার্থনা। মায়ামমতাহীন ডাক্তারের হঠাৎ বোধোদয় ঘটল। ল্যাবরেটরিতে বসে তার কেবলই মনে হতে থাকে, দু'খানি ব্যাধিজীর্ণ দুর্বল হাত তার দিকে কে প্রসারিত করে দিয়েছে, ঘোলাটে দুই চোখে

কি বিবর্ণ বেদনা, তাকে বলছে, "আপনার কাছে আমি আমার জীবন ভিক্ষা করছি। আপনি বিধাতার চেয়েও বড়'!

সংসারের কত অল্পই চাই আমরা, শুধু টিকে থাকার,"[১১]

বিবেকবোধে তাড়িত ডাক্তার ভোগবিলাসের বিহ্বলতা অতিক্রম করে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সে ব্যাধিগ্রস্তকে প্রাণবন্ত করে তোলার সাধনা গ্রহণ করে। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে রোগী জীবনের সীমারেখায় ইতি টানে। এ গল্পে স্বাস্থ্যসম্পদ আর বিত্তের বৈপরীত্যে জীবন বিধ্বংসী ব্যাধি আর দারিদ্র্যের নগ্ন ও বীভৎসতার চিত্রটি লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে ডাক্তারের মানসপটের পরিবর্তন এবং তার অন্তিম ব্যর্থতাবোধই গল্পের মুখ্য উপজীব্য।

'দাঙ্গা' গল্পের মূল প্রেক্ষাপট আমেদপুর আর ধুলেশ্বর গ্রামের বাঁশের সাঁকো। সেখানে এসে মিলিত হয় দুই গ্রামের ছেলে মেয়েরা। জিন্নাত আর মকবুলের মেয়ে মমিনা। প্রেম হয়, ভালোবাসা হয় তাদের। মমিনা জিন্নাত পরস্পরকে ভালোবাসলেও চেতনাকে রাঙাতে পারেনি। ঘর বাঁধার স্বপ্নে বিভোর মমিনা দাঙ্গা কোলাহলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। দু'জনের বিয়ে হলেই বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো আবার শক্ত কাঠের পোল হয়ে উঠবে। দুই গ্রামের বিরোধের মিলন সেতু নির্মিত হবে। কিন্তু মমিনার আশা আকাঙ্ক্ষা কিংবা চিন্তা ভাবনার সাথে জিন্নাতের মানসিকতার বৈপরীত্যে লক্ষ্য করা যায়। মকবুলের দলের কাছে গফুরালির দল হেরে গেল, জিন্নাত হল বন্দী। রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি মমিনা গেল প্রেমিকের কাছে, পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিল। দুজনেই নিজেদের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বিয়ে করবে, কাজির কাছে রেজেস্ট্রি করবে। জিন্নাত তাতে সম্মতি দিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পবিত্র প্রেমকে ছাপিয়ে গেল জিন্নাতের মনের গোষ্ঠী চেতনা। একটা মেয়ের জন্য সে কী করে দলগত সম্ভ্রমকে নষ্ট করবে? হাতের উপর হাতটা নিজে থেকে সরে গেল। পালিয়ে গেল জিন্নাত। মমিনার মত মহৎ নারীর হৃদয়ের অনুভূতি হার মানল। জিন্নাত মমিনার ভালবাসাকে অবহেলাভরে মর্গে পাঠিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করল না। ঝগড়া ফ্যাসাদের মাঝে চাপা পড়ে রইল নারীর ভালোবাসার রঙমহল,

"ভাঙা চাঁদ ডুবে গেল পশ্চিমে। মমিনা তাড়াতাড়ি চলে এসে তার ছাড়া বিছানায় শুয়ে পড়ল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে নদীর আভাস দেখা যায় ঝাপসা ঝাপসা। অন্ধকারে আঁধার মাণিকের দিকে চেয়ে থেকে ভাবতে লাগল, জিন্নাতের দু'হাতে হঠাৎ এত জোর এল কি করে?"[১২]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্পগুলো পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যায়, সেখানে রয়েছে জীবনবোধের শূন্যতা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, রোমান্টিক প্রণয়াবেগ, অবচেতন মনের যৌবনাবেগ, প্রেমের মধ্যেই পরম মুক্তির স্বাদ। সমাজের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বা ব্রাত্যসমাজের চরিত্রের মধ্যেও তিনি এই একই সুরের ধ্বনিব্যঞ্জনা শুনতে পেয়েছেন। প্রত্যেকটি গল্প অভিজ্ঞতার উষ্ণস্পর্শে জারিত। জীবনকে সাহিত্যের আয়নাতে তুলে ধরতে গিয়ে যদি তাঁর গভীরতাকে স্পর্শ করতে না পারে তাহলে দিনবদলের লেখালেখির কি লাভ? অচিন্ত্যকুমার আসলে ছেঁড়া-ফাটা বাস্তবের উপর দাঁড়িয়ে মানব চেতনার দীপ্তির উদ্ভাসন ঘটাতে চেয়েছিলেন।

শুধু অপমান আর অবক্ষয় নয়, সেখান থেকে মানুষের উত্তরণের দৃষ্টিভঙ্গিও তাঁর গল্পের অভিমুখ। তিনি হয়তো ছোটগল্পের সব বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখতে পারেননি কিন্তু যা পেরেছিলেন তা হল গল্পকে সংযত আবেগে যুক্তিপ্রবণ ও নিরীক্ষাপ্রবণ করে তুলতে। বিষয় বৈচিত্র্য, প্লট বিন্যাস, রচনারীতির মিথোস্ক্রিয়ায় তাঁর গল্প জীবনবোধের পরিক্রমায় সফল। তিনি মূলত কবি, গদ্যলেখার ক্ষেত্রেও তাঁর কবিমনের আশ্রয় পাওয়াটা স্বাভাবিক। যে কারণে কাব্যধর্মীতা তাঁর গল্পের অন্যতম গুণ। প্রকৃতির রূপ অঙ্কনে, মানব মনের ঘাত-প্রতিঘাত, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গীতিকাব্যের সুর ঝংকৃত হয়েছে। ফলে তাঁর ছোটগল্প একদিকে বাস্তব অভিমুখী অপরদিকে শিল্প আবেদনময়। সর্বশেষকথা হল পাঠক। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্পের শিল্পসৌধ সেই পাঠকের অনুভূতির স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে নিতে পেরেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'আবিষ্কার', শতবার্ষিকী সংকলন, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪১০, পৃ. ২৬৪
২। 'অচিন্ত্যকুমারের ছোট গল্প', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সংখ্যা', উজাগর পত্রিকা, সম্পাদক- উত্তম পুরকাইত, অষ্টাদশ বর্ষ, ১৯২৯ পৃ. ৯৯, ১০০
৩। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোলযুগ', এম.সি সরকার এণ্ড সন্স, বৈশাখ ১৩৭২, পৃ. ১২৯
৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'দুইবার রাজা', অচিন্তকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্প, সম্পাদনা-জগদীশ ভট্টাচার্য, বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা ১২, প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃ.৩
৫। তদেব, পৃ. ১
৬। তদেব, পৃ. ১৯
৭। 'ন যযৌ ন তস্থৌ', পৃ. ১৪৫
৮। 'তিরশ্চী' পৃ. ১২৩
৯। 'বস্ত্র', পৃ. ১৫৬, ১৫৭
১০। 'বাঁশবাজি', পৃ. ২৩৭
১১। 'ধন্বন্তরি', পৃ. ৫৯,৬০
১২। 'দাঙ্গা', পৃ. ২৭৬

কল্লোল-কুল মানিক

নী লা ঞ্জ না ঘো ষ গু প্ত

"লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে সব কথা জানানো যায় না সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি।"

বাংলা কথাসাহিত্যের জন্ম বঙ্কিমচন্দ্রের করকমলে, আর তারপর রবীন্দ্রনাথ, শরতচন্দ্রের সুবর্ণ সময় পার হয়ে এলো বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ীর সাম্রাজ্যকাল। এর পর আরো বহু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আগমন ঘটেছে এবং ঘটবে বাংলা গল্প-উপন্যাসের ভুবনে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম, বাংলা কথাসাহিত্যে 'রিয়ালিজম' বা বাস্তববাদী রচনার সূচনা ঘটালেন—এমনটাই মনে করেছেন সরোজমোহন মিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে বাংলা উপন্যাসের জন্ম— একথা যেমন সত্য, তেমনি মানতে হবে বঙ্কিমি চরিত্ররা প্রায় সকলেই কিছুটা 'larger than life' হওয়া ছাড়াও, লেখকের নৈতিক ভাবনা ও জীবনচেতনাই তাদের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গীকে নির্মাণ ও পুষ্ট করেছে। রাবীন্দ্রিক উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা আবার আমজনতার ধরাছোঁয়ার বাইরে, 'সুশিক্ষিত, সংবেদনশীল ও মননশীল' পাঠকসমাজের চেনা চরিত্র। শরৎচন্দ্রই প্রথম সাধারণ বাঙালি নারী-পুরুষের রোজকার চাওয়া-না চাওয়া, পাওয়া আর না পাওয়ার গল্প বললেন। উপরোক্ত তিনি "সেই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে" ভাষা দিলেন, অপমানিত আর অবহেলিত মানুষরাই তাঁর সাহিত্যে রাজার আসনে সসম্মানে অধিষ্ঠিত হলো। কিন্তু শরৎচন্দ্রের দরদিয়া কলমের উদ্দেশ্য ছিল চরিত্রগুলিকে, তাদের জীবনাচরণ আর বৃত্তিকে মর্যাদা দেওয়া, আপাত তুচ্ছ বা হীন জীবনযাপনে বাধ্য বা অভ্যস্ত মানুষগুলির অন্তমহিমার উদ্ভাস ঘটানো।

মানিক সাহিত্য কিন্তু গড়পড়তা মানবজীবনের কথা বলল, আর বলল, কোনো রাখঢাক না করে, মহিমা আরোপের কোনো চেষ্টা না করে। শরৎচন্দ্র, সেই বাঙালি জননী যিনি সর্বজননিন্দিত সন্তানের দোষভুল ঢেকেঢুকে, কেবল তার দুঃখ, দুর্দশা, অপ্রাপ্তির করুণ কাহিনী ছলছল চোখে শুনিয়ে শ্রোতা-পাঠকের সহানুভূতি আর সমবেদনা জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু মানিক প্রায় বিধাতাপুরুষের মতোই এক নির্মোহ স্রষ্টা, গল্প-উপন্যাসের চরিত্ররা যার সন্তানতুল্য নয় আদৌ ! মানিক প্রখর বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে জগত ও জীবনকে নিবিড়ভাবে দেখলেন, আত্মস্থ করলেন আর সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হলো সাহিত্যে। মানিক এই মাটির পৃথিবীর রক্তমাংসের প্রাণীদের সত্যিকারের বেঁচে থাকার বা বলা যায় টিকে থাকার লড়াই-এর গল্প বললেন। 'লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে যে সব কথা জানানো যায় না, সেই কথাগুলি..' লিখলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিজয়রথে সওয়ার হয়ে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বি এস সি পড়ুয়া, বছর কুড়ির তরুণটির বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে লেখা 'অতসীমামী' গল্প "বিচিত্রা" পত্রিকায় প্রকাশিত হলো, এবং মানিক সসম্মানে বৃত হলেন বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে, পাঠক এবং সমসাময়িক লেখক- সমালোচকদের দ্বারা। পরস্পর প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস-গল্পগুলির ধারাবাহিক উৎকর্ষ, অভিনবত্ব বিনা বাক্য ব্যয়ে প্রমাণ করলো এই লেখকের অত্যুচ্চ প্রতিভা ! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই একমেবাদ্বিতীয়ম লেখক যাঁর কোনও সাহিত্যিক প্রস্তুতি বা অনুশীলনের ইতিহাস নেই। যজ্ঞাগ্নি সম্ভব দ্রুপদসন্তানদের মতো প্রাপ্তবয়সী পরিণত মনস্কতা নিয়ে তার আগমন ঘটল।

বাংলা সাহিত্যের ছাত্র ও পাঠক হিসেবে পড়েছি, শুনেছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যদর্শনের বিবর্তনের বৃত্তান্ত, বস্তুবাদ থেকে মার্কবাদে লেখকের আস্থাস্থাপনের অনুকোটি চৌষট্টি। আমার মানিক সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা বলে তিনি বরাবরই মানুষের জীবনকথার উপস্থাপক। মানিক রচনায় মানুষের ব্যক্তিক বা সমষ্টিক জীবনের ভিতরবাহির উন্মোচিত হয়েছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষের মনোভাবই তাঁর একমাত্র বিবেচ্য বিষয়।

সালটা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ বা ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ। বাংলা ভাষাসাহিত্যে তখনও বহমান 'কল্লোলে'র বিদ্রোহী সৃষ্টির ধারা। এর এক বছর পর 'কল্লোল' পত্রিকার গতি রুদ্ধ হবে বটে কিন্তু যুগলক্ষণ বা কল্লোলীয়দের রচনাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা মানিকের মতোই কারও কারও সাহিত্য জীবনের শিকড়ের গোড়ায় স্থায়ী বাসা বাঁধবে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তাঁর 'কল্লোল যুগ' বইতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথমবার দেখার প্রসঙ্গে লিখেছেন, "প্রখর একটা ক্ষিপ্রতা তার চোখে মুখে, যেন বুদ্ধির সন্দীপ্তি।... ভঙ্গিতে এতটুকু কুণ্ঠা বা কাকুতি নেই।... যেন এলুম, লিখলুম আর জয় করলুম এমনি একটা দিব্য ভাব।' সময়টা কল্লোলের শেষ বছর, অচিন্ত্যকুমার তখন 'বিচিত্রা' য় চাকরি নিয়েছেন, সাব এডিটর, প্রুফ দেখার কাজ। অচিন্ত্যকুমার পড়লেন মানিকের প্রথম লেখা 'অতসীমামী', 'লেখাটা অদ্ভুত ভালো লাগল'। গল্প ছাপাও হলো বিচিত্রায়। অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, "মানিক কল্লোলের কুলবর্ধন, একমাত্র আধুনিক লেখক যিনি কল্লোল ডিঙিয়ে বিচিত্রায় চলে এলেন।"

মানিকের প্রথম লেখা গল্পটি প্রেমের গল্প, যেমন প্রেম দেখা যায় সংসারে, বাস্তবজগতে, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করলে- তেমন প্রেম। পূর্ববঙ্গের এক দম্পতির বাস্তব জীবনের নাটকীয় প্রেমের চরম অভিজ্ঞতার গল্প লিখলেন। ছাপা হলো, লেখকের সম্মানদক্ষিণাও মিলল, সঙ্গে সম্পাদকের দাবি আরো গল্পের। মানিকের নিজের কথায় "তারপর সব ওলোট পালোট হয়ে গেল। সব ছেড়ে দিয়ে আরম্ভ করলাম লেখা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগত প্রতিভায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁর মতে চিন্তার আশ্রয়

অভিজ্ঞতা। মানসিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের নেশা, লিখতে চাওয়ার উগ্রতা আর লিখতে শেখার একাগ্রতার উপর নির্ভর করে সাহিত্য সৃষ্টি। নিজস্ব জীবন উপলব্ধির ভাগ দেওয়ার তাগিদে মানিক লিখেছেন, তাই বিজ্ঞানীর নিরাসক্ত অথচ উৎসাহী দৃষ্টি দিয়ে জগত-জীবনকে যেমন দেখেছেন, বিশ্লেষণ করে যেমনটি বুঝেছেন তেমনটাই প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যে। অকপটে লেখক স্বীকার করেছেন নিজের অসম্পূর্ণতা আর ভ্রান্তির কথা। বলেছেন মানসিকতার বিবর্তনের বৃত্তান্তও। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি গুরুত্ব দিয়েছেন নিজেকে জানা আর নিজেকেও বিচার করবার সততাকে। মানিক সাহিত্যে প্রথমাবধি এসেছে আপাত ভদ্র-শিষ্ট-সুশীল সমাজ বহির্ভূত প্রান্তিক মানুষের দিনযাপনের অনাবৃত্ত ইতিহাস। মুখোশহীন এই জীবনকেই তিনি ছুঁতে চেয়েছিলেন, ভালবেসেছিলেন। পরে মার্কসবাদে দীক্ষা তাঁকে বোঝালো, জীবন ও সাহিত্যকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালবাসাই যথেষ্ট নয়! মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির পথও দেখাতে হবে!

সমাজবাস্তবতার একনিষ্ঠ চিত্রকর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা সমাজ মানুষের উন্নতি বিধানের প্রতি সাহিত্যের দায়বদ্ধতার মন্ত্রে দীক্ষিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর সৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনা বা বিশ্লেষণ এই লেখার উপজীব্য নয়। আমার অন্বিষ্ট "কল্লোল" পত্রিকা, গোষ্ঠী বা যুগ এর সঙ্গে মানিকের সম্পর্কের সমীকরণ এর প্রতি দৃষ্টিপাত। বাংলা সাহিত্যের নিষ্ঠ পাঠক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিক কাঠামো, সমকালীন সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে মতামত জানা যায় তাঁরই বিভিন্ন লেখালেখি থেকে, যেমন ১) ছেলেবেলা থেকেই তথাকথিত ভদ্র জীবন আর নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের অসামঞ্জস্য তাঁকে ভাবিত করেছিল, ২) ভদ্রজীবনের কৃত্রিমতার আবরণ তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল, ৩) সাহিত্যের 'ছাঁকা প্রেম' খুঁজে পেতেন না বাস্তব জীবনে, ৪) সাহিত্যে সতেজ বলিষ্ঠ সাধারণ বাস্তব জীবনের অভাব তাঁকে পীড়িত করতো;—কিন্তু এর বিপরীতে যে কল্লোলীয় "বাস্তববাদী আধুনিক সাহিত্য ধারার সোরগোলময় বিদ্রোহ তার মধ্যেও তিনি অসম্পূর্ণভাই দেখলেন। তীক্ষ্ণ মনন, বাস্তব চেতনা আর বিশ্লেষণ শক্তি দিয়ে উপলব্ধি করলেন কল্লোলিত বিপ্লবের অসারতা, অনুভব করলেন এই বস্তুবাদী সাহিত্য প্রেরণা নিছক উপরিতলের বিদ্রোহ; পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে ধার করা প্রাণহীন সৃষ্টি। "অসীম আগ্রহ নিয়ে আধুনিকদের লেখা পড়ে মানিকের প্রতীতি জন্মাল লেখক ও লেখ্য বিষয়ের সামাজিক বা শারীরিক দুরত্ব সৎ সাহিত্যের জন্ম দিতে পারে না। সচেতনভাবে যদি বস্তুবাদের আদর্শ গ্রহণ করতে হয় তবে ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে হবে, উপরোক্ত অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তার করতে হবে। বিদেশি সাহিত্য বা কোনো বিশেষ মতাদর্শ প্রভাবিত সাহিত্য ততক্ষণ বস্তুনিষ্ঠ সৎ সাহিত্য হয়ে ওঠে না যতক্ষণ না তাতে রচয়িতার নিজস্ব গভীর আস্থা, জীবনাচরণ আর অভিজ্ঞতার শিলমোহর পড়ে। কল্লোলের সাহিত্যচর্চা তাই পরপর সাজানো রুক্ষ নিষ্করুণ

জীবনের ছবিমাত্র। এ দুর্ভোগ, এ যন্ত্রণা, এ অবমাননা মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, নাগরিক কল্লোলীয় লেখকগোষ্ঠীর বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ মোটেই নয়, সারস্বত চর্চায় মগ্ন বাঙালি বুদ্ধিজীবি ঘাম-রক্ত দিয়ে সত্যকার খেটে খাওয়া গণদেবতার আঁতের কথা বুঝতে পারেনি, পারেনা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই 'কল্লোলভর আধুনিক' যথার্থ বাস্তববোধসম্পন্ন সেই স্রষ্টা, যিনি তাঁর সাহিত্যের চরিত্রদের সঙ্গ করেছেন, আগে দেখেছেন, বুঝেছেন, জেনেছেন তারপর এঁকেছেন। সমসাময়িক এবং মহারথী কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, মানিক সেই বিরল প্রজাতির লেখক যাঁর মন ও মননে সমাজ ও সাহিত্যের কোন ভেদরেখা নেই। মানিক সমকালের জনপ্রিয়তা প্রত্যাশা করেননি, গতানুগতিকতা ও প্রথানুসারিতা সচেতনভাবে পরিহার করে, সংস্কারমুক্ত সাহিত্য রচনা করলেন। মানিকসাহিত্য একান্তভাবে তাঁর চারিত্র্যের প্রতিফলন, ভানহীন এবং শিষ্ট সমাজ আচরণ বর্জিত। কল্লোল কুলোত্তর আধুনিক লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কল্লোলে'র পাতায় তাঁর কোনও লেখা প্রকাশিত হয়নি। তিনি যখন লেখা শুরু করেছেন তখন কল্লোলের বয়স পাঁচ। অথচ 'কল্লোলে'র যে ধারা—কুলবৈশিষ্ট্য সেই নবতর চেতনায় লালিত সারস্বত সৃষ্টি। এ কারণেই তিনি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র :

১. Manik Bandyopadhyay- Makers of Indian Literature/Sarojmohan Mitra/ Sahitya Akademi/ second edition 1982.

২. লেখকের কথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ,নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , ২য় সং ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭।

৩. কল্লোল যুগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত , এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড , অষ্টম সং শ্রাবণ ১৪০৫।

কল্লোলের সূচিপত্র : লেখা ও লেখক
প্রথম বর্ষ : ১৩৩০

ক. বৈশাখ : ১ম সংখ্যা : ১৩৩০

১. কল্লোল (কবিতা)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ২. বীণা (গল্প)—সুনীতি দেবী। ৩. মা (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৪. কল্লোল (কথিকা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ৫. রিক্তা (গল্প)—কেতকী দেবী। ৬. সংগ্রহ (সুভাষিত সংগ্রহ)। ৭. পুঁটেরাম (গল্প)—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ৮. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৯. ফুলের আকাশ (গল্প)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. ভাঙ্গাবাড়ী (গল্প)—অমলেন্দু সেনগুপ্ত। ১১. বিড়ালের স্বর্গ (অনুবাদ-গল্প)পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (মূল : Emile Zola)। ১২. বসন্তবিলাপ (কবিতা)—দীপঙ্কর (কালিদাস নাগ)।

খ. জ্যৈষ্ঠ : ২য় সংখ্যা : ১৩৩০

১. সৃষ্টি সুখের উল্লাসে (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ২. মন্দিরে (গল্প)—সুনীতি দেবী। ৩. বেনামী জিনিষ (গল্প)—নাম নেই। ৪. নারীর মন (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৫. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ ৬. অশ্রু (কথিকা)রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭. কাজের মানুষ (ব্যঙ্গরচনা)—দীনেশচন্দ্র দাশ। ৮. কবির মরণ (কথিকা)—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ৯. বিড়ালের স্বর্গ (অনুবাদ গল্প) — পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (মূল : Emile Zola)। ১০. স্বামী (গল্প)—ভবতারণ বসু। ১১. সংগ্রহ (সুভাষিত সংগ্রহ)। ১২. ললিতকুমার দে (পরিচয়লিপি)---সম্পাদক। ১৩. আলোচনা (পুস্তকাদির পরিচয়)—সম্পাদক। ১৪. লক্ষ্মীছাড়া (কবিতা)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৫. সমাচার।

গ. আষাঢ় : ৩য় সংখ্যা : ১৩৩০

১. কল্লোল (কবিতা)—জীবনময় রায়। ২. ফুলের গান (কথিকা)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৩. মায়াবিনী (গল্প)---রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪. দি টুয়েল্‌ভপাউন্ড লুক্ (অনুবাদ-নাটক)—মণীন্দ্রলাল বসু (মূল : J. M. Barrie)।* ৫. আমার সান্ধ্যসমিতি (রসরচনা)— বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ৬. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৭. বাজীমাৎ (গল্প)—সান্ত্বনা বসাক। ৮. শেষ অনুরোধ (গল্প)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৯. ধরা ছোঁয়া (কবিতা)—নরেন্দ্র দেব। ১০. সংগ্রহ (সুভাষিত সংগ্রহ)—সম্পাদক। ১১. আলোচনা (পত্রপরিচয় ও নাট্যালোচনা)—সম্পাদক ১২. ফিরিওলার গান (সঙ্গীত)---রচনা : চণ্ডীচরণ মিত্র; সুর ও স্বরলিপি---মোহিনী সেনগুপ্তা। ১৩. সমাচার—সম্পাদক।

Sir James Mathew Barrie (1860-1937)। The Twelve Pound Look প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১০ সালে। প্রকাশক।

ঘ. শ্রাবণ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৩০

১. অভিশাপ (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ২. পথ চাওয়া (গল্প)সুনীতি দেবী। ৩. ফুলের পূজা (কথিকা) —দীনেশরঞ্জন দাশ। ৪. স্নেহের ক্ষুধা (কথিকা) — নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ। ৫. দি টুয়েল্‌ভপাউন্ড লুক (অনুবাদ নাটক)—মণীন্দ্রলাল বসু (মূল : J. M. Barrie)। ৬. পথিক (উপন্যাস) — গোকুলচন্দ্র নাগ। ৭. নারীর মন (কথিকা)—লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়। ৮. জুতা-মাহাত্ম্য (রসরচনা)—অগ্নিশর্ম্মা। ৯. ঘাটের পথে (উপন্যাস)—হরিপদ বসু। ১০. বিদ্রোহ (কবিতা) — পুলকচন্দ্র সিংহ। ১১. সংগ্রহ (সুভাষিত সংগ্রহ)---সম্পাদক। ১২. আলোচনা (সাহিত্য-চিন্তা ও পত্রপরিচয়)—সম্পাদক। ১৩. সমাচার — সম্পাদক।

ঙ. ভাদ্র : ৫ম সংখ্যা : ১৩৩০

১. হেঁয়ালি (কবিতা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার।* ২. দয়িতা (কথিকা)—নাম নেই। ৩. ছিরে (গল্প)—সুশীলকুমার রায়। ৪. মা (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৫. কেশর (গল্প) — কৃষ্ণধন দে। ৬. ডায়েরীর একপাতা (কথিকা)—নীলিমা বসু। ৭. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৮. ঘাটের পথে (উপন্যাস)—হরিপদ বসু। ৯. ছুটির দিনে (কথিকা)---অনুপম গুপ্ত (দীনেশরঞ্জন দাশ)। ১০. সংগ্রহ (সুভাষিত সংগ্রহ)—সম্পাদক। ১১. জীবন (কবিতা)—দীপঙ্কর (কালিদাস নাগ)। ১২. আলোচনা (পত্রপরিচয় ও নানাচিন্তা)—সম্পাদক। ১৩. সমাচার সম্পাদক।

চ. আশ্বিন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ১৩৩০

১. আশান্বিতা (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ২. উপেক্ষিতা (কথিকা)—সুনীতি দেবী। ৩. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৪. বিদ্রোহীর ডায়েরী (কথিকা)—ভূপতি চৌধুরী। ৫. ঘাটের পথে (উপন্যাস)—হরিপদ বসু। ৬. ঝুমরু (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৭. মানসী (গল্প)—কৃষ্ণপদ দাস। ৮. গৌরী (গল্প)—অহল্যা গুপ্ত। ৯. গায়িকা (গল্প)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. প্রাচীর (কথিকা)—সোমনাথ সাহা। ১১. সুখের শেষ (গল্প)—রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২. সংগ্রহ সম্পাদক। ১৩. অগোচর (কবিতা)—গিরিজাকুমার বসু। ১৪. সমাচারসম্পাদক।

ছ. কার্তিক : ৭ম সংখ্যা : ১৩৩০

১. শিশু (কবিতা)—সুধীরকুমার চৌধুরী। ২. জয়-পরাজয় (কথিকা)—হরিহর চন্দ্র। ৩. সিদ্ধি (গল্প)—রামকানাই সামন্ত। ৪. আত্মদান (গল্প)—সুরুচিবালা রায়। ৫. চিঠি (কথিকা)—সমরেন্দ্রনাথ রায়। ৬. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৭. পারুল (গল্প)—সুকুমার ভাদুড়ী। ৮. নির্বাণের পথে (গল্প)—হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়। ৯. আঁধারের আশা (গল্প)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. ঘাটের পথে (উপন্যাস)—হরিপদ বসু।

১১. সংগ্রহ (সুভাষিত)—সম্পাদক। ১২. আলোচনা (নানাচিন্তা)—সম্পাদক। ১৩. সমাচার সম্পাদক।

জ. অগ্রহায়ণ : ৮ম সংখ্যা : ১৩৩০

১. শ্রাবণ-শেষে (কবিতা)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ২. বন্ধন (কথিকা)—শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ৩. শেষ বেলা (কথিকা)—মিনতি দেবী। ৪. যাত্রা-পথে (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৫. ছবি (কথিকা)—ইন্দুলেখা দেবী। ৬. সরাইখানা (গল্প)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৭. রক্তের বান (কথিকা)—অনিলকুমার ভট্টাচার্য। ৮. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৯. তুমি প্রাণে (কবিতা) ---বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ১০. ঘাটের পথে (উপন্যাস)—হরিপদ বসু। ১১. নারী (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ১২. মরমী (গান)—রচনা : নজরুল ইসলাম; সুর ও স্বরলিপি মোহিনী সেনগুপ্তা। ১৩. সংগ্রহ (সুভাষিত)—সম্পাদক। ১৪. সমাচার—সম্পাদক।

ঝ. পৌষ : ৯ম সংখ্যা : ১৩৩০

১. আলতা-স্মৃতি (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ২. ফিরে চাওয়া (কথিকা)— হরিহর চন্দ্র। ৩. তৃষিত (গল্প)—সান্ত্বনা বসাক। ৪. ব্যথা (গল্প) — প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত। ৫. গাঁয়ের মাটি (গল্প)— অনুপম গুপ্ত (দীনেশরঞ্জন দাশ)। ৬. পথের সাথী (কথিকা)—মুরলীধর বসু। ৭. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৮. চিরকুমার (কবিতা)—সুধীররঞ্জন রায়চৌধুরী। ৯. কল্যাণী (গল্প)—অহল্যা গুপ্ত। ১০. সংগ্রহসম্পাদক। ১১. আলোচনা (নানাচিন্তা)—সম্পাদক। ১২. মানুষ চাই (কবিতা)—বনফুল। ১৩. সমাচার—সম্পাদক।

ঞ. মাঘ : ১০ম সংখ্যা : ১৩৩০

১. ওঠ বীর (কবিতা)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ২. মরণ-বরণ (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৩. মনস্কামনেশ্বর (গল্প)—সীতাদেবী। ৪. অভিসার (কথিকা)— হিরণকুমার বসু। ৫. কালের গতিক (গল্প)—সুবোধ রায়। ৬. কাহিনী —(আরনল্ড বেনেট-এর পরিচয়) দীনেশরঞ্জন দাশ। ৭. বিচার (গল্প)—প্রিয়কুমার গোস্বামী। ৮. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৯. বড়দিন (গল্প)—সুকুমার ভাদুড়ী। ১০. মার্জনা (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ১১. সংগ্রহ —(সুভাষিতাবলী) সম্পাদক। ১২. আলোচনা —(পুস্তক ও পত্রপরিচয়সহ নানাচিন্তা) সম্পাদক। ১৩. চিঠি —(পাঠকের পত্র) ---মুকুন্দপ্রসাদ সিংহ। ১৪. প্রেম (কবিতা)---সুনীতি দেবী। ১৫. চিরন্তন (কথিকা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী। ১৬. সমাচার সম্পাদক।

---

* বিজয়চন্দ্র তাঁর শেষ জীবনে 'হেঁয়ালির কবি" অভিধায় চিহ্নিত হতেন। দ্র. প্রকাশকের সংযোজিত পরিশিষ্ট : —। প্রকাশক।

ট. ফাল্গুন : ১১শ সংখ্যা : ১৩৩০

১. বিদ্রোহ (কবিতা)—সুধীরকুমার চৌধুরী। ২. পাগ্‌লা হাওয়া (কথিকা)—সত্যরঞ্জন বসু। ৩. পান্থবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৪. অশোক (গল্প)—অনুপম গুপ্ত—(দীনেশরঞ্জন দাশ)। ৫. ভবিতব্য (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৬. মা-হারা (গল্প)—রবীন্দ্রলাল রায়। ৭. আহ্বান (গল্প) — কৃষ্ণপদ দাস। ৮. উপেক্ষিতা (গল্প)—অমরেন্দ্রনাথ বসু। ৯. কাহিনী (সাহিত্যচিন্তা)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১০. বকুল (গল্প)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১১. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ১২. আলোচনা (পত্রিকাচিন্তা)—সম্পাদক। ১৩. সংগ্রহ (সুভাষিতাবলী)—সম্পাদক। ১৪. সমাচার (পত্রিকা ও গ্রন্থ পরিচয়) —সম্পাদক।

ঠ. চৈত্র : ১২শ সংখ্যা : ১৩৩০

১. রৌদ্র-দগ্ধের গান (কবিতা) — নজরুল ইসলাম। ২. মনের দেখা (কথিকা)—সুনীতি দেবী। ৩. অপূর্ণ (গল্প) — সোমনাথ সাহা। ৪. পরিচয় (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৫. চম্পা (গল্প)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৬. ঝড়ের রাতে (গল্প)—সরোজকুমারী দেবী। ৭. গ্রেপ্তার (গল্প; ইংরেজী গল্পের ছায়া)—শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ৮. সংসার (গল্প)—মিনতি দেবী। ৯. পান্থবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১০. স্মৃতি-চিহ্ন (গল্প)—অনিলকুমার ভট্টাচার্য। ১১. সত্য (নাটিকা) — পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ১২. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ১৩. কাহিনী (সাহিত্যচিন্তা)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৪. সংগ্রহ (সুভাষিতাবলী)—সম্পাদক। ১৫. আলোচনা (পত্রচিন্তা)—সম্পাদক। ১৬. সমাচার — সম্পাদক।

দ্বিতীয় বর্ষ : ১৩৩১

ক. বৈশাখ : ১ম সংখ্যা : ১৩৩১

১. শেষ অর্ঘ্য (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. পারের খেয়া (গল্প)—সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩. পান্থবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৪. চাওয়া (গল্প)—লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়। ৫. বিচ্ছেদ (গল্প)—কুমুদিনীকান্ত কর। ৬. শ্রান্তির শেষ (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৭. পিয়াসী (অনুবাদ-গল্প)—সুকুমার ভাদুড়ী (মূল : গর্কী)। ৮. বনফুল (গল্প)—সুনীতি দেবী। ৯. প্রিন্স (গল্প)—প্রমথ চৌধুরী। ১০. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ১১. ভূতের বোঝা (প্রবন্ধ)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১২. আলোচনা (নানাচিন্তা)—সম্পাদক। ১৩. ছোটগল্প (সমালোচনা)—সম্পাদক ১৪. কাহিনী (সাহিত্যচিন্তা)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৫. রূপ (গল্প)—মুরলীধর বসু। ১৬. দুইদিন (গল্প)—সুধাংশুবিকাশ রায়চৌধুরী। ১৭. সংগ্রহ (সুভাষিতাবলী)—সম্পাদক। ১৮. বসন্ত দীপঙ্কর (কালিদাস নাগ)। ১৯. সমাচার—সম্পাদক। অন্যান্য পরিচয়লিপি, ছবি।

খ. জ্যৈষ্ঠ : ২য় সংখ্যা : ১৩৩১

১. প্রত্যয় (কবিতা)—সুবোধ রায়। ২. সন্ধিক্ষণ (গল্প)—সত্যেন্দ্রকুমার বসু। ৩. ঝরাফুল (গল্প)—শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ৪. দিদি (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৫. পান্থবীণা (উপন্যাস) —শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৬. বরুণা (গল্প)—নীলিমা বসু। ৭. ভুলের শাস্তি (কথিকা)— সুবোধ দাশগুপ্ত। ৯. ভোলা (গল্প)—হীরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী। ১০. হারানিধি (গল্প)—হরিসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ১১. রঙ্গীন ছবি (ছবি-আলোচনা) —নাম নেই। ১২. সংগ্রহ (সুভাষিত)—সম্পাদক। ১৩. নীরব (কবিতা)—শৈলবালা সেন। ১৪. সমাচার (পুস্তক-পরিচয়)—সম্পাদক। অন্যান্য-পরিচয়লিপি, ছবি।

গ. আষাঢ় : ৩য় সংখ্যা : ১৩৩১

১. ঝড় (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ২. খাতা (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৩. সাগরিকা (গল্প) — প্রমথনাথ বিশী। ৪. আরেক ফাল্গুনে (গল্প)—শিবরাম চক্রবর্ত্তী। ৫. মুকুল (গল্প)—রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। ৬. বালুবেলা (বালুরেখা) (গল্প)— দীনেশরঞ্জন দাশ। ৭. পূজা (গল্প)—সুনীতি দেবী। ৮. পান্থবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৯. শুদ্ধ-শাসন-প্রচেষ্টা (গল্প)—আনন্দসুন্দর ঠাকুর (প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়)। ১০. বিধবা (গল্প)—অহল্যা গুপ্ত। ১১. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ১২. সংগ্রহ (সুভাষিতাবলী)—সম্পাদক। ১৩. আলোচনা (নানাচিন্তা)—সম্পাদক। ১৪. দুজনে—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৫. সমাচার সম্পাদক। অন্যান্য — পরিচয়লিপি, ছবি।

ঘ. শ্রাবণ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৩১

১. অভাবিত (কবিতা) —সুধীরকুমার চৌধুরী। ২. সংক্রান্তি (গল্প) — প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৩. গুমোট (গল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৪. বাদল বেলা (গল্প) — বিজয় সেনগুপ্ত। ৫. বিধবা (গল্প)—অহল্যা গুপ্ত। ৬. পান্থবীণা (উপন্যাস) —শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৭. প্রতীক্ষায় (গল্প)—সুষমা মুখোপাধ্যায়। ৮. পথিক (উপন্যাস) — গোকুলচন্দ্র নাগ। ৯. পূবের হাওয়া (কবিতা) — নজরুল ইসলাম। ১০. প্রাপ্ত পত্র (সমালোচনা) — সুশান্ত সেন। ১১. কে লইবে (কবিতা)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১২. নিয়মিত লেখক (প্রবন্ধ)—সম্পাদক। ১৩. সংগ্রহ (সুভাষিত) —সম্পাদক। ১৪. সমাচার (পুস্তক ও পত্রপরিচয়)—সম্পাদক। অন্যান্য—পরিচয়লিপি, ছবি।

ঙ. ভাদ্র : ৫ম সংখ্যা : ১৩৩১

১. অম্লান পুষ্প (কবিতা)—সুধীরকুমার চৌধুরী। ২. চোখের চাতক (গল্প)— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩. পোড়ো বাড়ী (গল্প)—সুকুমার ভাদুড়ী। ৪. কালো মেয়ে (গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৫. কাজল-আঁখি এনা (গল্প)---প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়। ৬. সিঁদেল চোর (গল্প)—সুবোধ দাশগুপ্ত। ৭. মেঘদূত (কবিতা)—দীপঙ্কর (কালিদাস নাগ)। ৮. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৯. কাহিনী (সাহিত্যচিন্তা)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১০. পান্থবীণা (উপন্যাস)---শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১১. প্রাপ্ত-পত্র (সমালোচনা)—সুশান্ত সেন। ১২. কোথায় যেন পড়েছি (সংগ্রহ)—সম্পাদক। ১৩. পুস্তক ও পত্রিকাপরিচয়—সম্পাদক। ১৪. কল্লোল (গল্প)—হীরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী। ১৫. সমাচার সম্পাদক। অন্যান্য ছবি, পরিচয়লিপি।

চ. আশ্বিন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ১৩৩১

১. বুড়ো-ঝি (গল্প)—নীলিমা বসু। ২. বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে, বন্দী মোর ভগবান কাঁদে (গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৩. শীতের নিঃশ্বাস (গল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৪. স্মৃতির খাতা (গল্প)—সুনীতি দেবী। ৫. মেঘের হাসি (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৬. দেবতার গ্রাস (গল্প)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৭. ব্যর্থ-অশ্রু (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৮. পাষাণ-পুরী (গল্প)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৯. ওস্তাদ-জি (গল্প) — সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১০. শশী পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

ছ. কার্তিক : ৭ম সংখ্যা : ১৩৩১

১. ভাইফোঁটা (গল্প) — সান্ত্বনা বসাক। ২. আঁধি (গল্প)—বিজয় সেনগুপ্ত। ৩. ঝাপট (গল্প)—সুকুমার ভাদুড়ী। ৪. ওরে পথিক (কবিতা)—সুবোধ রায়। ৫. মরুতৃষা (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৬. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৭. বীরপুরুষের লাঞ্ছনা (গল্প)—প্রমথ চৌধুরী। ৮. পান্থবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৯. কাহিনী (সাহিত্যচিন্তা) — জসীমউদ্দিন। ১০. সর্বনাশের ঘণ্টা (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ১২. পুস্তক পরিচয়-সম্পাদক।

জ. অগ্রহায়ণ : ৮ম সংখ্যা : ১৩৩১

১. চাষা (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. তিলোত্তমা (গল্প)—শান্তা দেবী। ৩. শাস্তি (গল্প)—শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৪. মালা (কবিতা) — বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ৫. অভিমান (গল্প)—নীলিমা বসু। ৬. আশার বাণী (প্রবন্ধ : এইচ. জি. ওয়েলস)—সম্পাদক। ৭. ভুঁই-চাঁপা—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৮. আনাতোল ফ্রাঁস — কালিদাস নাগ। ৯. ছোট-গল্পের কথা—কুসুমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০. সংগ্রহ (সাহিত্যকথা)—

দীনেশরঞ্জন দাশ। ১১. গল্প-সাহিত্যে দুঃসাহস (প্রবন্ধ) —সম্পাদক। ১২. দানব (গল্প)— সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩. ভাটির মায়া (কবিতা) — জসীমউদ্দিন। ১৪. প্রাণ-প্রতিষ্ঠা (গল্প) — রামনারায়ণ রায়। ১৫. সহযাত্রী (গল্প) — রবীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬. পান্থবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৭. মনোলোক (সাহিত্যকথা) —সম্পাদক। ১৮. প্রাপ্ত পুস্তক পরিচয়—সম্পাদক।

ঝ. পৌষ : ৯ম সংখ্যা : ১৩৩১

১. অমর সমাধি (কবিতা)—সুবোধ দাশগুপ্ত। ২. পুরুষ (গল্প)—রাধারাণী দত্ত। ৩. কমলা কেবিন (গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৪. স্নেহের জয় (গল্প)—রমেশচন্দ্র দাশ। ৫. মাটির খেলা (গল্প)—সত্যেন্দ্রকুমার দাস। ৬. রোকশোধ (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৭. কমালী (গল্প)—নরেন্দ্র দেব। ৮. রূপকথা (গল্প)—সোমনাথ সাহা। ৯. ত্যাগ (গল্প : জাপানী কাহিনী)—রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। ১০. গোষ্পদ (গল্প)—যুবনাশ্ব। ১১. মুক্তি-পথে (কবিতা)—সুবোধ রায়। ১২. কাহিনী (William Le Quex- এর- জীবন- কাহিনী*) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৩. প্রকৃতি-সুন্দরী (গান)—অতুলপ্রসাদ সেন। ১৪. সংগ্রহ সম্পাদক। ১৫. বাংলা সাহিত্যের কথা (অনুবাদ-প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী (অনুবাদ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়)। ১৬. পাহাড়ের পথে (গল্প)—শৈলবালা ঘোষজায়া। ১৭. সমালোচনা আলোচনা (প্রবন্ধ)—সম্পাদক। ১৮. পান্থবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

ঞ. মাঘ : ১০ম সংখ্যা : ১৩৩১

১. কবি-নাস্তিক (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ২. মুক্তি (নাটিকা)— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩. বসন্ত-বেদনা (গল্প)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৮. অন্ধকার (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৫. বাংলা সাহিত্যের কথা (অনুবাদ-প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী (অনুবাদ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়)। ৬. মৃত্যুঞ্জয় (গল্প)—যুবনাশ্ব। ৭. বন্ধ্যা (গল্প) —প্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী। ৮. দুই দিন (গল্প)—নির্মলকুমার রায়। ৯. মানসী (গল্প)—দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০. পান্থবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১১. বিদ্যা-বণিক (প্রবন্ধ)—সম্পাদক। ১২. অবস্থান্তর (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ১৩. প্রতীক্ষায় (গল্প)— সুবোধ দাশগুপ্ত। ১৪. রম্যাঁ রলাঁ (প্রবন্ধ)—কালিদাস নাগ। ১৫. পথের আলো (গল্প)—বিজয় সেনগুপ্ত। ১৬. নিবেদন (জাঁ ক্রিসতফ-এর অনুবাদ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি)।

ট. ফাল্গুন : ১১শ সংখ্যা : ১৩৩১

১. অনাগত কবি (কবিতা) — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. সেথা তুমি পূর্ণ ছিলে

---

*লেখক সম্পর্কে আমরা কোনও তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। প্রকাশক।

(কবিতা) — প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৩. যৌবন-বিদায় (কবিতা) — দীনেশরঞ্জন দাশ। ৪. সৃষ্টির প্রথম প্রাতে বিধাতার মনে যে কথাটি ছিল সঙ্গোপনে (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৫. ফাল্গুনের গান (কবিতা) — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৬. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস) — রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ) ৭. কাব্য-কানন (গল্প) — বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮. ন্যুট হামসুন (প্রবন্ধ)— নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ৯. ফাল্গুন-হাওয়া (গল্প) —বিজয় সেনগুপ্ত। ১০. কালনেমী (গল্প) —যুবনাশ্ব। ১১. ভিখারী (গল্প) —শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ১২. বাংলা সাহিত্যের কথা (অনুবাদ- প্রবন্ধ) — প্রমথ চৌধুরী (অনুবাদ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়) ১৩. পাছবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৪। মিলন (গল্প) —সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৫. অভিনেত্রী (গল্প) — পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ১৬. ভাগ্যবতী (গল্প)—দীনেশচন্দ্র লোধ। ১৭. প্রাপ্ত-পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় — সম্পাদক।

ঠ. **চৈত্র : ১২শ সংখ্যা : ১৩৩১**

১. অন্ধকার (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ। (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ)। ৩. জীবন-শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৪. অগ্নিশিখা (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৬. সাঁঝে (কবিতা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ৬. রাত বিরেতে (গল্প)—যুবনাশ্ব। ৭. ধরাতে চরণ রাখি আকাশেরে লইব মাথায় (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৮. আশা (গল্প) —রামপরায়ণ রায়। ৯. পান্থবীণা (উপন্যাস) —শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১০. ম্যাক্সিম গর্কী (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১১. নৈয়ায়িক (গল্প) — প্রমথনাথ বিশী। ১২. পাশের বাড়ি (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ১৩. কমল মধু (গল্প)—অনুপম গুপ্ত (দীনেশরঞ্জন দাশ)। ১৪. একটা নিবেদন—(সম্পাদকীয় নিবেদন)।

তৃতীয় বর্ষ : ১৩৩২

ক. **বৈশাখ : ১ম সংখ্যা : ১৩৩২**

১.মুক্তি (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. চিঠি (চিঠিপত্র)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩. যাত্রা (কবিতা)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৪. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)— সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৫. রাত্রি (কথিকা)—সুনীতি দেবি। ৬. নববর্ষের গান (কবিতা) — অমিয় চক্রবর্তী। ৭. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস) — রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ)। ৮. উদ্বেলিত যৌবনের সিন্ধুতীরে (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৯. গমের দানা ডিমের মত বড় (অনুবাদ-গল্প)—লিও

* এই ফরাসি লেখক সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। প্রকাশক।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)। ১০. কেয়ার কাঁটা টলস্টয় (অনুবাদ (নাটিকা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১১. পঞ্চশর (গল্প) — প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১২. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য (প্রবন্ধ) — বীরবল। ১৩. পান্থবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৪. চৈতী-হাওয়া (কবিতা)—নজরুল ইসলাম

খ. জ্যৈষ্ঠ : ২য় সংখ্যা : ১৩৩২

১. রেল-ঘুম (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ২. শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩. সূর্য (কবিতা) — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৪. রামলাল (গল্প)—জলধর সেন। ৫. শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ) — গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৬. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৭. ভুখা ভগবান (গল্প) — জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ৯. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস) — রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ)। ১০. নীচের সমাজ (গল্প) — পঞ্চানন ঘোষাল। ১১. কবির উত্তরাধিকারী (গল্প) — সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (ফরাসী লেখক Andre Godard * অনুসরণে)। ১২. পাঁকের পোকা (গল্প)—সুকুমার ভাদুড়ী। ১৩. দীর্ঘ-নিশ্বাস ক্লাব (গল্প) — সুবোধ দাশগুপ্ত।

গ. আষাঢ় : ৩য় সংখ্যা : ১৩৩২

১. আখাঢ়ক মাহ (কবিতা) — সুরেশচন্দ্র ঘটক। ২. বিরহ (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩. নিশীথ-রাতে (কবিতা) — প্রেমকুমার চক্রবর্তী। ৪. একখানা চিঠি (গল্প)—প্রফুল্লকুমার রায়চৌধুরী। ৫. শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৬. কবর (গ্রাম্যকবিতা)—জসীমউদ্দীন। ৭. মহামানব (গল্প)— সুবোধ দাসগুপ্ত। ৮. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৯. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ) — নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১০. স্মৃতির পরশ (প্রবন্ধ)—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১. পঞ্চশর (গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১২. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস) — রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ)। ১৩. ডাকঘর (পুস্তক পরিচয়)—সম্পাদক। ১৪. মরুর বাতাস (গল্প)—সত্যেন্দ্রকুমার দাস।

ঘ. শ্রাবণ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৩২

১. রাজর্ষি চিত্তরঞ্জন (প্রবন্ধ)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ২. জীবনাহুতি (প্রবন্ধ : চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)—পঞ্চানন মজুমদার। ৩. আজ আমি চ'লে যাই (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৪. দা' গোঁসাই—সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৫. সুদূর (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৬. শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ৭. আমার গোয়েন্দাগিরি —বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৮. পান্থবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৯. মিনতি (কবিতা)—কুসুমকুমারী দেবী। ১০. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১১. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ উপন্যাস)—রম্যা রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ)। ১২. ডাকঘর (চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)—সম্পাদক। ১৩. রাজ-ভিখারী (গান : চিত্তরঞ্জন)—নজরুল ইসলাম। ১৪. দেশবন্ধু (গান)—নিরুপমা দেবী। ১৫. নবীন বুদ্ধ (কবিতা : চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)—বীণাপাণি দেবী। ১৬. বন্ধু-হারা (কবিতা:চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)—নরেন্দ্র দেব। ১৭. মহাপ্রয়াণ (গান : চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)—বিশ্বপতি চৌধুরী। ১৮. দেশবন্ধু (প্রবন্ধ)—অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ১৯. শেষ সাক্ষাৎ (প্রবন্ধ : চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)---শৈলেশনাথ বিশী। ২০. চিত্ত-স্মারক (কবিতা : চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)—হেমেন্দ্রকুমার রায়। ২১. ভাঙ্গিতে চাই কেন (বক্তৃতা) —চিত্তরঞ্জন দাশ (অনুবাদ : পঞ্চানন মজুমদার)। ২২. চিত্ত-তীর্থে (কবিতা : চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)—নলীনিকান্ত সরকার।

ঙ. **ভাদ্র : ৫ম সংখ্যা : ১৩৩২**

১. পান্থ (কবিতা) — মোহিতলাল মজুমদার। ২. কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (প্রবন্ধ)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩. কবির স্মৃতি (প্রবন্ধ : সত্যেন্দ্র স্মৃতিতর্পণ)—মাণিকলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ৪. ব্রজগাথা (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র ঘটক। ৫. শরৎচন্দ্র (জীবনী) সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৬. বেনামী বন্দর (কবিতা) — প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৭. সাহিত্যে সমস্যা (প্রবন্ধ) — কাজী আবদুল ওদুদ। ৮. চিত্তরঞ্জন দাশ (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৯. আশার ফাঁদ (গল্প)—গিরিজাকুমার বসু। ১০. মেশিনের পাশে (গল্প)—তারানাথ রায়। ১১. পান্থবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১২. মুক্তি (গল্প) —হিমাংশুপ্রভা শিকদার। ১৩. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ)। ১৪. চড়কডাঙ্গার মোড় (গল্প)—চারুচন্দ্র ঘোষ। ১৫. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৬. ডাকঘর (পুস্তক পরিচয়)—সম্পাদক।

চ. **আশ্বিন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ১৩৩২**

১. শেফালি (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. দেউড়ীর দারোয়ান (গল্প)—নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. শেষের দিক (গল্প)—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। ৪. ব্যাথার প্রদীপ (গল্প)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৫. দীর্ঘসূত্রতার পরিণাম (গল্প)—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ৬. মন্থ-শেষ (গল্প)—যুবনাশ্ব। ৭. খাসিয়াদের শারদোৎসব (অনুবাদ : গীতি) —অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৮. মোট বারো (গল্প) —প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৯. সাদা কালো (গল্প)—জলধর সেন, ১০. জৈতার আত্মত্যাগ (ময়মন সিংহ গাথা)—ভূপেন্দ্রনাথ অধিকারী। ১১. ডাকঘর (কল্লোল প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

ছ. **কার্তিক : ৭ম সংখ্যা : ১৩৩২**

১. ঝটিকা (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২.ঋণ শোধ (গল্প)—সকুমার ভাদুড়ী।

গঙ্গোপাধ্যায়। ৩. বিদ্রোহী (কবিতা) —বিভাবতী দেবী। ৪. শরৎচন্দ্র (জীবনী) —সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫. আশাতীত (কবিতা)— সুশীলাসুন্দরী দেবী। ৬. স্রষ্টা (গল্প) —যুবনাশ্ব। ৭. মনে মনে (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী। ৮. মূর্শীদ্যা গান (প্রবন্ধ)—জসীম উদ্দীন। ৯. গোকুলচন্দ্র নাগের মৃত্যুসংবাদ—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. প্রশ্ন (কবিতা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ১১. ঝরাফুল (গল্প)—নীলিমা বসু। ১২. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস)— রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ)। ১৪. হিসাবের বাহিরে (গল্প) —ভূপতি চৌধুরী। ১৫. ঘাসফুল (গল্প) —রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

জ. অগ্রহায়ণ : ৮ম সংখ্যা : ১৩৩২

১. গোকুলচন্দ্র নাগ (প্রবন্ধ : স্মৃতিতর্পণ)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ২. ঝরবে না আঁখিজল (কবিতা : গোকুলস্মৃতি) — বুদ্ধদেব বসু। ৩. যৌবনপথিক (কবিতা : গোকুলস্মৃতি) —জগৎ বন্ধু মিত্র। ৪. প্রেতপুরী (কবিতা)—মোহিতলাল মজুমদার (মার্কিন-কবি G. S. Viereck-এর* অনুভাবে) ৫. ঝরা-ফুল (গল্প)—নীলিমা বসু। ৬. জংলা (গল্প)—সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৭. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৮. নিকষ কালো আকাশ তলে (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত। ৯. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ) ১০. ১০. শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১১. দুর্যোগ (গল্প) —যুবনাশ্ব। ১২. মুর্শীদ্যা গান (প্রবন্ধ)—জসীম উদ্দীন। ১৩. গোকুল নাগ (কবিতা : স্মৃতিতর্পণ)—নজরুল ইসলাম। ১৪. ডাকঘর (গোকুল প্রসঙ্গ ও পুস্তক পরিচয়) —সম্পাদক। ১৫. পুরোহিত (গল্প)—কিরীট ঘোষ।

ঝ. পৌষ : ৯ম সংখ্যা : ১৩৩২

১. রলাঁ ও তরুণ বাংলা (প্রবন্ধ)—কালিদাস নাগ। ২. রম্যাঁ রলাঁ (কবিতা)— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩. সে কবে আমার মনে (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৪. কপালের লিখন (গল্প) — সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৫. যৌবন-চাঞ্চল্য (কবিতা)— যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ৬. তারপর (কবিতা)—নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত। ৭. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৮. একটা ফিরিস্তি (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৯. জাঁ ক্রিস্তফ

---

* লেখক সম্পর্কে কোনও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। প্রকাশক

(অনুবাদ-উপন্যাস) — রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ)। ১০. মুর্শীদ্যা গান (প্রবন্ধ) — জসীম উদ্দীন। ১১. সন্ধ্যারাগ (গল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১২. শরৎচন্দ্র (জীবনী)---সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩. ডাকঘর (রল্যা-প্রসঙ্গ)— সম্পাদক। ১৪. পোষাকের দাম (গল্প) —বিজয় সেনগুপ্ত (হাঙ্গেরীয় লেখক Koloman Mikszath- হইতে)।

ঞ. মাঘ : ১০ম সংখ্যা : ১৩৩২

১. দেবী হয়ে ছিনু বটে (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী। ২. এক টুকরো (গল্প) — সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ৩. আশ্রয় (গল্প)—প্রভাবতী দেবীসরস্বতী। ৪. আর একটা পথ (গল্প)—নরেন্দ্র দেব। ৫. ওরা ভয় পায় (কবিতা)— প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৬. শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৭. পল্লী-ব্যথা (কবিতা) — গোপাললাল দে। ৮. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)— সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।৯. জাসিন্তো বেনাভান্তে (প্রবন্ধ) —নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১০. না (গল্প)— হিমাংশুপ্রভা শিকদার। ১১. মুর্শীদ্যা গান (প্রবন্ধ)— জসীম উদ্দীন। ১২. উৎসর্গ (গল্প)—প্রীতি সেন। ১৩. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী)। ১৪. মানসী (কবিতা)—হুমায়ুন কবির। ১৫. ডাকঘর (বেনাভান্তে ও জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রসঙ্গ ও পুস্তক পরিচয়)—সম্পাদক। ১৬. গোকুল চন্দ্র নাগ স্মরণে (কবিতা)—জিতেন বক্সী।

ট. ফাল্গুন : ১১শ সংখ্যা : ১৩৩২

১. এস (কবিতা)—বিভাবতী দেবী। ২. রাত্রির অভিযান (গল্প)—নির্মলকুমার রায়। ৩. কোনো এক স্বপ্নে ঢাকা মায়াময় দেশে (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত। ৪. শিল্পের স্বরূপ (প্রবন্ধ)— ইন্দুশোভা দেবী। ৫. বাসর-রাত্রি (কবিতা)— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৬. চোর (গল্প)— দীনেশচন্দ্র লোধ। ৭. অন্ধ কবি (কবিতা)— বুদ্ধদেব বসু (আরব কবি Kahlil Gibran-এর কবিতা** "The Blind Poet"-এর অনুবাদ)। ৮. শরৎচন্দ্র (জীবনী)— সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৯. শীতের দুপুরে (কবিতা) —শৈলেন্দ্রনাথ রায়। ১০. উৎসব রাতে (গল্প)— অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় (ইটালিয়ান

* লেখক সম্বন্ধে কোনও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। প্রকাশক।

লেখক Masuccio of Salerno-এর*** "Friends in Love"—অবলম্বনে)। ১১. নীলিমা (কবিতা)— জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ১২. ক্ষণিকা (প্রবন্ধ)—ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ১৩. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৪. দ্বিজেন্দ্র-প্রয়াণ (কবিতা)—গোপাললাল দে। ১৫. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী)। ১৬. ডাকঘর (কল্লোল ও বিজলী প্রসঙ্গ) —সম্পাদক। ১৭. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ-স্মৃতিতর্পণ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

ঠ. **চৈত্র : ১২শ সংখ্যা : ১৩৩২**

১. মরুভূমি (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. বিজলী (গল্প)—বিমলা দেবী। ৩. আখেরী (কবিতা)—নির্মলকুমার ঘোষ। ৪. সুকুমার ভাদুড়ী (প্রবন্ধ : স্মৃতিতর্পণ) — দীনেশরঞ্জন দাশ। ৫. পড়ে থাকা (কবিতা) —প্রিয়ম্বদা দেবী। ৬. চিঠি (গল্প)হরিপদ ৭. আবোল তাবোল (প্রবন্ধ)যুবনাশ্ব। ৮. কবি সুকুমার রায় (প্রবন্ধ)—বুদ্ধদেব বসু। ৯. সঞ্চয় (কবিতা) — হুমায়ুন কবির। ১০. কবি (গল্প)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (হল্যান্ডের লেখক Louis Couperus-এর* গল্প অবলম্বনে)। ১১. যৌবন-প্রভাতে (কবিতা)—জ্যোৎস্নানাথ চন্দ। ১২. স্মৃতির আলো রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী)।

** 'ইটালীয়ান লেখক Masuccio of Salerno-এর'-এই পরিচিতির লেখকের ইতালিয়ান ভাষায় নাম সম্ভবত Macuccio Salernitano (1415-1480)। গল্পকার গদ্যলেখক হিসেবেই তাঁর উল্লেখ পাই।

... Masuccio Salernitano (c. 1415-c. 1480) wrote only fifty stories in his Novellino– and he often been accounted the most important prose-writer of his country*f*- Ref. A Short Hist. of Italian Lit. by J. H. Whitfield– Pelican ed. 1960– p. 93. প্রকাশক।

*** Jibrän Khalil Jibran (1883-1931) সিরিয়ান-আমেরিকান কবি-ঔপন্যাসিক-চিত্রকর। তাঁকে 'বিশ শতকের ব্লেক' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, ব্রিটিশ কবি-চিত্রকর ব্লেক-এর অনুষঙ্গে। ১৯২৩-এ লেখা তাঁর উপন্যাস The Prophet ২৩টি ভাষায় অনূদীত হয়েছিল। প্রকাশক

চতুর্থ বর্ষ : ১৩৩৩

ক. বৈশাখ : ১ম সংখ্যা : :১৩৩৩

...২. জীবন-নাট্য (গল্প)—সত্যভূষণ সেন।** ৩. ধরণী (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত। ৪. স্মৃতি-চিহ্ন (গল্প)—বিমল দত্ত। ৫. ঝড়ের রাত্রি (গল্প)—মায়া বসু। ৬. বেদুঈন (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ৭. পদ্মের পঙ্ক (গল্প)—দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। ৭. শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৮. দরিয়া (গল্প)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৯. মানবতা (বিদেশী ছায়া-গল্প) শামসুন নাহার। ১০. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১১. কল্লোল (কবিতা)—সুনীতি দেবী। ১২. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী)। ১৩. রুষসাহিত্য ও তরুণ বাঙালী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৪. ডাকঘর (রবীন্দ্রনাথ, কল্লোল প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

খ. জ্যৈষ্ঠ : ২য় সংখ্যা : ১৩৩৩

১. কবির কামনা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্রসংকলন)। ৩. রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র (বিজলী সাপ্তাহিক থেকে) — সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু। ৪. সুকুমার (সুকুমার ভাদুড়ী স্মরণে কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী। ৫. মানব (কবিতা)— অজিতকুমার দত্ত। ৬. মানহানির মোকদ্দমা (গল্প)—জগৎবন্ধু মিত্র ৭. কাক-কোকিল-কথা (কথিকা) — যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ৮. রজনী হ'ল উতলা (গল্প)—বুদ্ধদেব বসু। ৯. রূপছায়া (উপন্যাস) —সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ১০. প্রবঞ্চিত (কবিতা)—সুশীলাসুন্দরী দেবী। ১১. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী)। ১২. আঁধারের যাত্রী (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ১৩. ডাকঘর (কল্লোল প্রসঙ্গ)—সম্পাদক। ১৪. সেতুবন্ধ (গল্প)—উমা মিত্র।

গ. আষাঢ় : ৩য় সংখ্যা : ১৩৩৩

১. মোর আঁখিজল (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ২. পাথেয় (গল্প) — বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. গা'ব আজ আনন্দের গান (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৪. ঘেন্নার কথা (গল্প)—জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ৫. রৌদ্র (কবিতা) — হেমচন্দ্র বাগচী।

---

* ডাচ ঔপনাসিক-কবি-সাংবাদিক। জন্ম ১৮৬৩, মৃত্যু-১৯২৩ সালে। ভবঘুরে সাহিত্যিক। তাঁর বই-এর এক বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদক ফরাসি বিজ্ঞানী অঁরি ফ্যাকরে-র অনুবাদক হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত। প্রকাশক।

** কপি অনুসারে '১' ছাড়াই মুদ্রিত হল।

৬. স্মৃতির আলো (উপন্যাস) — সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৭. লিপি (কবিতা) — অজিতকুমার দত্ত। ৮. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী)। ৯. এক টুকরো রুটি (গাথা) — কনকভূষণ ১০. নারী (কথিকা) — রাধারাণী দত্ত। ১১. সদর মুখোপাধ্যায়। (কথিকা)—কিরীট ঘোষ। ১২. কবি ওমর খৈয়াম (প্রবন্ধ) — (নাম নেই)। ১৩. ডাকঘর (কল্লোল প্রসঙ্গ) — সম্পাদক। ১৪. রূপ ও আঁখি (কবিতা) — যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ১৫. হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় (জীবনী)—অবনীনাথ রায়।

ঘ. শ্রাবণ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৩৩

১. স্বপ্নকথা (কথিকা)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ২. জীবনের অন্দর জয়-যাত্রা (কবিতা)—কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য। ৩. ছিন্নমুকুল (গল্প)—প্রবোধকুমার স্যান্যাল। ৪. চলার ভাষা (কবিতা)—মোসাম্মৎ সফিয়া খাতুন। ৫. পটলডাঙার পাঁচালী (নাটিকা)— যুবনাশ্ব।* ৬. কোন লোভ রাখি না ক' স্মৃতির উপরে (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী। ৭. অগ্নি শুদ্ধি (গল্প)—সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৮. কল্পনা (গল্প)—অদিতি দেবী। ৯. নাবিক (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ১০. জাঁ ক্রিস্তফ(অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী)। ১১. রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প (প্রবন্ধ)—শান্তা দেবী। ১২. রবীন্দ্রনাথ ও মাসিক পত্র (প্রবন্ধ)— রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৩. রূপছায়া (উপন্যাস)— সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ১৪. যে যার কাজে (গল্প)—জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ১৫. বনস্পতির মৃত্যু (গল্প : ভূমিকাসহ) —নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (ব্লাডিক্লাসরেমন্ট** থেকে)। ১৬. পুরাতনী (ঈশ্বরগুপ্তের প্রবোধ প্রভাকর গ্রন্থের ভূমিকাংশ)—সঙ্কলন : নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ১৭. ডাকঘর (কল্লোল প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

ঙ. ভাদ্র : ৫ম সংখ্যা : ১৩৩৩

১. অন্ধকার (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত। ২. গানের খাতা (গল্প)—অখিল নিয়োগী। ৩. জজের রায় (গল্প)—শশিভূষণ পাল। ৪. রাজ শক্তি (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ৫. পিয়াসী (কথিকা)—সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ৬. চরম গোধূলি (কবিতা) — নির্মলকুমার ঘোষ। ৭. অকাজের বাঁশী (তত্ত্বনাটিকা) — হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়। ৮. অধিকার (কবিতা)—সুশীলাসুন্দরী দেবী। ৯. বর্তমান গদ্যসাহিত্যে তিনখানি ভাল বই—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) ঐন্দ্রজালিক : সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

---

* 'পটলডাঙার পাঁচালী" 'নাটিকা" নয়। যুবনাশ্বের বিখ্যাত একটি গল্প। পরে এই শিরোনামেই তাঁর গল্পের বই প্রকাশিত হয়। প্রকাশক।

** কোনও তথ্য সংগ্রহ করা যায় নি। প্রকাশক।

(খ) গড্ডালিকা[য] : পরশুরাম। (গ) অতসী : শৈলজানন্দ : মুখোপাধ্যায়)। ১০. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ। (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী)। ১১. বড় ছোট (কবিতা)—শৈলেশরঞ্জন ঘোষ। ১২. রূপছায়া (উপন্যাস) — সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ১৩. প্রেম (কবিতা) — ভক্তিসুধা হার। ১৪. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৫. নোগুচি [জ. ১৮৭৬- মৃ. ?। জাপানী কবি।] (আলোচনা)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৬, ডাকঘর (কল্লোল প্রসঙ্গ) —সম্পাদক।

চ. আশ্বিন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ১৩৩৩

১. রাখালী (কবিতা) — জসীম উদ্দীন। ২. কবির বিয়ে (কথিকা)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৩. রক্তসাঁঝে সোনার ফসল এল চাষীর ঘরে (কবিতা) — সুরেশ বিশ্বাস। ৪. মানবলতিকা (গল্প)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। ৫. কল্যাণী (গল্প) — প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। ৬. উজোর ঘরের কান্না (খাসিয়াদের গাথা) — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৯. বেদে (আহ্লাদি) (গল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৮. যুগল সাহিত্যক (গল্প) —সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। ৯. সমালোচনা (প্রবন্ধ)— প্রমথ চৌধুরী। ১০. ধান্যমঞ্জরী (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ১১. আলো-ছায়া (গল্প)—সুরমা দেবী। ১২. ডাকঘর (কল্লোল প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

ছ. কার্তিক : ৭ম সংখ্যা : ১৩৩৩

১. শাপভ্রষ্ট (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ২. আলেয়া (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৩. কান্ডারী (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৪. মাধবীর পত্র (গল্প)—সরোজকুমারী দেবী। ৫. কোহিনূর (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ৬. গান ও স্বরলিপিকথা, সুর ও স্বরলিপি —দিলীপকুমার রায়। ৭. গান ও সুর (চিঠি)—দিলীপকুমার রায়। ৮. গোত্রহীনের মা (গল্প)—হেমেন্দ্রলাল রায়। ৯. ঝড় (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী। ১০. জুরশনির গ্রহশুদ্ধি (গল্প)—জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ১১. মাঠের হরফ (কবিতা)—সৈয়দউদ্দীন। ১২. পন-ভঙ্গ (গল্প) — সুনীতি দেবী। ১৩. নেশার জের (গল্প) — নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ১৪. শারদ সঙ্গীত (কবিতা)—গোপাললাল দে। ১৫. তারা (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ১৬. ব্যথার পূজা (কবিতা)—যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ১৭. তোমার কথাটি (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী। ১৮. ডাকঘর (নানা প্রসঙ্গবাঙ্গালা গল্পের স্থান)—সম্পাদক এবং পঞ্চানন মজুমদার।

জ. অগ্রহায়ণ : ৮ম সংখ্যা : ১৩৩৩

১. দারিদ্র্য (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ২. অবগুণ্ঠিতা (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৩. তোমরা চলিয়া গেছ (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী। ৪. শিবানী (গল্প)—ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৫. অগ্নি (অনুবাদ-কবিতা)—তারাকুমার চট্টোপাধ্যায় (মূল : হারীন্দ্রনাথ

চট্টোপাধ্যায়)। ৬. পতি (গল্প)—অমলেন্দু বসু। ৭. মৃত্যু-দূত (কবিতা)—ক্ষিতীন্দ্রমোহন সাহা। ৮. ক্ষিদের খোরাক—জগদীশ গুপ্ত। ৯. শুভদিন (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ১০. আমিনা (গল্প) — পঞ্চানন মজুমদার ১১. পুরাতনী (প্রবন্ধ)—নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ১২. বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান মহিলা (প্রবন্ধ)—মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী। ১৩. পরীস্থান (কবিতা) — গোপাললাল দে। ১৪. বেদে (উপন্যাস। আস্‌মানী)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৫. ব্যবধান (কবিতা) — হেমচন্দ্র বাগচী। ১৬. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৭. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ উপন্যাস) —রম্যা রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী)। ১৮. ডাকঘর (সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

ঝ. পৌষ : ৯ম সংখ্যা : ১৩৩৩

১. আদি যুগ আন ফিরাইয়া (কবিতা) — সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু। ২. মা-হারা (গল্প)—নিরুপমা দেবী। ৩। সর্বনাশের সুখ (গল্প)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৪. ছবি দেখা (গল্প) — প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। ৫. শ্মশান (কবিতা) —জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ৬. প্রভুপাদ (গল্প)—সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৭. রাত্রি (কবিতা) —হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। (মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ : তারাকুমার মুখোপাধ্যায়)। ৮. তান্ত্রিকের গান (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ৯. বেদে (উপন্যাস। বাতাসী)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১০. স্বর্ণ-তোরণ (কবিতা)—সরোজিনী নাইডু। (মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ : প্রভাতকুমার শর্মা)। ১১. গ্রাম্যসঙ্গীত (কবিতা) ---ঐ। ১২. ধানকাটার স্তোত্র (কবিতা) --- ঐ। ১৩. রবীন্দ্রনাথের ভাবরহস্য (প্রবন্ধ : পূরবীর ভূমিকা)—নীহাররঞ্জন রায়। ১৪. গৈবী (কবিতা : কবীর)—রাধাচরণ চক্রবর্তী। ১৫. নিখিল স্রোত (গল্প)—অনুপম গুপ্ত (দীনেশরঞ্জন দাস)। ১৬. রম্যাঁ রলাঁ ও হিন্দুদর্শন (প্রবন্ধ) — নাম নেই। ১৭. পুরাতনী (প্রবন্ধ : বড়দিন প্রসঙ্গ) নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ১৮. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস) — রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী) ১৯. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ২০. পুস্তক ও পত্রিকা (পরিচয় লিপি)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় [?] ২১. ডাকঘর (সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

ঞ. মাঘ : ১০ম : ১৩৩৩

১. মহাক্ষুধা (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ২. মুস্কিল-আসান (গল্প)—সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৩. বংশী-হারা (কবিতা)—জসীম উদ্দীন। ৪. উৎসব রজনী (গল্প) — বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫. পলাতক (গল্প)---দীনেশচন্দ্র লোধ। ৬. গজল গীত (গান) (ভৈরবী-পোস্তা) —নজরুল ইসলাম। ৭. গজল গীতি (গান) ঐ। ৮. টলস্টয়ের স্মৃতি (অনুবাদ-প্রবন্ধ)— পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। (মূল : গর্কি) ৯. গান—কল্যাণী ঘোষ।

১০. মৃত্যুর অমৃত (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ১১. ওরে সোনার পাখী (কবিতা)—সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ১২. অভিভাষণ (বক্তৃতা)— জগদীশচন্দ্র বসু। ১৩. ভাল লেগেছিল মোর (কবিতা)—জিতেন্দ্রনাথ বক্সী। ১৪. মহিলা প্রগতি (সংবাদ) — নাম নেই। ১৫. রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৬. সভাপতির অভিভাষণ (বক্তৃতা)—প্রমথ চৌধুরী। ১৭. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ উপন্যাস)—রম্যা রলাঁ। (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী) ১৮. অশ্রুজল (কবিতা)—সুনির্মল বসু (বায়রণ অবলম্বনে)। ১৯. লিওনিদ অনাদ্রিত* (প্রবন্ধ) — নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ২০. পরীক্ষা (কবিতা : সংস্কৃত থেকে)—সারদাচরণ রায়। ২১. ডাকঘর (সাহিত্যের নানাপ্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

ট. ফাল্গুন : ১১শ সংখ্যা : ১৩৩৩

১. বন্দীর বন্দনা (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ২. কবিত্বহীন গল্প (গল্প)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৩. সমাজদ্রোহী (গল্প)—প্রভাবতী দেবীসরস্বতী। ৪. বেদে (উপন্যাস। মুক্তা)— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৫. অজগর-মণি (একাঙ্ক নাটক)—মন্মথ রায়। ৬. শাক-তুলুনী (কবিতাজসীম উদ্দীন। ৭। দুঃখবাদী (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৮. সভাপতির অভিভাষণ (বক্তৃতা)—প্রমথ চৌধুরী। ৯. রুদ্রলীলা (কবিতা) — অজিতকুমার দত্ত। ১০. ওমর-গুরু আবু আলি সিনা (প্রবন্ধ) — সুরেশচন্দ্র নন্দী। ১১. গজল গান (সঙ্গীত)—নজরুল ইসলাম। ১২. বীরবল (প্রবন্ধ : প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গ)— অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ১৩. মনের পাগল (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী। ১৪. স্মৃতির-আলো (উপন্যাস) --- সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৫. গতি (কবিতা) --- বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ১৬. কেশবচন্দ্র (প্রবন্ধ)—সত্যানন্দ রায়। ১৭. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী)।

ঠ. চৈত্র : ১২শ সংখ্যা : ১৩৩৩

১. গজল-গান (সঙ্গীত)—নজরুল ইসলাম। ২. পোষ্টাপিস (গল্প) — পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৩. খাখ (গল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৪. ব্যথার তৃপ্তি (গল্প)— নৃসিংহদাসী দেবী। ৫. চালমাৎ (গল্প)—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। ৬. ব্রাহ্মণ (কবিতা)— হেমচন্দ্র বাগচী। ৭. সুবলবেশে রাইমিলন (গাথা)—চন্দ্রকুমার দে (প্রাচীন কীর্তন অবলম্বনে)। ৮. যৌবন বিদায় (কবিতা : পুশকিন)—অজিতকুমার দত্ত। ৯. দিলীপকুমার (মানপত্র) —শুভানুধ্যায়ীবর্গ। ১০. নিবেদন (বক্তৃতা) — দিলীপকুমার রায়। ১১. বিধিলিপি

* লিয়োনিদ নিকোলেভিচ আনদ্রিভ (১৮৭১-১৯১৯)। বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক। তিনি রুশ-বিপ্লব বিরোধী ছিলেন। প্রকাশক।

(কবিতা সংস্কৃত থেকে)—সারদাচরণ রায়। ১২. দরদী (গান। কথা ও সুর)—নজরুল ইসলাম (স্বরলিপি : দিলীপকুমার রায়)। ১৩. দক্ষিণা (কবিতা)— জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ১৪. বিনোদিনীর ব্রজ (গল্প)---জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ১৫. লীলা- অভিলাষ (কবিতা)—আবদুল কাদের। ১৬. চড়ক-সংক্রান্তি (প্রবন্ধ)—'সাধনা' থেকে পুনমুদ্রিত। ১৭. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী)। ১৮. পুস্তক ও পত্রিকা (পরিচয়লিপি)—কনক রায়। ১৯. বর্ষশেষে নিবেদন (সম্পাদকীয়) —দীনেশরঞ্জন দাশ। ২০. কবির আত্ম-সমর্পণ (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত।

পঞ্চম বর্ষ : ১৩৩৪

ক. বৈশাখ : ১ম সংখ্যা : ১৩৩৪

১. স্বাক্ষর (কবিতা)---রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. বাণ (গল্প)---প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ৩. শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে প্রেম (প্রবন্ধ)—জগৎবন্ধু মিত্র। ৪. কুমারী হুদিয়ের "স্বামী" (অনুবাদ : গল্প)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (মূল : Mercel Precust [?])*। ৫. নববর্ষের গান (কবিতা)—গোপাললাল দে। ৬. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ৭. নব-পন্থা (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৮. মীনকেতন (অনুবাদ উপন্যাস) —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মূল : ন্যুটহাসুন)। ৯. সহজ (সঙ্গীত) —নিরুপমা দেবী। ১০. এম-এ আর্টিষ্টের প্রশ্নমালা (প্রবন্ধ)—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১. দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ১২. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৩. আমারে ভুলিও ভাই (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৪. বীরবল (প্রবন্ধ; ঐতিহাসিক)---প্রমথ চৌধুরী। ১৫. কল্লোল (প্রবন্ধ)---সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। ১৬. আমি-হারা (কবিতা)—যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ১৭. পুরাতনী (সম্বাদ সংগ্রহ)— "প্রচার" পত্রিকা থেকে। ১৮. আগামী কাল (গল্প) — প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৯. নীলিমা বসু (স্মৃতিতর্পণ)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ২০. ডাকঘর (কল্লোল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ) — সম্পাদক। ২১. সহজ (গান। কথা)—নিরুপমা দেবী (সুর ও স্বরলিপি : দিলীপকুমার রায়)।

---

* দে'জ সংস্করণে সম্ভবত লেখক-প্রদত্ত নাম "Precust" বানানটি থেকে গেছে। সম্ভবত হওয়া উচিত ছিল PROUST। যদি তাই হয়, তবে তিনি বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে মার্সেল প্রস্ত। যাঁর জন্ম-মৃত্যু তারিখ ১৮৭১ এবং ১৯২২। ফরাসি সাহিত্য প্রেমিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্ভবত ১৯০৪-এ রাস্কিনের গল্পের এবং নিজের গল্পের ১৯০৬ সালে অনুবাদ বা মূল থেকে অনুবাদ করেছিলেন। প্রকাশক।

খ. জ্যৈষ্ঠ : ২য় সংখ্যা : ১৩৩৪

১. অ-ধরা (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ২. লক্ষ্মীছাড়া (গল্প)—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. সত্যব্রত (গল্প) —দীনেশরঞ্জন দাশ। ৪. গজল গান (গান) নজরুল (গল্প)—বিমলাচরণ বিদ্যারত্ন। ৬. ধর্মঘট (কবিতা)অভিমান—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৭. আমরা ও তাঁহারা (প্রবন্ধ)—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৮. মাতাল (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী। ৯. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১০. কবেকার কথা (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী। ১১. জন্মান্তর (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ১২. সিন্ধু (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ১৩. অলকা (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ১৪. লেখা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৫. বুলবুলি (গজলগান। কথা ও সুর)— নজরুল ইসলাম (স্বরলিপি দিলীপকুমার রায়)। ১৬ পুরাতনী (রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'মীমাংসা')—'সাধনা' থেকে পুনর্মুদ্রিত। ১৭. সমালোচক (প্রবন্ধ)—অতুলচন্দ্র গুপ্ত ('কালি-কলম" থেকে পুনর্মুদ্রিত)। ১৮. দীপক (উপন্যাস)---দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৯. বৃদ্ধ পরীক্ষক (অনুবাদ-কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু [মূল জাপানী কবি আজুমি রিয়োসাই]। ২০. মীনকেতন (অনুবাদ- উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (মূল : ন্যুটহামসুন)। ২১. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী)।

গ. আষাঢ় : ৩য় সংখ্যা : ১৩৩৪

১. আজি হ'তে শতবর্ষ আগে (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ২. মৃগতৃষ্ণিকা (গল্প) —দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. মাধুকরী (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত। ৪. বেদে (উপন্যাস। বন-জ্যোৎস্না) — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৫. ওগো বিদ্যুল্লতা (কবিতা)— বুদ্ধদেব বসু। ৬. প্রভাকর (গল্প)—জগদীশ গুপ্ত। ৭. দুঃখবিবাদী (কবিতা) — ধনঞ্জয় শর্মা। ৮. দীপক (উপন্যাস)---দীনেশরঞ্জন দাশ। ৯. অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য (প্রবন্ধ)—অমলেন্দু বসু। ১০. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (মূল : ন্যুটহামসুন)। ১১. বাংলার মেয়ে (কবিতা)—সুনীতি দেবী। ১২. লেখা (প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী। ১৩. আগামীকাল (গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৪. সেকালে (কবিতা)—হেমেন্দ্রকুমার রায়। ১৫. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী)। ১৬. ডোরা (অনুবাদ-গল্প) মূল : ম্যাক্সিম গর্কি —(অনুবাদকের নাম নেই)। ১৭. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১৮. ডাকঘর (সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

ঘ. শ্রাবণ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৩৪

১. সকলি যে তুলিয়াছি (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. মরুকুঞ্জ (গল্প)— সুরমা দেবী। ৩. দশবৎসর পরে (গল্প)—হেমেন্দ্রকুমার রায়। ৪. লক্ষ্মী-প্রতিষ্ঠা (গল্প)—

হরিপদ গুহ। ৫. আব্দার (কবিতা)—হেমেন্দ্রলাল রায়। ৬. চলে নাগরী কাঁখে গাগরী (গল্প)—সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ৭. কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—ভবানী ভট্টাচার্য। ৮. প্রাপ্তি-স্বীকার (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৯. দীপক (উপন্যাস) —দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. সঞ্চয় (কবিতা)—হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়। ১১. ভ্রাম্যমানের জল্পনা (ভ্রমণ কাহিনী)—দিলীপকুমার রায়। ১২. মৈত্রেয়ী (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ১৩। মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস) — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (মূল ন্যুট্ হামসুন)। ১৪. প্রবাহ ('গান'রবীন্দ্রনাথ এবং "সাহিত্য ও আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য" গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) — যথাক্রমে 'উত্তরা" ও "বঙ্গবাণী" থেকে পুনর্মুদ্রিত। ১৫. নারী-আঁখি (কবিতা)—চামেলীপ্রভা ঘোষ। ১৬. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১৭. জমিদার (কবিতা) — কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়। ১৮. প্রার্থনা (কবিতা)—কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়। ১৯. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস) — রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী)। ২০. আগামী কাল (গল্প) — প্রেমেন্দ্র মিত্র। ২১. ডাকঘর (কল্লোল ও সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ) —সম্পাদক। ২২. গ্যাব্রিয়েল দ্য" আনুসিয়ো (প্রবন্ধ)—গিরিজা মুখোপাধ্যায়।

ঙ. ভাদ্র : ৫ম সংখ্যা : ১৩৩৪

১. গজল (গান)—নজরুল ইসলাম। ২. কলের নৌকা (গল্প)—অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৩. অন্ধের দৃষ্টি (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী। ৪. আকাশ পাতাল (গল্প) — পরিমল গোস্বামী। ৫. বেলা শেষের আলো (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৬. রুদ্ধঘর (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত। ৭. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (মূল : ন্যুটহামসুন)। ৮. এস (কবিতা)—বিমলা দেবী। ৯. পল্লী-গীতি (ভাটিয়াল সুর)—চিত্তরঞ্জন আচার্য্য। ১০. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১১. বেদে (উপনাস। মৈত্রেয়ী)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১২. কবির কাব্য (কবিতা) — যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ১৩. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৪. এইচ জি. ওয়েলস(প্রবন্ধ)—হুমায়ুন কবির। ১৫. হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় (প্রবন্ধ। স্মৃতিতর্পণ)—অবনীন্দ্রনাথ রায়। ১৬. প্রবাহ (পারস্য-কবি মুয়িজ্জী ও আনোয়ারী মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ) ("সওগাত" থকে পুনর্মুদ্রিত)। ১৭. অসংলগ্ন (প্রবন্ধ)—কৃত্তিবাস ভদ্র (প্রেমেন্দ্র মিত্র)। ১৮. ডাকঘর (এইচ জি. ওয়েলও সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৯. ছোটগল্পের কথা (প্রবন্ধ)—বুদ্ধদেব বসু। ২০. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়লিপি সম্পাদক।

চ. আশ্বিন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ১৩৩৪

১. চরকা (একাঙ্ক নাটক)—মন্মথ রায়। ২. ব্যথিত (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ৩. স্বপ্নের বিড়ম্বনা (গল্প)—জগৎবন্ধু মিত্র। ৪. চিঠি (গল্প)—উমা দেবী। ৫. সন্ন্যাসী (গল্প)—

তারানাথ রায়। ৬. বিধাতার মত ভাই (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৭. জুনাবালী (বিয়ের গান ও কথা)—জসীমউদ্দীন। ৮. ভোরের আলোকে এই বন্দরখানি (কবিতা) — ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৯. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১০. অভিসার (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী। ১১. সমালোচনার কথা (প্রবন্ধ)—মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। ১২. দেবতা কোথায়? (কবিতা)—চামেলীপ্রভা দেবী। ১৩. দীপক (উপন্যাস) ---দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৪. ছবি ও মায়া (কবিতা) ---ক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার। ১৫. মীনকেতন (অনুবাদ- উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (মূল : ন্যুট হামসুন)। ১৬. ভ্রাম্যমানের জল্পনার উত্তর (প্রবন্ধ)—বঙ্গনারী (প্রকৃত নাম : অনিন্দিতা দেবী)। ১৭. ডাকঘর (সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ) —সম্পাদক।

ছ. **কার্তিক : ৭ম সংখ্যা : ১৩৩৪**

১. আসার আশায় (গল্প) —সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ২. অনূঢ়া (গল্প)—নরেন্দ্র দেব। ৩. পাষাণ মানব (গাথা)—চন্দ্রকুমার দে (মৈমনসিংহ গীতিকা কেনারামের পালা অবলম্বনে)। ৪. মন্থন (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৫. ঠাট্-টা (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৬. আরবী গল্প (কাহিনী)—আবুল ফজল। ৭. মা (গল্প) রাধারানী দত্ত। ৮. সর্পিল পন্থা (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৯. কুড়ের বাথান (গল্প)—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। ১০. স্বপ্ন-ব্যথা (গল্প)—শ্রীঅনিন্দিতা দেবী। ১১. মদন ভস্মের পর (গল্প) — দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ. **অগ্রহায়ণ : ৮ম সংখ্যা : ১৩৩৪**

১. সব পুড়ে' হল ছাই (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. বর্ণ-সমস্যা (গল্প) — অমিয়া চৌধুরী। ৩. অন্তরের অন্ধকারে (গল্প)—ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৪. লতাময়ী ঊর্বশী (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ৫. ভ্রাম্যমানের জল্পনা (ভ্রমণ-কাহিনী)— দিলীপকুমার রায়। ৬. জাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রঁম্যা রলাঁ (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী)। ৭. বৈদিশী বন্ধু (গান)—জসীমউদ্দীন (খাটুগানের সুর, মৈয়মনসিংহের ভাষা)। ৮. অপরাধিনী (গল্প)—প্রভাবতী দেবীসরস্বতী। ৯. মাটির টান (কথিকা)সুনীতি দেবী। ১০. দরিদ্রের ভগবান (কবিতা)—গোপাললাল দে। ১১. যাদুঘর (উপন্যাস) — নরেন্দ্র দেব। ১২. সংস্কৃত-সাহিত্যে কাব্য-সমালোচনা—মনোমোহন ঘোষ। ১৩. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (মূল : ন্যুটহামসুন)। ১৪. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৫. শিল্পী দেবীপ্রসাদ (শিল্পী-পরিচয়) —সম্পাদক প্রভৃতি। ১৬. অসংলগ্ন (কথিকা)—কৃত্তিবাস ভদ্র (প্রেমেন্দ্র মিত্র)। ১৭. ভগবানের রাজ্য (গল্প)—কিরণকুমার রায়। ১৮. অশ্রুজল (কবিতা) — সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ১৯. পুস্তক ও পত্রিকা (পরিচয়লিপি)—সম্পাদক প্রভৃতি। ২০. ডাকঘর (নানা প্রসঙ্গ;

রবীন্দ্রভক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর স্মৃতি-তর্পণ উল্লেখযোগ্য) — সম্পাদক প্রভৃতি (‘প্রভৃতি’ কথার উল্লেখ এই প্রথম লেখকের মন্তব্য)। ২১. চণ্ডীদাস (প্রবন্ধ)— সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ২২. দূরের বন্ধু (গান)—আবদুল কাদের।

ঝ. পৌষ : ৯ম সংখ্যা : ১৩৩৪

১. রমা (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ২. ব্যতিক্রম (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৩. মাৎসুয়্যামার আর্শি (জাপানী গল্প)—চিত্তরঞ্জন আচার্য। ৪. ভ্রাম্যমানের জল্পনা (ভ্রমণকাহিনী)—দিলীপকুমার রায়। ৫. দীওয়ান-ই-হাফিজ (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যশিল্প (প্রবন্ধ)—হেমচন্দ্র বাগচী। ৭. দেবযাজী (কবিতা) —হেমেন্দ্রকুমার রায়। ৮. রূপসী (গল্প)—সত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত। ৯. যাদুঘর (উপন্যাস) —নরেন্দ্র দেব। ১০. আর কিছু নাহি সাধ (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ১১. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (মূল : ন্যুট হামসুন)। ১২. ঝরা ফসলের গান (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশ (এই প্রথম গুপ্ত নেই)। ১৩. দীপক (উপন্যাস)— দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৪. এলো শীত ঘিরে কুয়াশায় (কবিতা) — প্রিয়ম্বদা দেবী। ১৫. কেমন করে লিখতে শিখি (অনুবাদ-প্রবন্ধ) — পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (মূল : সেলমা ল্যাগারলফ)। ১৬. সেলমা ল্যাগারলফ (প্রবন্ধ) —নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৭. ডাকঘর (জাঁ ক্রিস্তফ অনুবাদ ও অন্যান্য সাহিত্য প্রসঙ্গ)—সম্পাদক প্রভৃতি।

ঞ. মাঘ : ১০ম সংখ্যা : ১৩৩৪

১. আমার প্রিয়ার ঘরের অতিথি (কবিতা) —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. মায়ে-পোয়ে (পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)—ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩. স্বীকার (পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)—অনিন্দিতা দেবী। ৪. বাস্তু (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৫. সাহিত্যিক সংহতি (গল্প)—ভবানী ভট্টাচার্য। ৬. সুরের দুলাল (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ৭. বিগলিত শিলা (গল্প) — জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ৮. পাকা ধানের বিদায় (কবিতা)—জসীমউদ্দীন। ৮. বাঙলা সাহিত্যে দেশানুরাগ (প্রবন্ধ)—ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ১০. ছন্দের কথা (প্রবন্ধ)—অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। ১১. মহাকাল (কবিতা)—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১২. যাদুঘর (উপন্যাস) —নরেন্দ্র দেব। ১৩. প্রাচীন ভারতে নাট্যশিল্প (প্রবন্ধ)—হেমচন্দ্র বাগচী। ১৪. বাদলের দিন (রম্য রচনা)—এস ওয়াজেদ আলি। ১৫. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৬. নীলার বারমাস্যা (গান)—মহম্মদ মনসুর উদ্দীন (সংগ্রাহক)। ১৭. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (মূল : ন্যুটহামসুন)। ১৮. টমাস হার্ডি (পরিচয়)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৯. পুস্তক ও পত্রিকা (পরিচয় লিপি)— সম্পাদক প্রভৃতি। ২০. ডাকঘর (লেখক সম্প্রদায় ও কল্লোল প্রসঙ্গ)—সম্পাদক প্রভৃতি।

ট. ফাল্গুন : ১১শ সংখ্যা : ১৩৩৪

১. মানুষ (কবিতা)—হেমেন্দ্রকুমার রায়। ২. রসকলি (গল্প)—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. দেবী-দর্শন (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ৪. পরস্ত্রী (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫. লীলাকমল (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ৬. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ৭. আমার মেঘনা নদী (কবিতা) এবং ৮. নহেক প্রথমতম (কবিতা) ---অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৯. স্বপ্নমানের কল্পনা (গল্প)---প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ১০. ফেরদৌসির অগ্রদূত কবি দকিকী মহম্মদ মনসুর উদ্দীন। ১১. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (মূল : ন্যূট হামসুন)। ১২. আদিম (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশ। ১৩. দীপক (উপন্যাস) দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৫. পুস্তক ও পত্রিকা (পরিচয় লিপি)—সম্পাদক প্রভৃতি। ১৬. বয়সের বহ্বাড়ম্বর—মৃত-জীবিত কশ্চিৎ বৃদ্ধ। ১৭. তেপান্তরের মাঠে (গল্প)—সুবোধ দাশগুপ্ত। ১৮. ডাকঘর (শৈলজানন্দ ও সাহিত্য-প্রসঙ্গ)।

ঠ. চৈত্র : ১২শ সংখ্যা : ১৩৩৪

১. খেজুর বাগান (কবিতা) — যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ২. কম্‌লি (গল্প)—কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ৩. আগ্‌-ছাপ (গল্প) — প্রবোধকুমার সান্যাল। ৪. বিধির বিদ্রূপ (গল্প) — নৃসিংহদাসী দেবী। ৫. অন্ধকারের অন্ধকূপ (গল্প)—ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৬. পাহাড়িয়া (কবিতা) — জসীমউদ্দীন। ৭. বাঁধন না মুক্তি (প্রবন্ধ) —বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। ৮. রোগশয্যায় একা শুয়ে আছি (কবিতা)---অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৯. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১০. অন্তর পারাবার (কবিতা) — নিরুপমা দেবী। ১১. দীপক (উপন্যাস) — দীনেশরঞ্জন দাশ। ১২. অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য (প্রবন্ধ) — বুদ্ধদেব বসু (প্রগতি থেকে পুনর্মুদ্রিত)। ১৩. অসময়ে (কবিতা) — বীণাপাণি (কবিতা)—বীণাপাণি রায়। ১৪. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মূল : ন্যূট হামসুন)। ১৫. দোল-পূর্ণিমা (গান)---নজরুল ইসলাম। ১৬. শিল্পী যামিনী রায় (পরিচয়)—বিশ্বপতি চৌধুরী।

ষষ্ঠ বর্ষ : ১৩৩৫

ক. বৈশাখ : ১ম সংখ্যা : ১৩৩৫

১. নূতন (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. আলো ও আলেয়া (গল্প) — ভবানী ভট্টাচার্য। ৩. হারানো সুর (গল্প) — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪. অপরূপ (উপন্যাস) প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ৫. আরণ্যক (কবিতা)—হেমেন্দ্রকুমার রায়। ৬. নীড় (গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৭. যদি কোন দিন (কবিতা)---অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৮. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ৯. অস্ফুট স্মৃতির সুর (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচি।

১০. ছায়াপথ (গল্প)—পান্নালাল অধিকারী। ১১. ডাক-পিওন (বড় গল্প)— শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১২. আমি কেন নীরব (প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী। ১৩. কাক জ্যোৎস্না (গল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৪. ছায়া (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ১৫. 'দেবদাস'-এর জন্মেতিহাস (প্রবন্ধ)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৬. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৭. ডাকঘর (কল্লোল প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

খ. জ্যৈষ্ঠ : ২য় সংখ্যা : ১৩৩৫

১. তবু তোমা ভুলি নাই (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ২. তোমারে বেসেছি ভালো (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ৩. আলোর নীচেয় (গল্প)—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ৪. দুনিয়াদারী (গল্প)—সরোজকুমার রায়চৌধুরী। ৫. বন্দনা (কবিতা)—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬. রস ও নীতিধর্ম (প্রবন্ধ)—মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। ৭. প্রশস্তি (কবিতা)—জগৎ মিত্র। (কল্লোলের নতুন প্রচ্ছদের সঙ্গে বোধ হয় ভাবের মিল আছে। দ্র. ঘোষণা) ৮. স্বাগত (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৯. অপরূপ (উপন্যাস)—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ১০. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১১. * "তোমার ঐ ঝরণাতলার নির্জনে" (কবিতা)—রাধারাণী দত্ত। ১২. ডাক-পিওন (বড় গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৩. মন্বন্তর (কবিতা)—চামেলীপ্রভা ঘোষ। ১৪. যাদুঘর (উপন্যাস)— নরেন্দ্র দেব। **১৫. কবি শশাঙ্কমোহন (আলোচনা) — ধীরেন্দ্র বিশ্বাস। ১৬. গজল গানকথা, সুর ও স্বরলিপি নজরুল ইসলাম। ১৭. ডাকঘর (বঙ্কিম-সম্মেলন, বীণাপাণি রায় ও পত্র-পত্রিকা)—সম্পাদক। ১৮. পুস্তক-পরিচয় (মরুশিখা যতীন্দ্রনাথ, পদ্মরাগ — মিসেস আর এস হোসেন)—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত (?)।

গ. আষাঢ় : ৩য় সংখ্যা : ১৩৩৫

১. গজল গান—নজরুল ইসলাম। ২. চব্বিশ ঘণ্টা (গল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩. মুশাফির (গল্প)—অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৪. বিবর্তন (গল্প) — বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় । ৫. প্রথম বারিধারা (কবিতা) — হেমচন্দ্র বাগচী। ৬. শিল্পের আদর্শ (নন্দলাল বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার)—ইন্দ্রকুমার চৌধুরী। ৭. সিঁদুরের বেসাতি (কবিতা)—জসীমউদ্দীন। ৮. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ৯. ডাক-পিওন (বড়গল্প) —শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১০. বহুরূপী (কবিতা) — সুকুমার সরকার। ১১. দীপক (উপন্যাস) —দীনেশরঞ্জন দাশ। ১২. শেলী (Andre Maurois এর পদাঙ্ক অনুসরণে) — নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৩. ডাকঘর (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শরৎচন্দ্র-সম্বর্ধনা, গোকুল নাগ, প্রবাসী প্রসঙ্গ)। ১৪. বৈশাখী পূর্ণিমা (কবিতা) — বুদ্ধদেব বসু।

---

* ২১৯ পৃষ্ঠা সংশোধন আছে একটি ছত্রের। [লেখক]

** ২১৯ পৃষ্ঠায় সংশোধন। [ঐ]

১৫. প্রবাহ (উপন্যাসের ধারা আলোচনা) — মৃত্যুঞ্জয় রায়। ১৬. অভিভাষণ (শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনী) — প্রমথ চৌধুরী। ১৭. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়লিপি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ, সত্যের সন্ধানে, ইসলাম ও তাহার প্রেরিত মহাপুরুষ, স্বামীর পত্র, চরকাবুড়ী, উলট পালট, রূপতৃষ্ণা-খগেন্দ্র মিত্র, আরতি, ফুল্লরা, বাংলার বাণী) নাম নেই। ?।

ঘ. শ্রাবণ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৩৫

১. সব বুঝি যায় (কথিকা)—আনন্দসুন্দর ঠাকুর (প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়)। ২. সমাজ ও মাসিক সাহিত্য (প্রবন্ধ) — ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৩. নারী (কবিতা)— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৪. স্থলপদ্ম (গল্প)—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫. ভুলের মূল্য (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৬. অনাগত প্রিয়া (কবিতা)—জ্যোতি সেন। ৭. পাতানো মা (গল্প)—রাধারাণী দত্ত। ৮. সে শুধু চাহিয়াছিল (কবিতা)—সুকুমার সরকার। ৯. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. উৎসর্গ (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ১১. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১২. শেলী (Andre Maurois-এর পদাঙ্ক অনুসরণে) — নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৪. ডাকঘর (পত্র-প্রসঙ্গ)—সম্পাদক

ঙ. ভাদ্র : ৫ম সংখ্যা : ১৩৩৫

১. রূপায়ণ (প্রবন্ধ)—মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। ২. শরৎপ্রশস্তি (কবিতা)—জগৎ মিত্র। ৩. বাতাস দিল দোল (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৪. সেদিন হারায়ে গেছে, স্বপ্ন যদি সত্য হোত (দুটি কবিতা)—জ্যোৎস্নাময়ী দত্ত। ৫. শেলী (Andre Maurois-এর পদাঙ্ক অনুসরণে)---নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ৬. মহিলা মজলিস (প্রবন্ধ, গল্প)—কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ৭. চিত্ত ও চিত্র (গল্প)—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ৮. কবির মুক্তি (কবিতা)—প্রফুল্লশঙ্কর গুহ। ৯. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১০. আমি যে প্রবাসী ভাই (কবিতা) — কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়। ১১. সাহিত্যে অশ্রদ্ধার অপরাধ (প্রবন্ধ)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৩. ডাক-পিওন (উপন্যাস*) — শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৪. ডাকঘর (বিভিন্ন প্রসঙ্গ) —সম্পাদক।

চ. আশ্বিন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ১৩৩৫

১. জেরোম কে. জেরোম ও তাঁহার সাহিত্য (প্রবন্ধ) — বুদ্ধদেব বসু। ২. আজ শরতে (কবিতা) — ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩. ডাক্তারের ফাঁড়া (গল্প) শচীন্দ্রনাথ ৪. গরীবের প্রেম (গল্প) - দীনেশচন্দ্র লোধ। ৫. দীপান্বিতা (কবিতা) — হেমচন্দ্র বাগচী। ৬. সাহিত্যে অনাচার (প্রবন্ধ) — পৃথ্বীসিংহ নাহার। ৭. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ৮. বিজলী (কবিতা) —মহমুদ হোসেন। ৯. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. ধরণী (কবিতা) — সুকুমার সরকার। ১১. শেলী (Andre Maurois)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে প্রবন্ধ) — নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১২. নিজের ও পরের (গল্প)

— জগদীশ গুপ্ত। ১৩. দোসরা আশ্বিন (কবিতা)— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৪. ডাকঘর (গোকুল নাগ, অতি আধুনিক সমালোচনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ)—সম্পাদক। ১৫. ডাক-পিওন (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৬. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপি : (বিনোদিনী জগদীশ গুপ্ত, বসুধারা নরেন্দ্র দেব, কালের ডায়েরী, মাতৃস্নেহ, সুরধনী, স্মৃতির আলো, মানুষ-গড়া, নারীর কেশ (গল্প), বেদে, মোয়াজ্জিন (পত্র), মেঘদূত (পত্র), উপাসনা (পত্র))—নাম নেই। ১৭. শরৎচন্দ্র-সম্বর্ধনা (বিবরণ)—নাম নেই। ১৮. টলস্টয় (জীবনী)—নাম নেই। ১৯. আপন মনে (প্রবন্ধ)— বিষ্ণু দে।

ছ. কার্তিক : ৭ম সংখ্যা : ১৩৩৫

১. নীড়ের মায়া (গল্প)—সুরমা দেবী। ২. বড়বাবু ছোটবাবু (গল্প)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩. বারোয়ারি পূজা (গল্প)—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। ৪. সুখ-দুঃখের বোঝা (গল্প)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। ৬. নায়ক-নায়িকা (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৭. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৮. মাতৃ-মূর্তি (নাটিকা)—মন্মথ রায়। ৯. বি. এন. ডবলিউ. আর (গল্প)—সুবোধ দাশগুপ্ত। ১০. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপিসম্পাদক প্রভৃতি।

জ. অগ্রহায়ণ : ৮ম সংখ্যা : ১৩৩৫

১. শরৎচন্দ্রের নারী-চিত্র (প্রবন্ধ)—বিপিনচন্দ্র পাল। ২. বিন্দুর ছেলে (প্রবন্ধ)— অবনীনাথ রায়। ৩. তোমার লাগিয়া (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী। ৪. ডাক-পিওন (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৫. পাহাড়ের বুকে (গল্প)—কিশোরীমোহন ভট্টাচার্য। ৬. ছায়া-ছবি (গল্প) — পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৭. দুঃখের পার (কবিতা) —যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৮. চৈতী হাওয়া (গল্প)—সরলকুমার অধিকারী। ৯. তোমারে ভুলিয়া গেছি (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১০. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১১. শরতের বিদায় (কবিতা)—জসীমউদ্দীন। ১২. শেলী (জীবন-কথা)— নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৩. সহজ প্রেম (কবিতা)—সুকুমার সরকার। ১৪. মাসিক সংবাদ... ১৫. চয়নিকা... ১৬. মিছিল (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৭. ডাকঘর (নানা প্রসঙ্গ)—সম্পাদক প্রভৃতি।

ঝ. পৌষ : ৯ম সংখ্যা : ১৩৩৫

১. ভদ্রলোকের এক কথা (গল্প)—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ২. তব মুখ পানে (কবিতা)—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩. ভৈরবী চক্র (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৪. প্রেম প্রশস্তি (কবিতা)—রাধারাণী দত্ত। ৫. ছেলেমানুষী (গল্প)—বুদ্ধদেব বসু। ৬. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৭. সিন্ধুকূলে (কবিতা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

৮. শেলী (জীবন-কথা)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ৯. কামনা (কবিতা) — জ্যোৎস্নাময়ী দত্ত। ১০. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় —নাম নেই। ১১. রুবাই ছন্দের জন্মকথা (প্রবন্ধ)—সুরেশচন্দ্র নন্দী। ১২. মিছিল (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৩. চয়নিকা নাম নেই। ১৪. শ্মশানচারী (কবিতা) — সন্ন্যাসী সাধু খাঁ। ১৫. মাসিক সংবাদ অজিতকুমার সেন। ১৬. দিব্ আনাই-হাফিজ (অনুবাদ) — মৌলভী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (মূল : ফার্সী)। ১৭. ডাকঘর (নানা প্রসঙ্গ)—সম্পাদক প্রভৃতি। ১৮. ঘুম (গল্প) —অমলেন্দু বসু।

ঞ. মাঘ : ১০ম সংখ্যা : ১৩৩৫

১. চতুর্দশপদী কবিতা (প্রবন্ধ)—বুদ্ধদেব বসু। ২. গৌরবান্বিত (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত। ৩. দৃষ্টির দোষ (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৪. গান —আবদুল কাদের। ৫. ডাক-পিওন (উপন্যাস) —শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৬. পারুল (গল্প)—ভবানী মুখোপাধ্যায়। ৭. দীপক (উপন্যাস) — দীনেশরঞ্জন দাশ। ৮. বিরহ- মিলন (কবিতা) — সুকুমার সরকার। ৯. মিনতি (কবিতা)—কনকলতা ঘোষ। ১০. চয়নিকা...। ১১. সভাপতির অভিভাষণ জলধর সেন। ১২. মাসিক সংবাদ—অজিতকুমার সেন। ১৩. শেলী (জীবন-কথা)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৪. দিব্-আন-ই-হাফিজ (অনুবাদ) মৌ. মু. মনসুরউদ্দীন (মূল : ফার্সী)। ১৫. দীপান্বিতা (সমালোচনা)—বুদ্ধদেব বসু। ১৬. পৌষ-পার্বণ (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ১৭. ডাকঘর—সম্পাদক প্রভৃতি। ১৮. শুভবিবাহ (গল্প)—সুবোধ দাশগুপ্ত।

ট. ফাল্গুন : ১১শ সংখ্যা : ১৩৩৫

১. বাঙলার পল্লী-সঙ্গীতে লীলাবাদ (প্রবন্ধ)—আবদুল কাদের। ২. ফাল্গুন-মাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে (কবিতা)—রাধারাণী দত্ত। ৩. গিটি (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৪. পত্রলেখা (কবিতা)—বিশ্বেশ্বর দাশ। ৫. ময়ূরপুচ্ছের নূতন কাহিনী (গল্প) —বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ৬. জবা (কবিতা)—সরোজবালা ঘোষ। ৭. কাল সে আসিবে (কবিতা)—জসীমউদ্দীন। ৮. চতুর্দশপদী কবিতা (প্রবন্ধ)—বুদ্ধদেব বসু। ৯. তখনও তুমি আস নাই ভাই (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১০. ভুলে যাওয়া (গল্প)—জাহাঙ্গীর ভকীল। ১১. শান্তিজল (গল্প)—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২. কল্পনা (কবিতা)—নিকুঞ্জমোহন সামন্ত। ১৩. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৪. মাসিক সংবাদ—অজিতকুমার সেন। ১৫. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপি- —সম্পাদক প্রভৃতি। ১৬. মিছিল (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঠ. চৈত্র : ১২শ সংখ্যা : ১৩৩৫

১. নবীন সাধক (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. শব (গল্প)—ফণীন্দ্র পাল। ৩. বাঙলার পল্লী-সঙ্গীতে লীলাবাদ (প্রবন্ধ) — আবদুল কাদের। ৪. একুখানি হাসি (কবিতা)—জসীমউদ্দীন। ৫. সংস্কার (গল্প) — সুনীলকুমার ধর। ৬. টমাস হার্ডি (কবিতা) — সারদাচরণ রায় চৌধুরী। ৭. ডাক-পিওন (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৮. বিরাজ-বৌ (প্রবন্ধ)—অবনীনাথ রায়। ৯. তুমি কাঁদো আর আমি কাদি (কবিতা)—কুমুদ ভট্টাচার্য। ১০. দিব্-আনই-হাফিজ (অনুবাদ)— মৌ, মু. মনসুরউদ্দীন (মূল : ফার্সী)। ১১. রক্ত কবরী (কবিতা)—জগৎবন্ধু মিত্র। ১২. কুলির প্রাণ (গল্প) — রানী সুরুচিবালা চৌধুরানী। ১৩, স্মরণ (কবিতা)—প্রণব রায়। ১৪. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৫. প্রিয়-সন্দর্শনে (কবিতা)—কনকলতা ঘোষ। ১৬. ভবিতব্য (গল্প)—হরিহর চন্দ্র। ১৭. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (স্মৃতিতর্পণ) —সম্পাদক। ১৮. বর্ষ শেষের নিবেদন—সম্পাদক।

সপ্তম বর্ষ : ১৩৩৬

ক. বৈশাখ : ১ম সংখ্যা : ১৩৩৬

১. দুয়ার (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. রবীন্দ্রাদিত্য (প্রবন্ধ) — অন্নদাশংকর রায়। ৩. পত্র ('বেদে' উপন্যাস সম্পর্কে)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪. শীতের সিন্ধু (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ৫. অতি-আধুনিক ইংরেজি কবিতা (প্রবন্ধ)—অভিনব গুপ্ত। ৬. ওপিঠ (গল্প)—সরোজকুমার রায় চৌধুরী। ৭. "প্রাণেশ্বর" (গল্প) — পান্নালাল অধিকারী। ৮. আকাশের ভাষা দাও কবি (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ৯. প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নের রূপ-মাধুর্য (সমালোচনা)—রাধারাণী দত্ত। ১০. আরব কবিতা — (অনুবাদ-আলোচনা) বিষ্ণু দে। (মূল : খলিল জিব্রান)। ১১. পাখীরা (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশ। ১২. অভিনয় (গল্প)—বুদ্ধদেব বসু। ১৩. পূরবী (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ১৪. প্রবাহ (নীতিমূলক সমালোচনা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

খ. জ্যৈষ্ঠ : ২য় সংখ্যা : ১৩৩৬

১. নবধর্মের প্রতীক্ষায় (প্রবন্ধ)—মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। ২. সার্বজনীন (কবিতা)— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩. রাইকমল (গল্প)—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪. ও ওষ্ঠের জ্যোৎস্না এক কণা (কবিতা)—ভবানী ভট্টাচার্য। ৫. মিছিল (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৬. কীর্তন (গান)—নজরুল ইসলাম। ৭. ডাক-পিওন (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৮. অভিভাষণ (প্রবন্ধ)—বিপিনচন্দ্র পাল। ৯. সৌন্দর্য-পিপাসা (কবিতা)—অন্নদাশংকর রায়। ১০. রাতের বাসা (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১১. মুক্তি-নির্ভর (কবিতা)—অমিয় চক্রবর্তী। ১২. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপিসম্পাদক প্রভৃতি।

১৩. কৃচ্ছ্রসাধন (গল্প)---ভূপতি চৌধুরী। ১৪. প্রবাহ (অশ্লীলতা সম্বন্ধে আলোচনা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৫. পূর্ণমনস্কাম (কবিতা)—অন্নদাশংকর রায়।

গ. আষাঢ় : ৩য় সংখ্যা : ১৩৩৬

১. স্বপ্ন ও সত্য (প্রবন্ধ)—কালিদাস রায়। ২. অখ্যাত (কবিতা)—জগৎ মিত্র। ৩. একটি মুহূর্ত (গল্প)—প্রণব রায়। ৪. জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়ামের পঞ্জিকা সংস্কার (প্রবন্ধ) — সুরেশচন্দ্র নন্দী। ৫. আড়াল (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ৬. রাতের বাসা (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৭. দূর (কবিতা)—অন্নদাশংকর রায়। ৮. নারায়ণ (গল্প) — প্রবোধ সান্যাল। ৯. ডাক-পিওন (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১০. কাল (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ১১. পত্রোত্তর (গল্প)—দেবকীকুমার বসু। ১২. প্রবাহ (সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ) — সু। ১৩. মিছিল (উপন্যাস) — প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৪. এত ঘৃণা করি তবু (কবিতা)—ভবানী ভট্টাচার্য। ১৫. অদৃশ্য ক্ষত (গল্প) সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ১৬. চলচ্চিত্র (প্রবন্ধ) — ডি. আর. (দীনেশরঞ্জন দাশ)। ১৭. সাহিত্য-সংবাদ...। ১৮. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপি-প। ১৯. কালের প্রতিভা (গল্প)—সরল সেন।

ঘ. শ্রাবণ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৩৬

১.গান নজরুল ইসলাম। ২. নাটকের স্বরূপ (প্রবন্ধ) — বিজনবিহারী বসু। ৩. দুইটি স্বপ্ন (গল্প) — পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৪. লেখাপড়া (কবিতা) —মৈত্রেয়ী দেবী। ৫. সঙ্গীত-স্বরলিপির মর্যাদা (প্রবন্ধ) — নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ৬. সমাপ্তি (কবিতা) — অন্নদাশংকর রায়। ৭. রাতের বাসা (উপন্যাস) — দীনেশরঞ্জন দাশ। ৮. শাশ্বত (কবিতা)—সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ৯. নৃত্য করে নটরাজ—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১০. দ্বীপান্তরের আসামী (গল্প) — সুধীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ১১. তারুণ্য (কবিতা)—নরেন্দ্র দেব। ১২. স্রোতের মুখে (গল্প)—তারা মুখোপাধ্যায়। ১৩. কাল সে আসিয়াছিল (কবিতা)—জসীমউদ্দীন। ১৪. চলচ্চিত্র (প্রবন্ধ)—ডি. আর (দীনেশরঞ্জন দাশ)। ১৫. অসংলগ্ন (আলোচনা) —কৃত্তিবাস ভদ্র (প্রেমেন্দ্র মিত্র)। ১৬. নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু...। ১৭. প্রবাহ (নানা প্রসঙ্গ)—সু। ১৮. বিবিধ সংবাদ।

ঙ. ভাদ্র : ৫ম সংখ্যা : ১৩৩৬

১. লীলাকীর্তন (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ২. পতন অভ্যুদয়—বীরেশ্বর সেন। ৩. সাবিত্রী (কবিতা)—অন্নদাশংকর রায়। ৪. ডব্লউ. আর-এর ব্রাঞ্চ লাইন (গল্প) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ৫. শৈশব (কবিতা)—বিমলা দেবী। ৬. গান নজরুল ইসলাম। ৭. পাহাড়ী নদী (গল্প)—মায়া দেবী। ৮. কালো চোখে এত আলো (কবিতা)—ভবানী ভট্টাচার্য। ৯. বর্তমান রুষ-সাহিত্যে আইভান বুনিন (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্র দাস। ১০. তেপাটি (কবিতা)—বিষ্ণু দে। ১১. রাতের বাসা (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ।

১২. মায়ামৃগ (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ সেন। ১৩. প্রবাহ (নানা প্রসঙ্গ)—সু। ১৪. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপি—অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। ১৫. যতীন্দ্রনাথ দাস (স্মৃতিতর্পণ)—সু।

চ. আশ্বিন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ১৩৩৬

১. সৃষ্টি-স্থিতি (গল্প)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ২. ষড়-রত্ন (গল্প)—বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩. পান্থাবাস (কবিতা)—যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ৪. নূপুর (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৫. গ্রীক কবি কোস্টিস পালামাস (প্রবন্ধ)—সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী। ৬. অকারণ (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৭. তির্যক রেখা (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৮. আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য (প্রবন্ধ)—ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ। ৯. খোলা দরজা (গল্প) ---সুবোধকুমার দাশগুপ্ত। ১০. এ সুন্দর ধরণীরে লাগিয়াছে ভাল (কবিতা)—জিতেন্দ্র বক্সী। ১১. সেই ঘর মরি খুঁজিয়া (আলোচনা) — গিরিজা মুখোপাধ্যায়।

ছ. কার্তিক : ৭ম সংখ্যা : ১৩৩৬

১. আবিষ্কার (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. পৌরাণিক প্রশাখা (গল্প) — বিষ্ণু দে। ৩. গ্রামের মায়া (গল্প) — সুবোধ দাশগুপ্ত। ৪. সৃজন (কবিতা) — সুকুমার সরকার। ৫. রাতের বাসা (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৬. অভিনয় নয় (গল্প) — বুদ্ধদেব বসু। ৭. চতুরঙ্গে শরচ্চন্দ্র (আলোচনা)—ফণীভূষণ চন্দ। ৮. অচেনা (কবিতা)—কার্তিকচন্দ্র শীল। ৯. ওমর খৈয়াম (গীতি-কাব্য)—হীরেন্দ্রকুমার বসু। ১০. প্রবাহ (গলওয়ার্দি, সুধীন্দ্র ঠাকুর প্রসঙ্গ) — সত্যেন্দ্র দাস।

জ. অগ্রহায়ণ : ৮ম সংখ্যা : ১৩৩৬

১. গন্ধ (গল্প)—প্রণব রায়। ২. দুটি কথা (কবিতা) ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩. ভূতের বোঝা (গল্প)---কল্যাণী পাল। ৪. রামধনু (গল্প)---সত্যেন্দ্র দাস। ৫. ঝঝপের দহ (কবিতা)— বন্দে আলী মিয়া। ৬. প্রবাহ(ক) শিবরাম চক্রবর্তীর কবিতা লীলাময় রায়।* (খ) টমাস মান সত্যেন্দ্র দাস। ৭. যোগ্যতা (কবিতা) —অন্নদাশংকর বায়। ৮. রাতের বাসা (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৯. পাটের ক্ষেতের মায়া (কবিতা)—মনোজ বসু। ১০. চলচ্চিত্র (আলোচনা)—ডি. আর। ১১. ডায়েরী (গল্প)—পরিমল গোস্বামী। ১২. মাসিক-সংবাদ (সাহিত্যিক প্রসঙ্গ)। ১৩. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়লিপি—সত্যব্রত ইত্যাদি।

ঝ. পৌষ : ৯ম সংখ্যা : ১৩৩৬

১. সঙ্কেতময়ী (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. ব্যঙ্গ (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৩. মালা (কবিতা)—নীলিমা রায়। ৪. কাজললতা (বড় গল্প)—প্রবোধকুমার

সান্যাল। ৫. ভিক্ষুক (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ৬. চরিত্রহীন (প্রবন্ধ)—অবনীনাথ রায়। ৭. মানব (কবিতা)—শিশির ঘোষ। ৮. তোমাকে (কবিতা)— প্রণব রায়। ৯. রাতের বাসা (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. ভবিষ্যৎ (কবিতা) —অন্নদাশংকর রায়। ১১. চলচ্চিত্র (আলোচনা)—ডি. আর। ১২. প্রবাহ (নাটক ও কালিদাস নাগ প্রসঙ্গ) — সত্যেন্দ্র দাস। ১৩. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়লিপি। ১৪. গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট বিশেষ নিবেদন দীনেশরঞ্জন দাশ। **

* অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছদ্মনাম। প্রকাশক।

টলস্টয়, গর্কি, রলাঁ প্রমুখ বিশ্বপরিচিত লেখকদের ক্ষেত্রে টীকা দেওয়া হয়নি। যদিও নিয়মানুসারে টীকার প্রয়োজন ছিল। প্রকাশক।

উৎস : কল্লোলের কাল, —জীবেন্দ্র সিংহরায়।

দীনেশরঞ্জন দাসের আঁকা কার্টুন

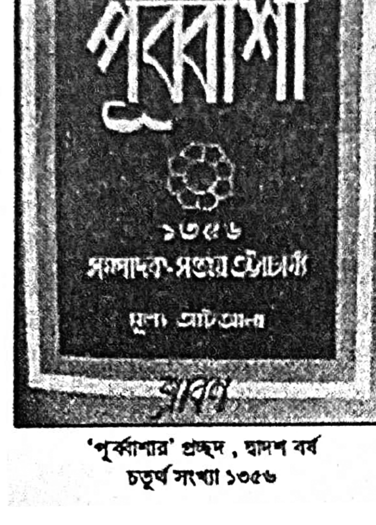

'পূর্ব্বাশার' প্রচ্ছদ , দ্বাদশ বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা ১৩৫৬

কল্লোল

সচিত্র মাসিক পত্র ৫ম বর্ষ, ১৩৩৪ সাল

বার্ষিক মূল্য ৩।০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ।০ আনা.

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কার্য্যালয়—১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

বৈশাখ হইতে বর্ষ আরম্ভ। এ বৎসরের দুই জন প্রসি- লেখকের দুই-খানি নূতন উপন্যাস, একখানি ইউরোপী- উপন্যাসের অনুবাদ ও অন্যান্য অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধনে সমগ্র বাংলার তা- বাংলার উদীয়মান বহু চিন্তাশীল ও সৌন্দর্য্যোপাসক লেখকের সমাবেশে কল্লোল বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

আপনি কল্লোলের গ্রাহক হইয়া জাতীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করুন।

প্রবাসী

সম্পাদক
বুদ্ধদেব বসু

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬)

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)

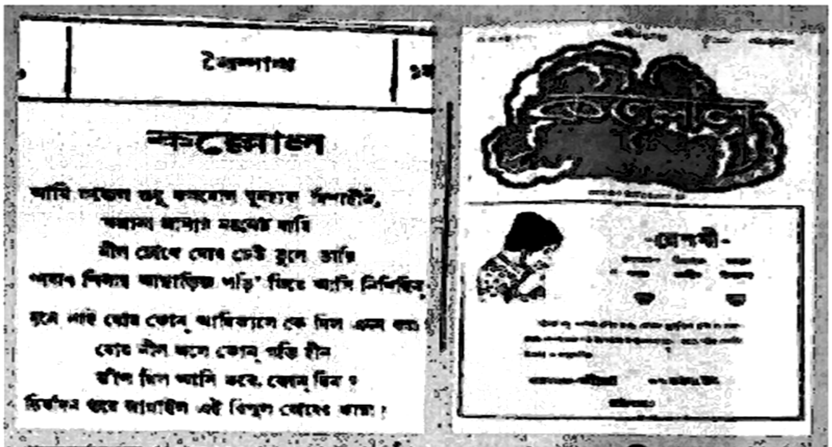

কল্লোলের প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা কল্লোলের একটি সংখ্যার প্রচ্ছদ